তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮
তৃতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৯১

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫১ ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

উপন্যাস

বিবিধ

পঞ্চগ্রাম

এক

আষাঢ় মাস। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা পর্ব; দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে আষাঢ়ে রথযাত্রা হিন্দুর সর্বজনীন উৎসব। পুরীতে জগন্নাথ-বিগ্রহের রথযাত্রাই ভারতবর্ষে প্রধান রথযাত্রা। সেখানেও আজ জগন্নাথ-বিগ্রহ জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের ঠাকুর; অবশ্য এ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষত্ব কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; হিন্দুদের সকলেই আজ রথের দড়ি স্পর্শ করিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহের স্পর্শ-পুণ্যলাভের অধিকারী। জগন্নাথ-বিগ্রহ কাঙালের ঠাকুর।

পুরীর রথযাত্রা প্রধান রথযাত্রা হইলেও, হিন্দু-সমাজের সর্বত্র বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের প্রায় গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্র বৃহৎ আকারে রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু-গৃহে আজ জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হইবে। আম কাঁঠালের সময়, আম-কাঁঠাল ভোগের একটি অপরিহার্য উপকরণ। ধনী জমিদারদের অনেকেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রথ আছে; কাঠের রথ, পিতলের রথ। এই রথে শালগ্রাম-শিলা অথবা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহমূর্তিকে অধিষ্ঠিত করিয়া পুরীর অনুকরণে রথ টানা হয়। বৈষ্ণবদের মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সংকীর্তন হয়, মেলা বসিয়া থাকে। বাংলার চাষীদের অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী, তাহারা এই পর্বটি বিশেষ আগ্রহে পালন করে; হলকর্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া তাহারা পর্বটিকে আপনাদের জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়াইয়া লইয়াছে। দু-দশখানা গ্রাম অন্তর অবস্থাপন্ন-চাষীপ্রধান গ্রামে বাঁশ-কাঠ দিয়া প্রতি বৎসর নূতন রথ তৈয়ারী করিয়া পর্বের সঙ্গে উৎসব করে। ছোট-খাটো মেলা বসে। আশপাশের লোকজন ভিড় করিয়া আসে। কাগজের ফুল, রঙীন কাগজে মোড়া বাঁশী, কাগজের ঘূর্ণিফুল, তালপাতার তৈরী হাত-পা নাড়া হনুমান, দুম-পটকা বাজী, তেলেভাজা পাঁপর, বেগুনি, ফুলুরি ও অল্পস্বল্প মনিহারীর জিনিস বিক্রি হয়।

মহাগ্রামের ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রার অনুষ্ঠান অনেক দিনের. ন্যায়রত্নের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ রথ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনঠাকুর রথারোহণ করেন; পাঁচচূড়া-বিশিষ্ট মাঝারি আকারের কাঠের রথ। একটি মেলাও বসে। আগে মেলাটা বেশ বড় হইত। বিশেষ করিয়া লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের টুকরা, বাবুই-ঘাসের দড়ি, তৈয়ারী দরজা-জানালা এবং কামারের সামগ্রী অর্থাৎ লোহার বড় গজাল, ফাল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারী, হাতা, খন্তা কিনিতে কয়েকখানা গ্রামের লোকই এখানে ভিড় করিয়া আসিত। কিন্তু এখন আর সে সব জিনিস কেনাবেচা হয় না। স্থানীয় ছুতার-কামারেরা এখন সাহস করিয়া এ সব জিনিস মেলায় বিক্রির জন্য তৈয়ারী করে না। তাহাদের পুঁজির অভাবও বটে, আবার লোকে কেনে না বলিয়াও বটে। একমাত্র লাঙলের জন্য বাবলাকাঠের কেনাবেচা এখনও কিছু হয় এবং বাবুই-ঘাস এবং বাবুই-দড়িও এখনও কিছু বিক্রি হয়।

তবে অন্য কেনাবেচা কম হয় নাই, দোকানপাটও পূর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় আসে, লোকের ভিড়ও বাড়িয়াছে। মাতব্বর ছাড়াও লোকজনেরা ভিড় করিয়া আসিয়া থাকে। সস্তা শৌখীন মনিহারী জিনিসের দোকান, তৈরী জামা কাপড়ের দোকান আসে, জংশনের ফজাই শেখের জুতার দোকানও আসিয়া একপাশে বসে। কেনাবেচা যাহা হয় তাহা—এইসব দোকানেই। লোকও অনেক আসে। কয়েকখানা গ্রামের মাতব্বর লোকেরা আজও সসম্ভ্রমে ন্যায়রত্নের বাড়ীতে ঠাকুরের রথযাত্রা উপলক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়, রথের টানে প্রথম মাতব্বরেরাই দড়ি ধরিবার অধিকারী। অপর লোকের জনতা দোকানেই বেশী। এখনও তাহারা ভিড় করিয়াই আসে। পাঁপর খাইয়া, কাগজের বাঁশী বাজাইয়া, নাগর-দোলায় চাপিয়া ঘুরপাক খাইয়া তাহারাই মেলা জমাইয়া দেয়।

মহাগ্রাম এককালে—এককালে কেন, প্রায় সত্তর-আশী বৎসর পূর্বেও—ঐ অঞ্চলের প্রধান গ্রাম ছিল। ন্যায়রত্নই এ অঞ্চলের সমাজপতি, পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিতবংশের উত্তরাধিকারী। এককালে ন্যায়রত্নের পূর্বপুরুষেরাই ছিলেন এখানকার পঞ্চবিংশতি গ্রাম-সমাজের বিধান-দাতা। পঞ্চবিংশতি গ্রাম-সমাজ অবশ্য বর্তমানকালে কল্পনার অতীত। কিন্তু এককালে ছিল। গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রাম, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, বিংশতিগ্রাম, পঞ্চবিংশতি-গ্রাম—এমনি ভাবেই গ্রাম্য-সমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল ; বহুপূর্বে শতগ্রাম, সহস্রগ্রাম পর্যন্ত এই বন্ধন-সূত্র অটুটও ছিল। তখন যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য। এখন যাতায়াত সুগম হইয়াছে কিন্তু সম্পর্ক-বন্ধন বিচিত্রভাবে শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজ অবশ্য সে সব নিতান্তই কল্পনার কথা, তবে পঞ্চগ্রাম-বন্ধন এখনও আছে। মহাগ্রাম আজ নামেই মহাগ্রাম, কেবলমাত্র ন্যায়রত্নের বংশের অস্তিত্বের লুপ্তপ্রায় প্রভাবের অবশিষ্টাংশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া মহৎ বিশেষণে কোনমতে টিকিয়া আছে। রথযাত্রার মতই কয়েকটি পর্ব উপলক্ষে লোকে ন্যায়রত্নদের টোল ও ঠাকুরবাড়ীতে আসে। রথযাত্রা, দুর্গাপূজা, বাসন্তীপূজা—এই তিনটি পর্ব এখনও ন্যায়রত্নের বাড়ীতে বেশ একটু সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আজ ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রার উৎসব।

ন্যায়রত্ন নিজে হোম করিতেছেন। টোলের ছাত্রেরা কাজ-কর্ম করিয়া ফিরিতেছে। কয়েকখানি গ্রামের মাতব্বরেরা আটচালায় সতরঞ্জির আসরে বসিয়া আছে। গ্রাম্য চৌকিদার এবং আরও কয়েকজন তামাক সাজিয়া দিতেছে। মেলার মধ্যেও লোকজনের ভিড় ধীরে ধীরে ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। একটা ঢাকী ঢাক বাজাইয়া দোকানে দোকানে পয়সা মাগিয়া ফিরিতেছে।

বর্ষার আকাশে ঘনঘোর মেঘের ঘটা ; শূন্যলোক যেন ভূ-পৃষ্ঠের নিকট স্তরে স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই-একখানা পাতলা কালো ধোঁয়ার মত মেঘ অতি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়াছে ; মনে হইতেছে সেগুলি বুঝি ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী উঁচু বাঁধের উপর বহুকালের সুদীর্ঘ তালগাছগুলির মাথা ছুঁইয়া চলিয়াছে।

ঢাকের বাজনা শূন্যলোকের মেঘস্তরের বুকে প্রতিহত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শিবকালীপুরের দেবু ঘোষ ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ ধরিয়া দ্রুতপদে মহাগ্রামের দিকে চলিয়াছিল। ঢাকে গুরুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি দিগন্তে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহাগ্রামেই ঢাক বাজিতেছে। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রা। এতক্ষণে ঠাকুর বোধ হয় রথে চড়িলেন। রথ হয়ত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুত-গতিতেই সে চলিয়াছিল, তবু সে তাহার গতি আরও দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশ্বনাথ দেবুর স্কুলের বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, স্কুলে তাহারা ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। ক্লাসে কোনবার দেবু ফার্স্ট হইত, কোনবার হইত বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ এম্-এ পড়ে। দেবু পাঠশালার পণ্ডিত। এককালে, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুর পূর্বে, একথা মনে করিয়া তীব্র অসন্তোষের আক্ষেপে দেবু বিদ্রূপের হাসি হাসিত। কিন্তু এখন আর হাসে না—দুঃখও তাহার নাই। প্রাক্তন অথবা অদৃষ্ট অমোঘ অখণ্ডনীয় বলিয়া নয়, সে যেন এখন এসবের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যতীনকে।

ডেটিন্যু যতীন তাহাকে দিয়া গেল অনেক। এ সমস্তকে জয় করিবার শক্তি—যতীনের সাহায্যই তাহাকে দিয়াছে। যতীনবাবু আজ এখান হইতে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ পূর্বে সে তাহাকে ময়ূরাক্ষীর ঘাট পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া বিদায় লইয়াছে। সেখান হইতে সে মহাগ্রামের দিকে আসিতেছে। তাহার শূন্য জীবনে ডেটিন্যু যতীনই ছিল একমাত্র সত্যকারের সঙ্গী। আজ সে-ও চলিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—এই বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিনটিতেই এই ময়ূরাক্ষীর ঘাটেই কোন নির্জন গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ওই ঘাটের পাশেই—ময়ূরাক্ষীর বালুচরের উপর সে তাহার খোকনকে এবং প্রিয়তমা বিলুকে ছাই করিয়া দিয়াছে। জৈষ্ঠ্যের ঝড়ে—অল্পস্বল্প বৃষ্টিতে সে চিহ্ন আজও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই; তাহার পাশ দিয়া ভিজা বালির উপর পায়ের ছাপ আঁকিয়া যতীন চলিয়া গেল। আজ যে ঘটা করিয়া মেঘ নামিয়াছে, নৈঋর্ত কোণ হইতে যে মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে বর্ষার বর্ষণ নামিতে আর দেরি নাই। গ্রাম মাঠ ঘাট ভাসিয়া ময়ূরাক্ষীতে ঢল নামিবে—সেই ঢলের স্রোতে খোকন-বিলুর চিতার চিহ্ন, যতীনের পায়ের দাগ নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে—সেই মুছিয়া যাওয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ীর আহ্বান সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। যতীন তাহাকে জীবনে দিয়াছে একটি সুস্পষ্ট আদর্শ আর ন্যায়রত্ন তাহার জীবনে দিয়াছেন এক পরম সান্ত্বনা। তাঁহার সে গল্প যে ভুলিবার নয়। ঠাকুরমশাই আজ তাহাকে বিশেষ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহার একটি বিশেষ কারণও আছে। স্নেহ তো আছেই, কিন্তু যে কারণ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—সেই কথাটিই দেবু ভাবিতেছিল।

সরকারী জরীপ আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে সেটেলমেণ্ট সার্ভে হইয়া গেল। রেকর্ড অব্ রাইট্সের ফাইন্যাল পাব্লিকেশনও হইয়া গিয়াছে। সেটেলমেণ্টের খরচের অংশ দিয়া প্রজারা 'পরচা' লইয়াছে। এইবার জমিদারের খাজনা-বৃদ্ধির পালা। সর্বত্র সকল জমিদারই এক ধুয়া তুলিয়াছে- খাজনা-বৃদ্ধি। আইনসম্মতভাবে তাহারা প্রতি দশ বৎসর অন্তর নাকি খাজনায় বৃদ্ধি পাইবার হক্‌দার। আজ বহু দশ বৎসর পর সেটেলমেণ্টের বিশেষ সুযোগে তাহারা খাজনা বৃদ্ধি করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—এইটাই হইল খাজনা-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। রাজসরকারের প্রতিভূস্বরূপে জমিদারের প্রাপ্য নাকি ফসলের অংশ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে জমিদারেরা সেই প্রাপ্য ফসলের তৎকালীন মূল্যকেই টাকা-খাজনায় রূপান্তরিত করিয়াছিল। সুতরাং আজ যখন ফসলের মূল্য সেকাল হইতে বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, তখন জমিদার বৃদ্ধি পাইবার হক্‌দার। তা ছাড়া আরও একটা প্রকাণ্ড সুবিধা জমিদারের হইয়াছে। সেটেলমেণ্ট আইনের পাঁচ-ধারা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সাময়িক আদালত বসিবে। সেখানে কেবল এই খাজনা-বৃদ্ধির উচিত-অনুচিতের বিচার হইবে। অতি অল্প খরচে বৃদ্ধির মামলা দায়ের করা চলিবে—বিচারও হইবে অল্প সময়ের মধ্যে। তাই আজ ছোট বড় সমস্ত জমিদারই একসঙ্গে বৃদ্ধি-বৃদ্ধি করিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।

প্রজারাও বসিয়া নাই, 'বৃদ্ধি দিব না' এই রব তুলিয়া তাহারাও মাতিয়া উঠিয়াছে। হ্যাঁ, 'মাতন' বই কি! যুক্তি আছে তাহাদের, তর্কও তাহারা করে। তাহারা বলে—ফসলের দাম বাড়িয়াছে সে কথা ঠিক, কিন্তু আমাদের সংসার-খরচ কত বাড়িয়াছে দেখ! জমিদার বলে—সে দেখিবার কথা আমাদের নয়, আমাদের সম্পর্ক রাজভাগ ফসলের দামের সঙ্গে। এ সূক্ষ্ম যুক্তি প্রজারা বুঝিতে পারে না—বুঝিতে চায় না। তাহারা বলিতেছে—আমরা 'দিব না'। এই 'দিব না' কথাটির মধ্যে তাহারা আস্বাদ পায় এক অদ্ভুত তৃপ্তির। একক কেহ পাওনাদারের প্রাপ্য দিব না বলিলে সমাজে সে নিন্দিত হয়, কিন্তু ওইটিই মানুষের যেন অন্তরের কথা। না দিলে আমার যখন বাড়িবে—অন্তত কমিয়া যাওয়ার দুঃখ হইতে বাঁচিব—তখন না-দিবার প্রবৃত্তিই অন্তরে জাগিয়া উঠে। তবে একক বলিলে সমাজে নিন্দা হয়, আদালতে পাওনাদার দেনাদারের কাছে সহজেই প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়। কিন্তু আজ যখন সমাজসুদ্ধ সকলেই দিব না রব তুলিয়াছে, তখন এ আর নিন্দার কথা কোথায়? আজ দাঁড়াইয়াছে দাবীর কথা। রাজদ্বারে পাওনাদার করুক নালিশ; কিন্তু আজ তাহারা একখানি বাঁশের কঞ্চি নয়, আজ তাহারা কঞ্চির আঁটি, মুট্ করিয়া অনায়াসে ভাঙিয়া যাইবার ভয় নাই। 'ভয় নাই' এই উপলব্ধির মধ্যে যে শক্তি আছে, যে মাতন আছে, সেই মাতনেই তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রায় সকল গ্রামের প্রজারাই ধর্মঘট করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। এখন প্রয়োজন তাহাদের নেতার। প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে দেবু নিমন্ত্রণ পাইয়াছে। তাহাদের গ্রাম শিবকালীপুরের লোকেরা তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ সব ব্যাপারে দেবুর আর নিজেকে জড়াইয়া ফেলিবার

ইচ্ছা ছিল না। বারবার সে তাহাদের ফিরাইয়া দিতেই চাহিয়াছে—তবু তাহারা শুনিবে না। এদিকে মহাগ্রামের লোকে শরণাপন্ন হইয়াছিল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের। ন্যায়রত্ন পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দেবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত আমার শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম—তুমি বিধান দিতে পার; বিবেচনা করিয়া তুমি ইহার বিধান দিও।"

আজ এই রথযাত্রা উপলক্ষে পঞ্চগ্রামের চাষী মাতব্বরেরা ন্যায়রত্নের ঠাকুরবাড়ীতে সমবেত হইবে। মহাগ্রামের উদ্যোক্তারা এই সুযোগে ধর্মঘটের উদ্যোগপর্বের ভূমিকাটা সারিয়া লইতে চায়। তাই বারবার দেবুকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছে। ন্যায়রত্ন নিজেও আবার লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত আমার আশীর্বাদ জানিবে। ঠাকুরের রথযাত্রা, অবশ্যই আসিবে। আমাকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর। আমার ঠাকুরের রথ চলিবে সংসার সমুদ্র পার হইয়া পরলোকে। ইহলোকে যাহাদের প্রভুর রথ সুখ-সম্পদময় মাসীর ঘরে যাইবে, তাহারা আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। দায়িত্বটা তুমি লইয়া আমাকে মুক্তি দাও। তোমার হাতে ভার দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কারণ মানুষের সেবায় তুমি সর্বস্ব হারাইয়াছ; তোমার হাতে ঘটনাচক্রে যদি লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হয়—তবু সে ক্ষতিতে অমঙ্গল হইবে না বলিয়া আমার প্রত্যয় আছে।" দেবু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাই স্ত্রী-পুত্রের চিতা-চিহ্নের বিপুল আকর্ষণ, বন্ধু যতীনের বিদায়-বেদনার অবসাদ—সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে মহাগ্রাম অভিমুখে চলিয়াছে।

ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর হইতে সে মাঠের পথে উত্তরমুখে নামিল। খানিকটা দূর গিয়াই মহাগ্রাম। ঢাকের শব্দ উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। পথচলার গতি আরও খানিকটা দ্রুততর করিয়া, জনতার ভিড় ঠেলিয়া শেষে সে ন্যায়রত্নের ঠাকুরবাড়ীর আটচালায় আসিয়া উঠিল। পূজার স্থানে প্রজ্বলিত হোমবহ্নির সম্মুখে বসিয়াই ন্যায়রত্ন তাহাকে স্মিতহাস্যে সস্নেহে নীরব আহ্বান জানাইলেন।

দেবু প্রণাম করিল।

চাষী মাতব্বরেরাও দেবুকে সাগ্রহে সস্নেহে আহ্বান করিল।—এস এস, পণ্ডিত এস। এই—এই এইখানে বস। সকলেই তাহাকে বসিতে দিবার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিয়া কাছে পাইতে চাহিল। দেবু কিন্তু সবিনয়ে হাসিয়া এক পাশেই বসিল; বলিল—এই বেশ বসেছি আমি।—তবে তাহাদের আহ্বানের আন্তরিকতা তাহার বড় ভাল লাগিল। স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া সে যেন এ অঞ্চলের সকল মানুষের স্নেহ-প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। দুইবিন্দু জল তাহার চোখের কোণে জমিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অন্তরটা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। মানুষের এত প্রেম!

আসিয়াছে অনেকে। মহাগ্রামের মুখ্য ব্যক্তি শিবু দাস, গোবিন্দ ঘোষ, মাখন মণ্ডল, গণেশ গোপ প্রভৃতি সকলে তো আছেই—তাহা ছাড়া শিবকালীপুরের হরেন্দ্র ঘোষাল

আসিয়াছে, জগন ডাক্তারও আসিবে। দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস আসিয়াছে, সঙ্গে আরও কয়েকজন; বালিয়াড়ার বৃদ্ধ কেনারাম, গোপাল ও গোকুলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। কেনারাম সে-কালে গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, এখন সে বৃদ্ধ এবং অন্ধ; প্রাচীনকালের অভ্যাসবশেই বোধ করি দৃষ্টিশক্তিহীন চোখে এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চাহিয়া দেখিল, তারপর সঙ্গী গোপালকে মৃদুস্বরে ডাকিল—গোপাল!

গোপাল পাশেই ছিল, সে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—পণ্ডিত দেবু ঘোষ!

কুব্জ বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিয়া ডাকিল—দেবু? কই, দেবু কই?

দেবু আপনার-স্থান হইতেই উত্তর দিল—ভাল আছেন?

—এইখানে—এইখানে, আমার কাছে এস তুমি।

এ আহ্বান দেবু উপেক্ষা করিতে পারিল না, সে উঠিয়া আসিয়া বৃদ্ধের কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ জানাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম করছি।

আপনার দুইখানি হাত দিয়া দেবুর মুখ হইতে বুক পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ বলিল—তোমাকে দেখতেই এসেছি আমি। পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—চোখে দেখতে পাই না, দৃষ্টি নাই, তাই তোমাকে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দেখছি।

দেবু এই বৃদ্ধের কথার অন্তরালে যে সমবেদনা এবং প্রশংসার গাঢ় মধুর আস্বাদ অনুভব করিল, সে উচ্ছ্বাসকে এড়াইবার জন্যই প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিয়া বলিল—চোখের ছানি কাটিয়ে ফেলুন না। এই তো 'বেনাগড়ে'তে পাদ্রীদের হাসপাতালে একছার ছানি কাটিয়ে আসছে লোকে। সত্যি-সত্যিই ওখানে অপারেশন খুব ভাল হয়।

—অপারেশন? অস্ত্র করাতে বলছ?

—হ্যাঁ। সামান্য অপারেশন—হয়ে গেলেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

—কি দেখব? বৃদ্ধ অদ্ভুত হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি দেখব? তোমার শূন্য ঘর? তোমার চোখের জল? চোখ গিয়েছে ভালই হয়েছে দেবু। অকাল-মৃত্যুতে দেশ ছেয়ে গেল। সেদিন আমার একটা ভাগ্নে ম'ল, বোনটা বুক ফাটিয়ে কাঁদলে—কানে শুনলাম, কিন্তু তার মরা মুখ তো দেখতে হল না! এ ভাল, দেবু এ ভাল! এখন কানটা কালা হয় তো এ সব আর শুনতেও হয় না।

বৃদ্ধের দৃষ্টিহীন বিস্ফারিত চোখ হইতে জলের ধারা মুখের কুঞ্চিত লোল চর্ম সিক্ত করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। ম্লান হাসিমুখে দেবু চুপ করিয়া রহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না। সমবেত সকলের কথাবার্তাও বন্ধ হইয়া গেল। শুধু ন্যায়রত্নের মন্ত্রধ্বনি একটা সঙ্গীতময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া উচ্চারিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়েই 'টোল-বাড়ী'র আটচালার বাহিরে খোলা উঠানে রাস্তা হইতে আসিয়া উঠিল আধুনিক সুদর্শন তরুণ, দেবুরই সমবয়সী। তাহার পিছনে একটি কুলির মাথায় ছোট একটি সুটকেস ও একটি ফলের ঝুড়ি। দেবু সাগ্রহে উঠিয়া দাঁড়াইল—বিশু-ভাই!

দেবুর বিশু-ভাই—বিশ্বনাথ—ন্যায়রত্নের পৌত্র।

ন্যায়রত্নের তখন কথা বলিবার অবকাশ ছিল না, শুধু তাঁহার ঠোঁটের কোণে মন্ত্রোচ্চারণের ছেদের মধ্যে একটু সস্নেহ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দুই

শিবকালীপুর অঞ্চলে—শিবকালীপুরেই প্রথম খাজনা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ধর্মঘটের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আগুন জ্বলিতেই প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুস্তরে প্রবাহ জাগিয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আগুনের আশপাশের বস্তুগুলির ভিতরের দাহিকা শক্তি অগ্নির স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া যেন অধীর আগ্রহে কাঁপে। খড়ের চালে যখন আগুন জ্বলে, তখন পাশের ঘরের চালের খড় উত্তাপে স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভকেশরের মত ফুলিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। অগ্নিকণার স্পর্শ না পাইলেও উত্তাপ গ্রাস করিতে করিতে সে চালও এক সময় দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আগুন জ্বলে, সে আগুনের উত্তাপে আশপাশের ঘরেও আগুন লাগে। তেমনি ভাবেই শিবকালীপুরের ধর্মঘট চারিপাশের গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িল। দিন কয়েকের মধ্যেই এ অঞ্চলে প্রায় সকল গ্রামেই ধুয়া উঠিল—খাজনা-বৃদ্ধি দিতে পারিব না। দিব না। কেন বৃদ্ধি? কিসের বৃদ্ধি?—অন্যদিকে শিবকালীপুরের নূতন পত্তনীদার চাষী-হইতে-জমিদার শ্রীহরি ঘোষও সাজিল। সে পাকা মামলাবাজ গোমস্তা, সদরের প্রধান দেওয়ানী-আইনবিদ্‌ উকীল এবং পাইক-লাঠিয়াল লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া সে ঘোষণা করিল—তাহার স্বপক্ষে আইনের সপ্তসিন্ধু উত্তাল হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার অপরিমেয় অর্থশক্তি দ্বারা সেই সিন্ধু-সলিল ক্রয় করিয়া আনিয়া সে এই ক্ষুদ্র শিবকালীপুরকে প্লাবিত করিয়া দিবে। খাজনা-বৃদ্ধির মামলা লইয়া সে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়িবে। আশপাশের জমিদারেরাও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিল। তাহারাও শ্রীহরিকে আশ্বাস দিল।

রথযাত্রার কয়েকদিন পর।

এই কয়েক দিনের মধ্যেই ধর্মঘটের উত্তাপ গ্রীষ্মের উত্তাপের মত ছড়াইয়া পড়িল। প্রবল বর্ষণে মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। চাষের কাজ শুরু হইয়া গেল ঝপ করিয়া। রাত্রি থাকিতে চাষীরা মাঠে গিয়া পড়ে। চারিপাশের গ্রামগুলির মধ্যস্থলে মাঠের মধ্যেই কাজ করিতে করিতে ধর্মঘটের আলোচনা চলিতেছিল।

জলভরা মাঠের আইল কাটিতে কাটিতে ক্লান্ত হইয়া একবার তামাক খাইবার জন্য শিবু আসিয়া বসিল। চকমকি ঠুকিয়া শোলায় আগুন ধরাইয়া তামাক সাজিয়া বেশ জুত করিয়া বসিতেই আশপাশ হইতে কয়েকজন আসিয়া জুটিয়া গেল। কুসুমপুরের রহম শেখই প্রথমটা আরম্ভ করিল।

—চাচা, তোমরা লাগালুছ শুনলাম ?

শিবু দাস বিজ্ঞের মত একটু হাসিল।

এই সেদিন ন্যায়রত্নের বাড়ীতে ধর্মঘট করা ঠিক হইয়াছে।

দেবু তাহাদের সব বুঝাইয়া বলিয়াছে। বাধা-বিপত্তি দুঃখ-কষ্ট অনিবার্যরূপে যাহা আসিবে, তাহারই কথা সে বারবার বলিয়াছে। বিগত একশত বৎসরের মধ্যেই এই পঞ্চগ্রামে যত ধর্মঘট হইয়াছে তাহার কাহিনী শুনাইয়া জানাইয়াছে—কত চাষী জমিদারের সঙ্গে ধর্মঘটের দ্বন্দ্বে সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। বারবার বলিয়াছে, আইন যেখানে জমিদারের স্বপক্ষে, সেখানে 'বৃদ্ধি দিব না' এ কথা বলা ভুল, আইন অনুসারে অন্যায়। প্রজা ও জমিদারের অর্থ-শক্তির কথা এবং আইনানুযায়ী অধিকারের কথা স্মরণ করিয়া সে প্রকারান্তরে নিষেধই করিয়াছিল।

সকলে দমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র বিশু সেখানে উপস্থিত ছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আইন পাল্টায় দেবু-ভাই। আগে গভর্নমেন্টের মতে জমির মালিক ছিল জমিদার; প্রজার অধিকার ছিল শুধু চাষ-আবাদের। প্রজা কাউকে জমি বিক্রি করলে জমিদারের কাছে খারিজ-দাখিল করে হুকুম নিতে হত। জমির উপর মূল্যবান্ গাছের অধিকারও প্রজার ছিল না। কিন্তু সে আইন পাল্টেছে। প্রজারা যদি 'বৃদ্ধি দেব না' বলে—না-দেবার দাবীটাকে জোরালো করতে পারে, সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারে—তবে বৃদ্ধির আইন পাল্টাবে।

কথাটা বলিবামাত্র সমস্ত লোকের মনে একটিমাত্র যুক্তি স্ফীতকলেবর বিন্ধ্যপর্বতের মত মাথা ঠেলিয়া আকাশস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল—কোথা হইতে দিব? দিলে আমাদের থাকিবে কি? আমরা কি খাইয়া বাঁচিব? সরকারের এমন আইন কি করিয়া ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে?

অন্ধ বৃদ্ধ পণ্ডিত কেনারাম হাসিয়া বলিয়াছিল—কিন্তু বিশুবাবু, মারে হরি তো রাখে কে?

বৃদ্ধের কথায় সমস্ত মজলিসটা ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছিল। জীব-জীবনের ধাতুগত প্রকৃতি অনুযায়ী একজন অপরজনকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করিয়া শোষণ করিয়া আপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তোলে। যে পরাজিত হয়, শোষিত হয়, শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুক্তির প্রচেষ্টায় সে বিরত হয় না; সেক্ষেত্রে ক্ষোভ বা অভিমান সে করে না। কিন্তু প্রতিবিধানের জন্য—সে যাহার উপর নির্ভর করে, সে-ও যদি আসিয়া ওই শোষণকারীকেই সাহায্য করে, তাহার শক্তির চাপ চাপাইয়া দেয় প্রাণপণ মুক্তি-প্রচেষ্টার বুকে, তবে শোষিতের শেষ সম্বল—দুটি বিন্দু অশ্রুসিক্ত মর্মান্তিক ক্ষোভ; শুধু ক্ষোভ নয়—অভিমানও থাকে। সেই ক্ষোভ, সেই অভিমান তাহাদের জাগিয়া উঠিল।

বিশু এবার বলিয়াছিল—হরি যদি ন্যায়বিচার না করে মারতেই চায়, তবে এ হরিকে পাল্টে অন্য হরিকে পূজো করব আমরা।

দেবু শিহরিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—কি বলছ বিশু-ভাই! না—না, ও কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।

শুধু দেবু নয়, গোটা মজলিসটা শিহরিয়া উঠিয়াছিল। বিশু কিন্তু হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—বংশীধারী বা চক্রধারী গোকুল বা গোলকবিহারী হরির কথা বলছি না দেবু-ভাই, তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন মাথার ওপর। আমি বলছি আইন যাঁরা করেন তাঁদের কথা। যাঁরা আইন করেন—তাঁরা যদি আমাদের দুঃখের দিকে না চান, তবে আসছে-বারে আমরা তাঁদের ভোট দেব না। ভোট তো আমাদের হাতে!

এই সময় ন্যায়রত্ন আসিয়া বিশ্বনাথকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন পাশের ঘরেই ছিলেন; তিনি সবই শুনিতেছিলেন। বলিয়াছিলেন—বিশ্বনাথের সংসার-জ্ঞান নেই। ওর যুক্তিতে তোমরা কান দিও না। তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরা পাঁচজনে বিচার করে যা হয় কর।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলেও তুমুল তর্ক-কোলাহলের মধ্যে তাহাদের অন্তরের অকপট অভিলাষই জয়লাভ করিল—বৃদ্ধি দিব না।

দেবু বলিল—তবে আমি এর মধ্যে নেই। আমাকে রেহাই দাও।

—কেন?

—আমার মত—'বৃদ্ধি দেব না' এ কথা ঠিক হবে না। যা ন্যায়সঙ্গত তার বেশী দেব না এই কথাই বলা উচিত। এর জন্যে ধর্মঘট করতে হয়—আমি রাজী আছি।

—কিন্তু বিশুবাবু যে বললেন—'আমরা দেব না' বললে বৃদ্ধি-আইন পাল্টে যাবে!

মৃদু হাসিয়া দেবু বলিয়াছিল—ঠাকুরমশাই যে বললেন—বিশু-ভাইয়ের সংসার-জ্ঞান নেই, আমিও তাই বলি। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার আমাদের, বৃদ্ধি দেব না—পণ ধরলে, আমাদের জমি-জেরাত এক ছটাক কারও থাকবে না। অবশ্যি তারপর হয়ত আইন পাল্টাতে পারে।

জগন উঠিয়া বলিল—এটা তোমার কাপুরুষের মত কথা। সবাই যদি ধর্মঘট করে, তবে জমি কিনবে কে?

—কিনবে কে? হাসিয়া দেবু স্মরণ করাইয়া দিল কঙ্কণার এবং আশপাশের ভদ্রলোক বাবুদের কথা—জংশনের গদিওয়ালা মহাজনদের কথা।

জগনও এবার মাথা নিচু করিয়া বসিয়া ছিল।

অবশেষে দেবুর মতেই সকলে রাজী হইয়াছে। কিন্তু স্থির হইয়াছে—ও কথাটা ভিতরের কথা, প্রথমত বলা হইবে 'দিব না—বৃদ্ধি দিব না।'

শিবু দাস ওই ভিতর-বাহিরের কথা জানে,—তাই বিজ্ঞের মত একটু হাসিল।

—আমাদের তো কাল জুম্মার নমাজ—মছ্‌জেদেই সব ঠিক হবে আমাদের।

শিবু এবার প্রশ্ন করিল—দৌলত শেখ? শেখজী রাজী হয়েছে?

দৌলত শেখ চামড়ার ব্যবসায়ী ধনী লোক। অতীতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া

শিবু দাসের সন্দেহ জাগিয়া উঠিল দৌলত শেখ সম্বন্ধে। তাহাদের গ্রামেও ঠিক ওই একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভদ্রলোকেরা ধর্মঘটে যোগ দিতে রাজী হয় নাই। তাহাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে মামলা-মকদ্দমা করিবে স্থির করিয়াছে। কেহ কেহ আপোসে বৃদ্ধি দিবে বা দিয়াছে। ভদ্রলোকেরা নিজ হাতে চাষ করে না বলিয়া তাহারা জমিদারকে ধরিয়াছে। প্রথমেই তাহারা বৃদ্ধি দিতেছে বলিয়া ভদ্রতা এবং আনুগত্যের দাবীও তাহাদের আছে। ইহারা সকলেই চাকুরে এবং গরীব ভদ্র গৃহস্থ।

রহম হাসিয়া বলিল—ত্যালে আর পানিতে কখনও মিশ খায় চাচা? শ্যাখ আলাদা মামলা করবে। সবারই সঙ্গে সি নাই।

কুসুমপুরের পাশেই দেখুড়িয়া গ্রাম, দেখুড়িয়ার তিনকড়ি দাস দুর্ধর্ষ লোক, দুর্ধর্ষপনার জন্যই সে প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন সে অন্য লোকের জমি ভাগে চষিয়া খায়, শিবকালীপুরের এলাকার মধ্যেই কঙ্কণার ভদ্রলোকের জমিতে চাষ দিতে আসিয়াছিল, সে বলিল —আমাদের গাঁয়ের শালারা এখনও সব 'গুজুর গুজুর' করছে। আমি বলে দিয়েছি—যে দেবে সে দিতে পারে, আমি দোব না।

পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—জমি তো মোটে পাঁচ বিঘে। পঁচিশ বিঘে গিয়েছে, পাঁচ বিঘে আছে। যাক্, ও পাঁচ বিঘেও যাক্! তারপর তল্পীতল্পা নিয়ে বম্ বম্ করে পালাব একদিন!

রহম বলিল—তুরা সব তাক্ জানিস্ না। মেড়ার মতন ঢু মারতেই জানিস। লড়াই কি শুধু গায়ের জোরে হয়? প্যাঁচ হল আসল জিনিস। 'আমুতি'র (অম্বুবাচীর) লড়ায়ে সিবার এইটুকুন জনাব আলি—কেমন দিলে—তুদের লগেন গয়লাকে দড়াম করে ফেলে— দেখেছিলি?

তিনকড়ি চটিয়া উঠিল। সিধা হইয়া দাঁড়াইল।

দেখুড়িয়ার তিনকড়ি যেমন গোঁয়ার, দৈহিক শক্তিতেও সে তেমনি বলশালী লোক— তাহার উপর সে নামজাদা লাঠিয়ালও বটে। রহমের এই শ্লেষে সে চটিয়া উঠিল। চটিয়া উঠিবার হেতুও আছে। দেখুড়িয়ার লোকের সঙ্গে কুসুমপুরের সাধারণ চাষী মুসলমানদের শক্তি-প্রতিযোগিতা বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। দেখুড়িয়ার বাসিন্দাদের অধিকাংশই ভল্লাবাগ্দী; ভল্লাবাগ্দীদের শক্তি বাংলা দেশে বিখ্যাত। তিনকড়ি চাষী সদগোপ হইলেও ওই ভল্লাবাগ্দীদের নেতৃত্ব করিয়া থাকে। এ অঞ্চলে তাহার গ্রামের শক্তি তাহার অহঙ্কার। তাহার সেই অহঙ্কারে রহম ঘা দিয়াছে। শিবু দাস কিন্তু বিব্রত হইয়া উঠিল। দুজনে বুঝি লড়াই বাধিয়া যায়। সহসা বাঁ দিকে চাহিয়া শিবু আশ্বস্ত হইয়া বলিল—চুপ কর তিনকড়ি —চৌধুরী আসছেন!

ও-দিক হইতে দ্বারিকা চৌধুরী আসিতেছিল চাষের তদ্বিরে। সাদা কাপড় দিয়া ডবল করা ছাতাটি মাথায়, লাঠি হাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এ অঞ্চলে সকলেই দূর হইতে চিনিতে পারে। তা ছাড়া লোকটিকে সকলেই শ্রদ্ধা-সম্মান করে। শিবু দাস দূর হইতে চৌধুরীকে দেখিয়া

বলিল—চৌধুরী আসছেন, চুপ কর।

চৌধুরীরা একপুরুষ পূর্বে জমিদার ছিল, এখন জমিদারী নাই। চৌধুরী বর্তমানে চাষ-বাস বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছে, বৃত্তি অনুসারে চাষীই বলিতে হয়, তবুও চৌধুরীরা, বিশেষতঃ বৃদ্ধ চৌধুরী এখনও সাধারণ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, লোকও বৃদ্ধ চৌধুরীকে একটু বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখে।

চৌধুরী কাছে আসিয়া অভ্যাসমত মৃদু হাসিয়া বলিল—কি গো বাবা সকল, তামাক খেতে বসেছেন সব?

আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিতে চৌধুরী এমনি ভাবেই সকলকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। আপনি বলিয়া সম্বোধন করিলে প্রত্যুত্তরে তুমি এ সংসারে কেহ বলিতে পারে না।

শিবু দাস উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—পেন্নাম। এইবার তাহলে সেরে উঠেছেন?

চৌধুরী বলিল—হ্যাঁ বাবা, উঠলাম। পাপের ভোগ এখনও আছে—সেরে উঠতে হল। কিছুদিন পূর্বে শিবকালীপুরের নূতন পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষ ও দেবু ঘোষের মধ্যে একটা গাছ কাটা লইয়া দাঙ্গা বাধিয়াছিল। শ্রীহরি ঘোষ দেবু ঘোষকে জব্দ করিবার জন্য তাহার পিতামহের প্রতিষ্ঠা করা গাছ কাটিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল; দেবু নির্ভয়ে উদ্যত কুড়ুলের সামনে দাঁড়াইয়া বাধা দিয়াছিল। সেই দাঙ্গায় উভয় পক্ষকে নিরস্ত করিতে গিয়া—চৌধুরী শ্রীহরি ঘোষের লাঠিয়ালের লাঠিতে আহত হইয়া কয়েক মাসই শয্যাশায়ী ছিল। ঘটনায় সকলেই হায় হায় করিয়াছে।

শিবু দাস বলিল—কালকের মজলিসের কথা শুনেছেন?

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—শুনলাম বৈকি। জগন ডাক্তার মশায় গিয়েছিলেন আমার কাছে।

ব্যগ্র হইয়া শিবু প্রশ্ন করল—কি হল?

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিবার অভিপ্রায় তাহার ছিল না। প্রসঙ্গটা সে এড়াইয়া যাইতে চায়।

শিবু কিন্তু আবার প্রশ্ন করিল—চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, সেকেলে লোক; একেলে কাণ্ড-কারখানা বুঝিও না, সহ্যও হয় না। ও-সবে আমি নাই।

কথাটা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত অশোভন নীরবতার মধ্যে কাটিবার পর চৌধুরী অন্য প্রসঙ্গ আনিবার জন্যই হাসিয়া বলিল—জল তো এবার ভাল—সকাল-সকালই বর্ষা নামল—এখন শেষ-রক্ষে করলে হয়!

রহম শেখ কথা বলিবার একটা সূত্র খুঁজিতেছিল—পাইবামাত্র সে সেলাম করিয়া বলিল—সেলাম গো চৌধুরী জ্যাঠা। শেষ-রক্ষে কিন্তু হবে না—ই একেবারে খাঁটি কথা।

—সেলাম। কি রকম? শেষ-রক্ষে হবে না কি করে বলছেন শেখজী?

—পাপ। পাপের লেগে বলছি। আল্লার দুনিয়া পাপে ভরে গেল। বড়লোকের

গোড়ের তলায় দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ কুত্তার মতন লেজ নাড়ছে ; পাপের আবার বাকী আছে চৌধুরী মশায় ?

—তা বটে। তবে বড়লোক, গরীবলোক—সে তো আল্লাই করে পাঠান শেখজী।

—তা পাঠান, কিন্তু বড়লোকের পা চাটতে তো বলেন নাই আল্লা। এই ধরুন, আপনার মতো লোক, এককালে আপনারাও আমীর ছিলেন, জমিদার ছিলেন। ছিরে চাষা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে—আপনি তার ভয়ে দশ-জনার ধর্মঘটে আসছেন নাই। ইতে কি আল্লা দয়া করেন, না শেষ-রক্ষে হয় ?

চৌধুরী তবুও হাসিল। কিন্তু একথার কোন উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে চলিতে বলিল—আচ্ছা তাহলে চলি এখন।

চৌধুরী ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরি নারায়ণ, পার কর প্রভু !

একান্ত অন্তরের সঙ্গেই সে এ কামনা করিল। রহমের কথার শ্লেষ তাহাকে আঘাত করিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু ওটাই একমাত্র হেতু নয়। কিছুদিন হইতেই সে জীবনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে। সে অস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন যেন গভীর এবং প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একালের সঙ্গে সে কিছুতেই আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। রীতি-নীতি, মতি-গতি, আচার-ধর্ম সব পাল্টাইয়া গেল। তাহারই পুরানো পাকা বাড়ীটার মত সব যেন ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ঝুর-ঝুর করিয়া অহরহ যেমন বাড়ীটার চুনবালি ঝরিয়া পড়িতেছে—তেমনিভাবেই সেকালের সব ঝরিয়া পড়িতেছে। লোক আর পরকাল মানে না, দেব-দ্বিজে ভক্তি নাই, প্রবীণকে সমীহ করে না, রাজা-জমিদার-মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই ; অভক্ষ্যভক্ষণেও দ্বিধা নাই। পুরোহিতের ছেলে সাহেবী ফ্যাশানে চুল ছাঁটিয়া টিকি কাটিয়া কি না করিতেছে ? কঙ্কণার চাটুজ্জেদের ছেলে চামড়ার ব্যবসা করে। গ্রামের কুমোর পলাইয়াছে, কামার ব্যবসা তুলিয়া দিল, বায়েন ঢাক বাজানো ছাড়িল ; ডোমে আর তালপাতা-বাঁশ লইয়া ডোম-বৃত্তি দেয় না, নাপিত আর ধান লইয়া ক্ষৌরী করে না, তেলে ভেজাল, ঘিয়ে চর্বি, নুনের ভিতর মধ্যে মধ্যে হাড়ও বাহির হয়। সকলের চেয়ে খারাপ—মানুষের সঙ্গে মানুষের অমিল। প্রত্যেক লোকটিই একালে স্বাধীন—প্রধান ; কেহ কাহাকেও মানিতে চাহে না। এই প্রজা-ধর্মঘট সে-কালেও হইয়াছে, নূতন নয়, কিন্তু এইবারের ধর্মঘটের যাহা আরম্ভ—তাহার সহিত কত প্রভেদ ! জমিদার সেকালে অত্যাচার করিলে বা অন্যায় দাবী করিলে ধর্মঘট হইত ; কিন্তু এবার জমিদার যে বৃদ্ধি দাবী করিতেছে—চৌধুরী অনেক বিবেচনা করিয়াও সে দাবীকে অন্যায় বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাহার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী একটা বৃদ্ধি জমিদারের প্রাপ্য হইয়াছে। আইনে বিশ বৎসর অন্তর জমিদার শস্য-মূল্যের বৃদ্ধির অনুপাতে একটা বৃদ্ধি পাইবার হক্‌দার। অবশ্য পরিমাণ মত পাইতে হইবে জমিদারকে। অন্যান্য

দাবী করিলে—'ন্যায্য প্রাপ্যের বেশী দিব না' একথা লোকে বলিতে পারে, কিন্তু একেবারে দিব না একথা বলিতেছে কোন্ ধর্মবুদ্ধিতে, কোন্ বিবেচনায় ?

আপনাকে ঐ প্রশ্নটা করিয়া চৌধুরী পরক্ষণেই আপনার মনে হাসিল। ধর্মবুদ্ধি? তাহাদের পুরানো বাড়ীটার পলেস্তারা-খসা ইট-বাহির-করা দেওয়ালের মত মানুষের ধর্মবুদ্ধি লুপ্ত হইয়া লোভ, ক্ষুধা আর স্বার্থ-স্বর্বস্ব দাঁতগুলিই একালে মানুষের সার হইয়াছে। ধর্ম-বুদ্ধি? তাও যদি উদরসর্বস্ব স্বার্থসর্বস্ব হইয়া পেটটাকেই ভরাইতে পাইত—তবুও একটা সান্ত্বনা থাকিত। একালে কয়টা লোকের ঘরে ভাত আছে? জমিদারের ঘর ফাঁক হইয়া গেল, চাষীর গোলায় আর ধান ওঠে না ; সমস্ত ধান কয়টা মহাজনের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ছিরু পাল মহাজনী করিতে করিতে শ্রীহরি ঘোষ হইল—জমিদারের গোমস্তা হইল—অবশেষে পত্তনীদার হইয়া বসিয়াছে। একালকে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। এই সময় মানে মানে যাওয়াই ভাল। অন্তরের সঙ্গেই সে হরিকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিল—পার কর প্রভু!

চারিপাশ জলে ভরিয়া গিয়াছে, ও-মাঠ হইতে পাশে নিচু মাঠে কলকল শব্দে জল বহিয়া চলিয়াছে। আবারও আজ আকাশে মেঘ জমিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বর্ষণও রহিয়াছে। চৌধুরী সন্তর্পণে পিছল আলপথের উপর দিয়া চলিতেছিল। তাহার নিজের জমির মাথায় দাঁড়াইয়া চৌধুরী দেখিল গরু দুইটার পিঠে পাঁচন-লাঠির আঘাতের দাগ ফুটিয়া রহিয়াছে মোটা দড়ির মত। চৌধুরীর রাগ সহজে হয় না, কিন্তু গরু দুইটার পিঠের দাগ দেখিয়া সে আজ অকস্মাৎ রাগে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। রহম শেখের কথার জ্বালা—জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এমনি একটা নির্গমন পথের সুযোগ পাইয়া অগ্নিশিখার মত বাহির হইয়া পড়িল। চৌধুরী জলভরা জমিতে নামিয়া পড়িয়া কৃষাণটার হাতের পাঁচনটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখবি? দেখবি?

কৃষাণটা আশ্চর্য হইয়া বলিল—ওই! কি? করলাম কি গো?

—গরু দুটোকে এমনি করে মেরেছিস্ যে?

চৌধুরী পাঁচন উদ্যত করিয়াছিল, কিন্তু পিছন হইতে কে ডাকিল—হাঁ, হাঁ, চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দেখিল, দেবু ঘোষ আর একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের ভদ্র যুবা। চৌধুরী লজ্জিত হইয়াই পাঁচনটা ফেলিয়া দিল। বলিল—দেখ দেখি বাবা, গরু দুটোকে কি রকম মেরেছে দেখ দেখি? অবোলা জীব, গরু—ভগবতী!

ভদ্র যুবকটি হাসিয়া বলিল—ও লোকটার কিন্তু গরু দুটোর সঙ্গে খুব তফাত নেই চৌধুরী মশায়। তফাত কেবল—অবোলা নয়, আর ভগবতী নয়।

চৌধুরী আরও লজ্জিত হইয়া বলিল—তা বটে। ভয়ানক অন্যায় হত। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

দেবু বলিল—মহাগ্রামের ঠাকুর মশায়ের নাতি।

তৎক্ষণাৎ চৌধুরী সেই কর্দমাক্ত আলপথের উপরেই মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল —ওরে বাপ রে! বাপ রে! আজ আমার মহাভাগ্যি, আপনার পুণ্যেই আজ আমি মহা অন্যায় করতে করতে বেঁচে গেলাম।

বিশ্বনাথ কয়েক পা পিছাইয়া গেল, তারপর বলিল—না—না—না! এ কি করছেন আপনি?

চৌধুরী সবিস্ময়ে বলিল—কেন?

—আপনি আমার দাদুর বয়সী। আপনি এভাবে প্রণাম করলে—শুধু লজ্জাই পাই না, অপরাধও স্পর্শ করে।

—আপনি এই কথা বলছেন?

—হ্যাঁ বলছি। বলিয়া বিশ্বনাথ তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল।

চৌধুরী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এ অঞ্চলের মহাগুরু বলিয়া পূজিত ন্যায়রত্নের পৌত্রের মুখে এ কি কথা! কিছুদিন পূর্বে শিবকালীপুরে যতীনবাবু ডেটিন্যু, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনিও তাহাকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৌধুরী সেদিন এত বিস্মিত হয় নাই, তাহার অন্তরের সংস্কারে এতখানি আঘাত লাগে নাই। সেদিন সে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল—যতীনবাবু কলিকাতার ছেলে, তাহার এ ম্লেচ্ছভাব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু ন্যায়রত্নের পৌত্র এ অঞ্চলের ভাবী মহাগুরু, তিনি যদি নিজ হইতে এইভাবে সমাজের কর্ণধারত্ব ত্যাগ করেন—তবে কি গতি হইবে সমাজের?

দেবু অগ্রসর হইয়া বলিল—আপনার ওখানে কাল যাব চৌধুরী মশায়।

—এঁ্যা? সচকিত হইয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিল—এঁ্যা?

—কাল আমরা আপনার ওখানে যাব।

—সে আমার ভাগ্য। কিন্তু কারণটা কি? ধর্মঘট?

—হ্যাঁ।

—আমি ও ধর্মঘটে নেই বাবা। আমাকে ক্ষমা করো। বলিয়াই সে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল।

দেবু পিছন হইতে ডাকিল—চৌধুরী মশায়!

অগ্রসর হইতে হইতে চৌধুরী হাত নাড়িয়া বলিল—না বাবা।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এস, পরে হবে। প্রণাম না নেওয়াতে বুড়ো চটে গেছে।

দেবু বলিল—ও কথা বলেই বা তোমার কি লাভ হল বল তো? আর প্রণাম নেবে নাই বা কেন? তুমি ব্রাহ্মণ।

—পৈতে আমি ফেলে দিয়েছি দেবু।

—পৈতে ফেলে দিয়েছ?

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—ফেলেই দিয়েছি, তবে বাক্সে রাখি। যখন বাড়ী আসি গলায় পরে নিই। দাদুকে আঘাত দিতে চাই নে।

—কিন্তু সে তো প্রতারণা কর তুমি! ছি!

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল—ও আলোচনা পরে করা যাবে। এখন চল।

—না। দেবু দৃঢ়স্বরে বলিল—না। আগে ওই মীমাংসাই হোক তোমার সঙ্গে। তারপর দুজনে একসঙ্গে পা ফেলব। নইলে ধর্মঘটের ভার তুমি নাও, আমি সরে দাঁড়াই। কিংবা—তুমি সরে দাঁড়াও।

—সেটা তুমিই ভেবে দেখ। তুমি যা বলবে তাই আমি করব।—বিশ্বনাথ তখনও হাসিতেছিল।

দেবু বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

ঠিক এই সময়েই তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল রহম শেখ।—আদাব গো দেবুবাপ!

চিন্তান্বিত মুখেই একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া দেবু প্রত্যভিবাদন জানাইল—আদাব চাচা।

রহম বলিল—হাল ছেড়্যা আসতে লারছি, আর তুমরাও আচ্ছা গুজুর গুজুর লাগাল্ছ যা হোক। তা আমাদের গাঁয়ে যাবা কবে বল দেখি?

—যাব চাচা, আজই যাব।

—হঁ্যা। যাইও। কাল শুকুর বারে জুম্মার নামাজ হবে। মছ্জেদেই সব কায়েম হবে যাবে। তুমি বরং আজই উবেলাতেই যাইও, যেন ভুলিও না!

—আচ্ছা। দেবু একটু হাসিল।

—আর শুন। ওই তুমাদের ঠাকুরের লাতি—উয়াকে নিয়া যাইও না। আমাদের তাসের মিয়া—জান তো তাসের মিয়ারে? কলকাতায় কলেজে পড়ে? উ বুলছিল—ঠাকুরের লাতি নাকি স্বদেশী করে। তা ছাড়া আমাদের ইরসাদ মৌলভী বুলছিল—উনি বামুন ঠাকুর মানুষ—উয়ারে তুমরা হিঁদুরা মানতি পার, আমরা মানব কেনে?

—না, না, তুমি জান না রহম চাচা—বিশু-ভাই আমাদের সে-রকম নয়।—দেবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

দুর্দান্ত রূঢ়ভাষী রহম—আন্দাজে বিশুকে চিনিয়াই কথাগুলি বলিয়াছিল—এবার সে হাসিয়া বলিল—অ! তুমিই বুঝি ঠাকুরের লাতি?

হাসিয়া বিশু বলিল—হঁ্যা।

—তুমি যাইও না ঠাকুর, তুমি যাইও না।—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিল আপনার জমির দিকে।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—মীমাংসা হয়ে গেল দেবু ভাই। আমি তাহলে ফিরলাম।

দেবু কাতর দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—দরকার হলেই ডাক দিও—আমি তৎক্ষণাৎ আসব।

রিম-ঝিম বৃষ্টি নামিয়া আসিল। তাহারই ভিতর দুজন দুজনের কাছ হইতে সামান্য দূরত্বের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রহম রূঢ় সত্য প্রকাশ করিয়া মনের আনন্দে লাঙল ঠেলিতে ঠেলিতে তখন গান ধরিয়া দিল—

"হোসেন হাসান দু'টি ভাই—এই দুনিয়ায় পয়দা হয়,
তাদের মত খাস বান্দা এই দুনিয়ায় নাই।
ফতেমা-মা, মা-জননী—তাঁর কাহিনী বলি আমি,
তাঁহার স্বামী হজরৎ আলি বলিয়া জানাই।"

তিন

মহুগ্রাম বা মহাগ্রাম এককালে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বহুসংখ্যক মাটির এবং ইঁটের বাড়ীর পড়ো-ভিটা গ্রামখানির প্রাচীনত্ব এবং বিগত সমৃদ্ধির প্রমাণ হিসাবে আজও দেখা যায়। গ্রামখানি এখনও আকারে অনেক বড়, কিন্তু বসতি অত্যন্ত ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত। মধ্যে মধ্যে বিশ-পঁচিশ, এমন কি পঞ্চাশ-ষাট ঘর বসতির উপযুক্ত স্থান পতিত হইয়া আছে; খেজুর, কুল, আঁকড়, সেওড়া প্রভৃতি গাছে ও ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এগুলি এককালে নাকি বসতি-পরিপূর্ণ পাড়া ছিল। বসতি নাই কিন্তু এখনও দুই-চারিটার নাম বাঁচিয়া আছে। জোলাপাড়া ধোপাপাড়ায় এক ঘরও বসতি নাই; পালপাড়ায় মাত্র দুই ঘর কুমোর অবশিষ্ট; খাঁ-য়ের পাড়ায় খাঁ উপাধিধারী হিন্দু পরিবার এককালে রেশমের দালালী করিয়া সম্পদশালী হইয়াছিল; রেশমের ব্যবসায়ের পতনের সঙ্গে তাহাদের সম্পদ গিয়াছে, খাঁয়েরাও কেহ নাই; আছে কেবল খাঁ মহাজনদের ভাঙা বাড়ীর ইঁটের বনিয়াদের চিহ্ন। খাঁয়ের পাড়া পার হইয়া বিশ্বনাথ আপনাদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন—শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন—এ অঞ্চলের মহামাননীয় ব্যক্তি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। বহুকাল হইতেই বংশটি পাণ্ডিত্য এবং নিষ্ঠার জন্য এ অঞ্চলে বিখ্যাত। দেশ-দেশান্তর হইতে তাঁহাদের টোলে বিদ্যার্থী-সমাগম হইত। এখনও টোল আছে, ন্যায়রত্নের মত মহামহোপাধ্যায় গুরুও আছেন, কিন্তু একালে বিদ্যার্থীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বাড়ীর প্রথমেই নারায়ণশিলার খড়ো-ঘরের সম্মুখে খড়ের আটচালায় টোল বসে। এক পাশে লম্বা একখানি ঘরে ছাত্রদের থাকিবার ব্যবস্থা। ঘরখানি প্রকাণ্ড; সুদৃশ্য এবং মনোরম না হইলেও বাস করিবার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাই, সেকালে কুড়ি জন পর্যন্ত ছাত্র এই ঘরে বাস করিত, এখন থাকে মাত্র দুই জন। বিশ্বনাথ যখন আসিয়া আটচালায় ঢুকিল তখন তাহারাও কেহ ছিল না; বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তাহাদের দুইজনকেই চাষের কাজ দেখিতে মাঠে পাঠাইয়াছেন। কেবল একটা কুকুর ন্যায়রত্নের বসিবার আসন ছোট চৌকিটার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া বাদলের দিনে পরম আরাম উপভোগ করিতেছিল। বিশ্বনাথ দেখিয়া শুনিয়া বিষম চটিয়া গেল। দাদুর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি, সেই দাদুর আসনে আসিয়া বসিয়াছে একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর! এদিক-ওদিক চাহিয়া কিছু না পাইয়া সে হাতের

ছাতাটা উদ্যত করিয়া কুকুরটার পিছন দিক হইতে অগ্রসর হইল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ভিতরবাড়ীর দরজায় ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ !

মুখ ফিরাইয়া দাদুর দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এ ব্যাটা যদি আপনার কৃষ্ণসার আশ্রমমৃগ হয় তবে ঋষিবাক্যও আমি মানব না। ব্যাটা ঘেয়ো কুকুর—

হাসিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—ও আমার কাঙালীচরণ।

কাঙালী আপন নাম শুনিয়া মুখ তুলিয়া ছত্রপাণি বিশ্বনাথকে দেখিয়াও নড়িবার নাম করিল না, শীর্ণ কাটির মত লেজটা জলচৌকির উপর আছড়াইয়া পটপট শব্দ-মুখর করিয়া তুলিল। ন্যায়রত্ন অগ্রসর হইয়া আসিতেই সে চিত হইয়া শুইয়া পা চারিটা উপরের দিকে তুলিয়া দিল। এবার বিশ্বনাথ না হাসিয়া পারিল না। ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—এক ঘা খেলেই তো মরে যেতো। যা ছাতা তুমি তুলেছিলে !

বিশ্বনাথ উদ্যত ছাতাটা নামাইয়া বলিল—মাথা রাখবার জন্য ছাতার ব্যবস্থা দাদু, ওর বাঁট আর শিক যতই মজবুত হোক—মাথা ভাঙবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মাথা ওর ভাঙত না, এক ঘা ওটাকে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। যাক্ গে—হঠাৎ ও ব্যাটা জুটল কি করে ? কি নাম বললেন ওর ?

—কাঙালীচরণ। নামটা দিয়েছি আমিই। নামেই পরিচয়, কেমন করে কোথা থেকে এসে জুটলেন উনি। কিন্তু এই বাদলা মাথায় করে গিয়েছিলে কোথায় ?

—গিয়েছিলাম দেবুর সঙ্গে। বলছি। দাঁড়ান আগে জামা গেঞ্জি খুলে আসি আমি।

বিশ্বনাথ ভিতরে চলিয়া গেল।

দেবুর নামে ন্যায়রত্নের মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই তিনি স্বাভাবিক প্রসন্নমুখে বাড়ীর ভিতরেই চলিয়া গেলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই ন্যায়রত্ন শুনিলেন নারীকণ্ঠের কথা—আর বলো না, বুড়ীর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। কানে বদ্ধ কালা—বকলেও শুনতে পায় না ; একবার কাপড় নিলে পনর দিনের আগে দেবে না। জবাব দিতেও মায়া লাগে।

বিশু বলিল—তাই বলে এই রকম ময়লা কাপড় পরে থাকবে ! ছি !

—তা বটে। লোকজনের সামনে বেরুতে লজ্জা।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি।"

সখি শকুন্তলে, মধুরাণাং আকৃতিনাং মণ্ডনং শোভনং কিমিব ন ! তোমার সুন্দর বরতনুতে এই ময়লা কাপড়খানিই অপরূপ শোভন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার দুষ্মন্ত ওতেই মুগ্ধ হয়েছেন।

বিশ্বনাথ কথা বলিতেছিল স্ত্রীর সঙ্গে। সুন্দর একটি খোকাকে কোলে করিয়া তরুণী জয়া

রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিল ; সেও লজ্জিত হইয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। বিশ্বনাথও হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

শূন্য উঠানে দাঁড়াইয়া ন্যায়রত্ন আবার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল খোকাটি। সুন্দর খোকা! মনোরম একটি লাবণ্য যেন সর্বাঙ্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। বছরখানেক বয়স, সে আসিয়া বলিল—ঠাকুল!

জয়া তাহাকে শিখাইয়াছে কথাটি ; প্রপিতামহ ন্যায়রত্নকে সে বলে ঠাকুর।

ন্যায়রত্ন পৌত্রের সহিত ভাই সম্বন্ধ ধরিয়া প্রপৌত্রকে বলেন—বাবা, বাপি।

ছেলেটি আবার ডাকিল—ঠাকুল!

মুহূর্তে ন্যায়রত্নের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তিনি দুই হাত প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন—বাপি!

—আবা কোলো, আবা গান কোলো। অর্থাৎ আবার গান করো। ন্যায়রত্নের শ্লোক আবৃত্তির মধ্যে যে সুরটি থাকে—শুনিয়া শুনিয়া শিশু সেই সুরের মাধুর্যটিকে চিনিয়াছে, একবার শুনিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না, সে বলে—আবা গান কোলো। ন্যায়রত্ন শিশুর অনুরোধ উপেক্ষা করেন না, আবার তিনি শ্লোক আবৃত্তি করেন। শিশুটির নাম অজয়, অজয় আবারও বলে—আবা কোলো।

ন্যায়রত্ন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরেন। আনন্দে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। তাঁহার মনে হয়—এ সেই। হারানো ধন তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে।

ন্যায়রত্নের হারানো ধন, তাঁহার একমাত্র পুত্র শশিশেখর, বিশ্বনাথের বাপ। সৌম্যকান্তি সুপুরুষ শশিশেখর এমনি তীক্ষ্ণধী ছিলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। শুধু হিন্দুদর্শন নয়, বৌদ্ধদর্শন, এমন কি বাপকে লুকাইয়া ইংরাজী শিখিয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শনও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই হইয়াছিল সর্বনাশের হেতু।

সে আমলে শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন ছিলেন আর এক মানুষ। প্রাচীন কাল এবং সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মহাকালের তপোবনরক্ষী শূলহস্ত নন্দীর মত ভ্রূভঙ্গি করিয়া তর্জনী উদ্যত করিয়া সদাজাগ্রত ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। শশিশেখরও আপনার ইংরাজী শিক্ষার কথা সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ সে কথা একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একজন ইংরেজ। ভদ্রলোক আই-সি-এস কর্মচারী হইলেও রাজনীতি অপেক্ষা বিদ্যানুশীলনেই বেশী অনুরাগী ছিলেন। আপন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র। ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জেলায় আসিয়া তিনি মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্নের নাম শুনিয়া একদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন ন্যায়রত্নের টোলে। সাহেবের সঙ্গে ছিলেন জেলা স্কুলের হেডমাস্টার।

দোভাষীর কাজ করিবার জন্যই সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শশিশেখর তখন সবে নবদ্বীপ হইতে দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। ন্যায়রত্ন সাদর অভ্যর্থনার ক্রটি করিলেন না। শশীর কিন্তু এতটা ভাল লাগিল না। তবু সে চুপ করিয়াই রহিল। সাহেবও একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ন্যায়রত্নকে বলিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না ন্যায়রত্ন মশায়—সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আপনার এখানে আসেন নি। উনি এসেছেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আলাপের ভূমিকাই হল অভ্যর্থনা। আর এটা আমার আতিথ্য-ধর্ম। রাজার দরবারে পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মান যেমন প্রাপ্য—পণ্ডিতের কাছে রাজা রাজপুরুষের সম্মানও তেমনি প্রাপ্য। এ আমার কর্তব্য।

অতঃপর আরম্ভ হইল আলাপ। আলাপ আলোচনা শেষ করিয়া সাহেব উঠিয়া হাসিয়া ইংরাজীতে হেডমাস্টারকে কি বলিলেন। মাস্টারটি ন্যায়রত্নকে কথাটা অনুবাদ করিয়া না শুনাইয়া পারিলেন না। বলিলেন—সাহেব কি বলছেন জানেন?

ন্যায়রত্ন কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশের এক যোগী-পুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম তবে এই ভারতের যোগী হবার কামনা করতাম। সাহেবও ঠিক তাই বলছেন। বলছেন যে, ইংলণ্ডে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি শিবশেখরেশ্বর হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—আমার এ ব্রাহ্মণজন্ম না হলেও আমি কিন্তু এই দেশের কীট-পতঙ্গ হয়ে জন্মাতে কামনা করতাম, অন্যত্র জন্ম কামনা করতাম না।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ন্যায়রত্নের কথার মর্ম শুনিয়া হাসিয়া ইংরেজীতে মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন—ইনফিরিয়রিটির এ এক ধারার বিচিত্র প্রকাশ! এটা যেন ভারতবাসীর প্রকৃতিগত।

মাস্টারটির মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু সাহেবের কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস তাঁহার হইল না। ন্যায়রত্ন ইংরাজী বুঝিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও কথার স্বর শুনিয়া ব্যঙ্গের শ্লেষ অনুভব করিলেন। তবুও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শশিশেখর দৃঢ়স্বরে ঈষৎ উষ্ণতার সহিত ইংরাজীতেই বলিয়া উঠিলেন—না, ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স এ নয়। এই তার এবং ভারতীয় মনীষীদের অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা মনের অতিরিক্ত কিছু বোঝে না—বিশ্বাস করে না, আমরা মনের সীমানা অতিক্রম করে অন্তর এবং আত্মাকে বিশ্বাস করি। মন ও চিত্তকে জয় করে আত্মোপলব্ধির সাধনাই আমাদের সাধনা। আমাদের আত্মাকে মন পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত। সুতরাং তোমাদের মনোবিশ্লেষণে আমাদের ভারতীয় সাধক মনীষীদের কম্‌প্লেক্স বিচার মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহেব সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মাস্টারটি ত্রস্ত হইয়া

উঠিলেন, রাজপুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টিকেও তিনি বিশ্বাস করেন না। ন্যায়রত্ন বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শশী ম্লেচ্ছভাষায় অবলীলাক্রমে কথা বলিয়া গেল। শশীর মুখে ম্লেচ্ছভাষা!

এই লইয়াই পিতাপুত্রে বিরোধ বাধিয়া গেল।

ন্যায়রত্ন কালধর্মকে শিবের তপোবনে ঋতুচক্রের আবর্তনকে ঠেকাইয়া রাখার মত দূরে রাখিয়া সনাতন মহাকালধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ দেখিলেন—কখন কোন এক মুহূর্তে সেখানে অকাল বসন্তের মত কালধর্ম বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহারই ঘরে শশীর মধ্য দিয়া ম্লেচ্ছ বিস্তার ভাবধারা সনাতন মহাকালধর্মকে ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অপর দিকে শশিশেখর, এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ফলে, সঙ্কোচশূন্য হইয়া আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসংস্কৃতিমত জীবন নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

তারপর সে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি। ন্যায়রত্ন শূলপাণি নন্দীর মতই কঠিন নির্মম হইয়া উঠিলেন। শশিশেখর স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য গৃহত্যাগ করিল। ন্যায়রত্ন তাহাকে বাধা দিলেন না। কিন্তু বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুত্রবধূ ও পৌত্রকে লইয়া যাইতে দিলেন না। সংকল্প করিলেন, শশী যে সংস্কৃতির ধারাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে সেই ধারাকে সংস্কার করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন ঐ পৌত্রকে; এক বৎসর পরে ঘটিল এই ঘটনার চরম পরিণতি। এক পণ্ডিত-সভায় পিতা-পুত্রে শাস্ত্রবিচার লইয়া বিতর্ক উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ্য বিরোধ বাধিয়া গেল। শশিশেখরের সেই দীপ্ত চক্ষু, স্ফুরিত অধর, প্রতিভার বিস্ফোরণ আজও ন্যায়রত্নের চোখের উপর ভাসে। তাঁহার চোখে জল আসে।

সভার শেষে পিতা পুত্রকে বলিলেন—আজ থেকে জানব আমি পুত্রহীন। সনাতন ধর্মকে যে আঘাত করতে চেষ্টা করে, সে ধর্মহীন। ধর্মহীন পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা বরণীয় কল্যাণ আর কিছু কামনা করতে পারি না আমি।

শশীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সে বলিল—তা হলেই কি সনাতন ধর্ম রক্ষা হবে আপনার?

—হবে।

সেই দিনই শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন পুত্রহীন হইয়া গেলেন। শশিশেখর আত্মহত্যা করিল।

শিবশেখরেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া কিছুকালের জন্য যেন সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। মদনকে ভস্ম করিয়া মহাকাল অন্তর্হিত হইলে নন্দীর যেমন অবস্থা হইয়াছিল—ন্যায়রত্নেরও তেমনি অবস্থা হইল। 'তারপর অকস্মাৎ একদা তিনি মহাকালকে—ওই নন্দীর মতই গিরিভবন-পথে বরবেশী মহাকালকে আবিষ্কারের মতই—আবিষ্কার করিলেন। কালের পরিবর্তনশীলতাকে মহাকালের লীলা বলিয়া যেন প্রত্যক্ষ করিলেন। সতীপতি মহাকাল সেই লীলায় গৌরীপতি, কিন্তু সেইখানেই কি তাঁহার লীলার শেষ হইয়া গিয়াছে? এককালে তাই তিনি বিশ্বাস করিতেন বটে। কিন্তু আজ অনুভব করেন—সতী-গৌরীরূপিণী মহাশক্তি কত নূতন রূপে মহাকালকে বরণ করিয়াছেন, কিন্তু সে লীলা প্রত্যক্ষ করিবার মত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাসদেব আবির্ভূত হইয়া আর নব-পুরাণ-রচনা করেন নাই।

বিশ্বনাথের পড়িবার বয়স হইতেই তিনি বিশ্বনাথকেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন—দাদুর কোথায় পড়তে মন? আমার টোলে—না কঙ্কণার ইস্কুলে?

ছয়-সাত বৎসর বয়সের বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—বাড়ীতে তোমার কাছে পড়ব দাদু আর ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাব। টোলের নামও করে নাই।

ন্যায়রত্ন সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।···বিশ্বনাথ আজ এম-এ পড়ে। ন্যায়রত্নের স্ত্রী মারা গিয়াছেন, পুত্রবধূ বিশ্বনাথের মা-ও নাই। বিশ্বনাথের বিবাহ দিয়া ন্যায়রত্ন আজ সংসার করিতেছেন, আর কালধর্মকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধ দ্রষ্টার মত তাঁহার চরণক্ষেপের দিকে চাহিয়া আছেন।

কিন্তু তবু আজ দুই-দুইবার তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। বিশ্বনাথ এ কি করিতেছে? স্থানীয় বৈষয়িক গণ্ডগোলে আপনাকে জড়াইতেছে কেন? নিরস্ত হইবার জন্যই তিনি ঘরে গিয়া পুঁথি লইয়া বসিলেন।

সমস্ত দুপুর চিন্তা করিয়াও তিনি নিরস্ত এবং নিস্পৃহ হইতে পারিলেন না। অপরাহ্নে পৌত্রের ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন—বিশু!

ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল শিশু অজয়—ঠাকুর! কোলে চাপি বাড়ী যাই।—বাড়ী যাই অর্থাৎ বাহিরে যাই।

হাসিয়া ন্যায়রত্ন ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন—বিশ্বনাথ ঘরে নাই। অজয়কে কোলে তুলিয়া লইয়া পৌত্রবধূকে প্রশ্ন করিলেন—হলা রাজ্ঞী শকুন্তলে! রাজা দুষ্মন্ত কোথায় গেলেন?

হাসিয়া মাথার ঘোমটা অল্প বাড়াইয়া দিয়া জয়া বলিল—কি জানি কোথায় গেলেন।

ন্যায়রত্ন অজয়কে আদর করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তোমার সংসার-জ্ঞান আর কখনও হবে না।—বলিয়া প্রপৌত্রকে পৌত্রবধূর কোলে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন চণ্ডীমণ্ডপে। বিশ্বনাথ নাটমন্দিরেই বসিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—বিশ্বনাথ!

'বিশ্বনাথ' ডাকে বিশ্বনাথ চকিত হইয়া উঠিল। দাদু তাহাকে ডাকেন 'দাদু' বা 'বিশু' নামে অথবা সংস্কৃত নাটক-কাব্যের নায়কদের নামে—কখনও ডাকেন রাজন, কখনও রাজা দুষ্মন্ত, কখনও অগ্নিমিত্র ইত্যাদি—যখন যেটা শোভন হয়। বিশ্বনাথ নামে দাদু কখনও ডাকিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। চকিত হইয়া সে সসম্ভ্রমেই উত্তর দিল—আমাকে ডাকছেন?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত আছ কি?

ন্যায়রত্ন অকস্মাৎ আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। পুত্র শশিশেখরের আত্মহত্যার পর হইতে তিনি নিরাসক্তভাবে সংসারে বাস করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। স্ত্রী-বিয়োগে তিনি এক‌ফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই, এমন কি মনের গোপনতম কোণেও একবিন্দু বেদনাকে

জ্ঞাতসারে স্থান দেন নাই। তারপর পুত্রবধূ মারা গেলে—সেদিনও তিনি অচঞ্চল-ভাবেই আপনার কর্তব্য করিয়াছিলেন। নিজে হাতে রান্না করিয়া দেবতার ভোগ দিয়াছেন পৌত্র বিশ্বনাথকে খাওয়াইয়াছেন, গৃহকর্ম করিয়াছেন ; স্থিরতা কখনও হারান নাই। আজ কিন্তু অন্তরে অস্থির, বাহিরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এখানে যে প্রজা-ধর্মঘট লইয়া আন্দোলন উঠিয়াছে—সে সংবাদ বিশ্বনাথ কলিকাতায় বসিয়া কেমন করিয়া পাইল ? এবং প্রজা-ধর্মঘটে সে কেন আসিল ?

তাহার এই আসা রথযাত্রা উপলক্ষে হইলেও ধর্মঘটের ব্যাপারটাই যে এই আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য একথা স্পষ্ট। দেশ-কালের পরিচয় তাঁহার অজ্ঞাত নয়, রাজনীতিক আন্দোলনের সংবাদ তিনি রাখিয়া থাকেন ; দেশের বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রজা জাগরণের মধ্যে কেমন করিয়া সঞ্চারিত হইতেছে—তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই আজ দেবু ঘোষের সহিত বিশ্বনাথের এই যোগাযোগে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। অকস্মাৎ অনুভব করিলেন যে, এতকালের নিরাসক্তির খোলসটা আজ যেন খসিয়া পড়িয়া গেল ; কখন আবার ভিতরে ভিতরে আসক্তির নূতন ত্বক সৃষ্টি হইয়া নিরাসক্তির আবরণটাকে জীর্ণ পুরাতন করিয়া দিয়াছে।

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—বাঁকা কথা কয়ে লাভ নেই দাদু—আমি সোজা কথাই বলতে চাই। প্রজা-ধর্মঘটের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ? দেবু ঘোষের এই হাঙ্গামার খবর তোমাকে জানালেই বা কে ?

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আজকাল টেলিগ্রাফের কল এখানে টিপ্‌লে হাজার মাইল দূরের কল সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, আর কলকাতায় খবরের কাগজ বের হয় দুবেলা। তা ছাড়া আপনি তো জানেন যে, দেবু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।

—আমি তো বলেছি বিশ্বনাথ, আমি সোজা কথা বলছি, উত্তরে তোমাকেও সোজা কথা বলতে অনুরোধ করছি। আর আমার ধারণা তুমি অন্তত আমার সামনে সত্য কখনও গোপন কর না।

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বর আন্তরিকতায় গভীর ও গম্ভীর। বিশ্বনাথ পিতামহের দিকে চাহিল—দেখিল মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পূর্বে ন্যায়রত্নের এ মুখ দেখিলে এ অঞ্চলের সকলেই অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র শশিশেখর পর্যন্ত এ মূর্তির সম্মুখে চোখে চোখ রাখিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। পিতার সহিত, তিনি বিদ্রোহ করিয়াছেন তর্ক করিয়াছেন—কিন্তু সে সবই করিয়াছেন নতমুখে মাটির দিকে চোখ রাখিয়া। ন্যায়রত্নের সেই মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—কথার উত্তর দাও ভাই !

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার কাছে মিথ্যে কখনও বলি নি, বলবও না। এখানে—মানে, ওই শিবকালীপুর গ্রামে—একজন রাজবন্দী ছিল জানেন ? যাকে এখান থেকে ক'দিন হল সরিয়ে দিয়েছে ? খবর দিয়েছিল সে-ই।

—তার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?

—আছে।

—তাহলে—ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—তোমরা তাহলে একই দলভুক্ত ?

—এককালে ছিলাম। কিন্তু এখন ভিন্ন মত ভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করেছি।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমাদের মত, তোমাদের আদর্শটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার বিশ্বনাথ ?

পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ বলিল—আমার কথায় আপনি কি দুঃখ পেলেন দাদু ?

—দুঃখ ? ন্যায়রত্ন অল্প একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন—সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া সহজ সাধনার কাজ নয় ভাই। দুঃখ একটু পেয়েছি বই কি।

—আপনি দুঃখ পেলেন দাদু! কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। সংসারে যারা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদেরই একজন হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই বলে দুঃখ পেলেন ?

—বিশ্বনাথ, দুঃখ পাব না, সুখ অনুভব করব না, এই সংকল্পই তো শশীর মৃত্যুর দিন গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু জয়াকে যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলাম, আজ মনে হচ্ছে সেইদিন শৈশবকালের মত গোপনে চুরি করে আনন্দরস পান করেছিলাম—তারপর এল অজুমণি, অজয়। আজ দেখছি—শশীর মৃত্যুদিনের সংকল্প আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। জয়া আর অজয়ের জন্যে চিন্তার, দুঃখের যে সীমা নেই।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া রহিল।

ন্যায়রত্নও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তোমার আদর্শের কথা তো আমাকে বললে না ভাই ?

—আপনি সত্যিই শুনতে চান দাদু ?

—হ্যাঁ, শুনব বই কি।

বিশু আরম্ভ করিল—তাহার আদর্শের কথা, অর্থাৎ মতবাদের কথা। ন্যায়রত্ন নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন, একটি কথাও বলিলেন না। রুশ দেশের বিপ্লবের কথা, সে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া বিশ্বনাথ বলিল—এই আমাদের আদর্শ দাদু। কম্যুনিজম্, মানে সাম্যবাদ।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমাদের ধর্মও তো অসাম্যের ধর্ম নয় বিশ্বনাথ। যত্র জীব তত্র শিব, এ তো আমাদেরই কথা, আমাদের দেশের উপলব্ধি।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলাম দাদু, শুনেছিলাম শিবময় কাশী। দেখলাম সত্যই তাই। বিশ্বনাথ থেকে আরম্ভ করে মন্দিরে, মঠে, পথে, ঘাটে, কুলুঙ্গিতে শিবের আর অন্ত নাই, অগুন্তি শিব। কিন্তু ব্যবস্থায় দেখলাম বিশ্বনাথের বিরাট

রাজসিক ব্যবস্থা—ভোগে, শৃঙ্গারবেশে, বিলাসে, প্রসাধনে—বিশ্বনাথের ব্যবস্থা বিশ্বনাথের মতই। আবার দেখলাম কুলুঙ্গিতে শিব রয়েছেন—গুনে চারটি আতপ চাল আর একটি বেলপাতা তাঁর বরাদ্দ। আমাদের দেশের 'যত্র জীব তত্র শিব' ব্যবস্থাটা ঠিক ওই রকম ব্যবস্থা। সেইজন্যেই তো এখানে-ওখানে ছড়ানো ছোটখাটো শিবদের নিয়ে বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান!

—থাক্ বিশ্বনাথ, ধর্ম নিয়ে রহস্য করো না ভাই; ওতে অপরাধ হবে তোমার।

—অঙ্কশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্র আমাদের সর্বস্ব দাদু, ধর্ম আমাদের।

—উচ্চারণ কর না বিশ্বনাথ—উচ্চারণ কর না!

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বরে বিশ্বনাথ এবার চমকিয়া উঠিল। ন্যায়রত্নের আরক্তিম মুখে-চোখে এবার যেন আগুনের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুকালের নিরুদ্ধ আগ্নেয়গিরির শীতল গহ্বর হইতে যেন শুধু উত্তাপ নয়, আলোকিত ইঙ্গিতও ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারিতেছে।

—নারায়ণ, নারায়ণ!—বলিয়া ন্যায়রত্ন উঠিয়া পড়িলেন। বহুকাল পরে তাঁহার খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময়েই জয়া অজয়কে কোলে করিয়া বাড়ী ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নাতি-ঠাকুর্দায় খুব তো গল্প জুড়ে দিয়েছেন, এদিকে সন্ধ্যে যে হয়ে এল!

চার

কয়েক দিন পর দেবু চলিয়াছিল কুসুমপুর।

পাঁচখানা গ্রাম—মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া-দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা এই লইয়া এককালে হিন্দুসমাজের পঞ্চগ্রাম গঠিত ছিল। তারপর কবে, কেমন করিয়া সমগ্র কুসুমপুর পুরাপুরি মুসলমানের গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। হিন্দু-সামাজিক বন্ধন হইতে কুসুমপুর দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবুও একটা নিবিড় বন্ধন ছিল কুসুমপুরের সঙ্গে। এককালের কুসুমপুরের মিঞা-সাহেবরাই এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। কুসুমপুরের মিঞাদের প্রদত্ত লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তরের জমি এ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ এবং বহু দেবস্থান আজও ভোগ করিতেছে। আবার কুসুমপুরের প্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটির নিম্নাংশ যে এককালে কোন দেব-মন্দির ছিল—সে কথা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। ধর্মকর্ম, পালপার্বণ এবং বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে দুই সমাজের মধ্যে নিমন্ত্রণ এবং লৌকিকতার আদান-প্রদানও ছিল; বিশেষ করিয়া বিবাহাদি ব্যাপারে দুই পক্ষের সহযোগিতা ছিল নিবিড়। সেকালে মিঞাসাহেবদের পাল্কী ছিল চার-পাঁচখানি। এ অঞ্চলের যাবতীয় বিবাহে সেই পাল্কীই ব্যবহৃত হইত। সামিয়ানা, সতরঞ্জি মিঞাদের বাড়ী হইতেই আসিত। বিবাহে মিঞারা লৌকিকতা করিতেন। বিবাহ-বাড়ী হইতে নিমন্ত্রিত মিঞাসাহেবদের বাড়ীতে অধিকাংশ স্থলেই পান-সুপারী এবং চিনির সওগাত

পাঠানো হইত ; ক্ষেত্রবিশেষে অবস্থাপন্ন হিন্দুর বাড়ী হইতে যাইত সিধা—ঘি, ময়দা, মাছ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। মিঞাসাহেবদের বাড়ীর বিবাহ-উৎসবে হিন্দুদের বাড়ীতেও অনুরূপ উপঢৌকন আসিত। হিন্দুদের পূজা-অর্চনায়, পূজার ব্যাপার চুকিয়া গেলে, মুসলমানেরা প্রতিমা দেখিতে আসিত, বিসর্জনের মিছিলে যোগ দিত ; এককালে মিঞাসাহেবদের দলিজার সম্মুখ পর্যন্ত বিসর্জনের মিছিল যাইত, মিঞাসাহেবরা প্রতিমা দেখিতেন ; হিন্দুদের জন্য সেখানে তামাকের বন্দোবস্ত থাকিত। মুসলমানদের মহরমের মিছিলও হিন্দুদের গ্রামে আসিত, তাজিয়া নামাইয়া তাহারা লাঠি খেলিত, তামাক খাইত। সেকালে হিন্দুদের পূজা-পার্বণে বাদ্যকর, প্রতিমা বিসর্জনের বাহক, নাপিত, পরিচারক প্রভৃতিদের, মিঞা-সাহেবদের সেরেস্তায় পার্বণী বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের অনেক বাড়ীতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। লাঠিয়ালদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই থাকিত। পীরের দরগায় হিন্দুবাড়ীর মানসিক চিনি-মিষ্টির নৈবেদ্যের রেওয়াজ এখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য দেখুড়িয়া কালীবাড়ীতে মুসলমান রোগী আজও আসিয়া থাকে।

বর্তমান কালে কিছুদিন হইতে এসব প্রথা ক্রমে লোপ পাইতেছে, বিশেষ করিয়া এই ভোট-প্রথা প্রচলিত হইবার পর। ইহা ছাড়া কারণ অবশ্য লোকের বৈষয়িক অবস্থার অবনতি ; মিঞারা আজ প্রায় সর্বস্বান্ত। অন্যান্য হিন্দু-মুসলমানের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিয়াছে। যাহাদের নূতন অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাদেরও ধারা-ধরন নূতন রকমের। আপনাদের সমাজ, আপনাদের জাতির মধ্যেও তাহাদের বন্ধনটা নিতান্তই লৌকিক। এখনকার দেশকাল সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তবুও বন্ধন কিছু আছে, সেটুকু গ্রাম্য-জীবন যাপন করিতে হইলে ছিন্ন করা অসম্ভব। সমস্তটুকুই চাষের ব্যাপার লইয়া। কামার-ছুতারের বাড়ীতে এখনও বর্ষার সময় দুই দলই ভিড় করিয়া একত্র বসে—গল্প করে। জমিদারের কাছারীতে কিস্তির সময় পাশাপাশি বসিয়া খাজনা দেয়, অজন্মার বৎসর খাজনা ও সুদ লইয়া উভয় পক্ষ একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া জমিদার সেরেস্তায় একসঙ্গে দাবী উত্থাপন করে। যাত্রা ও কবিগানের আসরে উভয় পক্ষ ভিড় করিয়া আসে। কঙ্কণার বাবুদের থিয়েটার দেখিতে দুই পক্ষের ভদ্র শিক্ষিতেরা সমবেত হন। অম্বুবাচী উপলক্ষে চাষীদের যে সর্বজনীন কুস্তী প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের চাষীরাই যোগদান করে। হিন্দুর আখড়ায় মুসলমান লড়িতে আসে, মুসলমানের আখড়ায় হিন্দুরা যায়। তবে আজকাল একটু সাবধানে দল বাঁধিয়া যায়। মারামারি হইবার ভয়টা যেন ইদানীং বাড়িয়াছে। উভয় পক্ষের গানের দলের প্রতিযোগিতা এখনও হয়। হিন্দুরা গায় ঘেঁটুগান, মুসলমানদের আছে আলকাটার কাপ, মেরাচিনের দল। মনসার ভাসানের গান দুই দলেই গায়।

বর্তমানে কুসুমপুরের চামড়ার ব্যবসায়ী দৌলত শেখ সর্বাপেক্ষা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। শেখ ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। গ্রামে ঢুকিতেই পড়ে তাহার দলিজা। সে আপনার দলিজায়

বসিয়া তামাক খাইতেছিল, পথে দেবুকে দেখিয়া সে ডাকিল—আরে দেবু পণ্ডিত নাকি? কুথাকে যাবে বাপযান? আরে শুন শুন!

দেব একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া আসিল। দৌলত শেখ সহৃদয়তার সঙ্গেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দলিজায় বসাইল। তারপর বিনা ভূমিকায় সে বলিল— ই কাম তুমি ভাল করছ না বাপযান।

দেবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শেখের দিকে চাহিল। শেখ বলিল—খাজনা বৃদ্ধি নিয়া হাঙ্গামা করছ, ধর্মঘট বাধাইছ—ই কাম তুমি ভাল করছ না।

সবিনয়ে হাসিয়া দেবু বলিল—কেন?

দাড়িতে হাত বুলাইয়া দৌলত বলিল—আপন কামে কলকাতায় গেছিলাম। লাটসাহেবের মেম্বরদের সঙ্গে মুলাকাত হয়েছিল আমার। আমার মক্কেল আমারে নিয়া গেছিল মিনিস্টরের বাড়ী। হক সাহেবের পেয়ারের লোক মুসলমান মিনিস্টর, তাঁর বাড়ী। আমি শুধালাম। মিনিস্টর আমারে বললেন মিটমাট করে নিবার লেগে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। দৌলতই বলিল—তুমি বহুত ফৈজতে পড়বা পণ্ডিত, ই কাম তুমি করিও না। শেষ-মেশ সকল হুজ্জত তোমার উপর গিয়ে পড়বা। বেইমানরা তখন ঘরের কোণে জরুর আঁচল ধরে গিয়ে বসবা। মিনিস্টার আমারে বললেন—সরকারী আইনে যখন জমিদার বৃদ্ধি পাবার হক্‌দার হইছে, তখন ঠেকাবে কে? তার চেয়ে মিটমাট করে নেন গিয়া—সেই ভাল হবে। হুজ্জত বাধাইলে সরকারের ক্ষতি, সরকার সহ্য করবা না।

দেবু এবার বলিল—কিন্তু যে বৃদ্ধি জমিদার দাবী করছেন, সে দিতে গেলে আমাদের থাকবে কি? আমরা খাব কি?

দৌলত মৃদুস্বরে বলিল—ঘোষের সাথে আমি কথা বলেছি বাপজান। আমারে ঘোষ পাকা কথা দিছে। তুমি বল—তুমারও আমি সেই হারে করে দিব। টাকায় আনা। ব্যস্! দৌলত অত্যন্ত বিজ্ঞের মত হাসিতে লাগিল।

—তাতে তো আমরা এক্ষুনি রাজী। আজই আমি ডেকে বলছি সব—

বাধা দিয়ে দৌলত বলিল—সবার কথা বাদ দিতে হবে, ই আমি তুমার কথা বুলছি।

দেবু এবার সমস্ত কথা এক মুহূর্তে বুঝিয়া লইল। সে ঈষৎ হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—মাফ করবেন চাচা, একলা মিটমাট আমি করব না। আপনি চার পয়সা বলছেন? আমি জানি, এদের পক্ষ আমি যদি ছেড়ে দিই—শ্রীহরি টাকায় এক পয়সা বৃদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে মিটমাট করবে কিন্তু সে আমি পারব না।—দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল।

দৌলত তাহার হাত ধরিয়া বলিল—বস, বাপজান বস!

দেবু বসিল না, কিন্তু হাতও ছাড়াইয়া লইল না; দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল—বলুন।

—দেখ বাপ, আমার বয়স তিন কুড়ি হয়ে গেল—দুনিয়ার অনেক দেখলাম, অনেক শুনলাম। ই কাম তুমি করিয়ো না দেবু। আমি তোমাকে বুলছি, ই কাম তুমি করিয়ো না। শুন দেবু, দুনিয়াতে মানুষ বড় হয় ধনদৌলতে, আর বড় হয় আপনার এলেমে। ভাল

কাম যে করে, আল্লা তাকে বড় করে। বাপজান, প্রথম বয়সে খালি পায়ে ছাতা মাথায় বিশ কোশ হেঁটেছি—মুচীদের বাড়ী গিয়ে খাল কিনেছি, জমিদারে সেলাম ঠুকেছি, তুমার লগ্নিরে বুলেছি চাচা। আজ আল্লার মেহেরবানিতে ক্ষেত-খামার করলাম—নগদ টাকা জমালাম,—এখন যদি আমারে আমি কদর না করি, তবে দশজনা ছোট আদমিতেই বা আমায় খাতির করবে কেনে, আর আল্লাই বা আমার উপর মেহেরবানি রাখবে কেনে? তোমার গাঁয়ের ঘোষেরে দেখ, দেখ তার চাল-চলন। আরও শুন, কঙ্কণার মুখুর্জাদের কর্তার সবে তখন ব্যবসার পত্তন। তখন মুখুর্জা রায়বাবুদের, বাঁড়ুজ্জাবাবুদের সালাম বাজাত, পায়ের ধুলা নিত। আবার দেখলাম—লাখ টাকা রোজগার করলে, মুখুর্জাকর্তাই মুলুকের সেরা আদমি হল; তখুনি নিজে বসত চেয়ারে, রায়বাবুদের বসতে দিত তক্তপোশে! ইজ্জত রাখতে হয়! বাপজান, তুমার বেটা গেছে—বহুত মাশুল তুমি দিছ, তার জন্যে দশজনা তুমাকে ধন্যি করছে। আমীর রইস থেকে ছোটলোক সবাই ভাল বুলছে। এই সময় নিজের ইজ্জত তুমার নিজেকে বুঝতে হবে। ছোটলোক-হারামীদের সাথে উঠা-বসা তুমি করিও না। কঙ্কণার বাবু, পেসিডেন্ বাবু বুলছিল—দেবু ঘোষ যদি ইবার বোডে দাঁড়ায় তবে মুশকিল করবে। বোডে দাঁড়াও তুমি। ব্যবসা-পাতি কর, এখুন তোমাকে খাতির করে বহুত মাহাজন মাল দিবে; আমি বুলছি দিবে। সাদি কর, ঘর-সংসার কর।

দেবু ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইল। অভিবাদন করিয়া বলিল—সেলাম চাচা, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।

দৌলত এবার স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল—তুমি ব্যবসা কর, শ্রীহরি ঘোষ মাহাজনের কাছে তোমার লাগি জামিন থাকবে।

হাত জোড় করিয়া দেবু বলিল—সে হয় না চাচা, কিছু মনে করবেন না আপনি।

সে আসিয়া উঠিল চাষী মুসলমানদের পাড়ায়। সেখানে তখন অনেক লোক জুটিয়াছে। সমবেত হওয়ার আনন্দে উৎসাহে তাহারা তাহাদের পাড়ার গানের দলটাকে লইয়া গানবাজনার ব্যবস্থাও করিয়াছে। শ্রমিক ও শ্রমিক-চাষীদের গান-বাজনার দল। পশ্চিম-বাংলায় এই ধরনের দলকে বলে—ছ্যাঁচড়ার দল। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে ধুয়া ধরিয়া গান গাহিতেছিল, মূল গায়েন ইট-পাড়াইয়ের ঠিকাদার ওসমান—মূল গানটা গাহিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের বহু প্রাচীন কালের গান। ছেলেগুলি ধুয়া গাহিতেছে—

"—সজনি লো—দেখে যা—এত রেতে চরকায় ঘর্‌ঘরানী—
সজনি—লো—!"

ওসমান গাহিয়া চলিয়াছিল—

"কোন্ সজনি বলে রে ভাই চরখার নাইক হিয়া—
চরখার দৌলতে আমার সাতটি বেটার বিয়া।
কোন্ সজনী বলে রে ভাই চরখার নাইক পাঁতি—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি।

কোন্ সজনী বলে রে ভাই চরখার নাইক নোয়া—
চরখার দৌলতে আমার দোবে বাঁধা ঘোড়া।"

দেবু আসিতেই গান থামিয়া গেল। কয়েকজন একসঙ্গেই বলিল—এই যে, আসুন—পণ্ডিত সাহেব আসুন।

রহম বলিল—বুড়ো শয়তান তুমাকে কি বুলছিল চাচা?

দেবু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

চাষীদের মাতব্বর, কুসুমপুর মক্তবের শিক্ষক ইরসাদ বলিল—বসেন ভাই সাহেব। দৌলত শেখ যা বুলছিল—সে আমরা জানি। আমাদের গাঁয়ে মজলিশের কথা শুনে—ছিরু ঘোষও যে এসেছিল আজ দৌলত শেখের কাছে।

দেবু এ-কথার কোন উত্তর দিল না।

ইরসাদ বলিল—আপনি বুড়াকে কি বললেন?

—ওঁর কথা থাক্ ভাই ইরসাদ। এখানে আমাকে ডেকেছেন যার জন্যে, সেই কথা বলুন।

ইরসাদ স্থির দৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উদ্ধত দুর্ধর্ষ রহম মুহূর্তে উগ্র উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আলবাৎ বুলতে হবে তুমাকে।

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না।

—আল্‌বাৎ বুলতে হবে।

দেবু এইবার প্রশ্ন করিল ইরসাদকে—ইরসাদ ভাই?

ইরসাদ রহমকে ধমক দিয়া বলিল—রহম চাচা, করছ কি তুমি? বস, চুপ করে বস।

রহম বসিল, কিন্তু দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিয়া আপন মনেই বলিল—যে হারামী বেইমানী করবে,তার নলীটা আমি দু ফাঁক করে ময়ূরাক্ষীর পানিতে ভাসায়ে দিব, হ্যাঁ! যা থাকে আমার নসীবে।

দেবু এবার হাসিয়া বলিল—সে যদি করি রহম চাচা, তবে তুমি তাই করো! সে সময়ে যদি চেঁচাই কি তোমাকে বাধা দিই, তবে আজকের কথা তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও। আমি তোমাকে বাধা দেব না; চেঁচাব না; কাঁদব না, গলা বাড়িয়ে দেব।

সমস্ত মজলিশটা স্তব্ধ হইয়া গেল। ছ্যাচড়ার দলের ছোকরা কয়টি বিড়ি টানিতে টানিতে মৃদুস্বরে রসিকতা করিতেছিল—তাহারা পর্যন্ত সবিস্ময়ে দেবু ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। অনুত্তেজিত শান্ত স্বরে উচ্চারিত কথা কয়টি শুনিয়া সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল—এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে আশ্চর্য সে এক মিষ্টি হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। ওই কথাগুলা বলিয়া মানুষ এমন করিয়া হাসিতে পারে? রহম যে রহম, সেও একবার একবার দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া, পরমুহূর্তেই মাথাটা নিচু করিল, এবং অকারণে নখ দিয়া মাটির উপর হিজিবিজি দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর ইরসাদ বলিল—আপনি কিছু মনে করবেন না দেবু-ভাই। রহম চাচাকে তো আপনি জানেন।

—না—না—না, আমি কিছু মনে করি নাই। দেবু হাসিল।—এখন কাজের কথা বলুন ইরসাদ-ভাই। রাত্রি অনেক হয়ে গেল।

ইরসাদ বিড়ি বাহির করিয়া দেবুকে দিল; দেবু হাসিয়া বলিল—ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছেন? ইরসাদ নিজে একটা বিড়ি ধরাইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি ফকির হয়ে গেলেন দেবু-ভাই!

খাজনা-বৃদ্ধি সম্পর্কিত কথাবার্তা শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল। কথা হইল, কুসুমপুরের মুসলমান প্রজারা আলাদা ভাবেই ধর্মঘট করিবে; হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক এইটুকু থাকিল যে, পরস্পরে পরামর্শ না করিয়া কোন সম্প্রদায় পৃথক ভাবে জমিদারের সঙ্গে মিটমাট করিতে পারিবে না। মামলা-মকদ্দমায় দুই পক্ষেরই পৃথক উকীল থাকিবেন, তবে তাঁহারাও পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন।

ইরসাদ বলিল—সদরে নূরউল মহম্মদ সাহেবকে জানেন তো? আমাদের জেলার লীগের সভাপতি; উনাকেই আমরা ওকালতনামা দিব। আমাদের সুবিধা করে দিবেন।

—বেশ, তাই হবে। আজ তাহলে আমি উঠি।...বলিয়া কথা শেষ করিয়া দেবু উঠিল।

—রাত্রি অনেক হয়েছে দেবু-ভাই, দাঁড়ান, আলো নিয়ে লোক সঙ্গে দিই আপনার।

—দরকার হবে না। বেশ চলে যাব আমি।

—না না। বর্ষার সময়, আঁধার রাত, সাপ-খোপের ভয়। তা ছাড়া তোমার ঘোষকে বিশ্বাস নাই। ঘোষের সাথে দৌলত শেখ জুটেছে। উঁহু!

সম্মুখের প্রাঙ্গণটায় লোকজন তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল রহম চাচা, এক হাতে হ্যারিকেন, অন্য হাতে একগাছা লাঠি।—আমি যাচ্ছি ইরসাদ, আমি যাচ্ছি। চল বাপজান।—বলিয়া সে একমুখ হাসিল।

রহম দুর্দান্ত গোঁয়ার হইলেও চাষীদের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তাহার পক্ষে এইভাবে কাহাকেও আগাইয়া দেওয়া অগৌরবের কথা। দেবু ব্যস্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না, না, চাচা,—সে কি, তুমি কেন যাবে?

—আরে বাপজান, চল। দেখি তুমার দৌলতে যদি পথে ঘোষ কি শেখের লোকজনের সাথে মুলাকাত হয় তো একপ্যাঁচ আমুতির লড়াই করে লিব।...সে পরম গৌরবে হাসিতে আরম্ভ করিল। দেবু আর আপত্তি করিল না। ইরসাদও বাধা দিল না। অন্যায় সন্দেহে আকস্মিক ক্রুদ্ধ মুহূর্তে-সে দেবুকে যে কটু কথা বলিয়াছে, তাহারই অনুশোচনায় সে এমন ভাবে লাঠি-আলো লইয়া এই রাত্রে দেবুর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছে; আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও 'মাফ কর' কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই; সে তাই মমতাময় অভিভাবকের

মত আপনার সকল সম্মান খর্ব করিয়া তাহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া বুঝাইতে চায় —সে তাহাকে কত ভালবাসে, সে তাহার কত বড় আত্মীয় !

ইরসাদ বলিল—যাও চাচা—তাই তুমিই যাও।···

মাঠে পড়িয়াই রহম উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

"কালো বরণ মেঘ রে, পানি নিয়া আয়
আমার জান জুড়ায়ে দে।"

হাসিয়া দেবু বলিল—আর জল নিয়ে করবে কি চাচা? মাঠ যে ভেসে গেল।

রহম একটু অপ্রস্তুত হইল। চাষের সময় এই মাঠের মধ্যে তাহার এই গানটাই মনে আসিয়া গিয়াছে।· বলিল—ব্যাঙের সাদীর গান চাচা! বলিয়াই আবার দ্বিতীয় ছত্র ধরিল—

"বেঙীর সাদী দিব রে মেঘ, ব্যাঙের সাদী দিব,
হুড়-হুড়ায়ে দে-রে জল, হুড়-হুড়ায়ে দে।
আমার জান জুড়ায়ে দে।"

আষাঢ়-শ্রাবণে অনাবৃষ্টি হইলে এ অঞ্চলে ব্যাঙের বিবাহ দিবার প্রথা আছে। ব্যাঙের বিবাহ দিলে নাকি আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামে। বাল্যকালে দেবুও দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া ব্যাঙের বিবাহ দিয়াছে। ব্যাঙের বিবাহে তাহার প্রিয়তমা বিলুরও বড় উৎসাহ ছিল। তাহার মনে পড়িল, বিলু একবার একটা ব্যাঙকে কাপড়-চোপড় পরাইয়া অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে কনে সাজাইয়াছিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিলু ও খোকা! তাহার জীবনের সোনার লতা ও হীরার ফুল। ছেলেবেলায় একটি রূপকথা শুনিয়াছিল—রাজার স্বপ্নের কথা। স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছিলেন—এক অপূর্ব গাছ, রুপার কাণ্ড সোনার ডাল-পালা, তাহাতে ধরিয়াছে হীরার ফুল। আর সেই গাছের উপর পেখম ধরিয়া নাচিতেছে হীরা-মোতি-পান্না-প্রবাল-পোখ্‌রাজ-নীলা প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের মণিমাণিক্যময় এক ময়ূর। বিলু ছিল তাহার সেই গাছ, খোকা ছিল সেই ফুল, আর সেই গাছে নাচিত যে ময়ূর—সে ছিল তাহার জীবনের সাধ-সুখ-আশা-ভরসা, তাহার মুখের হাসি, তাহার মনের শান্তি! সে নিজে, হ্যাঁ নিজেই তো, সেই গাছ কাটিয়া ফেলিয়াছে। আজ সে শুধু ধর্ম, কর্তব্য, সমাজ লইয়া কেবল ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাই যদি সে ভগবানকে ডাকিতে পারিত!

রাজবন্দী যতীনবাবু এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর মধ্যে মধ্যে কতদিন তাহার মনে হইয়াছে যে, সব ছাড়িয়া যে কোন তীর্থে চলিয়া যায়। কিন্তু সে যেন পথ পাইতেছে না। যেদিন যতীনবাবু চলিয়া গেলেন, সেই দিনই ন্যায়রত্ন মহাশয় চিঠি পাঠাইলেন—"পণ্ডিত, আমাকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর।"

খাজনা-বৃদ্ধি লইয়া জমিদার-প্রজায় যে বিরোধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে সে বিরোধে প্রজাপক্ষের সমস্ত দায়িত্ব, বিপুল-ভার পাহাড়ের মত তাহার মাথায় আজ চাপিয়া বসিয়াছে।

খাজনা-বৃদ্ধি। প্রজার অবস্থা চোখে দেখিয়াও জমিদার কেমন করিয়া যে খাজনা-বৃদ্ধি চায়, তা সে বুঝিতে পারে না।

প্রজার কি আছে? ঘরে ধান নাই, বৈশাখের পর হইতেই চাষী প্রজা ধান ধার করিয়া খাইতে শুরু করিয়াছে। গোটা বৎসর পরনে তাহাদের চারিখানার বেশী কাপড় জোটে না, অসুখে লোকে বিনা চিকিৎসায় মরে। চালে খড় নাই; গোটা বর্ষার জলটা তাহাদের ঘরের মেঝের উপর ঝরিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়াও খাজনা-বৃদ্ধি দাবী কেমন করিয়া করে তাহারা? এ অঞ্চলের জমিদারেরা একটা যুক্তি দেখাইয়াছেন যে ময়ূরাক্ষী নদীর বন্যারোধী বাঁধ তাঁহারা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, তাহার ফলে এখানকার জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। এত বড় মিথ্যা কথা আর হয় না। এ বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে প্রজারা। জমিদার মাথা হইয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছে, চাপরাসী দিয়া প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আজও প্রজারাই প্রতি বৎসর বাঁধ মেরামত করে। ইদানীং অবশ্য চাষী-প্রজারা অনেকে বাঁধ মেরামতের কাজে যায় না। এখন আইনও কিছু কড়া হইয়াছে বলিয়া জমিদার সদ্গোপ প্রভৃতি জাতির প্রজাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া কাজ করাইতে সাহসও করে না; কিন্তু বাউরী, মুচী, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর প্রত্যেককে আজও বেগার খাটাইয়া লয়। সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অব রাইট্সে পর্যন্ত ওই বেগার দেওয়াটাই তাহাদের বসতবাটির খাজনা হিসাবে লেখা হইয়াছে। 'ভিটার খাজনা বৎসরে তিনটি মজুর'—একটি বাঁধ মেরামতের জন্য, একটি চণ্ডীমণ্ডপের জন্য, অপরটি জমিদারের নিজের বাড়ীর জন্য।

—দেবু চাচা! ইবার আমি যাই? এতক্ষণ ধরিয়া রহম শেখ সেই গানটাই গাহিতেছিল, অকস্মাৎ গান বন্ধ করিয়া দেবুকে বলিল—গাঁয়ের ভিতরে আমি আর যাব না। লণ্ঠন ও লাঠি হাতে দেবুর সঙ্গী হিসাবে রহম এ গ্রামে ঢুকিতে চায় না।

দেবু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—গ্রামপ্রান্তে মুচীপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার তুমি যাও চাচা।

—আদাব।

—আদাব চাচা।

—আমার কথায় তুমি যেন কিছু মনে করিও না বাপজান!...রহম এতটা পথ লাঠি ও লণ্ঠন হাতে দেবুর সঙ্গে আসিয়া রূঢ় কথার অপরাধ-বোধের গ্লানি হইতে অনেকখানি মুক্ত হইয়াছে, হাল্কা মনে এবার সে সহজভাবেই কথাটা বলিয়া ফেলিল।

দিব্যহাস্যে দেবুর মুখ ভরিয়া উঠিল, বলিল—না, না, চাচা। ছেলেপিলেকে কি শাসন করি না? বলি না—খারাপ কাজ করলে খুন করব?

—তাহলে আমি যাই?

—হ্যাঁ, যাও তুমি।

—নাঃ, চল তুমারে বাড়ীতে পৌছায়ে দিয়া তবে যাব।...দেবুর মিষ্টহাস্যে, তাহার ওই পরম আত্মীয়তা-সূচক কথাতে রহমের মনের গ্লানি তো মুছিয়া গেলই, উপরন্তু সেই আনন্দের

উচ্ছ্বাসে মুহূর্তে মান-অপমানের প্রশ্নটাও মুছিয়া গেল। সে বলিল—আপন ছেলেকে পৌঁছায়ে দিতে আসছি—তার আবার শরম কিসের? চল।

দেবুর বাড়ীর দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। দেবু বিস্মিত হইয়া গেল। আপনজনহীন বাড়ী,—সেখানে কাহারা এমন করিয়া বসিয়া আছে? এত রাত্রিতে কোথা হইতে কাহারা আসিল? কুটুম্ব নয় তো? অম্বুবাচী-ফেরত গঙ্গাস্নানের যাত্রী হওয়াও বিচিত্র নয়।

বাড়ীর দুয়ারে আসিতেই পাতু মুচী বলিল—এই যে এসে গিয়েছেন পণ্ডিত!

দাওয়ার উপরে বসিয়া ছিল হরেন ঘোষাল, তারা নাপিত, গিরীশ ছুতার এবং আরও কয়েকজন। শঙ্কিত হইয়াই দেবু প্রশ্ন করিল—কি হল?

হরেন বলিল—This is very bad পণ্ডিত, very bad;—এই জল-কাদা, সাপ-খোপ, অন্ধকার রাত্রি, তার ওপর জমিদারের সঙ্গে এই সব চলছে। তুমি সন্ধ্যাবেলায় আসবে বলে গেলে, তারপর এত রাত্রি পর্যন্ত আর নো-পাত্তা!

দরজার মুখের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা। সে হাসিয়া বলিল—জামাই তো কাউকে আপন ভাবে না ঘোষাল মশায়, যে মনে হবে আমার লেগে কেউ ভাবছে!

দেবু মৃদু হাসিল।

পাতু বলিল—আমি এই বেরুচ্ছিলাম লণ্ঠন নিয়ে।

দুর্গা বলিল—রাত হল দেখে কামার-বৌকে দিয়ে রুটি করিয়ে রেখেছি। মুখ-হাতে জল দাও, দিয়ে—চল খেয়ে আসবে। আজ আর রান্না করতে হবে না।

এই দুর্গা আর কামার-বউ পদ্ম! দেবুর স্বজনহীন জীবনে শুধু পুরুষেরাই নয়, এই মেয়ে দুটিও অপরিমেয় স্নেহমমতা লইয়া অযাচিত-ভাবে আসিয়া তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিতে চায়। কামার-বউ তাহার মিতেনী। অনি-ভাই যে দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল! কামার-বউ পদ্ম এখন তাহার পোষ্যের সামিল; স্বামী-পরিত্যক্তা বন্ধ্যা মেয়েটার মাথাও খানিকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। পদ্মকে লইয়া সে যে কি করিবে ভাবিয়া পায় না।

ভাবিতে ভাবিতে সে দুর্গার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। দুর্গা বলিল—দেবতা ললপাচ্ছে। রাতে জল হবে। ওঃ কি মেঘ!

পাঁচ

পদ্ম প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়া ছিল।

প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া অনেকদিন পর আজ আবার সে তৃপ্তি পাইয়াছে। এক সময় অনিরুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া কতদিন সারারাত জাগিয়া থাকিত। তারপর আসিয়াছিল যতীন।

পদ্মের রিক্ত জীবনে যতীনের আসাটা যেন একটা স্বপ্ন। ছেলেটি হঠাৎ আসিয়াছিল। বিধাতা যেন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিতেও বিস্ময় লাগে হঠাৎ থানার লোক

. *

আসিয়া তাহাদের একখানা ঘর ভাড়া লইল। কে নজরবন্দী আসিবে। তাহার পর আসিল যতীন।

অনিরুদ্ধের একখানা ঘর ভাড়া লইয়া পুলিস-কর্তৃপক্ষ কলিকাতার এই ছেলেটিকে এই সুদূর পল্লীগ্রামের উত্তেজনাহীন আবেষ্টনীর মধ্যে আনিয়া রাখিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিয়াছিল বাংলার মুমূর্ষু সমাজের অসুস্থ নিঃশ্বাস ইহাদের অন্তরেও সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। বর্ষার জলভরা মেঘের প্রাণদশক্তিকে নিষ্ফল করিবার জন্য মরুভূমির আকাশে পাঠাইয়া ছিলেন যেন ক্রুদ্ধ দেবতা। কিন্তু একদিন দেবতা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন প্রাণশক্তি ব্যর্থ হয় নাই; ঊষর-মরু-বুকে মধ্যে মধ্যে সবুজের ছোপ ধরিয়াছে, ওয়েসিস্ শিশু জাগিয়াছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লীগ্রামের তাপতৃষ্ণাময় নিরুদ্যম জীবনে এই রাজ-বন্দীগুলির প্রাণশক্তির স্পর্শে মরুদ্যান-আবির্ভাবের মত নব জাগরণের আভাস ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেখিয়া-শুনিয়া সরকার রাজবন্দীদের এই পল্লীনির্বাসন প্রথা তুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া লইলেন। বাংলাদেশের সরকারী রিপোর্টে এবং বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসে এ তথ্য স্বীকৃত এবং সত্য।

সে কথা থাক্। পদ্মের কথা বলি। পদ্ম তখন অপ্রকৃতিস্থ ছিল। রাজবন্দী যতীনবাবুকে লইয়া পদ্ম কয়েকদিন পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, সে সাজিয়া বসিয়াছিল তাহার মা। মেয়েদের মা সাজিবার শক্তি সহজাত। তিন-চার বছরের মেয়ে যেমন তাহার সমান আকারের সেলুলয়েডের পুতুল লইয়া মা সাজিয়া খেলা করে—তেমনি করিয়াই পদ্ম কয়েকদিন যতীনকে লইয়া খেলা-ঘর পাতিয়াছিল। যতীন আবার জুটাইয়াছিল এই গ্রামেরই পিতৃমাতৃহীন একটা বাচ্চাকে—উচ্চিংড়েকে। উচ্চিংড়ে আবার আনিয়াছিল আর একটাকে—সেটার নাম ছিল গোবরা।

দিনকতক খেলা-ঘর জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ ঘরটা ভাঙিয়া গেল। পুলিস-কর্তৃপক্ষ যতীনকে সরাইয়া লইতেই পদ্মর জীবনে আর এক বিপর্যয় আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার একমাত্র আর্থিক সংস্থান ঘরভাড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চিংড়ে এবং গোবরাও পদ্মকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কারণ আহারের কষ্ট সহ্য করিতে তাহারা রাজী নয়। জীবনে ইহারই মধ্যে তাহারা উপার্জনের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে বড় রেলওয়ে জংশন-স্টেশন। ব্যবসায় সেখানে দিন-দিন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; মাড়োয়ারী মহাজনদের গদী—বড় বড় ধান-কল, তেল-কল, ময়দা-কল, মোটর-মেরামতের কারখানা প্রভৃতিতে অহরহ টাকা-পয়সার লেনদেন চলিতেছে—বর্ষার জলের মত; মাঠের মাছের মত বন্যার জলের সন্ধান পাইয়া উচ্চিংড়ে ও গোবরা সেইখানে গিয়া জুটিয়াছে। কয়েকদিন ভিক্ষা করে; কয়েকদিন চায়ের দোকানে ফাই-ফরমাশ খাটে; কখনও মোটর-সার্ভিসের বাস ধুইবার জন্য জল তুলিয়া দেয়; আর সুযোগ পাইলে গভীর রাত্রে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে ঘুমন্ত যাত্রীদের দুই-একটা ছোটখাটো জিনিস লইয়া সরিয়া পড়ে।

পদ্ম যে তাহাদের ভালবাসিয়াছিল, সেও বোধ হয় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। কোন

দিন একবারের জন্যও তাহারা আসেও না। অনিরুদ্ধ জেলে। পদ্ম আবার বিশ্ব-সংসারে একা হইয়া পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে তাহার মানসিক অসুস্থতা আবার বাড়িতেছিল। একা উদাস দৃষ্টিতে জনহীন বাড়ীটার মাথার উপরের আকাশের দিকে চাহিয়া সে এখন নিথর হইয়া বসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে খুটখাট শব্দ উঠে। বিড়াল অথবা ইঁদুরে শব্দ করে ; অথবা কাক আসিয়া নামে। সেই শব্দে দৃষ্টি নামাইয়া সেদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া এক টুকরা বিচিত্র হাসিয়া আবার সে আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া তাকায়। উচ্চিংড়ে-গোবরা যে পরের ছেলে, তাহারা যে চলিয়া গিয়াছে এ কথাটা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

একমাত্র দুর্গা-মুচিনী তাহার খোঁজখবর করে। দুর্গা তাহাকে বলে, মিতেনী। এককালে স্বৈরিণী দুর্গা অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিতে পাতাইয়াছিল, শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ করিবার জন্যই পদ্মকে তখন সে মিতেনী বলিত। কিন্তু এখন সম্বন্ধটা হইয়া উঠিয়াছে পরম সত্য। দুর্গাই দেবু ঘোষকে পদ্মের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—একটা উপায় না করলে তো চলবে না জামাই !

দেবু চিন্তিত হইয়া উত্তর দিয়াছিল—তাই তো দুর্গা !

—তাই তো বলে চুপ করলে তো হবে না। তোমার মত লোক গাঁয়ে থাকতে একটা মেয়ে ভেসে যাবে ?

—কামার-বউয়ের বাপের বাড়ীতে কে আছে ?

—মা-বাপ নাই, ভাই-ভাজ আছে—তারা বলে দিয়েছে ঠাঁইঠুনো তারা দিতে পারবে না।

—তাহলে ?

—তাই তো বলছি। শেষকালে কি ছিরু পালের—

—ছিরু পালের ? দেবু চমকিয়া উঠিয়াছিল।

হাসিয়া দুর্গা বলিয়াছিল—ছিরু পালকে তো জান ? ঢের দিন থেকে তার নজর পড়ে আছে কামার-বউয়ের ওপর। ওর দিকে নজর দিয়ে আমাকে ছেড়েছিল সে। তাই তো আমি ইচ্ছে করে ওকে দেখাবার জন্যে অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিতে পাতিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিয়াছিল—খাওয়া-পরার কথা আমি ভাবছি না দুর্গা। একটি অনাথা মেয়ে, তার ওপর অনি-ভাই আমার বন্ধু ছিল, বিলুও কামার-বউকে ভালবাসত। খাওয়া-পরার ভার না হয় আমি নিলাম, কিন্তু ওকে দেখবে শুনবে কে ? একা মেয়েলোক—

শুনিয়া লঘু হাস্য ফুটিয়াছিল দুর্গার মুখে।

দেবু বলিয়াছিল—হাসির কথা নয় দুর্গা।

এ কথায় দুর্গা আরও একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—জামাই, তুমি পণ্ডিত মানুষ। কিন্তু—সহসা সে আপনার আঁচলটা মুখে চাপা দিয়া বেশ খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিয়াছিল—এই সব ব্যাপারে আমি কিন্তু তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত।

দেবু স্বীকার করিয়া হাসিয়াছিল।

—পোড়ার মুখের হাসিকে আর কি বলব? বলিয়া সে হাসি সংবরণ করিয়া অকৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলিয়াছিল—জান জামাই! মেয়েলোক নষ্ট হয় পেটের জ্বালায় আর লোভে। ভালবেসে নষ্ট হয় না—তা নয়, ভালবেসেও হয়। কিন্তু সে আর ক'টা? একশোটার মধ্যে একটা। লোভে পড়ে—টাকার লোভে, গয়না-কাপড়ের লোভে মেয়েরা নষ্ট হয় বটে। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পণ্ডিত। তুমি তাকে পেটের জ্বালা থেকে বাঁচাও। কর্মকার পেটের ভাত রেখে যায় নাই, কিন্তু একখানা বগি-দা রেখে গিয়েছে; বলত, এ দা দিয়ে বাঘ কাটা যায়। সেই দাখানা পদ্ম-বউ পাশে নিয়ে শুয়ে থাকে। কাজ করে, কর্ম করে —দাখানা রাখে হাতের কাছাকাছি। তার লেগে তুমি ভেবো না। আর যদি দেহের জ্বালায় সে থাকতে না পারে, খারাপই হয়, তা হলে তোমার ভাত আর সে তখন খাবে না। চলে যাবে।

দেবু সেই দিন হইতে পদ্মের ভরণপোষণের ভার লইয়াছে। দুর্গা দেখাশুনা করে। আজ পদ্মের বাড়ীতেই দুর্গা ময়দা কিনিয়া দিয়া দেবুর জন্য রুটি গড়াইয়া রাখিয়াছে।

খাবারের আয়োজন সামান্যই, রুটি, একটা তরকারি, দুই টুকরা মাছ, একটু মসুর-কলাইয়ের ডাল ও খানিকটা গুড়। কিন্তু আয়োজনের পারিপাট্য একটু অসাধারণ রকমের। থালা-গেলাস-বাটিগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে রুপার মত; ছেঁড়া কাপড়ের পাড়ের সুতা দিয়া তৈরী করা আসনখানি ভারি সুন্দর। তাহার নিজের হাতের তৈরী। কয়েকটি কচি পদ্মপাতা সুনিপুণভাবে গোল করিয়া কাটিয়া জলের গেলাসের ঢাকা করিয়াছে, ডালের বাটিও পদ্মপাতায় ঢাকা; সব চেয়ে ছোট যেটি সেটির উপর দিয়াছে একটু নুন, ইহাতেই সামান্য যেন অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে; প্রথম দৃষ্টিতেই মন অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। পদ্মের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া, শুচি-শ্রদ্ধা-মাখা এই আয়োজন দেখিয়া দেবু বেশ একটু লজ্জিত হইল।

—আরে বাপ রে! মিতেনী এসব করেছে কি দুর্গা?

দাওয়ার উপর এক প্রান্তে দুর্গা বসিয়া ছিল, সে হাসিয়া বলিল—আর বলো না বাপু, নুন দেবে কিসে—এই নিয়ে ভেবে সারা। আমি বললাম—একটু শালপাতা ছিঁড়ে তারই উপর দাও—উঁহু। শেষে এই রাত্তিরে গিয়ে পদ্মপাতা নিয়ে এল। তারপর ওই সব তৈরী হল।

পদ্ম খাবারের থালা নামাইয়া দিয়া, রান্নাঘরের দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কথাগুলি শুনিয়া তাহার মাথাটা অবসন্ন হইয়া দেওয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িল, স্থির-উদাস দৃষ্টিভরা বড় চোখ দুটিও মুহূর্তে বন্ধ হইয়া আসিল, দেহ-মন যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, চোখে স্বস্তির ঘুম জড়াইয়া আসিতেছে।

আসনে বসিয়া দেবুরও বড় ভাল লাগিল। বহুদিন—বিপুল মৃত্যুর পর হইতে এমন যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ খাইতে দেয় নাই। গ্লাসে জল গড়াইয়া হাত ধুইয়া সে হাসিয়া বলিল —দুর্গা, বিলু যাওয়ার পর থেকে এত যত্ন করে আমাকে কেউ খেতে দেয় নাই।

দুর্গা দেবুকে কোন জবাব দিল না, রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল—শুনছ হে মিতেনী, তোমার মিতে কি বলছে? ঘরের মধ্যে পদ্মের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুর্গা দেবুকে বলিল—বেশ মিতেনী তোমার, জামাই! খেতে দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। কি চাই—কোন্‌টা ভালো হয়েছে, শুধোবে কে বল তো?

দেবু বলিল—না, না, আমার আর কিছু চাই না। আর রান্না সবই ভালো হয়েছে।

—তা হলেও এসে দুটো কথা বলুক। গল্প না করলে খাওয়া হবে কি করে?

—তুই বড় ফাজিল দুর্গা।

—আমি যে তোমার শালী গো! বলিয়া সে হাসিয়া সারা হইল, তারপর বলিল—আমার হাতে তো তুমি খাবে না ভাই, নইলে দেখতে এর চেয়ে কত ভালো করে খাওয়াতাম তোমাকে।

দেবু কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল; বলিল—আচ্ছা এখন চললাম।

আলোটা তুলিয়া লইয়া দুর্গা অগ্রসর হইল। দেবু বলিল—তোকে যেতে হবে না, আলোটা আমাকে দে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দুর্গা আলোটা নামাইয়া দিল। বাড়ী হইতে দেবু বাহির হইতেই কিন্তু সে আবার ডাকিয়া বলিল—শোন জামাই, একটু দাঁড়াও!

দেবু দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

দুর্গা অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল—একটা কথা বলছিলাম।

—বল্!

—চল, যেতে যেতে বলছি।

একটু অগ্রসর হইয়া দুর্গা বলিল—কামার-বউকে কিছু ধান ভানা-কোটার কাজ দেখে দাও, জামাই। একটা পেট তো, ওতেই চলে যাবে। তারপর যদি কিছু লাগে তা বরং তুমি দিও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু শুধু বলিল—হুঁ!

আরও কিছুটা আসিয়া দুর্গা বলিল—এ গলির পথে আমি বাড়ী যাই।

দেবু কোনও উত্তর দিল না। দুর্গা ডাকিল—জামাই!

—কি?

—আমার উপর রাগ করেছ?

দেবু এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—না।

—হুঁ, রাগ করেছ। রাগ যদি না করেছ তো কই হাস দেখি একটুকুন।

দেবু এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল—যা, ভাগ্!

কৃত্রিম ভয়ে দুর্গা বলিয়া উঠিল—বাবা রে! এইবারে জামাই মারবে বাবা! পালাই।—বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া এক-হাত কাচের চুড়িতে যেন বাজনার ঝঙ্কার তুলিয়া গলি-

পথের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

দেবু সস্নেহে একটু হাসিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া সে যখন বাড়িতে পৌঁছিল, তখন দেখে পাতু শুইতে আসিয়া বসিয়া আছে। দুর্গার দাদা পাতু মুচী দেবুর বাড়ীতেই শোয়।

বিছানায় শুইয়াও দেবুর ঘুম আসিল না।

যাহাকে বলে খাঁটি চাষী, সেই খাঁটি চাষীর ঘরের ছেলে সে। বাপ তাহার নিজের হাতে লাঙল ধরিয়া চাষ করিত; কাঁধে করিয়া বাঁক বহিত, সারের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া গাড়ী বোঝাই করিত, ধানের বোঝা মাঠ হইতে মাথায় বহিয়া ঘরে আনিত, গরুর সেবা করিত। দেবুও ছেলেবেলায় ভাগের রাখালের পালে গরু দিয়া আসিয়াছে, গরুর সেবা সে-ও সে-সময় নিয়মিত করিত, চাষের সময় বাপের জন্য জলখাবার মাঠে লইয়া যাইত। তাহার বাপ জল খাইতে বসিলে—বাপের ভারী কোদালখানা চালাইয়া অভ্যাস করিত; বাড়ীতে কোদালের যাহা কিছু কাজকর্ম সে-বয়সে সে-ই করিয়া যাইত। তারপর একদা গ্রাম্য পাঠশালা হইতে সে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইল। পাঠশালায় পণ্ডিত ছিল ওই বৃদ্ধ, বর্ত্তমানে দৃষ্টিহীন কেনারাম। কেনারামই সেদিন তাহার বাপকে বলিয়াছিল—তুমি ছেলেকে পড়তে দাও দাদা। ছেলে হতে তোমার দুঃখ ঘুচবে। দেবু যেমন-তেমন বৃত্তি পায় নাই, গোটা জেলার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। কঙ্কণার ইস্কুলে মাইনে লাগবে না, তার ওপর মাসে দু'টাকা বৃত্তি পাবে। না পড়লে বৃত্তিটা পাবে না বেচারী।...

কেনারামই কঙ্কণার স্কুলে তাহার মণ্ডল উপাধি বাদ দিরা ঘোষ লিখাইয়াছিল। তারপর প্রতিবারই সে ফার্স্ট অথবা সেকেণ্ড হইয়া ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত উঠিয়াছে। এই কালটির মধ্যে তাহার বাপ তাহাকে কোন কাজ করিতে দেয় নাই। তাহার বাপ হাসিয়া তাহার মাকে কতবার বলিয়াছে—দেবু আমার হাকিম হবে। দেবুও সেই আশা করিত।...

কথাগুলা মনে করিয়া দেবু আজ বিছানায় শুইয়া হাসিল।

তারপর—অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত তাহার জীবনে নামিয়া আসিল জীবনের প্রথম দুর্যোগ, বাপ-মা প্রায় একসঙ্গেই মারা গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস হইতেই দেবুকে বাধ্য হইয়া পড়া ছাড়িতে হইল। তাহাকে অবলম্বন করিতে হইল তাহার পৈতৃক-বৃত্তি। হাল-গরু লইয়া বাপ-পিতামহের মত সে চাষ আরম্ভ করিল। তারপর পাইয়া গেল সে ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রী প্রাইমারী পাঠশালার পণ্ডিতের পদটি। বেশ ছিল সে। শান্ত-শিষ্ট বিলুর মত স্ত্রী, পুতুলের মত খোকামণি, মাসিক বারো টাকা বেতন, তাহার উপর চাষবাসের আয়। মরাইয়ে ধান, ভাঁড়ারে মাটির জালায় কলাই, গম, তিল, সরিষা, মষ্‌নে, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, দুই-চারিটি আম-কাঁঠালের গাছ, রাজার চেয়েও সুখ ছিল তাহার। অকস্মাৎ তাহার দুর্মতি জাগিল। দুর্মতিটা অবশ্য সে কঙ্কণার স্কুল হইতেই আয়ত্ত করিয়াছিল। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দুর্মতি স্কুল হইতে তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। সেই নেশায়—সেটল্‌মেন্টের কানুনগোর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া—কানুনগোর

চক্রান্তে জেল খাটিল।

জেল হইতে ফিরিয়া নেশাটা যেন পেশা হইয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। নেশা ছাড়িলেও ছাড়া যায়, কিন্তু পেশা ছাড়াটা মানুষের সম্পূর্ণ নিজের হাতে নয়। ব্যবসা বা পেশা ছাড়িব বলিলেই ছাড়া যায় না; যাহাদের সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আছে তাহারা ছাড়ে না। চাষ যাহার পেশা; সে চাষ ছাড়িলে জমিদার বাকী-খাজনার দাবী ছাড়ে না। জমি বিক্রয় হইয়া গেলেও খাজনার দায়ে অস্থাবরে টান পড়ে। সংসারে শুধু কি পাওনাদারেই ছাড়ে না? দেনাদারেও ছাড়ে না যে! মহাজন যদি বলে—মহাজনী ব্যবসা করিব না, তবে দেনাদারেরা যে কাতর অনুরোধ জানায়—সেও তো নৈতিক দাবী, সে-দাবী আদালতের দাবী হইতে কম নয়। আজ তাহারও হইয়াছে সেই দশা। আজ সংসারে তাহার নিজের প্রয়োজন কতটুকু? কিন্তু পাঁচখানা গ্রামের প্রয়োজন তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে।

ছাড়িয়া দিব বলিলে একদিকে লোক ছাড়ে না, অন্যদিকে পাওনাদার ছাড়ে না। তাহার পাওনাদার ভগবান। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গল্প মনে পড়িল;—মেছুনীর ডালা হইতে শালগ্রাম-শিলা আনিয়াছিলেন এক ব্রাহ্মণ। সেই শিলারূপী ভগবানের পূজার ফলে ব্রাহ্মণ সংসারে নিঃস্ব হইয়াও শিলাটিকে পরিত্যাগ করেন নাই। ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন, এই দুর্গত মানুষের মধ্যে যে ভগবান, তিনি ওই মেছুনীর ডালার শিলা।...তাহার বিলু গিয়াছে, খোকন গিয়াছে, এখন তাহাকে লইয়া তাহার অন্তর-দেবতা কি খেলা খেলিবেন তিনিই জানেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু মনে মনেই বলিল—তাই হোক ঠাকুর, দেখি তোমার দৌড়টা কতদূর! স্ত্রী-পুত্র নিয়েছ, এখন পাঁচখানা গ্রামের লোকের দায়ের বোঝা হয়ে তুমি আমার মাথায় চেপে বসেছ। বস, তাই বস...

বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বর্ষার জলভরা মেঘের গুরুগম্ভীর ডাক। গাঢ় ঘন অন্ধকারের মধ্যে অবিরাম রিমিঝিমি বর্ষণ চলিয়াছে। বড় বড় ব্যাঙগুলা পরমানন্দে ডাক তুলিয়াছে। ঝিঁঝির ডাক আজ শোনা যায় না। এতক্ষণ দেবুর এ সম্পর্কে সচেতনতা ছিল না। সে চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া ছিল। সে জানলার বাহিরের দিকে তাকাইল। বাহিরে ঘন অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর সেই অন্ধকারের মধ্যে আলো ভাসিয়া আসিল। রাস্তায় কেহ আলো লইয়া চলিয়াছে। এত রাত্রে এই বর্ষণের মধ্যে কে চলিয়াছে? চলায় অবশ্য এমন আশ্চর্যের কিছু নাই। তবু সে ডাকিল—কে? কে যাচ্ছ আলো নিয়ে?

উত্তর আসিল—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, আমরাই গো; আমি সতীশ।

—সতীশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঠে একটা কাঠ বাঁধতে হবে। ভেবেছিলাম কাল বাঁধব। তা যে রকম দেবতা নেমেছে, তাতে রেতেই না বাঁধলে—মাটি-ফাটি সব খুলে চেঁচে নিয়ে যাবে।

সতীশরা চলিয়া গেল, দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, নিতান্তই অকারণেই ফেলিল। সংসারে সব চেয়ে দুঃখী ইহারাই। চাষী গৃহস্থ তো ঘরে ঘুমাইতেছে, এই গরীব কৃষাণেরা ভাগীদারেরা গভীর রাত্রে চলিয়াছে ভাঙন হইতে তাহাদের জমি রক্ষা করিতে। অথচ

ইহাদিগকে খাদ্য হিসাবে ধান ধার দিয়া তাহার উপর সুদ নেয় শতকরা পঞ্চাশ। প্রথাটির নাম 'দেড়ী'।

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দেবু ওই কথাই ভাবিতেছিল। আজ এই ঘটনাটি এই মুহূর্তে তাহার কছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ চাষীর গ্রামে এ অতি সাধারণ ঘটনা।

কিছুক্ষণ পর জানালার নিচে দাঁড়াইয়া ভয়ার্ত মৃদুস্বরে চুপি চুপি কে ডাকিল—পণ্ডিত মশাই!

কণ্ঠস্বরে ভয়ার্ততার স্পর্শে দেবু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—কে?

—আমি সতীশ।

—সতীশ? কি সতীশ?

—আজ্ঞে, মৌলকিনীর বটতলায় মনে হচ্ছে 'জমাট-বস্তী' হয়েছে।

—'জমাট-বস্তী'? সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাঁ থেকে বেরিয়েই দেখি মাঠের মধ্যে আলো, আজ্ঞে এই জলের মধ্যেও বেশ জোর আলো। লাল বরণ আলো দপদপ করে জলছে। ঠাওর করে দেখলাম, মৌলকিনীর পাড়ে বটতলায় মশালের আলো জলছে।

'জমাট-বস্তী'—অর্থাৎ রাত্রে আলো জ্বালাইয়া ডাকাতের দলের সমাবেশ। দেবু দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল, বলিল—তুমি ভূপাল চৌকিদারকে তাড়াতাড়ি ডাক দেখি!

—আপনি ঘরের ভেতর যান পণ্ডিত মশায়। আমি এখুনি ডেকে আনছি।

দেবু অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা, তুমি যাও, শীগগির যাবে। আরি ঘরেই দাঁড়িয়ে আছি।

সতীশ চলিয়া গেল, দেবু অন্ধকারের মধ্যেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। 'জমাট-বস্তী'! বিশ্বাস নাই। বর্ষার সময় এখন গরীবদের ঘরে ঘরে অভাব-অনটন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আকাশে মেঘ, বর্ষণ রাত্রিকে দুর্যোগময়ী করিয়া তুলিয়াছে। চুরি-ডাকাতি যাহারা করে, সংসারের অভাব-অনটনে তাহাদের সুপ্ত আক্রোশ যখন এই হিংস্র পাপ-প্রবৃত্তিকে খোঁচা দিয়া জাগায় তখন বহির্জগতের এই দুর্যোগের সুযোগ তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকে, ক্রমে তাহারা পরস্পরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। তারপর একদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়ে নিষ্ঠুর উল্লাসে। নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া একজন হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়া অদ্ভুত এক রুদ্র রব তুলিয়া ধ্বনিটাকে ছড়াইয়া দেয় স্তব্ধরাত্রে দিগ্‌দিগন্তরে। সেই সঙ্কেতে সকলে আসিয়া সমবেত হয় ঠিক স্থানটিতে; তারপর তাহারা অভিযানে বাহির হইয়া পড়ে। সে সময় তাহাদের মায়া নাই, দয়া নাই, চোখে জলিয়া উঠে এক পরুষ কঠিন বিস্মৃতিময় দৃষ্টি—তখন আপন সন্তানকেও তাহারা চিনিতে পারে না; দেহে মনে জাগিয়া উঠে এক ধ্বংসশক্তির দুর্বার চাঞ্চল্য। তখন যে বাধা দেয়, তাহার মাথাটা ছিঁড়িয়া লইয়া গেণ্ডুয়ার মত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় অথবা নিজেরাই মরে। নিজেদের কেহ মরিলে তাহারা মৃতের মাথাটা কাটিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

কথাগুলা ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেবু শিহরিয়া উঠিল। এখনি কোথায় কোন্ পল্লীতে হা-হা শব্দে একটা ভয়ানক অট্টশব্দ তুলিয়া উহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ভূপাল এখনও আসিতেছে না কেন? ভূপালের আসিবার পথের দিকে সে স্থির ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বর্ষণ-মুখর রাত্রি, একটানা ব্যাঙের ডাক, কোথায় জলে ভিজিয়া পেঁচা ডাকিতেছে। দুর্যোগময়ী রজনী যেন ওই নিশাচরদের মতই উল্লাসময়ী হইয়া উঠিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাহার শরীরে একটা উত্তেজনার প্রবাহ ক্রমশ তেজোময় হইয়া উঠিতেছে।···কিন্তু ভগবান, তোমার পৃথিবীতে এত পাপ কেন? কেন মানুষের এই নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি? কেন তুমি মানুষকে পেট পুরিয়া খাইতে দাও না? তুমিই তো নিত্য-নিয়মিত প্রতিটি জনের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা কর! মহামারীতে, ভূমিকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, অগ্নিদাহে, ঝড়ে তুমি নিষ্ঠুর খেলা খেল, তুমি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠ,—বুঝিতে পারি; তখন তোমাকে হাতজোড় করিয়া ডাকি—হে প্রভু, তোমার এ রুদ্র রূপ সংবরণ কর। সে ডাক তুমি না শুনিলেও সে বিরাট মহিমময় রুদ্র রূপের সম্মুখে নিতান্ত অসহায় কীটের মত মরিয়া যাই, তাহাতে আক্ষেপ করিবার মত শক্তিও থাকে না। কিন্তু মানুষের এ ভয়ঙ্কর প্রকাশকে তো তোমার সে রুদ্র রূপ বলিয়া মানিতে পারি না। এ যে পাপ। এ পাপ কেন? কোথা হইতে এ পাপ মানুষের মধ্যে আসিল?

কিছুক্ষণ পর।

ভূপাল ডাকিল—পণ্ডিত মশাই!

—হ্যাঁ চল।—দেবু লাফ দিয়া পথে নামিল।

—হাঁক্ দোব পণ্ডিত?

—না, আগে চল, গ্রামের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি, ব্যাপার কি!

—দাঁড়ান গো। পিছন হইতে সতীশ বাউরী ডাকিল। সে তাহার পাড়ার আরও কয়েকজনকে জাগাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ছয়

দুর্যোগময়ী রাত্রির গাঢ় অন্ধকার আবরণে ঢাকা পৃথিবী, আকাশে জ্যোতির্লোক বিলুপ্ত, গাছপালা দেখা যায় না, গ্রামকে চেনা যায় না, একটা প্রগাঢ় পুঞ্জীভূত অন্ধকারে সব কিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উৎকণ্ঠিত মানুষ কয়টি আপনাদের ঘন-সান্নিধ্য হেতু স্পর্শ-বোধ এবং মৃদু কথাবার্তার শব্দ-বোধের মধ্যেই পরস্পরের কাছে বাঁচিয়া আছে। এই অখণ্ড অন্ধকারকে কোন এক স্থানে খণ্ডিত করিয়া জ্বলিতেছে একটা নর্তনশীল অগ্নিশিখা। উৎকণ্ঠিত মানুষগুলির চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি। দেবু ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল; এই সব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া অন্ধকারের মধ্যে সে স্থানটা নির্ণয় করিতেছিল। এই গ্রাম, এই মাঠ, এখানকার

দিগ্‌দিগন্তের সঙ্গে তাহার নিবিড় পরিচয়। সে যদি আজ অন্ধও হইয়া যায়, তবুও সে স্পর্শে, গন্ধে, মনের পরিমাপের হিসাবে সমস্ত চিনিতে পারিবে চক্ষুষ্মানের মত। তাহার উপর বর্ত্তমানে এই অঞ্চলের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে অহরহ কর্মস্পন্দনে মুখরিত এক নূতন পুরী; এই দুর্যোগে-ভরা অন্ধকারের মধ্যেও সে সমানে সাড়া দিতেছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন-স্টেশন; স্টেশনের চারিপাশে কলকারখানা, সেখানে মালগাড়ী-শান্টিংয়ের শব্দ—মিল-এঞ্জিনের শব্দ উঠিতেছে, মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছে রেল-এঞ্জিনের বাঁশী।

দেবুর সম্মুখের দিকেই ওই বাম কোণে পশ্চিম-দক্ষিণে জংশনের সাড়া উঠিতেছে। জংশনের উত্তর প্রান্তে ময়ূরাক্ষী নদী। জংশন সৃষ্টির আগে এমন অন্ধকার রাত্রে এই পল্লীর মানুষকে ময়ূরাক্ষীই দিত দিক্-নির্ণয়ের সাড়া। দেবুদের বামপাশে দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিমে বহমানা ময়ূরাক্ষী।

ওই ময়ূরাক্ষীকে ধনুকের জ্যার মত রাখিয়া অর্ধ-চন্দ্রাকারে ওই কঙ্কণা। পাশে কঙ্কণার উত্তর-পূর্বে কুসুমপুর, তাহার পাশে মহুগ্রাম; মহুগ্রামের পাশে শিবকালীপুর, শিবকালীপুরের পূর্ব-দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর কোল ঘেঁষিয়া বালিয়াড়া-দেখুড়িয়া। অর্ধ-চন্দ্রাকার বেষ্টনীটার মধ্যে প্রকাণ্ড এই মাঠখানা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল, প্রস্থে চার মাইলের অল্প কিছু কম। মাঠখানার নামই পঞ্চগ্রামের মাঠ। পাঁচখানা মৌজার সীমানারই জমি আছে এই মাঠে। এই বিস্তীর্ণ মাঠখানার বুকের মধ্যে এক জায়গায় এই রিমি-ঝিমি বর্ষণের মধ্যেও আগুনের রক্তাভ শিখা যেন নাচিতেছে, বোধ হয় বাতাসে কাঁপিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে দেবু হিসাব করিয়া বুঝিল, সতীশ ঠিক অনুমান করিয়াছে, জায়গাটা মৌলকিনীর বটতলাই বটে।

কোন্ বিস্মৃত অতীতকালে কেহ মৌলকিনী নামে ওই দীঘিটা কাটাইয়াছিল। দীঘিটা প্রকাণ্ড। দীঘিটা এককালে এই পঞ্চগ্রামের মাঠের একটা বৃহৎ অংশে সেচনের জল যোগাইয়াছে; ওই দীঘিটার পাড়ের উপর প্রকাণ্ড বটগাছটাও বোধ হয় দীঘি কাটাইবার সময়ই লাগানো হইয়াছিল। আজও রৌদ্রতপ্ত তৃষ্ণার্ত পথিক ও কৃষক, গরু-বাছুর, কাকপক্ষী দীঘিটার জল খায়, ওই গাছের ছায়ায় দেহ জুড়াইয়া লয়; কিন্তু রাত্রে বহুকাল হইতেই ওই বটতলাতে মধ্যে মধ্যে জমাট-বস্তীর আলো জ্বলিয়া উঠে। জমাট-বস্তীর আরও কয়েকটা স্থান আছে—ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপর অর্জুন-তলায়, কুসুমপুরের মিঞাদের আম-বাগানেও অন্ধকার রাত্রে এমনই ভাবে আলো জ্বলে। আজিকার আলো কিন্তু মৌলকিনীর বটগাছ-তলাতেই জ্বলিতেছে।

দেবু বলিল—মৌলকিনীর বটতলাই বটে, ভূপাল। মশালের আলোও বটে।

ভূপাল বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভল্লার দল।

—ভল্লার দল!

—হুঁ। একেবারে নিয্যস। মশাল জেলে ভল্লারা ছাড়া অন্য দল তো আগেভাগে মশাল জেলে জমায়েত হয় না।

ভল্লা—অর্থাৎ বাগ্দীর দল। বাংলাদেশে ভল্লা বাগ্দীরা বহুবিখ্যাত শক্তিমান সম্প্রদায়।

দৈহিক শক্তিতে, লাঠিয়ালির সুনিপুণ কৌশলে, বিশেষ করিয়া সড়্কি চালনার নিপুণতায় ইহারা এককালে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। এখনও দৈহিক শক্তি ও লাঠিয়ালির কৌশলটা পুরুষপরম্পরায় ইহাদের বজায় আছে। ডাকাতিটা এককালে ইহাদের গৌরবের পেশা ছিল। ইংরেজ আমলে—বাংলাদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের নব-জাগরণের সময় নব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ-নেতাদের সহযোগিতায় শাসক সম্প্রদায় বাংলার নিম্নজাতির দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ভল্লাদের বহুল পরিমাণে দমন করিয়াছেন। তবুও তাহারা একেবারে মরে নাই। আজ অবশ্য তাহাদের শক্তির ঐতিহ্য তাহারা অত্যন্ত গোপনে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের মত ঘাঘরা-কাঁচুলী পরিয়া রায়বেঁশের দল গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়। ক্ষেত্র-বিশেষে একটু বেশী পুরস্কার পাইলে—দৈহিক শক্তি ও লাঠিখেলায় নিপুণতার কসরৎ দেখায়। সাধারণত এখনও ইহারা চাষী, বাহ্যত অত্যন্ত শান্তশিষ্ট; কিন্তু মধ্যে মধ্যে—বিশেষ করিয়া এই বর্ষাকালে কঠিন অভাবের সময় তাহাদের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কয়েকদিন অভাব-অভিযোগের দুঃখ-ব্যথার কথা বলিতে বলিতে কখন যে ডাকাতির পরামর্শ আঁটিয়া বসে, সে কথা নিজেরাও বুঝিতে পারে না। পরামর্শ পাকিয়া উঠিলে তাহারা একদা বাহির হইয়া পড়ে। ভল্লা বাগ্দী ছাড়াও অবশ্য এই ধারার সম্প্রদায় আছে; ডোম আছে, হাড়ি আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই শ্রেণীর দল আছে; আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক লইয়া মিশ্রিত দলও আছে।

ভূপাল বলিল—এ ভল্লা বাগ্দীর দল। দেখুড়িয়া গ্রামখানা ভল্লা বাগ্দীর গ্রাম। গ্রামে অন্য বর্ণের বাসিন্দারাও কিছু কিছু আছে, কিন্তু ভল্লারাই সংখ্যায় প্রধান। পূর্বকালে দেখুড়িয়ার ভল্লারাই ছিল পঞ্চগ্রামের বাহুবল। আজ দুইশত বৎসরের অধিককাল তাহারা লুঠেরা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষ কয়টি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে কয়েকটি কথা হইতেছে, আবার চুপ হইয়া যাইতেছে। ওদিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সেই দূরে একই স্থানে জলিতেছে মশালের আলোটা। দেবু না থাকিলে ইহারা অবশ্য আপন বুদ্ধিমত যাহা হয় করিত। দেবুর প্রতীক্ষাতেই সকলে চুপ করিয়া আছে।

সতীশ বাউড়ী বলিল—পণ্ডিত মশায়?

—হুঁ।

—হাঁক মারি?

—হাঁক মারিলে জাগ্রত মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচরের দল চলিয়া যাইতে পারে। অন্তত এ গ্রামের দিকে আসিবে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহারা যদি মাতিয়া উঠিয়া থাকে, তবে আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া এ গ্রাম বাদ দিয়া অপর কোন প্রসুপ্ত পল্লীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

ভূপাল বলিল—ঘোষ মশায়কে একটা খবর দিই পণ্ডিত মশায়, কি বলেন?

—শ্রীহরিকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বন্দুক নিয়েছেন, বন্দুক আছে, কালু শেখ আছে ঘোষ মশায়ের বাড়ীতে। তা ছাড়া ঘোষ মশায় ঠিক বুঝতে পারবেন—এ কীর্তি কার। বলিয়া ভূপাল একটু হাসিল।

শ্রীহরি ঘোষ এখন গ্রামের পত্তনীদার, সে এখন গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু এককালে সে যখন ছিরু পাল বলিয়া খ্যাত ছিল, তখন দুর্ধর্ষপনায় সে ওই নিশাচরদেরই সমকক্ষ ছিল। অনেকে বলে—চাষ এবং ধান দাদন করিয়া জমিদার হওয়ার অসম্ভব কাহিনীর অন্তরালে ওই সব নিশাচর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কাহিনী লুক্কায়িত আছে। সে আমলে ছিরু নাকি ডাকাতির বামালও সামাল দিত। অনিরুদ্ধ কর্মকারের ধান কাটিয়া লওয়ার জন্য একবার মাত্রই তাহার ঘর খানাতল্লাশ হয় নাই, তাহারও পূর্বে আরও কয়েকবার এই সন্দেহে তাহার ঘর সন্ধান হইয়াছিল। এখন অবশ্য সে জমিদার—প্রভাবশালী ব্যক্তি, এখন শ্রীহরি আর এই সব সংস্রবে থাকে না; কিন্তু সে ঠিক চিনিতে পারিবে—এ কাহার দল। হয়তো দুর্দান্ত কালু শেখকে সঙ্গে লইয়া বন্দুক হাতে নিঃশব্দে আলো লক্ষ্য করিয়া অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইয়া, এক সময় হঠাৎ বন্দুকটা দাগিয়া দিবে।

দেবু বলিল—এ রাত্রে দুর্যোগে তাঁকে আবার কষ্ট দিয়ে কাজ নাই ভূপাল। তার চেয়ে এক কাজ কর। সতীশ, তুমি তোমাদের পাড়ার নাগরা নিয়ে নাগরা পিটিয়ে দাও; ক'টা নাগরা আছে তোমাদের?

—আজ্ঞে, দুটো।

—বেশ। তবে দুজনে দুটো নাগরা নিয়ে—গাঁয়ের এ-মাথায় আর ও-মাথায় দাঁড়িয়ে পিটিয়ে দাও।

নাগরার শব্দ—বিশেষ করিয়া বর্ষার রাত্রে নাগরার শব্দ এ অঞ্চলে আসন্ন বন্যার বিপদ-জ্ঞাপন সংকেত-ধ্বনি। ময়ূরাক্ষীর বন্যায় বাঁধ ভাঙিলে এই নাগরার ধ্বনি উঠে; পরবর্তী গ্রাম জাগিয়া উঠে, সাবধান হয়, তাহারাও নাগরা বাজায়—সে ধ্বনিতে সতর্ক হয় তাহার পরবর্তী গ্রাম।

ডাকাতি হইলেও এই নাগরাধ্বনির নিয়ম ছিল এবং আছেও। কিন্তু সব সময়ে এ নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। গ্রামে ডাকাত পড়িয়া গেলে তখন সব ভুল হইয়া যায়। তা ছাড়া নাগরা দিলেও ভিন্ন গ্রামে লোক জাগে বটে, কিন্তু সাহায্য করিতে আসে না। কারণ পুলিস-হাঙ্গামায় পড়িতে হয়, পুলিসের কাছে প্রমাণ দিতে হয় যে সে ডাকাতি করিতে আসে নাই, ডাকাত ধরিতে আসিয়াছিল।

নাগরার কথাটা সতীশদের ভালই লাগিল। সতীশ সঙ্গে সঙ্গে দলের দুজনকে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ভূপাল ক্ষুণ্ন হইয়া বলিল—ঘোষ মশায় বোর্ডের মেম্বর লোক। খবরটা ওঁকে না দিলে ফৈজতে পড়তে হবে আমাকে।

শ্রীহরিকে সংবাদ দিতে দেবুর মন কিছুতেই সায় দিল না। একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—চল, আমরাই আর একটু এগিয়ে দেখি।

—না, আর এগিয়ে যেও না।

স্ত্রীলোকের দৃঢ়তাব্যঞ্জক চাপা কণ্ঠস্বরে সকলে চমকিয়া উঠিল। দেবুও চমকিয়া উঠিল,—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নারীকণ্ঠে কে কথা বলিল? বিলু! বিলুর অশরীরী আত্মা!

আবার নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল—বিপদ হতে বেশিক্ষণ লাগে না জামাই।

দেবু এবার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে? দুর্গা?

—হ্যাঁ।

সমস্বরেই প্রায় সকলে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—দুগ্‌গা?

—হ্যাঁ। বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে রসিকতা করিয়া বলিল—ভয় নাই, পেত্নী নই, মানুষ, আমি দুগ্‌গা।

—তুই কখন্ এলি?

দুর্গা বলিল—সতীশদা থানাদারকে ডাকলে, পাড়ায় ডাকলে, আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে থাকতে নারলাম, ওই সতীশদাদাদের পিছু পিছু উঠে এলাম।

—বলিহারি বুকের পাটা তোমার দুগ্‌গা! ভূপাল ঈষৎ শ্লেষভরেই বলিল।

—বুকের পাটা না থাকলে থানাদার, রাত-বিরেতে প্রেসিডেনবাবুর বাংলোতে নিয়ে যাবার জন্য কাকে পেতে বল দেখি? বকশিশই তোমার মিলত কি করে? আর চাকরির 'কৈফিৎ'ই বা কাটাতে কি করে?

কথাটার মধ্যে অনেক ইতিহাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট; ভূপাল লজ্জিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

ঠিক এই মুহূর্তেই গ্রামের দুই প্রান্তে নাগরা বাজিয়া উঠিল। দুর্যোগময়ী স্তব্ধ রাত্রির মধ্যে ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌ ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। দেবু হাঁক দিয়া উঠিল—আ—আ—হৈ! সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাঁক দিয়া উঠিল সমস্বরে—আ—আ—আ—হৈ! আ—হৈ! দূরে অন্ধকারের মধ্যে যে আলোটা বাতাসে কাঁপিয়া যেন নাচিতেছিল—সে আলোটা অস্বাভাবিক দ্রুততায় কাঁপিয়া উঠিল। আবার দেবু এবং সমবেত সকলে হাঁক দিয়া উঠিল—আ—হৈ, আ—হৈ! ওদিকে গ্রামের ভিতরে ইহারই মধ্যে সাড়া জাগিয়া উঠিল। স্পষ্ট শোনা যাইতেছে স্তব্ধ রাত্রে পরস্পর পরস্পরকে ডাকিতেছে। একটা উচ্চ কণ্ঠের প্রহরা-ঘোষণার শব্দ উঠিল। এ শব্দটা শ্রীহরির লাঠিয়াল কালু শেখের হাঁক। ওদিকে নাগরা দুইটা ডুগ্‌-ডুগ্‌ শব্দে বাজিয়াই চলিয়াছে।

এবার দূরে মাঠের বুকে অন্ধকারের মধ্যে জ্বলন্ত আলোটা হঠাৎ নিম্নমুখী হইয়া অকস্মাৎ যেন মাটির বুকের ভিতর লুকাইয়া গেল। স্পষ্ট বুঝা গেল মশালের আলো কেহ জলসিক্ত নরম মাটির মধ্যে গুঁজিয়া নিভাইয়া দিল। ওদিকে আরও দূরে আরও একটা নাগরা অন্য কোথাও, সম্ভবতঃ বালিয়াড়া-দেখুড়িয়ায় বাজিয়া উঠিল।

এতক্ষণে দেবু বলিল—এবার তুমি ঘোষ মহাশয়কে খবর দিয়ে এস ভূপাল। কাজ কি কৈফিয়তের মধ্যে গিয়ে!

পিছন হইতে কাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ভূপাল !

হ্যারিকেনের আলোও একটা আসিতেছে। ভূপাল চমকিয়া উঠিল—এ যে স্বয়ং ঘোষ মশায় ! শ্রীহরি নিকটে আসিতেই হাতজোড় করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল - হুজুর !

—কি ব্যাপার ?

—আজ্ঞে, মাঠের মধ্যে জমাট-বস্তী।

—কোথায় ?

—মৌলকিনীর পাড়ে মনে হল। আলো জ্বলছিল এতক্ষণ, আমাদের নাগরার শব্দ আর হাঁক শুনে আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

—আমাকে খবর দিস নাই কেন ?

দেবু বলিল—দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। তুমি নিজে এসে পড়লে।

—কে ? দেবু খুড়ো ?

—হ্যাঁ।

—হুঁ। কারা কিছু বুঝতে পারলে ?

—কি করে বুঝব ? তবে মশালের আলো দেখে ভূপাল বলছিল ভল্লার দল।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দে সকলে চমকিয়া উঠিল। বন্দুকের মধ্যে কার্টিজ পুরিয়া আকশমুখে পর পর দুইটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দিল শ্রীহরি। তীক্ষ্ণ উচ্চ শব্দ দুইটা রাত্রির অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফাড়িয়া দিল। চেম্বার খুলিয়া ফায়ার-করা কার্টিজ দুইটা বাহির করিয়া, শ্রীহরি বলিল—দেবু খুড়ো, এ সব হল গিয়ে তোমাদের ধর্মঘটের ধুয়োর ফল।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল। সবিস্ময়ে সে বলিল—ধর্মঘটের ধুয়োর ফল ? মানে ?

—হ্যাঁ। এ তোমার দেখুড়ের তিনকড়ি মোড়লের কাণ্ড। তিনকড়ি তোমাদের ধর্মঘটের একজন পাণ্ডা। ভল্লাদের দল অনেক দিনের ভাঙা দল। এই হুজুগে সে-ই আবার জুটিয়েছে। আমি খবরও পেয়েছি। তিনকড়ি মাঠের মধ্যে চাষ করতে করতে কি বলেছে জান ? বলেছে—বৃদ্ধির শখ একদিন মিটিয়ে দোব। আমার নাম করে বলেছে, তাকে দোব একদিন মূলোর মত মুচড়ে।

দেবু ধীর ভাবেই বলিল—ওসব কথার কোন দাম নাই শ্রীহরি। তুমিও তো বলেছ শুনতে পাই—যারা বেশী চালাকি করবে, তাদের তুমি গুলি চালিয়ে শেষ করে দেবে।

অকস্মাৎ পিছনের দিকে একটা চটাস্ করিয়া শব্দ উঠিল—কে যেন কাহাকে প্রচণ্ড জোরে চড় মারিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে দুর্গা বলিয়া উঠিল—আমার হাত ধরে টানিস, বদমাস—পাজী !

শ্রীহরি হ্যারিকেনটা তুলিয়া ধরিল। দুর্গার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে শ্রীহরির লাঠিয়াল কালু। শ্রীহরি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—কে দুর্গা ?

দুর্গা সাপিনীর মত ফোঁস করিয়া উঠিল—তোমার লোক আমার হাত ধরে টানে ?

শ্রীহরি কালুকে ধমক দিল—কালু, সরে আয় ওখান থেকে। তারপর আবার ঈষৎ

হাসিয়া বলিল—এই এখানে কোথায় এত রাতে ? পরমুহূর্তেই নিজের উত্তরটা আবিষ্কার করিয়া বলিল—আ ! দেবু খুড়োর সঙ্গে এসেছিস্ বুঝি !

দেবু কয়েক মুহূর্ত শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দুর্গাকে বলিল—আয় দুর্গা, বাড়ী আয়, এত রাত্রে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে না। সতীশ, এস, তোমরাও এস।

তাহারা সকলেই চলিয়া গেল, কেবল ভূপাল শ্রীহরি ঘোষকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। শ্রীহরি বলিল—কালই থানায় ডায়রি করবি। বুঝলি ?

—যে আজ্ঞে।

—দেখুড়ের তিনকড়ির নামে আমার ডায়রি করা আছে। দারোগাবাবুকে মনে করিয়ে দিবি কথাটা। বলিস কাল সন্ধ্যের দিকে আমি থানায় যাব।

ভূপালও জাতিতে বাগদী ; পুলিসের চাকরি তাহার অনেক দিনের হইয়া গেল। তাহার অনুমান সত্য—স্থানটাও মৌলকিনী দীঘির পাড়ের বটতলায়ই বটে এবং জমায়েত যাহারা হইয়াছিল তাহারাও ভল্লা বাগদী ছাড়া আর কেহ নয় কিন্তু নেতৃত্ব তিনকড়ির নয় ; শ্রীহরির অনুমান ভ্রান্তও বটে, আক্রোশ-প্রসূতও বটে। তিনকড়ি জাতিতে সদ্‌গোপ, শ্রীহরির সঙ্গে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে ; কিন্তু শ্রীহরির সঙ্গে বিবাদ তাহার অনেকদিনের। তিনকড়ি দুর্ধর্ষ গোঁয়ার। পৃথিবীতে কাহারও কাছে বাধ্য-বাধকতার খাতিরে মাথা নিচু করে না। কঙ্কণার লক্ষপতি বাবু হইতে শ্রীহরি পর্যন্ত—ওদিকে সাহেব-সুবো হইতে দারোগা পর্যন্ত কাহাকেও সে হেঁট-মুণ্ডে জোড়হস্তে প্রণাম জানায় না। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্টই সে ভোগ করিয়াছে।

দেখুড়িয়ার ভল্লা বাগদীদের নেতা সে বটে ; কিন্তু তাহাদের ডাকাতি কি চুরির সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই। ডাকাতি করার জন্য সে ভল্লাদের তিরস্কার করে, অনেক সময় রাগের মাথায় মারিয়াও বসে। সে তিরস্কার, সে প্রহার ভল্লারা সহ্য করে, কারণ তাহাদের পাপের ধনের সহিত সংস্রব না রাখিলেও মানুষগুলির সঙ্গে তিনকড়ির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, বিপদের সময় সে কখনও তাহাদের পরিত্যাগ করে না। ডাকাতি কেসে, বি-এল কেসে তিনকড়িই তাহাদের প্রধান সহায়, সে-ই তাহাদের মামলা-মকদ্দমার তদ্বির-তদারক করিয়া দেয়, তাহাদের পাপার্জিত ধন দিয়াই করে, কিন্তু একটি পয়সার তঞ্চকতা কখনও করে না। অবশ্য তদ্বির করিতে গিয়া ঐ পয়সা হইতেই সে অল্পস্বল্প ভালমন্দ খায়—বিড়ির বদলে সিগারেটও কেনে, মামলা জিতিলে মদও খায়, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু নয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার পাইপয়সাটি সে ভল্লাদের ফিরাইয়া দেয়। লোকে এই কারণেই সন্দেহ করে ভল্লাদের গোপন পাপ-জীবনযাত্রারও নেতা ওই তিনকড়ি। পুলিসের খাতায় বহুস্থানে তাহার উল্লেখ আছে। ভল্লাদের প্রায় প্রতিটি কেসেই পুলিস তিনকড়িকে জড়াইতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ভল্লাদের মধ্যে কবুল-খাওয়া

লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কালেভদ্রে নিতান্ত অল্পবয়সী নতুন কেহ হয়তো পুলিসের ভীতিপ্রলোভনময় কসরতে কাবু হইয়া কবুল করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মুখ হইতেও কখনও তিনকড়ির নাম বাহির হয় নাই।

বি-এল কেস—এসব ক্ষেত্রে পুলিসের মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু বি-এল কেসে অর্থাৎ 'ব্যাড লাইভ্‌লিহুড্‌' বা অসদুপায়ে জীবিকা-উপার্জনের অভিযোগের পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় তিনকড়ির পৈতৃক জোত-জমা। জোত-জমা তাহার বেশ ভালই ছিল। এবং গোঁয়ার হইলেও তিনকড়ি নিজে খুব ভাল চাষী ; এ অঞ্চলের কোন সাক্ষীই একথা অস্বীকার করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে তাহার কয়েকটা ব্রহ্মাস্ত্রের মত প্রমাণ আছে। জেলার সদর শহরে অনুষ্ঠিত সরকারী কৃষি-শিল্প ও গবাদি-পশু প্রদর্শনীতে চাষে উৎপন্ন কপি, মূলা, কুমড়া প্রভৃতির জন্য সে বহু পুরস্কার পাইয়াছে, সার্টিফিকেট পাইয়াছে। বার দুয়েক মেডেলও পাইয়াছে ;—ভাল বলদ, দুধালো গাইয়ের জন্যও তাহার প্রশংসাপত্র আছে। সেইগুলি সে দাখিল করে।

এতদিনে অবশ্য পুলিসের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। চাষে এমন উৎপাদন সত্ত্বেও তিনকড়ির জোত-জমার অধিকাংশ জমিই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। পঁচিশ বিঘার মধ্যে মাত্র পাঁচ বিঘা তাহার অবশিষ্ট আছে।

তিনকড়ির একসময় প্রেরণা জাগিয়াছিল—সে তাহাদের গ্রামের অধীশ্বর বৃক্ষতল অধিবাসী বাবা মহাদেবের একটা দেউল তৈয়ারী করাইয়া দিবে। সেই সময় তাহার হাতে কতকগুলা নগদ টাকাও আসিয়াছিল। তাহাদের গ্রামের খানিকটা সীমানা ময়ূরাক্ষীর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত—ওপারে জংশন স্টেশনে নতুন একটা ইয়ার্ড তৈয়ারী করিবার প্রয়োজনে সেই সীমানার অধিকাংশটাই রেল-কোম্পানী গভর্নমেন্টের ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন আইন অনুসারে কিনিয়া লয়। ওই সীমানার মধ্যে তিনকড়িরও কিছু জমি ছিল—বাবা দেবাদিদেবেরও ছিল। বাবার জমির মূল্যটা বাবার অধীশ্বর জমিদার লইয়াছিলেন, টাকাটা খুব বেশী নয়—দুই শত টাকা। তিনকড়ি পাইয়াছিল শ'চারেক। তাহার উপর তখন তাহার ঘরে ধানও ছিল অনেকগুলি। এই মূলধনে তিনকড়ি উৎসাহিত হইয়া গাছতলাবাসী দেবাদিদেবকে গৃহবাসী করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। জমিদারের কাছে গিয়া প্রস্তাব করিল, দেবাদিদেবের জমির টাকাটা হইতে বাবার মাথার উপর একটা আচ্ছাদন তুলিয়া দেওয়া হউক। জমিদার বলিলেন—দুশো টাকায় দেউল হয় না।

তিনকড়ির অদম্য উৎসাহ, সে বলিল—আমরা চাঁদা তুলব, আপনি কিছু দেন, ভল্লারা গতরে খেটে দেবে—হয়ে যাবে একরকম করে। আরম্ভ করুন আপনি।

জমিদার বলিলেন—তোমরা আগে কাজ আরম্ভ কর, চাঁদা তোল—তারপর এ টাকা আমি দেব।

তিনকড়ি সে কথাই স্বীকার করিয়া লইল এবং ভল্লাদের লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। প্রায় হাজার ত্রিশেক কাঁচা ইট তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়া জমিদারকে গিয়া বলিল—কয়লা চাই, টাকা দেন।

জমিদার আশ্বাস দিলেন—একেবারে কয়লা-কুঠী থেকে কয়লা আনবার ব্যবস্থা করব।

কয়লা আসিবার পূর্বে বর্ষা আসিয়া পড়িল, ত্রিশ হাজার কাঁচা ইট গলিয়া আবার মাটির স্তূপে পরিণত হইল, বহু তালপাতা কাটিয়া ঢাকা দিয়াও তিনকড়ি তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। রাগে ফুলিয়া উঠিয়া এবার সে জমিদারকে আসিয়া বলিল—এ ক্ষতিপূরণ আপনাকে দিতে লাগবে।

জমিদার তৎক্ষণাৎ তাহাকে খেদাইয়া দিলেন।

তিনকড়ি ক্ষিপ্ত হইয়া দেবোত্তরের অর্থ আদায়ের জন্য জমিদারের নামে নালিশ করিল। দুই শত টাকা আদায় করিতে মুন্সেফী আদালত হইতে জজ আদালত পর্যন্ত সে খরচ করিল সাড়ে তিনশত টাকা। ইহাতেই শুরু হইল তাহার জমি-বিক্রয়। টাকা আদায় হইল না, উপরন্তু জমিদার মামলা খরচ আদায় করিয়া লইলেন। লোকে তিনকড়ির দুর্বুদ্ধির অজস্র নিন্দা করিল, কিন্তু তিনকড়ি কোনদিন আফসোস করিল না। সে যেমন ছিল তেমনি রহিল, শুধু ওই দেবাদিদেবকে প্রণাম করা ছাড়িল ;—আজকাল যতবার ঐ পথে সে যায়-আসে, ততবারই বাবাকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যায়।

দেবাদিদেবের উদ্ধার চেষ্টার পরও তাহার যাহা ছিল—তাহাতেও তাহার জীবন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। কিন্তু ইহার পরই শিবু দারোগার নাকে ঘুষি মারার মামলায় পড়িয়া সে প্রায় তিন বিঘা জমি বেচিতে বাধ্য হইল। শিবু দারোগা আসিয়াছিল তাহার ঘর সার্চ করিতে। কোনও কিছু সন্দেহজনক না পাইয়া শিবচন্দ্রের মাথায় খুন চড়িয়া গেল ; ক্ষুব্ধ আক্রোশে যথেচ্ছ হাত-পা চালাইয়া তিনকড়ির ঘরের চাল-ডাল-নুন-তেল ঢালিয়া মিশাইয়া সে একাকার করিয়া দিল। খানাতল্লাশিতে তিনকড়ি আপত্তি করে নাই, বরং মনে মনে সকৌতুকে হাসিতেছিল। এমন সময় শিবু দারোগার এই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব দেখিয়া সে-ও ক্ষেপিয়া গেল। ধাঁ করিয়া বসাইয়া দিল শিবচন্দ্রের নাকে এক ঘুষি। প্রচণ্ড ঘুষি—দারোগার নাকের চশমাটা একেবারে নাক-কাটিয়া বসিয়া গেল। দারোগার নাকে সে দাগটা আজও অক্ষয় হইয়া আছে। সেই ব্যাপার লইয়া পুলিস তাহার নামে মামলা করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও দারোগার নামে মামলা করিল—ওই তাণ্ডব নৃত্যের অভিযোগে। গ্রামের ভল্লারা সকলেই তিনকড়ির সাক্ষী, প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যের কথাটা সকলেই একবাক্যে নির্ভয়ে বলিয়া গেল। পুলিস সাহেব আপোসে মামলা মিটাইয়া লইলেন। ততদিনে কিন্তু তিনকড়ির আরও তিন বিঘা জমি চলিয়া গিয়াছে।

বর্তমানে তিনকড়ি প্রজা ধর্মঘটে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভল্লাদের লইয়া শ্রীহরির ঘরে ডাকাতি করিবার মত মনোবৃত্তি তাহার নয়। অবশ্য সে মাঠেও ও-কথাটা বলিয়াছিল—দোব ছিরেকে একদিন মুলোর মত মুচড়ে।···কথাটা নেহাতই কথার কথা। তাহার কথারই ওই ধারা ; তাহার স্ত্রী যদি একটু উচ্চকণ্ঠে কথা বলে, তবে তৎক্ষণাৎ সে গর্জন করিয়া উঠে—টুটিতে পা দিয়ে দোব তোর 'নেতার' মেরে দেখবি'!···

সেদিন দেখুড়িয়ায় যে নাগরা বাজিল সে নাগরা তিনকড়িই বাজাইতেছিল।

এই গভীর দুর্যোগের রাত্রে নাগরার শব্দ শুনিয়া তিনকড়ির স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনকড়ির ঘুম অসাধারণ ঘুম ; খাইয়া-দাইয়া বিছানায় পড়িবামাত্র তাহার চোখ বন্ধ হয়, এবং মিনিট তিনেকের মধ্যেই নাক ডাকিতে শুরু করে। নাকডাকা আবার যেমন-তেমন নয়, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে যেমন বিচিত্র, গর্জনগাম্ভীর্যে তেমনি গুরুগম্ভীর। রাত্রিতে প্রসুপ্ত পল্লীপথে তিনকড়ির বাড়ীর অন্তত আধ রশি দূর হইতে সে ধ্বনি শোনা যায়। একবার এ অঞ্চলের থানায় নূতন জমাদার প্রথম দিন দেখুড়িয়ায় রোঁদে আসিয়া তিনকড়ির বাড়ীর আধ রশিটাক দূরে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌকিদারটাকে বলিয়াছিল—এই ! দাঁড়া !

চৌকিদারটা কিছু বুঝিতে পারে নাই, তাহার কাছে অস্বাভাবিক কিছুই ঠেকে নাই, সে একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—আজ্ঞে ?

জমাদার দুই পা পিছাইয়া গিয়া চারিদিকে চাহিয়া গর্জনের স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল, দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—সাপ,—হারামজাদা, শুনতে পাচ্ছ না ? গোঙাচ্ছে ? ·· তারপরই বলিয়াছিল—সাপে নেউলে বোধ হয় লড়াই লেগেছে। শুনতে পাচ্ছিস ?

এতক্ষণে চৌকিদারটা ব্যাপার বুঝিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজ্ঞে না।

—না ? মারব বেটাকে এক থাপ্পড়।

—আজ্ঞে না, উ তিনকড়ি মোড়লের নাক ডাকছে।

—নাক ডাকছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনকড়ি মোড়লের।

জমাদার বিস্ফারিত নেত্রে আবার একবার প্রশ্ন করিয়াছিল—নাক ডাকছে ?

এবার চৌকিদারটা আর হাসি সামলাইতে পারে নাই, খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, নাক।

—কোন্ তিনকড়ি ? পুলিস সস্পেক্ট্ যে লোকটা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোজ ডাকিস্ লোকটাকে ?

চৌকিদারটা চুপ করিয়া ছিল, কোনদিনই ডাকে না, ওই নাকডাকার শব্দ হইতেই তিনকড়ির বাড়ীতে থাকার প্রমাণ লইয়া চলিয়া যায়।

জমাদার বলিয়াছিল—থাক্, ডাকিস্ না বেটাকে। যেদিন নাক না-ডাকবে সেইদিন খবর করিস্।—কিছুক্ষণ পর আবার বলিয়াছিল—বেটা বড় সুখে ঘুমোয় রে !

এমনি ঘুম তিনকড়ির। এ ঘুম ভাঙাইলে আর রক্ষা থাকে না। কিন্তু আজ এই নিশীথরাত্রে নাগরার শব্দ শুনিয়া তিনকড়ির স্ত্রী লক্ষ্মীমণি স্থির থাকিতে পারিল না। সে চাষীর মেয়ে, নাগরার ধ্বনির অর্থ সে জানে, তাহার মনে হইল, ময়ূরাক্ষীতে বুঝি বন্যা আসিয়াছে। তিনকড়ির একটি ছেলে, একটি মেয়ে ; ছেলেটির বয়স বছর ষোল, মেয়েটির বয়স চৌদ্দ। তাহাদেরও ঘুম ভাঙিয়াছিল। মেয়েটি মায়ের কাছেই শোয়, ছেলে শোয় পাশের ঘরে।

তিনকড়ি শুইয়া থাকে বাহিরের বারান্দায় ; পাশে থাকে একটা টেটা ; একখানা খুব লম্বা হেঁসো দা এবং একগাছা লাঠি।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া তিনকড়ির স্ত্রী তাহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইল—ওগো—ওগো—ওগো!

প্রবল ঝাঁকুনিতে তিনকড়ি একটা চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল—এ্যাও! কে রে? সঙ্গে সঙ্গে সে হাত বাড়াইল হেঁসো দা-খানার জন্য।

লক্ষ্মীমণি খানিকটা পিছাইয়া গিয়া বার বার বলিল—আমি—আমি—ওগো আমি ওগো আমি। আমি লক্ষ্মী-বউ! আমি সন্নর মা!

—কে? লক্ষ্মী-বউ?

—হ্যাঁ।

—কি?

—নাগরা বাজছে, বোধ হয় বান এসেছে।

—বান?

—ওই শোন নাগরা বাজছে।

তিনকড়ি কান পাতিয়া শুনিল। তারপর বলিল—হুঁ।

লক্ষ্মীমণি বলিল—ঘর-দোর সামলাই?

তিনকড়ি উত্তর না দিয়া সেই দুর্যোগের মধ্যেই বারান্দার চালে উঠিয়া বারান্দার চাল হইতে তাহার কোঠা-ঘরের চালে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিল। নাগরা বাজিতেছে। হাঁকও উঠিতেছে। কিন্তু এ হাঁক তো বন্যাভয়ের হাঁক নয়!—আ—আ—হৈ! এ যে চৌকিদারি হাঁক। এদিকে ময়ূরাক্ষী হইতে তো কোন গোঁ-গোঁ ধ্বনি উঠিতেছে না। নদীর বুকে ডাক নাই। তবে তো এ ডাকাতির ভয়ের জন্য নাগরা বাজিতেছে! কাহারা? এ কাহারা?

তাহার গ্রামের পথেও চৌকিদার এবার হাঁকিয়া উঠিল—আ—আ—হৈ!

তিনকড়ি বার বার আপন মনে ঘাড় নাড়িল—হুঁ!—হুঁ! হুঁ! ডাকাতির ভয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে নাগরা বাজিতেছে, আর দেখুড়িয়ার ভল্লাদের সাড়া নাই! তাহারা লাঠি হাতে বাহির হয় নাই ; বদমাস পাষণ্ডের দল সব!—সে চালের উপর হইতেই হাঁক মারিল—আ—আ—হৈ!

চৌকিদারটা প্রশ্ন করিল—মোড়ল মশাই?

—হ্যাঁ। দাঁড়া। তিনকড়ি কোঠার চাল হইতে বারান্দার চালে লাফ দিয়া পড়িল, সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িল একেবারে উঠানে। দেরি তাহার আর সহিতেছিল না। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে বলিল—ভল্লাপাড়ায় কে কে নাই রে? ডেকে দেখেছিস?

চৌকিদারও জাতিতে ভল্লা। সে চুপি চুপি বলিল—রাম নাই একেবারে নিয্যস। গোবিন্দ, রংলেলে (রঙলাল), বিন্দেবন, তেরে (তারিণী) এরাও নাই। আর সবাই বাড়ীতে আছে।

—থানার কেউ রোঁদে আসবে না তো আজ ?

—আজ্ঞে না।

তিনকড়ি আপন মনে দাঁতে দাঁত ঘষিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে দুর্যোগময়ী রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা যেন চিরিয়া-ফাড়িয়া পর পর দুইটা বন্দুকের শব্দ ময়ূরাক্ষীর কূলে কূলে ছুটিয়া চলিয়া গেল। তিনকড়ি শঙ্কিত হইয়া বলিল—বন্দুকের শব্দ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিছন হইতে তিনকড়ির ছেলে ডাকিল—বাবা !

ছেলে গৌর এবং মেয়ে স্বর্ণ বাপের বড় প্রিয়। গৌর মাইনর স্কুলে পড়ে, বাপের সঙ্গে চাষেও খাটে। ছেলের ধার তেমন নাই, নতুবা তিনকড়ি তাহাকে বি-এ, এম-এ পর্যন্ত পড়াইত। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলে—গৌরটা যদি মেয়ে হত, আর স্বর্ণ যদি আমার ছেলে হত !

সত্যই স্বর্ণ ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, মেয়েটি তাহাদের গ্রাম্য পাঠশালা হইতে এল-পি পরীক্ষা দিয়া মাসে দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছিল। কিন্তু তারপর তাহার পড়ার উপায় হয় নাই। তবু সে দাদার বই লইয়া আজও নিয়মিত পড়ে; মাকে গৃহকর্মে সাহায্যও করে। চমৎকার সুশ্রী মেয়ে; কিন্তু হতভাগিনী। স্বর্ণ সাত বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। তিনকড়ির ঐ ক্ষুব্ধ কামনার মধ্যে বোধ হয় এ দুঃখও লুকানো আছে। স্বর্ণ যদি ছেলে হইত আর গৌর যদি মেয়ে হইত, তবে তো তাহাকে কন্যার বৈধব্যের দুঃখ সহ্য করিতে হইত না; গৌর তো স্বর্ণের ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিত না। ছেলে গৌর তাহার অত্যন্ত প্রিয়। বাপের মতই বলিষ্ঠ। ভোররাত্রি হইতে বাপের সঙ্গে মাঠে যায়, বেলা নয়টা পর্যন্ত তাহাকে সাহায্য করে; তারপর সে স্নান করিয়া খাইয়া জংশনের স্কুলে পড়িতে যায়। বাবুদের স্কুল বলিয়া তিনকড়ি তাহাকে কঙ্কণায় পড়িতে দেয় নাই। যে বাবুরা দেবতার সম্পত্তি মারিয়া দেয়, তাহাদের স্কুলে পড়িলে তাহার ছেলেও পরের সম্পত্তি মারিয়া দিতে শিখিবে—এই তাহার ধারণা! চারিটায় বাড়ী ফিরিয়া গৌর আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাপকে সাহায্য করে, তাহার পর সন্ধ্যায় বাড়ীর একটিমাত্র হ্যারিকেন জ্বালিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত পড়ে।

ছেলের ডাকে তিনকড়ি উত্তর দিল—কি বাবা ?

—ঘর-দোর সামলাতে হবে না ?

—না। তোমরা ঘরে গিয়ে শোও। আমি আসছি। ভয় নাই, কোন ভয় নাই। বানের ঢেঁড়া নয়।—বলিয়া চৌকিদার রতনকে ডাকিল—রতন, আয়।

গ্রামের প্রান্তে মাঠের ধারে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল জমাট-বস্তীর সন্ধানে। চারিদিকে অন্ধকার থমথম করিতেছে। সঠিক কিছু বুঝা যাইতেছে না। হঠাৎ তিনকড়ি বলিল—রতন !

—আজ্ঞে।

—আঠারো সালের বান মনে আছে ?

আঠারো সালের বন্যা ময়ূরাক্ষীর তটপ্রান্তবাসীদের ভুলিবার কথা নয়। যাহারা সে বন্যা দেখিয়াছে, তাহারা তো ভুলিবেই না, যাহারা দেখে নাই, তাহারা সে বানের গল্প শুনিয়াছে; সে গল্পও ভুলিবার কথা নয়। রতন বাগ্দীর পক্ষে তো আঠারো সালের বন্যা তাহার জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা। আঠারো সালের বন্যা আসিয়াছিল গভীর রাত্রে এবং আসিয়াছিল অতি অকস্মাৎ। তখন রতনের ঘর ছিল গ্রামের প্রান্তে—ময়ূরাক্ষীর অতি নিকটে। গভীর রাত্রে এমন অকস্মাৎ বান আসিয়াছিল যে, রতন স্ত্রী-পুত্র লইয়া শুধু হাতে-পায়েও ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, অগত্যা আপনার ঘরের চালে উঠিয়া বসিয়াছিল। ভোরবেলায় ঘর ধ্বসিয়া চালখানা ভাসিল, ভাসিয়া চলিল বন্যার স্রোতে। দুর্দান্ত স্রোত! রতন নিজে সাঁতার দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া সে স্রোতে সাঁতার দিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। সেদিন তিনকড়ি এবং ওই রামভল্লা অনেকগুলি লাঙ্‌লাদড়ি বাঁধিয়া এক এক করিয়া সাঁতার দিয়া আসিয়া চালে দড়ি বাঁধিয়াছিল। শুধু তাই নয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই রতনের স্ত্রী টলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল বন্যার জলে। রামভল্লা ও তিনকড়ি ঝাঁপ দিয়া বন্যার জলে পড়িয়া তাহাকেও টানিয়া তুলিয়াছিল। সে কথা কি রতন ভুলিতে পারে? সেই অন্ধকারেই রতন হাত বাড়াইয়া তিনকড়ির পা ছুঁইয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—সে কথা ভুলতে পারি মোড়ল মশাই? আপুনি তো—

—আমার কথা নয় রতন। রামার কথা বলছি। যদি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।

রতন বলিল—ওই দেখুন, আলপথ ধরে ওই কালো কালো সব গাঁ ঢুকছে।

সাত

শ্রীহরি ঘোষ বাড়ী ফিরিয়া বাকী রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইয়া দিল। কিছুতেই ঘুম আসিল না, জমাট-বস্তী দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হইতেছে—এই পঞ্চগ্রামের সমস্ত লোক তাহার বিরুদ্ধে কঠিন আক্রোশে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। তাহারা তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়। পরশ্রীকাতর হিংসুক লোভীর দল সব! পূর্ব-জন্মের পুণ্যফলে, এ জন্মের কর্মফলে মা লক্ষ্মী তাহার উপর কৃপা করিয়াছেন—তাহার ঘরে আসিয়া পায়ের ধূলা দিয়াছেন. সে অপরাধ কি তাহার? সে কি লক্ষ্মীকে অপরের ঘরে যাইতে বারণ করিয়াছে? সে এই অঞ্চলের জন্য তো কম কিছু করে নাই? প্রাইমারী ইস্কুলের ঘর করিয়া দিয়াছে, রাস্তা করিয়াছে, কূয়া করিয়াছে, পুকুর কাটাইয়াছে, মাটির চণ্ডীমণ্ডপও সে-ই পাকা করিয়া দিয়াছে, লোকের পিতৃ-মাতৃদায়ে, কন্যাদায়ে, অভাব অনটনে সে-ই টাকা ঋণ দেয়, ধান 'বাড়ি' দেয়। অকৃতজ্ঞের দল সে কথা মনেও করে না। তাহার বিরুদ্ধে কে কি বলে—সে সব খবর রাখে।

অকৃতজ্ঞেরা বলে—ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুল-ঘর বোর্ডই তৈরী করে দিত। আমরাও তো ট্যাক্স দি।

ওরে মূর্খের দল—ট্যাক্স থেকে কটা টাকা ওঠে?

বলে—নইলে ছেলেরা আমাদের গাছতলায় পড়ত।...

তাই উচিত ছিল।

রাস্তা সম্বন্ধেও তাহাদের ওই কথা।

চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে বলে—ওটা তো শ্রীহরি ঘোষের কাছারী।

কাছারী নয়—শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপ যখন জমিদারের, আর সে যখন গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব কিনিয়াছে—তখন একশোবার তাহার। আইন যখন তাহাকে স্বত্ব দিয়াছে, সরকার যখন আইনের রক্ষক, তখন সে স্বত্ব উচ্ছেদ করিবার তোরা কে? দেবু ঘোষের বাড়ীর মজলিশে মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাতি নাকি বলিয়াছে—চণ্ডীমণ্ডপের সৃষ্টিকালে জমিদারই ছিল না, তখন চণ্ডীমণ্ডপ তৈয়ারী করিয়াছিল গ্রামের লোকে,—গ্রামের লোকেরই সম্পত্তি ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবতুল্য ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার এই নাতিটির পাখনা গজাইয়াছে। পুলিস তাহার প্রতি পদক্ষেপের খবর রাখে। চণ্ডীমণ্ডপ যদি গ্রামের লোকেরই ছিল, তবে জমিদারকে তাহারা দখল করিতে দিল কেন?

পুকুর কাটাইয়াছে শ্রীহরি; লোকে পুকুরের জল খায়, অথচ বলে—জল তো ঘোষের নয়, জল মেঘের। শ্রীহরি মাছ খাবার জন্যে পুকুর কাটিয়াছে, আম-কাঁঠাল খাবার জন্যে চারিদিকে বাগান লাগাইয়াছে—আমাদের জন্যে নয়। বারণ করে, খাব না পুকুরের জল।...

বারণই তাহার করা উচিত। না; তাহা সে কখনও করিবে না। আবার পরজন্ম তো আছে। জন্মান্তরেও সে এই পুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আগামী জন্মে সে রাজা হইবে।

ঋণের জন্য তাহারা বলে—ঋণ দেয়, সুদ নেয়।

আশ্চর্য কথা, অকৃতজ্ঞের উপযুক্ত কথা! ওরে, সেই বিপদের সময় দেয় কে? ঋণ লইলেই সুদ দিতে হয়—এই আইনের কথা, শাস্ত্রের কথা। উঃ, পাষণ্ড অকৃতজ্ঞের দল সব!...

চিন্তা করিতে করিতে শ্রীহরি তিন কল্কে তামাক খাইয়া ফেলিল। আজকাল তামাক তাহাকে নিজে সাজিতে হয় না, তাহার স্ত্রীও সাজে না; বাড়িতে এখন শ্রীহরি চাকর রাখিয়াছে, সে-ই সাজিয়া দেয়।

সকালে উঠিয়াই সে জংশন-শহরে রওনা হইল। গতরাত্রে জমাট-বস্তীর কথা থানায় ডায়রি করিবে; লোক পাঠাইয়া কাজটা করিতে তাহার মন উঠিল না। কর্মচারী ঘোষ অবশ্য পাকা লোক, তবুও নিজে যাওয়াই সে ঠিক মনে করিল। সংসারে অনেক জিনিসই ধারে কাটে বটে, কিন্তু ভার না থাকিলে অনেক সময়ই শুধু ধারে কাজ হয় না। ক্ষুদ্র পোঁচ দিয়ে নালী কাটা যায়, কিন্তু বলিদান দিতে হলে গুরু-ওজনের দা চাই। সে নিজে গেলে দারোগা-জমাদার বিষয়টার উপর যে মনোযোগ দিবে, ঘোষ গেলে তাহার শতাংশের একাংশও দিবে না।

টাপর বাঁধিয়া গরুর গাড়ী সাজানো হইল। জংশন-শহরে আজকাল পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া-আসা সে বড় একটা করে না। গাড়ীর সঙ্গে চলিল কালু শেখ। কালু শেখ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়াছে। গাড়ীর মধ্যে শ্রীহরি লইয়াছে কিছু ডাব, এককাঁদি মর্তমান কলা, দুইটি ভাল কাঁঠাল। বড় আকারের হৃষ্টপুষ্ট বলদ দুইটা দেখিতে ঠিক একরকম, দুইটার রঙই সাদা, গলায় কড়ির মালার সঙ্গে পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। টুং-টুাং ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী কাঁধে বলদ দুইটা জোর কদমে চলিল।

শ্রীহরি ভাবিতেছিল—ডায়রির ভিতর কোন্ কোন্ লোকের নাম দিবে সে? তিনকড়ির নাম তো দিতেই হইবে। থানার দারোগা নিজেই ও-নামটার কথা বলিবে। পুলিস-কর্তৃপক্ষ নাকি পুনরায় তিনকড়ির বিরুদ্ধে বি-এল কেসের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দারোগা নিজে বলিয়াছে, লোকটা যদি নিজে ডাকাত না হয়, ডাকাতির মালও যদি না সামলায়, তবুও ও যখন ভল্লাদের কেসের তদ্বির করে, তখন যোগাযোগ নিশ্চয় আছে।

ভল্লাদের মধ্যে রামভল্লা নেতা। অন্য ভল্লাদের নাম তদন্ত করিয়া পুলিসই বাহির করিবে। আর কাহার নাম? রহম শেখ? ও লোকটাও পুলিসের সন্দেহভাজন ব্যক্তি। ভল্লা না হইলেও—ভল্লা-প্রধান ডাকাতের দলে না থাকিতে পারে এমন নয়। প্রজা-ধর্মঘটের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে ওই লোকটার প্রচণ্ড উৎসাহ এবং লোকটা পাষণ্ডও বটে। সুতরাং ধর্মঘটীদের মধ্যে দুর্ধর্ষ পাষণ্ড যাহারা, তাহারা যদি এই সুযোগে তাহার বাড়ীতে ডাকাতির মতলব করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে রহমের সংস্রব থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ভল্লা-প্রধান ডাকাত-দলের মধ্যে মুসলমানও থাকে; মুসলমান-প্রধান দলে দু-একজন ভল্লার সন্ধানও বহুবার মিলিয়াছে। তিনকড়ি, রহম—আর কে?

অকস্মাৎ গাড়ীখানার একটা ঝাঁকিতে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল; আঃ বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই সে দেখিল—গাড়ীখানা রাস্তার মোড়ে বাঁক ফিরিতেছে, ডাইনের সতেজ সবল গরুটা লেজে মোচড় খাইয়া লাফ দিয়া বাঁক ফিরিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, ভাল তেজী গরুর লক্ষণই এই! টাকা তো কম লাগে নাই, সাড়ে তিনশো টাকা জোড়াটার দাম দিতে···। মনের কথাও তাহার শেষ হইল না। সম্মুখেই অনিরুদ্ধর দাওয়া, দাওয়াটার উপর কামার-বউ একটা নয়-দশ বছরের ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, ছেলেটা প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় এক হাতে কামার-বউয়ের চুল ধরিয়া টানিতেছে, অন্য হাতে তাহাকে ঠেলিতেছে। কামার-বউয়ের মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, দেহের আবরণও বিস্রস্ত, চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি, শীর্ণ-পাণ্ডুর মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে যেন থম্ থম্ করিতেছে।

শ্রীহরির বুকের ভিতরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া প্রচণ্ডবেগে লাফাইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের মধ্যে পূর্বতন ছিরু উঁকি মারিল, তাহার বহুদিনের নিরুদ্ধ বাসনা উল্লাসে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি আপনাকে সংহত করিল। সে জমিদার, সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাছাড়া পাপ সে আর করিবে না। পাপের সংসারে লক্ষ্মী থাকেন না।

কিন্তু তবু সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল বিস্রস্তবাস অনবগুণ্ঠিতা পদ্মের দিকে।

সহসা পদ্মের দৃষ্টিও পড়িল তাহার দিকে। বলদের গলায় ঘণ্টার শব্দে গাড়ীর দিকে চাহিয়া সে দেখিল শ্রীহরি ঘোষ, সেই ছিরু পাল, তাহার দিকে চাহিয়া আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিল। ছেলেটা সেই উচ্চিংড়ে। সকাল বেলাতেই সে জংশন হইতে গ্রামে আসিয়াছে। আজ ছিল লুণ্ঠন-ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর দিন মা-মণিকে তাহার মনে পড়িয়াছিল। পড়িবার কারণও ছিল—পূর্বে ষষ্ঠীর দিন মা-মণি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করিত প্রচুর। কিন্তু এবার কোনও আয়োজনই নাই দেখিয়া সে পলাইয়া যাইতেছে। মুখে কিছু বলে নাই। বোধ হয় লজ্জা হইয়াছে। নজরবন্দী যতীনবাবু যখন এখানে পদ্মের বাড়ীতে থাকিত—তখন যতীনবাবু পদ্মকে বলিত 'মা-মণি'; উচ্চিংড়েও তখন যতীনবাবুর কাছে পেট পুরিয়া ভাল খাইতে পাইত বলিয়া এখানেই পড়িয়া থাকিত; পদ্মকে সে-ও মা-মণি বলিত। আজ মা-মণি, তাহাকে বার বার অনুরোধ করিল—এইখানে থাকিতে, অবশেষে পাগলের মত তাহাকে এমনি ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

ছাড়া পাইয়া উচ্চিংড়ে দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বোঁ-বোঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল। পদ্ম আপনাকে সম্বৃত করিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। গাড়ীখানাও কামার-বাড়ী পার হইয়া গেল।

শ্রীহরির অনেক কথা মনে হইল। অনিরুদ্ধ কামার শয়তান, তাহার ঠিক হইয়াছে। জেল খাটিতে হইয়াছে, দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে। সে সময় ওই কামারনীটির উপর তাহার লুব্ধ দৃষ্টি ছিল, আজও বোধ হয়···কিন্তু মেয়েটার চলে কেমন করিয়া? দেবু ধান দেয় বলিয়া শুনিয়াছে সে। কেন? দেবু ধান দেয় কেন? মেয়েটাই বা নেয় কেন? সে-ও তো দিতে পারে ধান; অনেক লোককেই সে ধান দান করে। কিন্তু কামার-বউ তাহার ধান কখনই লইবে না। শুধু তাহার কেন—দেবু ছাড়া বোধ হয় অন্য কাহারও কাছে ধান লইবে না।

গ্রাম পার হইয়া, কঙ্কণা ও তাহাদের গ্রামের মধ্য-পথে একটা বড় নালা; দুইখানা গ্রামের বর্ষার জল ওই নালা বাহিয়া ময়ুরাক্ষীতে গিয়া পড়ে। বেশী বর্ষা হইলে নালাটাই হইয়া উঠে একটা ছোটখাটো নদী। তখন এই নালাটার জন্য তাহাদের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া একটা দুর্ঘট ব্যাপার হইয়া উঠে। সম্প্রতি জংশন-শহরের কলওয়ালারা এবং গদীওয়ালারা ইহার উপর একটা সাঁকো বাঁধিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ডকে বলিয়াছে। তাহারা যথেষ্ট সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছে। সাঁকোটা বাঁধা হইলে—বর্ষার সময়েও এদিককার ধান-চাল—রেলওয়ে ব্রীজের উপর দিয়া জংশনে যাইতে পারিবে।

শ্রীহরি আপন মনেই বলিল—আমি বাধা দেব। দেখি কি করে সাঁকো হয়। এ গাঁয়ের লোককে আমি না-খাইয়ে মারব।

আজও নালাটায় এক কোমর গভীর জল খরস্রোতে বহিতেছে। গতকাল বোধহয় সাঁতার-

জল হইয়াছিল। নালাটার দুই ধারে পলির মত মাটির স্তর পড়িয়াছে। গাড়ী নালায় নামিল। পলি-পড়া জায়গাগুলিতে একহাঁটু কাদা। কিন্তু শ্রীহরির বলদ দুইটা শক্তিশালী জানোয়ার, তাহারা অবলীলাক্রমে গাড়ীটা টানিয়া ওপারে লইয়া উঠিল; এই কাদায় বেটা চাষাদের হাড়পাঁজরা বাহির করা বলদ-বাহিত বোঝাই গাড়ি যখন পড়িবে—তখন একটা বেলা অন্তত এইখানেই কাটিবে। নিজেরাও তাহারা চাকায় কাঁধ লাগাইয়া গাড়ী ঠেলিবে, পিঠ বাঁকিয়া যাইবে ধনুকের মত; কাদায়, ঘামে ও জলে ভূতের মত মূর্তি হইবে। শ্রীহরির মুখখানা গাম্ভীর্য-পূর্ণ ক্রোধে থম্ থম্ করিতে লাগিল।

নালাটার পরে খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়াই রেলওয়ে ব্রীজ। শ্রীহরির গাড়ী ব্রীজে আসিয়া উঠিল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা—পুরনো কালের খিলান-করা ব্রীজ। এক দিকে রাশি রাশি বেলে-পাথর-কুচির বন্ধনীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে রেলের লাইন—লাইনের পাশ দিয়া অন্য দিকে মানুষ যাইবার পথ। শ্রীহরির জোয়ান গরু দুইটা লাইন দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিল—ফোঁস-ফোঁস শব্দে বার বার ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। কচি বয়স হইতে তাহারা অজ-পাড়াগাঁয়ে কোন গরীব চাষীর ঘরে, মেটে ঘর, মেঠো নরম মাটির পথ, শান্ত-স্তব্ধ পল্লীর জনবিরলতার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছে; মাত্র কয়েক মাস হইল আসিয়াছে শ্রীহরির ঘরে। এই ইট-পাথরের পথ, লোহার চকচকে রেল-লাইন—এ সব তাহাদের কাছে বিচিত্র বিস্ময়; অজানার মধ্যে বিস্ময়ে ভয়ে গরু দুইটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রীজ পার হইয়া খেয়াঘাট পার হইতে হইবে।

শ্রীহরি গাড়োয়ানকে বলিল—হুঁশ করে চালা। বলিয়া সে হাসিল। জংশন-শহর তাহাদের কাছেও বিস্ময়। তাহার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হইল। মূল রেল-লাইনটা অবশ্য অনেক দিনের, স্টেশনটা তখন একটা ছোট স্টেশন ছিল। গ্রামটাও ছিল নগণ্য পল্লীগ্রাম। তাহার বয়স যখন বারো-তেরো বৎসর, তখন স্টেশনটা পরিণত হইল বড় জংশনে। দুই দুইটা ব্রাঞ্চ লাইন বাহির হইয়া গেল। সে-সব তাহার বেশ মনে আছে। পূর্বকালে শ্রীহরি মূল লাইনের গাড়ীতে চড়িয়া কয়েকবার গঙ্গাস্নানে গিয়াছে—আজিমগঞ্জ, খাগড়া প্রভৃতি স্থানে। তখন ঐ স্টেশনটায় কিছুই মিলিত না। স্টেশনের পাশে মিলিত শুধু মুড়ি-মুড়কী-বাতাসা। তখন এ অঞ্চলের বাবুদের গ্রাম ওই কঙ্কণা ছিল—তখনকার বাজারে-গ্রাম। ভাল মিষ্টি, মনিহারীর জিনিস, কাপড় কিনিতে লোকে কঙ্কণায় যাইত। তারপর ব্রাঞ্চ লাইন পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনটা হইল জংশন। বড় বড় ইমারত তৈয়ারী হইল, বিস্তীর্ণ মাঠ ভাঙিয়া রেল-ইয়ার্ড হইল, সারি সারি সিগ্‌নালের স্তম্ভ বসিল, প্রকাণ্ড বড় মুসাফিরখানা তৈয়ার হইল। কোথা হইতে আসিয়া জুটিল দেশ-দেশান্তরের ব্যবসায়ী,—বড় বড় গুদাম বানাইয়া এই অঞ্চলটার ধান, চাল, কলাই, সরিষা, আলু কিনিয়া বোঝাই করিয়া ফেলিল। আমদানীও করিল কত জিনিস—হরেক রকমের কাপড়, যন্ত্রপাতি, মশলা, দুর্লভ মনিহারী বস্তু। হ্যারিকেন লণ্ঠন ওই জংশনের দোকানেই তাহারা প্রথম কিনিয়াছে; হ্যারিকেন, দেশলাই; কাচের দোয়াত, নিবের হোল্‌ডার কলম, কালির বড়ি, হাড়ের বাঁটের ছুরি, বিলাতি

কাঁচি, কারখানায়-তৈয়ারী ঢালাই-লোহার কড়াই, বালতি, কালো-কাপড়ের ছাতা, বার্নিশ-করা জুতা, এমন কি কারখানার তৈয়ারী চাষের সমস্ত সরঞ্জাম ; টামনা,—বিলাতি গাঁইতি, খন্তা, কুড়ুল, কোদাল, ফাল পর্যন্ত। বড় বড় কল তৈয়ারী হইল—ধান-কল, তেল-কল, ময়দা-কল। ভানাড়ী কলু মরিল—ঘরের জাঁতা উঠিল। ছোটলোকের আদর বাড়িল—দলে দলে আশপাশের গ্রাম খালি করিয়া সব কলে আসিয়া জুটিয়াছে।

শ্রীহরির গাড়ী স্টেশন-কম্পাউণ্ডের পাশ দিয়া চলিয়াছিল। অদ্ভুত গন্ধ উঠিতেছে ; তেল-গুড়-ঘি, হরেক রকম মশলা—ধনে, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, লবঙ্গের গন্ধ একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ; তাহার মধ্য হইতে চেনা যাইতেছে—তামাকের উগ্র গন্ধ। অদূরের ধান-কল হইতে ইহার সঙ্গেই আবার ভাসিয়া আসিয়া মিশিতেছে—সিদ্ধ ধানের গন্ধ। স্টেশন-ইয়ার্ড হইতে মধ্যে মধ্যে এক এক দমকা কয়লার ধোঁয়াও আসিয়া মিশিতেছে তাহার শ্বাসরোধী গন্ধ লইয়া। রেল-গুদামের চারিটা পাশে—ওই সমস্ত জিনিস পড়িয়া চারিদিকের মাটি ঢাকিয়া গিয়াছে।

গাড়োয়ানটা সহসা বলিয়া উঠিল—ওরে বাপ্ স্ রে। গাঁট কত রে ?

শ্রীহরি মুখ বাড়াইয়া দেখিল—সত্যই দশ-বারোটা কাপড়ের বড় গাঁট পড়িয়া আছে। পাশে পড়িয়া আছে প্রায় পঞ্চাশটা চটের গাঁট। গাড়োয়ানটা সবগুলোকেই কাপড় মনে করিয়াছে। এক পাশে পড়িয়া আছে—কতকগুলা কাঠের বাক্স। নূতন কাপড় এবং চটের গন্ধের সঙ্গে—ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ উঠিতেছে, তাহার সহিত মিশিয়াছে—চায়ের পাতার গন্ধ।

গুদামটায় দুমাদুম শব্দ উঠিতেছে, মালগাড়ী হইতে মাল খালাস হইতেছে। রেল-ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের স্টীমের শব্দ, বাঁশীর শব্দ, দ্রুত চলন্ত বিশ-পঞ্চাশ-শত-দেড়শত জোড়া লোহার চাকার শব্দ, কলগুলার শব্দ, মোটর-বাসের গর্জন,—মানুষের কলরবে চারিদিক মুখরিত।

দিন দিন শহরটা বাড়িতেছে। রাস্তার দুপাশে পাকাবাড়ীর সারি বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফটকে নাম লেখা হরেক ছাঁদের একতলা দোতলা বাড়ী ; দোকানের মাথায় বিজ্ঞাপন, দেওয়ালে বিজ্ঞাপন।

গাড়োয়ানটা বলিয়া উঠিল—ওঃ, পায়রার ঝাঁক দেখো দেখি ! প্রায় দুইশতখানেক পায়রা রাস্তার উপর নামিয়া শস্যকণা খুঁটিয়া খাইতেছে। লোক কিংবা গাড়ী দেখিয়াও তাহারা ওড়ে না, অল্প-স্বল্প সরিয়া যায় মাত্র। জংশন-শহর তাহাদের কাছেও এখন বিস্ময়ের বস্তু। সহসা শ্রীহরির একটা কথা মনে হইল,—এখানকার কলওয়ালা কয়েকজন এবং গদীওয়ালা মহাজনগুলি তাহাদের অর্থাৎ জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষ লইয়া কতখানি উস্কানি দিতেছে সন্ধান লইতে হইবে। সে তাহাদের জানে। উহাদের জন্য চাষী-প্রজারা এতখানি বাড়িয়াছে। ছোটলোকগুলা তো কলের কাজ পাইয়াই চাষের মজুরি ছাড়িয়াছে। তাহাদের শাসন করিতে গেলে—বেটারা পলাইয়া আসিয়া কলে ঢুকিয়া বসে। কলের মালিক তাহাদের রক্ষা করে। কত জনের কাছে তাহার ধানের দাদন এইভাবে পড়িয়া গেল তাহার

হিসাব নাই। চাষ-বাস করা ক্রমে ক্রমে কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চাষীদের দাদন দেয় ইহারাই, জমিদারের সঙ্গে বিরোধে তাহাদের পক্ষ লইয়া আপনার লোক সাজে। মূর্খেরা গলিয়া গিয়া দাদন নেয়; ফসলের সময় পাঁচ টাকা দরের মাল তিন টাকায় দেয়— তবু মুর্খদের চৈতন্য নাই! এখনও একমাত্র ভরসার কথা—মিলওয়ালারা, গদীওয়ালারা ধান ঋণ দেয় না, দেয় টাকা। ধানের জন্য চাষী-বেটাদের এখনও জমিদার-মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়।

গাড়ীটা রাস্তা হইতে মোড় ঘুরিয়া থানা-কম্পাউণ্ডের ফটকে ঢুকিল।

দারোগা হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন—আরে, ঘোষ মশাই যে! কি খবর? এদিকে কোথায়?

শ্রীহরি বিনয় করিয়া বলিল—হুজুরদের দরবারেই এসেছি। আপনারা রক্ষে করেন তবেই, নইলে তো ধনে-প্রাণে যেতে হবে দেখছি।

—সে কি!

—খবর পেয়েছেন নাকি কাল রাত্রে জমাট-বস্তী হয়েছিল—মৌলকিনীর বটতলায়? ভূপাল-রতন আসে নাই?

—কই না—বলিয়া পরমূহূর্তেই হাসিয়া দারোগা বলিলেন—আর মশাই, থানা-পুলিসের ক্ষমতাই নাই তো আমরা করব কি? এখন তো মালিক আপনারাই—ইউনিয়ন বোর্ড। ভূপাল-রতনের আজ ইউনিয়ন বোর্ডে কাজের পালি। কাজ সেরে আসবে।

—আমি কিন্তু বার বার করে সকালেই আসতে বলেছিলাম।

—বসুন, বসুন। সব শুনছি।

শ্রীহরি কালু শেখকে বলিল—কালু, ওগুলো নামা।

কালু নামাইল—কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি।

দারোগা বক্রভাবে সেগুলির উপর চকিতে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন,—চা খাবেন তো? তিনি বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তার ওপারের চায়ের দোকানীকে হাঁকিয়া বলিলেন—এই, দু কাপ চা, জল্‌দি!

শ্রীহরিকে লইয়া তিনি অফিসে গিয়া বসিলেন। চা খাইয়া বলিলেন—সিগারেট বের করুন। সিগারেট ধরিয়ে শোনা যাক্ কালকের কথা।

শ্রীহরি বাড়ীতেও সিগারেট খায় না, কিন্তু রাখে; দারোগা হাকিম প্রভৃতি ভদ্র লোকজন আসিলে বাহির করে। বাহিরে গেলে সঙ্গে লয়, আজও সঙ্গে আনিয়াছিল। সে সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিল। দারোগা দ্বাররক্ষী কনেস্টবলকে বলিলেন—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শ্রীহরি থানার অফিস-ঘর হইতে বাহির হইল। দারোগাও বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—ও আপনি ঠিক করেছেন, কোন ভুল হয়নি—অন্যায়ও হয় নি—ঠিক করেছেন!

শ্রীহরি একটু হাসিল—শুষ্ক-হাসি।

সে গতরাত্রের জমাট-বস্তীর কথা ডায়রি করিয়া, ঐ সঙ্গে তাহার যাহাদের উপর সন্দেহ হয় তাহাদের নামও দিয়াছে। রামভল্লা, তিনকড়ি মণ্ডল, রহম শেখ-এর নামগুলি তো বলিয়াছেই, উপরন্তু সে দেবু ঘোষের নামও উল্লেখ করিয়াছে। তাহাকে তাহার সন্দেহ হয়। গোটা ব্যাপারটাই যদি প্রজা-ধর্মঘটের ফেঁকড়া হয়, তবে দেবুকে বাদ দেওয়া যায় না; দেবুই সমস্তের মূল—সে-ই সমস্ত মাথায় করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, পিছন হইতে প্রেরণা যোগাইতেছে।

দারোগা প্রথমটা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—তা কি সম্ভব ঘোষ মশায়? দেবু ঘোষ ডাকাতির ভেতর?

শ্রীহরি তখন বাধ্য হইয়া গতকাল গভীর রাত্রে সেই দুর্যোগের মধ্যেও গ্রামপ্রান্তে দেবুর প্রতি দরদী দুর্গা মুচিনীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিল—দেবু ছোঁড়ার পতন হয়েছে দারোগাবাবু।

—বলেন কি!

—শুধু দুর্গাই নয়; দেবু ঘোষ এখন অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রীর ভরণপোষণের সমস্ত ভার নিয়েছে তা খবর রাখেন?

দারোগা কিছুক্ষণ শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া খস্‌খস্‌ করিয়া সমস্ত লিখিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন—তবে আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন।

শ্রীহরি চমকিয়া উঠিয়াছিল—আপনি লিখলেন নাকি দেবুর নাম?

—হ্যাঁ। চরিত্রদোষ যখন ঘটেছে, তখন অনুমান ঠিক।

—না, না। তবু ভাল করে জেনে লিখলেই ভাল হত—

দারোগা হাসিয়া বার বার তাহাকে বলিলেন—কোন অন্যায় হয় নি আপনার। ঠিক ধরেছেন আর ঠিক করেছেন আপনি।

ফিরিবার পথে দুই-চারিজন গদীওয়ালা মহাজন ও মিলমালিকদের ওখানেও সে গেল। কিন্তু কোন সঠিক সংবাদ মিলিল না। কেবল একজন মিলওয়ালা বলিল—টাকা আমরা দোব ঘোষ মশায়। জমি হিসেব করে টাকা দোব। আপনাদের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ বেধেছে, আমাদের লাভের এই তো মরসুম।—সে দর্পের হাসি হাসিল।

শ্রীহরি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইল—কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। সে-ও একটু হাসিল।

মিলওয়ালা ভদ্রলোকটি বেঁটে-খাটো মানুষ, বড়লোকের ছেলে; জংশন-শহরে তাহার দুইটা কল—একটা ধানের, একটা ময়দার। অনেকটা সাহেবী চালের ধারা-ধরণ; কথাবার্তা পরিষ্কার-স্পষ্ট, তাহার মধ্যে একটু দাম্ভিকতার আভাস পাওয়া যায়। সে-ই আবার বলিল—কলের মজুর নিয়ে আপনারা তো আমাদের সঙ্গে হাঙ্গামা কম করেন না। কথায় কথায় আপন এলাকার মজুরদের আটক করেন। প্রজাদের বলেন—কলে খাটতে যাবি নে, গদীওয়ালার দাদন নিতে পারবি নে, তাদিকে ধান বেচতে পারবি নে। এখন আপনাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেধেছে, এই তো আমাদের পক্ষে সুবিধের সময় তাদের আরো আপনার করে নেবার।

শ্রীহরির অন্তরটা গর্তের ভিতরকার খোঁচা-খাওয়া ক্রুদ্ধ আহত সাপের মত পাক খাইতেছিল, তবুও সে কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল ও নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল।

মিলওয়ালা বলিল—কিছু মনে করবেন না, স্পষ্ট কথা বলেছি আমি।

শ্রীহরি ঘাড় নাড়িয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

মিলওয়ালা বাহিরে আসিয়া আবার বলিল—আপনি কোন্‌টা চাচ্ছেন? আমরা টাকা না দিলে প্রজারা টাকার অভাবে মামলা করতে পারবে না, তা হলেই বাধ্য হয়ে মিটমাট করবে! না তার চেয়ে আমরা টাকা দিই প্রজাদের? মামলা করে যাক তারা আপনাদের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত তারা তো হারবেই; একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে হারবে! তখন আপনাদের আরও সুবিধে। লোকটি বিজ্ঞতার হাসি হাসিতে লাগিল।

শ্রীহরি কোন উত্তর না দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—কঙ্কণায় চল্।

মিলওয়ালা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল—জমিদার-কনফারেন্স নাকি?

শ্রীহরি চকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার মিলওয়ালার দিকে চাহিল, তারপর সে ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিল। তেজী বলদ দুইটা লেজে মোচড় খাইয়া লাফাইয়া গাড়ীখানাকে লইয়া ঘুরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মিলের বাঁধানো উঠানে মেয়ে-মজুরদের কয়েকজন তাহাকেই দেখিতেছিল।

শ্রীহরি দেখিল—তাহারই গ্রামের একদল মুচি ও বাউড়ীর মেয়ে। মিলের বাঁধানো প্রাঙ্গণে মেয়ে-মজুরেরা পায়ে পায়ে সিদ্ধ ধান ছড়াইয়া চলিয়াছে—আর মৃদুস্বরে একসঙ্গে গলা মিলাইয়া গান গাহিতেছে।

শ্রীহরি আসিয়া উঠিল মুখুয্যেদের কাছারীতে।

মুখুয্যেবাবুরা লক্ষপতি ধনী। বৎসরে লক্ষ টাকার উপর তাঁহাদের আয়। শুধু এ অঞ্চলের নয়, গোটা জেলাটার অন্যতম প্রধান ধনী। কঙ্কণা অবশ্য বহুকালের প্রাচীন ভদ্রলোকের গ্রাম; কিন্তু বর্তমান কঙ্কণার যে রূপ এবং জেলার মধ্যে যে খ্যাতি, সে এই মুখুয্যেবাবুদের কীর্তির জন্যই। বড় বড় ইমারত, নিজেদের জন্যে বাগানবাড়ী, সাহেব-সুবার জন্য অতিথি-ভবন, সারি সারি দেবমন্দির, স্কুল, হাসপাতাল, বালিকা-বিদ্যালয়, ঘাটবাঁধানো বড় বড় পুকুর ইত্যাদি—মুখুয্যেবাবুদের অনেক কীর্তি। জমিদারী সম্পত্তি সবই প্রায় দেবোত্তর। দেবোত্তর হইতেই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ভার নির্বাহ হয়। সাহেবদের জন্য মুর্গী কেনা হয়, মদ কেনা হয়, বাবুর্চীর বেতন দেওয়া হয়, খেমটা-নাচওয়ালী-বাইজী আসে, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতির দল আসে। বাবুদের ছেলেরাও রঙ-চঙ মাখিয়া থিয়েটার করে। দেবোত্তরের আয়ও প্রচুর। ন্যায্য আয়ের উপরেও আবার উপরি আয় আছে। দেবোত্তরের সকল আদান-প্রদানেই টাকায় এক পয়সা হিসাবে দেবতার পার্বণী আছে; টাকা দিতে গেলে টাকায় এক পয়সা বাড়তি দিতে হয় দেনাদারকে, টাকা নিতে গেলে টাকায় এক পয়সা কম নিতে হয় পাওনাদারকে। মুখুয্যে-কর্তা হিসেবী বুদ্ধিমান লোক। শ্রীহরি মুখুয্যে-কর্তার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

মুখুয্যে-কর্তা বলিলেন—তাই তো হে, তুমি হঠাৎ এলে? আমি ভাবছিলাম একটা দিন ঠিক করে আরও সব যাঁরা জমিদার আছেন, তাঁদের খবর দেব। সকলে মিলে কথাবার্তা বলে একটা পথ ঠিক করা যাবে।

শ্রীহরি বলিল—আমি এসেছি আপনার কাছে উপদেশ নিতে। অন্য জমিদার যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে কিছু হবে না বাবু। অবস্থা তো সব জানেন।

মুখুয্যে-কর্তা হাসিয়া বলিলেন—সেই জন্যেই তো।

শ্রীহরি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কর্তা বলিলেন—ওঁরা সব বনেদী জমিদার। জেদ চাপলে বৃদ্ধির মামলা করবেন বৈ কি। জেদ চাপিয়ে দিতে হবে।

শ্রীহরি হাসিয়া সবিনয়ে বলিল—প্রজারা ধর্মঘট করে খাজনা বন্ধ করলে—কদিন মামলা করবেন সব?

—টাকা ঠিক করে রাখ তুমি। ছোটখাটো যারা তাদের তুমি দিয়ো। বড় যারা তাদের ভার আমার উপর রইল। টাকা-আদায় সম্পত্তি থেকেই হবে।

শ্রীহরি অবাক হইয়া গেল।

কর্তা বলিলেন—এতে করবার বিশেষ কিছু নাই; এক কাজ কর। তুমি তো ধানের কারবার কর? এবার ধান দাদন বন্ধ করে দাও। কোন চাষীকে ধান দিয়ো না।—বলিয়া তিনি হাঁকিয়া গদী-ঘরের কর্মচারীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—কে আছ, পাঁজীটা দিয়ে যাও তো হে।

পাঁজী দেখিয়া তিনি বলিলেন—হুঁ। মুসলমানদের রমজানের মাস আসছে। রোজার মাস। রোজা ঠাণ্ডার দিন ইদল্‌ফেতর পরব। ধান দিয়ো না, মুসলমানদের কায়দা করতে বেশী দিন লাগবে না—আবার তিনি হাসিয়া বলিলেন—পেটে খেতে না পেলে বাঘও বশ মানে।

শ্রীহরি প্রণাম করিয়া বলিল—যে আজ্ঞে, তাহলে আজ আমি আসি।

কর্তা হাসিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—মঙ্গল হোক তোমার। কিছু ভয় করো না। একটু বুঝে-সমঝে চলবে। ঘরে টাকা আছে, ভয় কি তোমার? আর একটা কথা, শিব-কালীপুরের পত্তনীর খাজনা কিস্তি কিস্তি দিচ্ছ নাকি তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাইপয়সা দিয়ে দিয়েছি।

—গভর্নমেণ্ট রেভিন্যু তুমি দাও—না জমিদার দেয়?

শ্রীহরি এবার বুঝিয়া লইল। হাসিয়া বলিল—আশ্বিন কিস্তিতে আর দেব না।

পথে আসিতে শ্রীহরি দেখিল পথের পাশেই বেশ একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি মণ্ডল একটা পাচন-লাঠি হাতে লইয়া ক্রুদ্ধবিক্রমে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সম্মুখে নতমুখে বসিয়া আছে একজন অল্পবয়সী ভল্লা। ভল্লাটির পিঠে পাচন-লাঠির একটা দাগ লম্বা মোটা দড়ির মত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—কি হয়েছে ? ওকে মেরেছ কেন অমন করে ?

তিনকড়ি বলিল—কিছু হয় নাই। তুমি যাচ্ছ যাও।

শ্রীহরি ভল্লাটিকে বলিল—এই ছোকরা, কি নাম তোর ?

সে এবার উঠিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা ভল্লারা

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি নাম তোর ?

—আজ্ঞে, ছিদাম ভল্লা।

—কে মেরেছে তোকে ?

ছিদাম মাথা চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে না। মারে নাই তো কেউ।

—মারে নাই ? পিঠে দাগ কিসের ?

—আজ্ঞে না। উ কিছু লয়।

—কিছু নয় ?

—আজ্ঞে না।

তিনকড়ি নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই আবার বলিল—যাও—যাও, যাচ্ছ কোথা যাও। হাকিমী করতে হবে না তোমাকে। মেরে থাকি বেশ করেছি। সে বুঝবে ও—আর বুঝব আমি।

শ্রীহরি বাড়ী ফিরিয়াই বৃত্তান্তটি লিখিয়া কালু শেখকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

আট

যে তরুণ ভল্লা-জোয়ানটিকে তিনকড়ি ঠেঙাইয়াছিল, সে গতরাত্রিতে গ্রামে অনুপস্থিত ভল্লাদের একজন। রাত্রির অন্ধকারে আল-পথে কালো কালো ছায়ামূর্তির মত যাহারা ফিরিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে ছিদামও ছিল। ওই ছেলেটা যে উহাদের সঙ্গে জুটিতে পারে—এ ধারণা তিনকড়ির ছিল না। রাম ভল্লা প্রৌঢ় হইয়াছে, এ অঞ্চলে তাহার মত শক্তিশালী লাঠিয়াল, ক্ষিপ্রগামী পুরুষ নাই। একবার সে সন্ধ্যায় শহর হইতে রওনা হইয়া এখানে আসিয়া মধ্যরাত্রে ডাকাতি করিয়াছিল এবং অবশিষ্ট ঘণ্টাচারেক সময়ের মধ্যে গিয়া হাজির হইয়াছিল সদর শহরে। সে জীবনে বার তিনেক জেল খাটিয়াছে। তারিণী, বৃন্দাবন, গোবিন্দ, রঙলাল ইহারাও কম যায় না। সকলেই রামের যৌবনের সহচর। এখনও প্রৌঢ়ত্ব সত্ত্বেও তাহারা বাঘ। তাদের সঙ্গে ওই ছোঁড়াটা জুটিয়াছিল জানিয়া তিনকড়ির বিস্ময় ও ক্রোধের আর সীমা ছিল না। হিল্‌হিলে লম্বা—কচি চেহারার ছেলেটা দু'বছর আগেও মনসা ভাসানের দলে বেহুলা সাজিয়া গান গাহিত—

"কাক ভাই, বেউলার সম্বাদ লইয়া যাও।"

দুই বৎসরের মধ্যে সেই ছেলের এমন পরিবর্তন ! বাল্যকালে ছোঁড়ার বাপ মরিয়াছিল, মা তাহাকে বহু কষ্টেই মানুষ করিয়াছে। সে সময় তিনকড়িই ছোঁড়াকে 'গাঁইটে' গরুর পাল করিয়া দিয়াছিল। 'গাঁইটে-পালে'র কাজটা হইল দশ-বারো ঘরের ভাগের রাখালের কাজ।

সকলের গরু লইয়া ছোঁড়া মাঠে চরাইয়া আনিত, প্রত্যেক গরু-পিছু বেতন পাইত মাসিক দু পয়সা। দশ-বারো ঘরে ত্রিশ-চল্লিশটা গরু চরাইয়া মাসে এক টাকা, পাঁচ সিকা নগদ উপার্জন হইত। এছাড়া পাইত প্রতিঘরে দৈনিক মুড়ির বদলে একপোয়া চাল; পূজায় প্রতিঘরে একখানা কাপড়। সেই ছিদামের এই পরিণতি দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে তিনকড়ি ছিদামকে ধরিতে পারে নাই। তিনকড়ির সাড়া পাইবামাত্র সে সেই রাত্রেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল।···

রাম এবং অন্য সকলের সঙ্গে রাত্রেই তার একচোট্ বচসা হইয়া গিয়াছে। বচসা বলিলে ভুল হইবে। বকিয়াছে সে নিজেই। হাজার ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে--ছি! ছি! ছি! এত সাজাতেও তোদের চেতন হল না রে? রাম, এই সেদিন তুই খালাস পেয়েছিস, বোধহয় গত বছর কার্তিক মাসে,—আর এ হল শ্রাবণ মাস, এরই মধ্যে আবার? রামা, কি বলব তোকে বল্? ছি! ছি! ছি!

রাম মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—ওঃ, বড় রেগেছে মোড়ল। বস—বস। ওরে, তেরে, আন্ একটা বোতল বার করে আন্।

—না-না—না। তোদের যদি আর আমি মুখ দেখি, তবে আমাকে দিব্যি রইল!··· তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দিকে ফিরিয়াছিল।

—মোড়ল, যেয়ো না, শোন। ও মোড়ল!

—না, না।

--না নয়, শোন! মোড়ল, ফিরলে না? বেশ, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ।

এবার তিনকড়ি না ফিরিয়া পারে নাই। অত্যন্ত রাগের সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল—কি বলছিস শুনি? বলি, বলবি কি? বলবার আছে কি তোর?

রাম বলিয়াছিল—তোমার সর্বস্ব তো জমিদারের সঙ্গে মামলা করে ঘুচাইছ। এখন কার দোরে যাই—কি খাই বল দেখি?

—মরে যা, মরে যা, তোরা মরে যা।

—তার চেয়ে জ্যাল খাটা ভাল।—রামের উচ্চকণ্ঠের হাসিতে দুর্যোগের অন্ধকার রাত্রি শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

—তাই বলে ডাকাতি করবি!

রাম আবার খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিল--তা না করে আর কি করব বল? গোটা ভল্লা-পাড়ায় এক ছটাক ধান নাই কারুর ঘরে। তুমি বরাবর দিয়ে এসেছ—এবার তোমার ঘরেও নাই। গোবিন্দের ঘরে তিন দিন হাঁড়ি চাপে নাই। বেন্দার বেটার বউ বাপের বাড়ী পালিয়েছে, বলে গিয়েছে—না খেয়ে ভাতারের ঘর করতে লারব। মাথার উপরে চাষের সময়। তোমরা ধর্মঘট জুড়েছ—জমিদারে ধান 'বাড়ি' দেবে না। মহাজনদের কাছে গিয়েছিলাম—তারা বলেছে--জমিদারের খাজনার রসিদ আন, তবে দোব। এখন

আমরা করি কি ?

তিনকড়ি এবার আর কথার উত্তর দিতে পারে নাই।

রাম হাসিয়াই বলিয়াছিল—কদিন গেলাম এলাম শিবকালীপুর দিয়ে ; দেখলাম—ছিরু পালের ঘরে ধান-ধন মড়্ মড়্ করছে। আবার কেলে স্যাখকে পাইক রেখেছে। বেটা গোঁফে তা দিয়ে লাঠি-হাতে বসে আছে। তাই সব আপনার মধ্যে বলাবলি করতে করতে মনে করলাম—দিই, ওই বেটার ঘরই মেরে দি। আমাদেরও পেট ভরুক ; আর ধর্মঘটেরও একটা খতম করে দি।

—তারপর ? তিনকড়ি এবার ব্যঙ্গপূর্ণ তিরস্কারের সুরে বলিয়াছিল—তারপর ?

—তারপর তুমি সবই জান ! বেটা ঘা খেলে মামলা-মকর্দমা আর করত না ; করতে পারত ?

—ওরে শুয়ার, তার যা হত তাই হত। তোদের কি হত একবার বল্ দেখি ?

—সে তখন দেখা যেত।—রাম বেপরোয়ার হাসি হাসিতে লাগিল।

তিনকড়ি এবার গাল দিয়াছিল—শুয়ার, তোরা সব শুয়ার। একবার অখাদ্যি খেলে শুয়ার যেমন জীবনে তার স্বাদ ভুলতে লারে, তোরাও তেমনি শুয়ার, আস্ত শুয়ার।

এবার সকলেই সশব্দে হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'শুয়ার' গাল তিনকড়ির নরম মেজাজের গালাগাল।

রাম বলিয়াছিল—তেরে, তোকে বললাম না একটা বোতল আনতে—হল কি শুনি ?

—না, না, থাক্।···তিনকড়ি বাধা দিয়াছিল।

—থাকবে কেনে ?

—তোদের ঘরে এমন করে ধান ফুরিয়েছে, খেতে পাচ্ছিস্ না, আমাকে বলিস্ নাই কেনে ? সত্যিই গোবিন্দের বাড়ীতে তিন দিন হাঁড়ি চড়ে নাই ?

গোবিন্দ ঝুঁকিয়া দেহখানা অগ্রসর করিয়া তিনকড়ির পায়ে হাত দিয়া বলিয়াছিল—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বৃন্দাবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—বেটার বউটা পালিয়ে গেল মোড়ল ; বেটাকে পাঠিয়েছিলাম আনতে, তা বলেছে—উপোস করে আধপেটা খেয়ে থাকতে লারব। এমন ভাতারের ঘরে আমার কাজ নাই।

তিনকড়িও এবার প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল। মনে মনে ধিক্কার দিয়াছিল নিজেকে। একটা পাথরের মোহে সে সব ঘুচাইয়া বসিল ! শিব-ঠাকুরকে সে এখন পাথর বলে। যতবার ওই পথ দিয়া যায় আসে—শিব-ঠাকুরকে সে আপনার বুড়ো-আঙুল দেখাইয়া যায়। পাথর নয় তো কি ? জমিদার তাহার সম্পত্তির মূল্যের টাকাটা আত্মসাৎ করিল—পাথর তাহার কি করিল ? আর সে গিয়াছিল পাথরের উপর দেউল তুলিতে—তাহারই জমি বিকাইয়া গেল !

নহিলে আজ তাহার ভাবনা কি ছিল ? নিজের পঁচিশ বিঘা জমিতে বিঘা প্রতি চার

বিশ হারে একশত বিশ অর্থাৎ আড়াইশো মণ ধান প্রতি বৎসর ঘরে উঠিত। তাহার জমি ডাকিলে সাড়া দেয়—এমন জমি; শুষ্ক-হাজা ছিল না। তাহারই ধানে তখন গোটা ভল্লা-পাড়ার অভাব পূরণ হইত। কুক্ষণে সে দেবোত্তরের টাকা উদ্ধারের জন্য জমিদারের সঙ্গে মামলা জুড়িয়াছিল। আর, মামলা এক মজার কল বটে! হারিলে তো ফতুর বটেই—জিতিলেও তাই। উকীল-মোক্তার-মুহুরী-আমলা-পেশকার-পেয়াদা—মায় আদালতের সামনের বটগাছটা পর্যন্ত সকলেরই এক রব—টাকা, টাকা, সিকি সিকি!…বটগাছটার তলায় একটা পাথরে সিঁদুর মাখাইয়া বসিয়া থাকে এক বামুন—মাদুলি বেচে। ওই মাদুলিতে নাকি মামলায় জয় অনিবার্য। যে জেতে সে-ও মাদুলি নেয়, যে হারে সে-ও মাদুলি ধারণ করে। তিনকড়িও একটি মাদুলি লইয়াছিল। প্রতি মামলার দিন একটি করিয়া পয়সা দিয়া সিঁদুরের ফোঁটাও লইয়াছিল; তবু হারিয়াছে। হারিয়া সে দুরন্ত ক্রোধে বামুনের কাছে গিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিল। বামুন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—অশুদ্ধ কাপড়ে মাদুলি পরলে কি ফল হয় বাবা? কই, দিব্যি করে বল দেখি—অশুদ্ধ কাপড়ে মাদুলি পর নি তুমি?

তিনকড়ি হলফ করিয়া বলিতে পারে নাই। কিন্তু বামুনের ধাপ্পাবাজি সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ গেল না।

আজ তাহার ঘরে ধান অতি সামান্য। যাহা আছে তাহাতে তাহার সংসারেরই বৎসর—অর্থাৎ নূতন-ধান-উঠা পর্যন্ত—চলিবে না। তাহার উপর আবার মাথার উপর বৃদ্ধির মামলা আসিতেছে। এ মামলা না করিয়া উপায় নাই! জমিদার বলিতেছে—উৎপন্ন ফসলের মূল্য বাড়িয়াছে, সুতরাং আইন অনুসারে সে বৃদ্ধি পাইবেই। প্রজা বলিতেছে—মূল্য যেমন বাড়িয়াছে, চাষের খরচও তেমনি বাড়িয়াছে; তা ছাড়া অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির জন্য ফসল নষ্ট হইতেছে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী, সুতরাং জমিদার বৃদ্ধি তো পাইবেই না, প্রজাই খাজনা কম পাইবে। দুই-ই আছে আইনে।…চুলায় যাক আইন। ভাবিয়া ও গোলকধাঁধার কূল-কিনারা নাই! যাহা হইবার হইবে। সে নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়াছিল—রাম, কাল বিকেলের দিকে যাস্, এক টিন করে ধান দোব। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব।

রাম বলিয়াছিল—দেবো বলছ, দিয়ো। কিন্তু এর পর তুমি নিজে কি করবে?

—তার লেগে এখন থেকে ভেবে কি করবে? যা হয় হবে।

—তবে আমার ধানটা আধা-আধি করে গোবিন্দকে বেন্দাকে দিয়ো।

—কেনে, তোর চাই না?

হাসিয়া রাম বলিয়াছিল—আমার এখন চলবে।

—চলবে? তা হলে তুই বুঝি—

—তোমার দিব্য। এবার জ্যাল থেকে এসে কখনও কিছু করি নাই। মাইরি বলছি, আগেকার ছিল।

—আগেকার ছিল? আমাকে ন্যাকা পেলি রামা? তিন বছর মেয়াদ খেটে বেরিয়েছিস্

আজ আট-ন' মাস—সেই টাকা এখনও আছে ?

—গুরুর দিব্যি। ছেলে-পোতা বাঁধের তালগাছ-তলায় পুঁতে রেখেছিলাম কুড়ি টাকা ; বলে গিয়েছিলাম মাগীকে ইশেরাতে যে, যদি খুব অভাব হয় কখনও তবে আষাঢ় মাসে জংশনের কলে যখন দশটার ভোঁ বাজবে, বাঁধের একানে তালগাছটার মাথা খুঁজে দেখিস্। নেহাৎ বোকা, তালগাছে উঠে মাথা খুঁজেছে। আষাঢ় মাসে দশটার ভোঁ বাজলে—গাছের মাথার ছায়াটা যেখানে পড়েছিল—ঠিক সেইখানে পুঁতেছিলাম। বুঝতে পারে নাই। আষাঢ় মাসে সেদিন খুঁড়ে দেখলাম ঠিক আছে ; আমার এখন চলবে কিছুদিন।

তিনকড়ি এবার খুশি না হইয়া পারে নাই। বলিয়াছিল—তুমি চোরা ভাই একটি বাস্তুঘুঘু!—বলিয়া সে উঠিয়াছিল ; আসিবার সময়েও বলিয়াছিল—তুই কাল যাস্ গোবিন্দ, বেন্দা, তেরে—যাস্ কাল বিকেলে। কিন্তু—খবরদার ! এসব আর লয়। ভাল হবে না না আমার সঙ্গে।

আজ তিনকড়ি কঙ্কণার মাঠে হঠাৎ ছিদামকে পাইয়া গেল। সকালে তিনকড়িকে সে নিজ-গ্রামের মাঠে চাষ করিতে দেখিয়া মহুগ্রাম, শিবকালীপুর, কুসুমপুর পার হইয়া কঙ্কণার দিকে আসিয়াছিল মজুরীর সন্ধানে। কঙ্কণা ভদ্রলোক-প্রধান গ্রাম। তাহারা কেবল জমির মালিক। অনেকে ঘরে হাল, বলদ ও কৃষাণ রাখিয়া চাষ করায়, অনেকে আশপাশের গ্রামের চাষীকে জমি বর্গা-ভাগে দিয়া থাকে। চাষ করিয়া ধান কাটিয়া চাষী ঘাড়ে করিয়া বহিয়া বাবুদের ঘরে মজুত করে ; অর্ধেক ভাগ মালিক পায়, অর্ধেক পায় চাষী। এমনি এক বর্গায়েৎ-চাষীর কাছে ছিদাম জন খাটিতেছিল। এমন সময় তিনকড়ি সেখানে আবির্ভূত হইল।

তাহার গরুর পালের মধ্যে একটা অত্যন্ত বদ্‌স্বভাবের বকনা আছে। সেটা সমস্তদিন বেশ শান্তশিষ্ট থাকে, কিন্তু সন্ধ্যায় গোয়ালে পুরিবার সময় হইবামাত্র লেজ তুলিয়া হঠাৎ ঘোড়ার ছার্তক চালের মত চালে—চার পায়ে লাফ দিয়া ছুটিয়া পলায়। সমস্ত রাত্রি স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া আবার ভোরবেলা গৃহে ফিরিয়া শিষ্টভাবে শুইয়া পড়ে অথবা দাঁড়াইয়া রোমন্থন করে। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় পলাইয়াও সে আজ পর্যন্ত ফেরে নাই। এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। জল খাবার বেলার সময় সে খবর পাইয়াছে সেটা নাকি কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীতে বাঁধা পড়িয়াছে। ফুলগাছ খাওয়ার জন্য তাহারা গরুটাকে নাকি এমন প্রহার দিয়াছে যে, চার-পাঁচ জায়গায় চামড়া ফাটিয়া রক্ত পড়িয়াছে ; তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে চাষ ছাড়িয়া পাচন হাতে কঙ্কণায় চলিয়াছে। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িয়া গেল ছিদাম। পলাইবার আর পথ ছিল না। একে বাবুদের উপর রাগে সে গর্-গর্ করিতেছিল, তাহার উপর অপরাধী ছিদামকে কাল রাত্রে ডাকিয়া বাড়ীতে পায় নাই ; কাজেই ছিদাম ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিতেই সে তাহার পিঠে হাতের পাচন-লাঠিটা বেশ প্রচণ্ড বেগেই ঝাড়িয়া দিল—হারামজাদা !

ছিদাম দুই হাতে তাহার পা দুইটা ধরিল। মুখে যন্ত্রণাসূচক এতটুকু শব্দ করিল না বা

কোন প্রতিবাদ করিল না।

তিনকড়ি আরও এক লাঠি ঝাড়িয়া দিল—পাজী শুয়ার!

ঠিক এই সময়ে শ্রীহরি ঘোষের গাড়ী আসিয়া পৌছিল।...

ছোঁড়াটাকে খানিকটা দূর সঙ্গে আনিয়া সে সহসা তাহার কব্জিটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ছাড়িয়ে নে দেখি।

ছিদাম অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ধমক দিয়া তিনকড়ি বলিল—নে, ছাড়িয়ে নে, দেখি। হারামজাদা, শুয়ার, তুমি যে রামা ভল্লার সঙ্গে রাত্রে বের হতে শিখেছ, কত জোর হয়েছে বেটার দেখি। নে, ছাড়িয়ে নে।

ছোঁড়াটার মুখে সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল—তাই পারি? •

—তবে শুয়ারের বাচ্চা?

—কি করব বলেন?...ছিদাম এবার বলিল—ঘরে খেতে নাই। গাঁইটে পালের চাল উঠিয়ে দিয়েছে লোকে। তা ছাড়া—মা বিয়ের সম্বন্ধ করছে, টাকা লাগবে। বললাম রাম কাকাকে, তা রামকাকা বললে—কি আর করবি, আমাদের সঙ্গে বেরুতে শেখ্।

—হুঁ। তিনকড়ি এবার তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিল।

ওদিক হইতে কে হাঁকিতেছে—হো—ই। হো—ই। ও তিনু—ভা—ই!

—কে? তিনকড়ি ও ছিদাম চাহিয়া দেখিল, রাস্তার মাঝখানের সেই নালাটায় একখানা গাড়ী পড়িয়াছে, শিবপুরের দোকানী বৃন্দাবন দত্ত হাঁকিতেছে। তাহারা দুজনেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। বোঝাই গাড়ীখানার চাকা দুইটা কাদায় বসিয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন জংশন হইতে মাল লইয়া আসিতেছে। পনের-ষোল মণ মাল, গরু দুইটা বুড়া—একটা তো কাদায় বসিয়া পড়িয়াছে। তিনকড়ি বৃন্দাবনের উপর ভয়ানক চটিয়া গেল। বলিল—খুব ব্যবসা করতে শিখেছ যা হোক। বেনেরা যে হাড়কিপ্পিন—তা তুমিই দেখালে দত্ত। এই বুড়ো গরু দুটোকে বাদ দিয়ে দুটো ভাল গরু কিনতে পার না? না—টাকা লাগবে?

দত্ত বলিল—কিনব রে কিনব। নে—নে, এখন একবার ধর্ ভাই ওরে—কি নাম তোর—ওরে বাবা—তুই বরং ওই গরুটির জায়গায় জোয়ালটা ধর্। হারামজাদা গরু এমন বজ্জাত—কাদায় শুয়েছে দেখ্ না। বেটার খাওয়া যদি দেখিস্! নে নে বাবা! ওই ভাই তিনু।

বিরক্তির সঙ্গেই তিনু বলিল—ধর্ ছিদেম, ধর্? জোয়াল ধরতে পারবি তুই? তুই বরং চাকাতে হাতে দে।

—না, আজ্ঞে আপনি চাকাতে ধরেন।—বলিয়া ছিদাম হাত ভাঁজিয়া সেই হাতের ভাঁজে বোঝাই গাড়ীর জোয়াল তুলিয়া বুক দিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল। তিনকড়ি অবাক হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ছিদামের চেহারা যেন পাথরের চেহারা হইয়া উঠিল। নিজে সে চাকা ঠেলিতে গিয়া বুঝিল—কি প্রচণ্ড শক্তিতে ছিদাম আকর্ষণ করিতেছে। অথচ ঠেলিতেছে খাড়া সোজা হইয়া, পায়ের গোড়ালী হইতে মাথা পর্যন্ত যেন একখানা পাকা

বাঁশের খুঁটির মত সোজা। ওপাশে ঠেলিতেছে—গরু, গাড়োয়ান এবং দত্ত স্বয়ং। তবুও এই দিকটাই আগে উঠিল।

দত্ত ট্যাঁক হইতে দুটি পয়সা বাহির করিয়া ছিদামের হাতে দিল, বলিল—একদিন আসিস্—বাড়ী থেকে চারটি মুড়ি নিয়ে যাস্।

তিনকড়ি ছিদামের হাত হইতে পয়সা দুইটা কাড়িয়া লইয়া দত্তের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। ছিদামকে বলিল—বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করিস্। আর খবরদার, ওই কিপ্‌টের দুটো পয়সা নিবি না।

হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে চলিতে সে ছিদামের কথাই ভাবিতেছিল, ছোঁড়া যদি পেট পুরিয়া খাইতে পাইত, তবে সত্যই একটা অসুর হইত।

কথায় আছে "একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর"। গরুটাকে প্রহার করা এবং আটকাইয়া রাখার জন্য ঝগড়া করিতে তিনকড়ি একাই একশ' ছিল, আবার হঠাৎ পথে রহমও তাহার সঙ্গে জুটিয়া গেল।

রহম ফিরিতেছিল জংশন হইতে। শ্রাবণের রৌদ্রে এক গা ঘামিয়া—কাঁধের চাদরখানা দিয়া বাতাস দিতেছিল আপনার গায়ে। তিনকড়ির একেবারে খাঁটি মাঠের পোশাক;—পরনে পাঁচহাতি মোটা সুতার কাপড়, সর্বাঙ্গে কাদা তো ছিলই, তাহার উপর দত্তের গাড়ীর চাকা ঠেলিয়া দেহখানা হইয়া উঠিয়াছে পঙ্কপল্বলচারী মহিষের মত—হাতে পাচন।

রহমই বলিল—ওই, তিনু-ভাই, এমন কর‍্যা কুথাকে যাবা হে? এক্কারে মাঠ থেকে মালুম হচ্ছে?

তিনকড়ি বলিল—যাব কঙ্কণায়। বাবু-বেটাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আমার একটা বক্‌নাকে বেটারা নাকি মেরে খুন করে ফেলাল্‌ছে।

—খুন করে ফেলাল্‌ছে!—রহম উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

—বাবুদের ফুলের গাছ খেয়েছে। ফুলের মালা পরবে বেটারা! তাই বলি দেখে আসি একবার।

—চল। আমিও যাব তুমার সাথে। চল।

এতক্ষণে তিনকড়ি প্রশ্ন করিল—তুমি আজ হাল জুড়লে না?

চাষের সময় চাষী হাল জুড়ে নাই—এ একটা বিস্ময়ের কথা। এখন একটা দিনের দাম কত! একই জমিতে আজিকার পোঁতা ধানের গুচ্ছ আগামী কালের পোঁতা গুচ্ছ হইতে অন্তত বিশ-পঁচিশটা ধান বেশী ফলন দিবে।

রহম বলিল—আর বুলিস্ কেন ভাই! আল্লার দুনিয়া শয়তানে দখল কর‍্যা নিলে। "যে করবে ধরম-করম—তার মাথাতেই বাঁশ-মারণ"। চাষের সময় ঘরে ধান ফুরাল্‌ছে, যা আছে শাওন্‌টা চলবে টেনে-হেঁচিড়ে। ইহার উপর পরব এসেছে। খরচ আছে। ছেলে-পিল্লাকে কাপড় পিরানটা দিতে হবে। মেয়েগুলিকে দিতে হবে। কি করি বল! তাই গেছিলাম সন্ধ্যায়।

তিনকড়ি বলিল—হ্যাঁ, তোমাদের রোজা চলছে বটে। এক মাস রোজা, নয়?

—হ্যাঁ তামান্ রমজানের মাস। মাঝে পুন্নিমে যাবে—তা বাদে অমাবস্তে। অমাবস্তের পর চাঁদ দেখা যাবে, রোজা ঠাণ্ডা হবে। ইদল্‌ফেতর পরব।

তিনকড়ি এ পর্বের কথা জানে, তাই বলিল—এ তো তোমাদের মস্ত বড় পরব।

—হ্যাঁ। ইদল্‌ফেতর বড় পরব। খানা-পিনা আছে, গরীব-দুঃখীকে খয়রাৎ করতে হয়, সাধু-ফকীর-মেহমানদের খাওয়াতে হয়। অনেক খরচ ভাই তিনকড়ি। অথচ দেখ কেনে —আভদ্রা বর্ষাকাল—ঘরে ধান নাই, হাতে পয়সা নাই।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওকথা আর বল কেনে রহম ভাই, চাকলার লোকের ও এক অবস্থা! কারুর ঘরে খাবার নাই। জমিদার ধান দেবে না। বলে, বৃদ্ধি দিলে তবে দেবে। মহাজন বলছে—জমির খাজনার হাল-ফিল্ রসিদ আন; পাকা খত লেখ।

—আমাদের আবার ইয়ার উপরে পরব।

তিনকড়ি এ কথার কি উত্তর দিবে, সে নীরবেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

রহম বলিল—তুদের পরবগুলা কিন্তুক বেশ ধান-পানের মুখে। দুগ্‌গা পূজা সেই ঠিক আশ্বিনে হবেই। আমাদের মাসগুলান্ পিছায়ে পিছায়ে বড় গোল বাধায়।

তিনকড়ি বলিল—হ্যাঁ, তোমাদের মাসগুলান্ পিছিয়ে পিছিয়ে যায় বটে।

—হ। বড় পেঁচ্ ভাই। এক-এক বছর এমন দুখ হয় তিনকড়ি, কি বুলব? এই দেখ, আমার যা কিছু দেনা তার অর্ধেক পরবের দেনা। মান-ইজ্জৎ আছে; ইদল্‌ফেতর—মহরম্—ই দুটি পরবে দশ টাকা খরচ না করলে—মানবে কেনে লোকে?

তিনকড়ি বলিল—তা বটে হ্যাঁ! আমাদের দুগ্‌গাপুজো কালীপুজোতে খরচা না করলে চলে? যে যেমন—তেম্‌নি খরচ করতে তো হবেই।

অভাবের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে দুইজনেরই মন কেমন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ীতে তাহারা যখন গিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই ভারাক্রান্ত মনের কারণেই রাম-সুগ্রীবের মত প্রথমেই একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া বসিল না। সামনে যে চাকরটা ছিল তাহাকে বলিল—তোমাদের বাবু কোথা? বল—দেখুড়ের তিনকড়ি মোড়ল এসেছে। ক্রোধোন্মত্ততা না থাকিলেও বেশ গম্ভীরভাবেই কথাটা সে বলিল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—বাড়ীর মালিক—তরুণ একটি ভদ্রলোক। তিনি বেশ মিষ্ট কথাতেই বলিলেন—তুমিই তিনকড়ি মোড়ল?

—হ্যাঁ। আমার গরু আপনি মেরে জখম করেছেন কেন? ধরেই বা রেখেছেন কোন্ আইনে?—তিনকড়ি কিছু কিছু করিয়া মনে উত্তাপ সঞ্চয় করিতেছিল।

রহম বলিল—গরুটাকে মেরে জখম কর‍্যা খুন বার কর‍্যা দিছ শুনলাম? হিন্দু—বেরাম্ভন্ তুমি?

ভদ্রলোকটি সবিনয়ে বলিলেন—দেখ, আমি দোষ স্বীকার করছি। তবে এইটুকু বিশ্বাস

কর—আমার হুকুমে হয় নি ব্যাপারটা। একজন নতুন হিন্দুস্থানী মালী রাগের বশে করে ফেলেছে, আমি তাকে জবাবও দিয়েছি।

তিনকড়ি রহম দুজনেই অবাক হইয়া গেল। কঙ্কণার ভদ্রলোক এমন মোলায়েম ভদ্রভাবে চাষীর সঙ্গে কথা কয়—এ তাহাদের বড় আশ্চর্য মনে হইল।

ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন—দেখ গরুটি জখম হয়েছিল; যদি আমার ইচ্ছে থাকত ব্যাপারটা স্বীকার না করার, তাহলে গরুটাকে ওই অবস্থাতেই তাড়িয়ে দিতাম—বেঁধে রেখে সেবা-যত্ন করতাম না।

সত্য-সত্যই গরুটির যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হইয়াছে। রক্তপাত হইয়াছিল একটা শিঙ ভাঙিয়া। ঔষধ দিয়া কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে আহত স্থানটি; ডাবাটায় তখনও মাড়, ভূষি, খইলের অবশেষ রহিয়াছে। দেখিয়া তিনকড়ি এবং রহম দুজনেই খুশী হইল। উহার জন্য আর কোন কটু কথাও তাহারা বলিতে পারিল না।

ভদ্রলোকটি অনুরোধ করিয়া বলিলেন—মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল খেয়ে যাও।

তিনকড়ি অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না; রহম হাসিয়া বলিল—আমার রোজা।

তিনকড়ি প্রশ্ন করিল—আপনারা তো কলকাতায় থাকেন?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ।

রহম মাথা নাড়িয়া বলিল—হুঁ! অর্থাৎ ব্যবহারটা সেইজন্যেই এমন।

তিনকড়ি বাতাসা চিবাইয়া জল খাইয়া বলিল—কবে এলেন দেশে?

—দিন পাঁচেক হল।

—এখন থাকবেন?

—নাঃ। ধান বেচতে এসেছি, ধান বেচা হয়ে গেলেই চলে যাব।

—ধান বেচবেন? বেচে দেবেন?

—হ্যাঁ, দরটা এই সময়ে উঠেছে, বেচে দেব। আমরা কলকাতায় থাকি। সেখানে চাল কিনে খাই। এখানে মজুত রেখে কি করব? প্রতি বৎসরই আমরা বেচে দিই।

—বেচে দেন? তা—তিনকড়ি কথা শেষ করিতে পারিল না।

রহম বলিল—তা আমাদিগে দাদন দেন না কেনে? ধান উঠলে 'বাড়ি' সমেত শোধ দিব।

তিনকড়ি বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু আমরা কেনে—এ চাকলাটা তা হলে খেয়ে বাঁচবে; দু হাত তুলে আপনাকে আশীর্বাদ করবে।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—না বাবু, ও-সব ফেসাদের মধ্যে নেই আমি।

ব্যগ্রতাভরে রহম বলিল—একটি ছটাক ধান আপনার ডুববে না।

—না। আমি কারুর উপকার করতেও চাই না, সুদেও আমার দরকার নেই।

রহম বলিল—শুনেন, বাবু শুনেন—

তাহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—

না-না। এসবের মধ্যে আমি নেই!

তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছিল। এ ধারার মানুষের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় নাই। এদেশের সুদখোর মহাজনকে তাহারা বুঝে, অত্যাচারী জমিদারকেও জানে, কিন্তু শহরবাসী এই শ্রেণীর মানুষ তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য। সুদও লইবে না, উপকারও করিতে চায় না। ইহাকে তাহারা বলিবে কি? ভাল না মন্দ? কঙ্কণায় এই শ্রেণীর লোক নেহাত কম নয়, তাহাদের সহিত ইহার পূর্বে এমন ভাবে তিনকড়ি-রহমের পরিচয় হয় নাই। ইহারা ধান এমনি করিয়াই বৎসর বৎসর বিক্রয় করিয়া দিয়া যায়।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওই ধরনের মানুষ—ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই।

রহম বুঝিতে পারিল না এই লোকটি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করা উচিত। গরু জখম করার অপরাধে মালীকে বরখাস্ত করে, ধনী ভদ্রলোক হইয়া চাষীদের কাছে দোষ স্বীকার করে; অথচ এত ধান থাকিতেও লোককে দিতে চায় না, সুদের প্রলোভন নাই!—এ লোককে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে বলিল—মরুক গে! লে আয়, ঘর আয়। আমাদের আবার ইরসাদের বাড়ীতে মজলিশ হবে, পা চালিয়ে চল ভাই।

—মজলিশ! সেদিন শুনলাম—দেবু পণ্ডিত এসেছিল, মজলিশ হয়েছিল তোমাদের। আবার মজলিশ? ধর্মঘটের নাকি?

—ইবার মজলিশ—প্যাটের। ধানের ব্যবস্থা চাই তো। দৌলত ছিরুর সঙ্গে ভিতরে ভিতরে ফয়সালা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া ধরেছে—ধান দিবে না। তাই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ইদিকে মাথার উপর পরব!

—তবে তুমি সকাল বেলায় গিয়েছিলে কোথা?

—জংশনে। মজলিশের লেগ্যা তো একবেলার বাদে চায কামাই হবেই। তাই গিয়েছিলাম জংশনে। মিলওয়ালা কলকাতার বাবু ঘর বানাইছে, তা ভাল তালগাছ খুঁজছে। সেই ধন্ধে গেছিলাম। ওই যি—মাঠের মধ্যি হাঁড়া গাছটা। বাবার হাতের গাছ—ওটাই দিব বুললাম।

দূর হইতে আজানের শব্দ আসিতেছিল। রহম ব্যস্ত হইয়া বলিল—তু আয় ভাই আমি যাই। জুম্মার নামাজ আজ।

ইরসাদের বাড়ীতে মজলিশ বসিয়াছিল। সমগ্র মুসলমান চাষী সম্প্রদায়ই আসিয়া জুটিয়াছে। সকলের মুখেই চিন্তার ছাপ। ঘরে সকলেরই ধান নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আউস ধান উঠিতে এখনও পুরা দুইটা মাস। দুই মাসের খাদ্য চাই। খাদ্যের সন্ধানে ঘুরিবারও অবকাশ নাই। মাঠে জল থৈ-থৈ করিতেছে, চাষের সময় বহিয়া যাইতেছে। জলের তলায় সার-খাওয়া চষা-মাটি গলিয়া ঘষা-চন্দনের মত হইয়া উঠিয়াছে, গোটা মাঠময় উঠিতেছে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বীজ-ধানের চারাগুলি প্রতিদিন এখন আঙুলের এক পর্বের সমান বৃদ্ধি

পাইতেছে। এখন কি চাষীর বসিয়া থাকিবার সময় ?

তিনকড়িও গরুটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া মজলিশের অদূরে বসিল। তাহাকে আবার এইভাবে ধানের জন্য ঘুরিতে হইবে। চাষ বন্ধ থাকিবে। শ্রাবণের দশ দিন পার হইয়া গেল। চাষ করিবার সময় অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। "শাওনের পুরো, ভাদ্রের বারো, এর মধ্যে যত পারো।" পুরা শ্রাবণ মাসটাই চাষের সেরা সময়– ওদিকে ভাদ্রের বারো দিন পর্যন্ত কোন রকমে চলে। তাহার পর চাষ করা আর বেগার খাটা সমান। "থোড় তিরিশে, ফুলোয় বিশে, ঘোড়া মুখ তের দিন জান, বুঝে কাট ধান।" আশ্বিনের তিরিশে ধানের চারাগুলি বৃদ্ধি একেবারে শেষ হইয়া যাইবে, ভিতরে শস্য-শীর্ষ সম্পূর্ণ হইয়া কুড়ি দিনের মধ্যেই সেগুলি বাহির হইয়া পড়িবে। তারপর ধানগুলি পরিপুষ্ট হইতে লাগে তের দিন। ধানগাছগুলির বৃদ্ধি তিরিশে আশ্বিনের মধ্যেই শেষ ; এখন এক-একটা দিনের দাম যে লক্ষ টাকা।

বিপদটা এবার তাহাদের চেয়েও রহম ভাইদের বেশী। ঘরে খাবার নাই, ভরা চাষের সময়, তাহার উপর তাহাদের পরব লাগিয়াছে। আশ্বিনের প্রথমে যেবার দুর্গাপূজা হয়— সেবার তাহাদের যে নাকাল হয় সে কথা বলিবার নয়। তবু তো তখন কিছু কিছু আউস উঠিয়া থাকে। তিনকড়ি মনে মনে বলিল—হায় ভগবান, এমনি করেই কি পাল-পার্বণের দিন করতে হয় ! মুসলমান সম্প্রদায়ের এই চাষীশ্রেণীর মানুষগুলি তাহাদের পবিত্র 'ঈদল্-ফেতর' পর্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্বেও উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছে না, সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

চান্দ্র বৎসর গণনায় ইসলামীয় পর্বগুলি নির্ধারিত হয় বলিয়া—সৌর প্রভাবে আবর্তিত ঋতুচক্রের সঙ্গে পর্বগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। আরব দেশে উদ্ভূত ইসলামীয় ধর্মে চান্দ্রমাস গণনায় কোন অসুবিধা ছিল না। উত্তপ্ত মরুভূমিতে সৌর সম্বন্ধ বর্জন করিয়া সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মধ্যে জীবন স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে বেশী। মানুষের অর্থনীতিক সঙ্গতির উপর পশুপাল-অধ্যুষিত পাহাড়ে ঘেরা, বালু-কঙ্কর-প্রস্তরপ্রধান মৃত্তিকাময় আরবে কৃষির প্রাধান্য— এমন কি প্রভাব, মোটেই নাই। সুতরাং অগ্নিবর্ষী সূর্য এবং বৈচিত্র্যহীন ঋতুচক্রের সঙ্গে সম্বন্ধহীন বর্ষ-গণনায় কোন অসুবিধা হয় নাই। প্রখরতম গ্রীষ্মের মধ্যে কয়েকদিনের জন্য অল্প কয়েক পশলা বর্ষণ আর কয়েকদিনের কুয়াশায় শীতের আবির্ভাব জীবনে ঋতু-মাধুর্যের এবং সম্পদের কোন প্রভাব আনিতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক। একমাত্র ফল-সম্পদ খেজুর ; সে সারা বৎসরই থাকে শুকাইয়া। খাদ্য-ব্যবস্থায় সেখানে শস্যের অপেক্ষা মাংসের স্থান অধিক ; আবার খাদ্যোপযোগী পশুর জীবনের সঙ্গেও ঋতুচক্রের কোন সম্বন্ধ নাই। সেখানে চান্দ্র-গণনায় মাস পিছাইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে অধিক সঙ্গতির তারতম্য হয় না ; সেখানে পর্বগুলি চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ রশ্মির মধ্যে তারতম্যহীন সমারোহে প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠে। কিন্তু কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষির উপর পূর্ণ-নির্ভরশীল মুসলমান চাষী সম্প্রদায় স্থানোপযোগী কাল গণনার অসঙ্গতিতে মহা অসুবিধায় পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুনে যখন

ঈদল্‌ফেতর মহরম হয়, তখন তাহারা যে আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেও খানিকটা আতিশয্যময়। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে নিষ্ঠুর অভাবের মধ্যে—চাষের অবসরহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে পর্বগুলি ম্রিয়মাণ হইয়া চলিয়া যায়—পৌষ-মাঘের উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তাহারই খানিকটা প্রতিক্রিয়ার ফলও বটে। এবার 'রমজান' মাস পড়িয়াছে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে, শেষ হইবে ভাদ্রের শুক্লপক্ষের প্রারম্ভে। এদিকে ভরা চাষের সময়, চাষীর ঘরে পৌষের সঞ্চিত খাদ্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, ওদিকে জমিদারের সঙ্গে খাজনা-বৃদ্ধি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে, তাহার উপর ঈদল্‌ফেতর পর্ব। পর্বের দিন দানখয়রাত করিতে হয়, সাধু-সজ্জন-আত্মীয়দিগকে আহারে পরিতৃপ্ত করিতে হয়; ছেলে-মেয়েদের নূতন কাপড়-পোশাক চাই; জরীর টুপী, রঙীন জামা, নক্সীপাড় কাপড়, বাহারে একখানা রুমাল পাইয়া কচি মুখগুলি হাসিতে ভরিয়া উঠিবে—তবে তো! তবে তো পর্ব সার্থক হইবে, জীবন সার্থক হইবে!

মক্তবের মৌলবী ইরসাদ মিয়া ইহাদের নেতা। সে ভাবিতেছিল—এতগুলি লোকের কি উপায় হইবে? মধ্যে মধ্যে সে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কথা ভাবিতেছিল।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক! এখানকার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান—কঙ্কণার লক্ষ-পতি মুখুয্যেবাবুর বড় ছেলে; সেক্রেটারীও কঙ্কণার অন্য বাবুদের একজন। তাহাদের গ্রামের চামড়ার ব্যবসায়ী ধনী দৌলত হাজী, শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষ—ইহার মেম্বার।

ইরসাদ তবুও বলিল—দেখি একখানা দরখাস্ত করে।

রহম বলিল—শুন, ইরসাদ বাপ—ইদিকে শুন একবার।

রহম একটা কথা তিনকড়িকে বলে নাই। আপনাদের কথা ভাবিয়াই কথাটা বলে নাই। ওপারের জংশনের কলওয়ালা কলিকাতার বাবুটি বলিয়াছেন টাকা আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে পাকা এগ্রিমেণ্ট করতে হবে—যারা টাকা নেবে, তাদের আমার টাকার পরিমাণের ধান আগে শোধ করতে হবে। আর আমি যখন অসময়ে টাকা দেব, তখন হলফ করে বলতে হবে তোমাদের, যখন যা ধান বেচবে আমাকেই বেচবে।

—দর?

—সি বাপ তুমি না হলে হবে না। পাঁচজনাকে নিয়া একদিন চল সাঁঝবেলাতেই যাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে কথাটা কানাকানি হইতে আরম্ভ করিল। তিনকড়ি শুনিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠিল।

ওই সংবাদটা পাইয়াই সে বাড়ি ফিরিল বেশ খুশী মনে। যাক, উপায় তাহা হইলে একটা মিলিয়াছে। দাদন মিলিলে আর চাই কি? সোনাফলানো জমি, তাহার হাতের চাষ, ভাবনা কি তাহার? ওঃ, নিজের সব জমি আজ যদি তাহার থাকিত! পাথরের দায়ে সর্বস্ব গেল। যাক! আবার সে সব গড়িয়া তুলিবে। এবারেই সে কয়েকজন ভদ্রলোকের জমি ভাগে লইয়াছে। কার্তিকে নদী নামিয়া গেলে এবার বাপ-বেটায় মিলিয়া ময়ূরাক্ষীর চরের জায়গাটা বেশ করিয়া কাটিয়া দস্তুরমত জমি করিয়া ফেলিবে। অগ্রিম আলু, কপি, মটর-শুঁটির চাষ করিবে। টাকা একদফা তাহাকে উপার্জন করিতেই হইবে। গৌরকে সে দিয়া

যাইবে কি ? গৌরের চেয়েও ভাবনা তার স্বর্ণ মায়ের জন্য। সোনার প্রতিমা মেয়ে, স্বর্ণময়ী নাম তো সে মিথ্যা দেয় নাই। তাহারই ভাগ্যে মেয়েটা সাত বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে। উহার একটা উপায় করিতে হইবে। তাহার জন্য কিছু জমি পাকাপাকি ভাবে লেখা-পড়া করিয়া দেওয়া তাহার সবচেয়ে বড় কাজ।

বাড়িতে ফিরিতেই স্বর্ণ তাহাকে তিরস্কার করিল—বাবা, এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু। মাঠে হাল-গরু রেখে—ওই ঠেঁটি কাপড় পরে তুমি কঙ্কণা চলে গেলে! বেলা গড়িয়ে গেল খাওয়া নাই দাওয়া নাই—

হা-হা করিয়া হাসিয়া তিনকড়ি বলিল—ওরে বাপ্‌রে, বুড়ো মা হলি দেখছি।

—বাবুদের সঙ্গে ঝগড়া করে এলে তো ?

—না রে না। লোকটি ইদিকে ভাল। কলকাতায় থাকে তো! মিষ্টি করেই বললে—অন্যায় হয়ে গিয়েছে। গরুটাকে খুব যত্ন করেছে। আমাকে জল খেতে দিলে। তবে টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না। উঃ, ওদের ধান কত স্বন্ন! সব ধান বেচে দেবে।

স্বর্ণ চুপ করিয়া রহিল; আপনার ধান সে যদি বেচিয়া দেয়, তবে কাহার কি বলিবার আছে ? তাহাদের নাই—কিন্তু তাহাতে সে বাবুর কি ?

স্বর্ণের মা বলিল—ওগো, শিবকালীপুরের দেবু পণ্ডিত এসেছিল।

—দেবু পণ্ডিত।

—হ্যাঁ।

—কেনে ? কিছু বলে গিয়েছে ?

—আমি তো কথা বলি নাই। স্বন্ন কথা বললে। কি বলেছে বল্ না স্বন্ন!

স্বর্ণ বলিল—বলে গিয়েছে, আবার সে আসবে, সে কথা তোমাকেই বলবে।

মা বলিল—তবে যে অনেকক্ষণ কথা বললি লো ?

স্বর্ণ আবার সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল—আমাকে পড়ার কথা বলছিল।

তিনকড়ি উৎসাহিত হইয়া উঠিল।—পড়ার কথা? তোকে পড়া ধরেছিল নাকি? বলতে পেরেছিলি ?

সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া নীরবে স্বর্ণ জানাইল—সব বলিতে পারিয়াছে সে। তারপর বলিল—আমাকে বলছিল ইউ-পি বৃত্তি পরীক্ষা দাও না কেনে তুমি ?

—তা দে না কেনে তুই স্বন্ন!—তিনকড়ির উৎসাহের আর সীমা রহিল না। কঙ্কণার মেয়ে-ইস্কুলে বাবুদের মেয়েরা পড়ে, স্বর্ণও পড়ুক না কেন। ভাল, দেবু তো আসিবেই বলিয়াছে, তাহার সঙ্গেই সে পরামর্শ করিবে।

নয়

আগামী কল্য ঝুলনযাত্রা আরম্ভ। আজ শ্রাবণের শুক্লা দশমী তিথি, কাল একাদশী। একাদশীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় বিষ্ণুর দ্বাদশযাত্রার অন্যতম 'হিন্দোল-যাত্রা' শেষ হইবে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে ঝুলনের বিশেষ উৎসব নাই। শুধু পূর্ণিমার দিন হল-কর্ষণ নিষিদ্ধ। আকাশে আবার মেঘ জমিয়াছে। গরমও খুব। বর্ষণ হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এবার বর্ষণ শুক্লপক্ষে। বাংলার চাষীদের এদিকে দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। আষাঢ় মাস হইতেই তাহারা লক্ষ্য করে, বর্ষণ এ বৎসর কোন্ পক্ষে! প্রতি বৎসরই বর্ষণের একটা নির্দিষ্ট সময় পরিলক্ষিত হয়। যেবার কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ হয়, সেবার কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি আরম্ভ হইয়া পূর্ণাতিথিতে অর্থাৎ অমাবস্যায় প্রবল বর্ষণ হইয়া যায়। আর শুক্লপক্ষের প্রথম কয়েকদিন মৃদু বর্ষণের পর আকাশের মেঘ কাটে, দশ-পনেরো বা আঠারো দিন অ-বর্ষণের পর আবার ঘটা করিয়া বর্ষা নামে। অতিবৃষ্টিতে অবশ্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কারণ ও দুইটাও ঋতুচক্রের প্রাকৃতিক গতির অস্বাভাবিক অবস্থা, নিয়মের মধ্যে অনিয়ম—ব্যতিক্রম।

এবার বর্ষা নামিয়াছে শুক্লপক্ষে। দশমীতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টিও হইতেছে; পূর্ণিমায় প্রবল বর্ষণ হইবে হয়তো। বর্ষা এবার কিছু প্রবল হইলেও মোটের ওপর ভালই বলিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে জলে প্রায় ছিরকুট করিয়া দিল। কর্কট রাশির মাস· শ্রাবণ; সূর্য এখন কর্কট রাশিতে। বচনে আছে—"কর্কট ছরকট, সিংহ (অর্থাৎ ভাদ্রে) শুকা, কন্যা (অর্থাৎ আশ্বিনে) কানে-কান, বিনা বায়ে তুলা (অর্থাৎ কার্তিকে) বর্ষে, কোথায় রাখিবি ধান।"

ধানের গতিক অর্থাৎ লক্ষণ এবার ভাল। জলের গুণও ভাল। এক এক বৎসর জল সচ্ছল হইলেও দেখা যায় ধানের চারা বেশ সতেজ জোরালো হইয়া উঠে না, খুব উর্বর জমিতেও না। এবার কিন্তু ধানের চারায় বেশ জোর ধরিয়াছে কয়েকদিনের মধ্যেই। এমন বর্ষা চাষীদের সুখের বর্ষা। মাঠ-ভরা জল, ক্ষেত-ভরা লক্লকে চারা, দলদলে মাটি—আর চাই কি। প্রকৃতির আয়োজন-প্রাচুর্যের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রম-শক্তিটুকু যোগ করিতে পারিলেই হইল।

এমন বর্ষায় চাষী মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়ে পাউশের মাছের মত। অন্ধকার থাকিতে মাঠে যাইবে; জলখাবার বেলা, অর্থাৎ দশটা বাজিলে, একবার হাল ছাড়িয়া জমির আলের উপর বসিয়া পিতৃপুরুষের পাঁচসেরি ধোয়া-বাটিতে মুড়ি-গুড় খাইবে, তারপর এক ছিলিম কড়া তামাক খাইয়া আবার ধরিবে হালের মুঠা। একটা হইতে দুইটার মধ্যে হাল ছাড়িয়া আরও ঘণ্টা তিনেক, অর্থাৎ পাঁচটা পর্যন্ত কোদাল চালাইবে। পাঁচটার পর বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করিয়া আবার মাঠে যাইবে বীজচারা তুলিতে; জলে কাদায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে চারা তুলিবে; প্রকাণ্ড চারার বোঝা মাথায় লইয়া বাড়ী ফিরিবে রাত্রি দশটায়। এমন

বর্ষায় ভোর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত গ্রামের মাঠ হাসি-তামাশা-আনন্দে মুখর হইয়া উঠে; ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের প্রতিটি চাষী—তাহার কণ্ঠস্বর যেমনই হউক না কেন—গলা ছাড়িয়া প্রাণ খুলিয়া গান গায়। সন্ধ্যার পর এই গান শোনা যায় বেশী এবং শোনা যায় হরেক রকমের গান।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এবার এমন বর্ষাতেও মাঠে গান নাই। এমন বর্ষাতেও প্রতি চাষীরই এক বেলা করিয়া কাজ বন্ধ থাকিতেছে। চাষীর ঘরে ধান নাই। দেবুর বয়সের অভিজ্ঞতায় বর্ষায় চাষীর ঘরে ধান কোন বৎসরই থাকে না; তবে সে শুনিয়াছে, আগে থাকিত। যতীনবাবুকে একদিন বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী যাহা বলিয়াছিল সেই কথা তাহার মনে পড়িল।

"—সেকালে গাই বিয়োলে দুধ বিলাতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, সরোবর-দীঘি কাটাতাম, দেবতার প্রতিষ্ঠা করতাম।—"

ছেলে-ঘুমপাড়ানী ছড়ায় আছে—"চাঁদো-চাঁদো, পাত ঘুমের ফাঁদো, গাই বিয়োলে দুধ দেবো, ভাত খেতে থালা দেবো—।" ভাত না থাকিলে ভাত খাইবার থালা দিবে কোন্ হিসাবে? আর দিবে কোন্ ধন হইতে? ধানের বাড়া ধন নাই।

"গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গাই, পুকুরভরা মাছ, বাড়ীর পাঁদাড়ে গাছা, বউ বেটির কোলে বাছা, গাইয়ের কোলে নই, লক্ষ্মী বলেন ওখানেই রই।" আগেকার কালে এসব ছিল ঘরে ঘরে। যদি না ছিল, তবে কথাটা আসিল কোথা হইতে? আজ এই পঞ্চগ্রামের মধ্যে এমন লক্ষণ শুধু শ্রীহরির ঘরে। কঙ্কণার বাবুদের লক্ষ্মী আছেন, কিন্তু এসব নাই। জংশনে লক্ষ্মী আছেন, কিন্তু সেখানকার লক্ষ্মীর লক্ষণ একেবারে স্বতন্ত্র। কঙ্কণার বাবুদের তবু জমি আছে, জমিদারি আছে। জংশনে আছে গদী, কল,—ক্ষেত-খামারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ধান সেখানে লক্ষ্মীই নয়, গাদা হইয়া পড়িয়া আছে, জুতা দিয়া উছলাইয়া ধান পরখ হয়, অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথি বৃহস্পতিবার সকাল সন্ধ্যায় বিক্রয় হইতেছে। অথচ লক্ষ্মী সেখানে দাসীর মত খাটিতেছেন। চৈত্রলক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে—লক্ষ্মী একবার এক ব্রাহ্মণের জমি হইতে দুইটি তিলফুল তুলিয়া কানে পরিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহাকে তিলস্যনা খাটিতে হইয়াছিল ব্রাহ্মণের ঘরে। এই গদীওয়ালাদের কি ঋণ লক্ষ্মী করিয়াছেন কে জানে!···

একদল মাঠ-ফেরত চাষী কলরব করিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল। কলরব রোজই করে, আজ যেন কলরব কিছু বেশী। দেবু লণ্ঠনের আলোর শিখাটা কিছু বাড়াইয়া দিল। চাষীর দল দেবুর দাওয়ার সম্মুখে আসিয়া নিজেরাই দাঁড়াইল।

—পেনাম পণ্ডিত মশায়—পেনাম।

—বসে আছেন?—সতীশ জিজ্ঞাসা করিল।

—হ্যাঁ। দেবু বলিল—আজ গোল যেন বেশী মনে হল? ঝগড়া-টগড়া হল নাকি কারুর সঙ্গে?

—আজ্ঞে না।

—ঝগড়া নয় আজ্ঞে।

—সতীশ আজ খুব বেঁচে গিয়েছে আজ্ঞে। উত্তেজিত স্বরে বলিল পাতু।

পাতু দুর্গার ভাই, সর্বস্বান্ত হইয়াছে, পেট ভরে না বলিয়া জাতি-ব্যবসা ছাড়িয়াছে। সে এখন মজুর খাটে। আজ ওই সতীশেরই ভাগের জমিতে মজুর খাটিতে গিয়াছিল।

—বেঁচে গিয়েছে? কি হয়েছিল?

—আজ্ঞে সাপ। কালো কস-কসে আলান। তা হাত দুয়েক হবে।

সতীশ হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। কি করে, বুয়েচেন, মুখ ঢুকিয়েছিল বীজচারার থোলা আঁটির মধ্যে। আমি জানি না। আঁটিটা বাঁধবার লেগে ধরেছি চেপে, কষে চেপে ধরেছিলাম—বুয়েচেন কিনা—লইলে ছাড়ত না। মুখে ধরেছি তো—হাতে সটান্ করে মেলে পাক। দিলাম কাস্তেতে করে পেঁচিয়ে, কি করব?

ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ ভীষণ নয়, মাঠে কাল-কেউটে যথেষ্ট। প্রতি বৎসরই দুই-চারিটা মারা পড়ে। মারা পড়ে অবশ্য এমনিধারা একটা সাক্ষাৎ অনিবার্য সংঘর্ষ বাধিলে, নতুবা তাহারা মাঠের আলের ভিতর থাকে। মাঠে চাষী চাষ করে, কেহই কাহাকেও অযাচিত ভাবে আক্রমণ করে না। মারা পড়ে সাপই বেশী, কদাচিৎ মানুষ পরাজিত হয় দ্বন্দ্বের অসতর্ক মুহূর্তে।

পাতু বলিল—সতীশ দাদাকে এবার মা মনসার থানে পাঁঠা দিতে হয়। কি বলেন?

সতীশ বলিল—সি হবে। চল্ চল্ তোরা এগিয়ে চল্ দেখি! আমি যাই।

দলটি আগাইয়া চলিয়া গেল। সতীশ দাওয়াতে বসিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—কিছু বলছ নাকি সতীশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে না বললে আর কাকে বলি।

—বল

—বলছিলাম আজ্ঞে, ধানের কথা।

দেবু বলিল—সেই তো ভাবছি সতীশ।

—আর তো আজ্ঞে, চলে না পণ্ডিত মশায়।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ বলিল—এক-আধজনা লয়। পাঁচখানা গেরামের তামাম লোক। কুসুমপুরের শেখদের তো ইয়ার উপর পরব। আজ দেখলাম—একখানা হাল মাঠে আসে নাই।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—উপায় তো একটা করতেই হবে সতীশ। দিন-রাত্রি ভাবছি আমি। বেশী ভেবো না, যা হয় একটা উপায় হবেই।

সতীশ প্রণাম করিয়া বলিল—ব্যস্, তবে আর ভাবনা কি? আপনি অভয় দিলেই হল। ···সে চলিয়া গেল।

দেবু সন্ধ্যা হইতেই ভাবিতেছিল। সন্ধ্যা হইতে কেন, কয়েকদিন হইতে এ ভাবনার

তাহার বিরাম নাই। ঐ জমাট-বস্তীর রাত্রির পরদিন হইতেই সে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ জমাট-বস্তীর উদ্যোক্তা ভল্লারাই হউক বা হাড়ীরাই হউক অথবা মুসলমান সম্প্রদায়ের অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিরাই হউক, এই উদ্যোগের মধ্যে তাহাদের অপরাধপ্রবণতা যেমন সত্য, উদরান্নের নিষ্ঠুর একান্ত অভাব তাহার চেয়ে বড় সত্য। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিগুলি সমাজের স্থায়ী বাসিন্দা, তাহারা বারো মাসই আছে ; দুর্যোগ, অন্ধকার—তাহাও আছে। কিন্তু এই অপরাধ তাহারা নিয়মিত করে না, বিশেষ করিয়া কার্তিক মাস হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত ডাকাতি হয় না। কার্তিক হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত এ দেশে সকলেরই সচ্ছল অবস্থা। তখন ইহারা এ নৃশংস পাপ করা দূরে থাক্—ব্রত করে, পুণ্যকামনা করিয়া স্বেচ্ছায় সানন্দে উপবাস করে, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয় ; ডাকাতের নাতি, ডাকাতের ছেলে—এই সব ডাকাতেরা তখন তো ডাকাতি করে না। অপরাধপ্রবণতা হইতেও অভাবের জ্বালাটাই বড়। মনে মনে সে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বলিল—মা, তুমি রহস্যময়ী, তুমি থাকিলেও বিপদ, না থাকিলেও বিপদ। কঙ্কণায় তুমি বাঁধা আছ। সেখানে তোমারই জন্য বাবুদের ওই বাবু-মূর্তি! ওরা গরীবদের সর্বস্ব গ্রাস করে নানা ছলে—খাজনার সুদে, ঋণের সুদে, চক্রবৃদ্ধিহারের সুদে ; এমন কি মানুষকে অন্যায়ভাবে শাসন করিবার জন্য—মিথ্যা মামলা-মকদ্দমা করিতে তাহারা দ্বিধা করে না, এগুলোকে অধর্ম বলিয়া মনে করে না ; তাহার মূলেও তুমি। আবার ভল্লারা ডাকাতি করে—যাহারা কোন পুরুষে কেহ ডাকাতি করে নাই, তেমন নূতন মানুষও ডাকাতের দলে যোগ দেয়, তাহার কারণ তোমার অভাব। মাগো, তোমার অভাবেই হতভাগ্যদের পাপ-বৃত্তি এমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগিয়া যখন উঠিয়াছে, তখন রক্ষা নাই। কোন্ দিন কোন্ গ্রামে ডাকাতি হইল বলিয়া। এইজন্যই সে সেদিন তিনকড়ির বাড়ী গিয়াছিল। তিনকড়ির সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখা হইয়াছে তাহার মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটি যেমন শ্রীমতী, তেমনি বুদ্ধিমতী।

তিনকড়ির সঙ্গে দেখা না হইলেও দেখুড়িয়ার নিদারুণ অভাবের ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। শুধু দেখুড়িয়ায় নয়—অভাব সমগ্র অঞ্চলটায়। অথচ এমন সুবর্ষায় চাষীদের ধানের অভাব হওয়ার কথা নয় ; মহাজন যাচিয়া ধান ঋণ দেয়। এবার ধর্মঘটের জন্য মহাজনরা ধান-'বাড়ি' দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। শ্রীহরির তো বন্ধ করিবারই কথা। ভাতে মারিয়া প্রজাদের কায়দা করিতে চায়। কঙ্কণার বাবুদের বন্ধ করিবার কারণও তাই। অন্য মহাজনে বন্ধ করিয়াছে জমিদারের ভয়ে এবং কায়দা করিয়া বেশী সুদ আদায়ের জন্য। তাহা ছাড়া দাদন পড়িয়া যাইবার ভয় আছে। সকল গ্রাম হইতেই চাষীরা আসিতেছে—কি করা যায় পণ্ডিত ?

দেবু কি উত্তর দিবে ?

তাহারা তবু বলে—একটা উপায় কর, নইলে চাষও হবে না, ছেলেমেয়েগুলান্ও না খেয়ে মরবে।

সতীশকে আজ সে অভয় দিয়া ফেলিল অকস্মাৎ। সতীশ খুশী হইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু দেবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। দায়িত্ব যেন আরও গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল তাহার।

হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত সবল কোন ব্যক্তি সশব্দ পদক্ষেপে অদূরের বাঁকটা ফিরিয়া দেবুর দাওয়ার সম্মুখে দাঁড়াইল। মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি থাকিলেও তিনকড়িকে চিনিতে দেবুর বিলম্ব হইল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তিনু-কাকা! আসুন, আসুন।

তিনু দাওয়ায় উঠিয়া সশব্দে তক্তাপোশটার উপর বসিল, তারপর বলিল—হ্যাঁ, এলাম। স্বর্ন বলছিল, তুমি সেদিন গিয়েছিলে। তা কদিন আর সময় করতে কিছুতেই পারলাম না।

দেবু বলিল—হ্যাঁ কথা ছিল একটু।

—বল। তোমার সঙ্গে আমারও কথা আছে।

দেবু একটু ইতস্তত করিয়া বলিল— সেদিন জমাট-বস্তীর কথা জানেন?

—হ্যাঁ জানি। বেটাদিগে আমি খুব শাসিয়ে দিয়েছি। তোমার কাছে বলতে বাধা নাই, এ ওই ভল্লা বেটাদের কাজ।

—শ্রীহরি থানাতে আপনার নামেও বোধহয় ডায়রি করেছে।

তিনকড়ি হা-হা করিয়া হাসিয়া সারা হইল; হাসি খানিকটা সংবরণ করিয়া বলিল—আমার উ কলঙ্কিনী নাম তো আছেই বাবাজী, উ আমি গেরাহ্যি করি না। ভগবান আছেন। পাপ যদি না করি আমি, কেউ আমার কিছু করতে পারবে না।

দেবু একটু হাসিল; তারপর বলিল—সে কথা ঠিক; কিন্তু তবু একটু সাবধান হওয়া ভাল।

—সাবধান আর কি বল? চাষবাস করি, খাটি-খুটি, খাই-দাই ঘুমোই। এর চেয়ে আর কি সাবধান হব?

এ কথার উত্তর দেবু দিতে পারিল না, সত্যিই তো, সৎপথে থাকিয়া যথানিয়মে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি তাহার উপর সন্দেহের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে সে কি করিবে? সৎপথে সংসার করার চেয়ে আর বেশী সাবধান কি করিয়া হওয়া যায়!

—উ বেটা ছিরে যা মনে লাগে করুক। না হয় জেলই হবে। বেটারা বি-এল করার তালে আছে, সে আমি জানি। উ জন্যে আমি ভাবি না। গৌর আমার বড় হয়েছে; দিব্যি সংসার চালাতে পারবে। জেলের ভাতই না হয় খেয়ে আসব কিছুদিন। বলিয়া তিনকড়ি আবার হা-হা করিয়া পরুষ হাসি হাসিয়া উঠিল।

দেবু বুঝিল, তিনকড়ি কিছু উত্তেজিত হইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও একটু হাসিল।

হঠাৎ তিনকড়ির হাসি থামিয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—ভগবান-টগবান একদম মিছে কথা দেবু। নইলে তোমার সোনার সংসার এমনি করে ভেঙে যায়? না আমার স্বর্নর মত সোনার পিতিমে সাত বছরে বিধবা হয়? আমি ওই পাথরটার লেগে কি কম করলাম? কি হল? আমারই টাকাগুলান গেল—জমি গেল। আমি বেটা

গাধা বনে গেলাম। ভগবান-টগবান মিছে কথা, শুধু ফাঁকি ফাঁকি!

দেবু শ্রদ্ধার সঙ্গে তিরস্কার করিয়া বলিল—ছিঃ তিনু-কাকা, আপনার মত লোকের ও কথা মুখ দিয়ে বের করা উচিত নয়।

—কেনে?

—ভগবানকে কি ওই সামান্য ব্যাপারে চেনা যায়? দুঃখ দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন।

—আহা-হা! তোমার ভগবান তো বেশ রসিক নোক হে! কেনে, সুখ দিয়ে পরীক্ষে করুন না কেনে? দুখ দিয়ে পরীক্ষে করার শখ কেনে?

—তাও করেন. বই কি। ওই কঙ্কণার বাবুদিগে দেখুন। সুখ দিয়ে পরীক্ষা করছেন সেখানে।

—তাতে তাদের খারাপটা কি হয়েছে?

—কিন্তু আপনি কি কঙ্কণার বাবুদের মত হতে চান? ওই সব বাবুদের মতন—শয়তান, চরিত্রহীন, পাষণ্ড? দেশের লোকে গাল দিচ্ছে। মরণ তাকিয়ে রয়েছে। যারা মলে দেশের লোকে বলবে—পাপ বিদেয় হল, বাঁচলাম। তিনু-কাকা, মরলে যার জন্যে লোকে কাঁদে না হাসে, তার চেয়ে হতভাগা কেউ আছে! কানা, খোঁড়া—দুনিয়াতে যার কেউ নাই, সে পথে পড়ে মরে, তাকে দেখেও লোকের চোখে জল আসে। আর যাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা, জমিদারী, তেজারতি, লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া, তারা মরে গেলে লোকে বলে—বাঁচলাম। এইবার ভেবে দেখুন মনে।

তিনকড়ি এবার চুপ করিয়া রহিল। দেবুর তীক্ষ্নস্বরের ওই কথাগুলো অন্তরে গিয়া তাহার অভিমান-বিমুখ ভগবৎপ্রীতিকে তিরস্কারে সান্ত্বনার আবেগে অধীর করিয়া তুলিল। কিন্তু আবেগোচ্ছ্বাসে সে অত্যন্ত সংযত মানুষ। স্বর্ণ যেদিন বিধবা হয় সেদিনও তাহার চোখে একফোঁটা জল কেহ দেখে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—তোমার ভাল হবে বাবাজী, তোমার ভাল হবে। ভগবান তোমাকে দয়া করবেন।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

তিনকড়ি বলিল—শোন, তোমার কাছে কি জন্যে এসেছি, শোন।

—বলুন।

—ধানের কথা।

দেবু ম্লান হাসিয়া বলিল—ধানের উপায় তো এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছি না তিনু-কাকা। দু-চারজন নয়, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক।

—কুসুমপুরের মুসলমানেরা ধানের যোগাড় করেছে। ধান নয়, টাকা। টাকা দাদন নিয়ে ধান কিনে নিয়ে এল। আজ মাঠে শেখেদের একখানা হালও আসে নাই।

দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল—জংশনের কলওয়ালারা টাকা দিলে, ধান কিনলে গদীওয়ালাদের কাছে। কলওয়ালারা চাল দিতেও রাজী আছে। তবে তাতে ভানাড়ীর খরচ বাদ যাবে তো; তা ছাড়া তুষ, কুঁড়ো, আর তোমার ধর—কলের চাল কেমন জল-জল, উ আমাদের মুখে রুচবে না। তার চেয়ে টাকাই ভাল।

দেবু বলিল—কুসুমপুরের সব কলে দাদন নিলে?

—হ্যাঁ। দশ-পনেরো, বিশ-পঁচিশ যে যেমন লোক। আজ ক'দিন থেকেই ঠিক করেছে, কাউকে বলে নাই। তা আমি সেদিন ওদের মজলিশে ছিলাম। শুনে এসেছিলাম।

দেবু বলিল—তাই তো? সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—আমিও গিয়েছিলাম বাবাজী, কথাবার্তা বলে এলাম। তুমি বরং চলো কাল-পরশু। আমি বলে এসেছি তোমার নাম। তা বললে—তার দরকার কি? তোমাদের কথা তোমরা নিজেরাই বল। দেবু পণ্ডিত টাকা নেবে না। সে একা লোক—তার ঘরে ধানও আছে।

—আমার সঙ্গে কলওয়ালাদের দেখা হয়েছে তিনু-খুড়ো। আমার কাছে তো লোক পাঠিয়েছিল।

—তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে?

—হয়েছে। আমি রাজী হতে পারি নি।

—কেনে?

—হিসেব করে দেখেছেন, কি দেনা ঘাড়ে চাপছে? আমি হিসেব করে দেখেছি। দেড়া সুদে ধান-'বাড়ি'র চেয়ে ঢের বেশী। দাদনের টাকায় যে ধান কিনবেন, পৌষে ধান বিক্রি করবার সময় ঠিক তার ডবল ধান লাগবে।

—কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি বল?

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি নি তিনু-কাকা।

—কিন্তু ই-দিকে যে পেটের ভাত ফুরিয়ে গেল। মুনিষ-মান্দের—ধান-ধান করে মেরে ফেললে। ভল্লা বেটাদেরই বা রাখি কি করে?

—আজ আপনাকে কিছু বলতে পারলাম না তিনু-কাকা। কাল একবার আমি ন্যায়রত্ন মশায়ের কাছে যাব। তারপর যা হয় বলব।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। জংশন হইতে সে খুব খুশী হইয়াই আসিতেছিল। সে খুশীর পরিমাণটা এত বেশী যে, এই রাত্রেই কথাটা সে দেবুকে জানাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—তবে আজ আমি উঠি।

দেবু নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিনকড়ি দাওয়া হইতে নামিয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আর একটা কথা বাবাজী।

—বলুন।

—আমার মেয়ে স্বন্নর কথা। তুমি দেখেছ তাকে সেদিন ?

—হ্যাঁ। বড় ভাল লাগল আমার, ভারি ভাল মেয়ে।

—পড়া-টড়া একটুকুন ধরেছিলে নাকি ? বলতে-টলতে পারলে ?

দেবু অকপট প্রশংসা করিয়া বলিল—মেয়েটি আপনার খুব বুদ্ধিমতী ; নিজেই যা পড়াশুনো করেছে দেখলাম, তাতেই ইউ-পি পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় বৃত্তি পায়।

তিনু উদাসকণ্ঠে বলিল—আমার অদৃষ্ট বাবা, ওকে নিয়ে যে আমি কি করব, ভেবে পাই না। তা স্বন্ন যদি বিত্তি-পরীক্ষে দেয় ক্ষতি কি ?

—কিসের ক্ষতি ? আমি বলছি তিনু-কাকা, তাতে মেয়ের আপনার ভবিষ্যৎ ভাল হবে।

তিনু তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল।—তা হলে বাবা, মাঝে মাঝে গিয়ে একটুকুন দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

—বেশ, মধ্যে মধ্যে যাব আমি।

তিনু খুশী হইয়া বলিল—ব্যস্—ব্যস্! স্বন্ন তা হলে ফাস্টো হবে—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি।

তিনু চলিয়া গেল। লণ্ঠনটা স্তিমিত করিয়া দিয়া দেবু আবার ভাবিতে বসিল। রাজ্যের লোকের ভাবনা। খাজনা বৃদ্ধির ব্যাপারটা লইয়া দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তিনকড়ি আজ যে পথের কথা বলিল, সে পথে লোকের নিশ্চিত সর্বনাশ! সে চোখের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। এ সর্বনাশের নিমিত্তের ভাগী হইতে হইবে তাহাকে।

পাতু যথানিয়মে সস্ত্রীক শুইতে আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা আসে নাই পণ্ডিত ?

—কই, না।

—আচ্ছা বজ্জাত যাহোক্। সেই সন্ধে বেলায় বেরিয়েছে—

ঘোমটার ভিতর হইতে পাতুর বউ বলিল—রোজগেরে বুন রোজকার করতে গিয়েছে।

পাতু একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বলিল—হারামজাদী, তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি ? ঘোষালের কাণ্ড বুঝি কেউ জানে না—না ?

দেবু বিরক্ত হইয়া ধমক দিল—পাতু!

—পণ্ডিত মশাই ? মৃদুস্বরে কে অদূরস্থ গাছতলাটা হইতে ডাকিল।

—কে ?

—আমি তারাচরণ! মৃদুস্বরেই তারাচরণ উত্তর দিল।

—তারাচরণ ? কি রে ? দেবু উঠিয়া আসিল।

তারাচরণ নাপিতের কথাবার্তার ধরনই এইরূপ। কথাবার্তা তাহার মৃদুস্বরে। যেন

কত গোপন কথা সে বলিতেছে। গোপন কথা শুনিয়া ও বলিয়াই অবশ্য অভ্যাসটা তাহার এইরূপ হইয়াছে। সে নাপিত, প্রত্যেক বাড়ীতেই তাহার অবাধ গতি। এই যাতায়াতের ফলে প্রত্যেক বাড়ীরই কিছু গোপন তথ্য তাহার কানে আসে। সেই তথ্য সে প্রয়োজন মত অন্যের কাছে বলিয়া, মানুষের ঈর্ষাশাণিত কৌতূহল-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া আপনার কার্যোদ্ধার করিয়া লয়। আবার তাহারও গোপন মনের কথা জানিয়া লইয়া অন্যত্র চালান দেয়। এ অঞ্চলটার সকল গোপন তথ্য সর্বাগ্রে জানিতে পারে সে-ই। থানার দারোগা হইতে ছিরু ঘোষ, আবার দেবু ঘোষ হইতে তিনকড়ি মণ্ডল—এমন কি মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও সুখ-দুঃখের বহু গোপন কথা তাহার জানা আছে। তাহাকে সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখে—তারাচরণ হাসে ; সন্দেহের চোখে দেখিয়াও ধূর্ত তারাচরণের কাছে আত্মগোপন তাহারা করিতে পারে না। কিন্তু সারা অঞ্চলটার মধ্যে দুইটি ব্যক্তিকে তারাচরণ শ্রদ্ধা করে —একজন মহাগ্রামের ন্যায়রত্ন মহাশয়, অপরজন পণ্ডিত দেবু ঘোষ।

দেবু কাছে আসিতেই তারাচরণ মৃদুস্বরে বলিল—রাঙাদিদির শেষ অবস্থা। একবার চলুন।

—রাঙাদিদির শেষ অবস্থা! কে বললে ?

—গিয়েছিলাম আজ্ঞে, ঘোষ মশায়ের কাছারিতে। ফিরছি পথে দুর্গার সাথে দেখা হল। বললে—রাঙাদিদির নাকি ভারি অসুখ। আপনাকে একবার যেতে বললে।

রাঙাদিদি নিঃসন্তান, চাষী সদ্গোপদের কন্যা। এখন সে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধা। দেবুদের বয়সীরা তাহাকে রাঙাদিদি বলিয়া ডাকে, সেই বৃদ্ধা মরণাপন্ন। দেবু পাতুকে বলিল—পাতু, তুমি শুয়ে পড়। আমি আসছি।

রাঙাদিদির সঙ্গে তাহার একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল। সে যখন চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা করিত, তখন বৃদ্ধা স্নানের সময় নিয়মিত একগাছি ঝাঁটা হাতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপটি পরিষ্কার করিয়া দিত। এই ছিল তাহার পারলৌকিক পুণ্য-সঞ্চয়ের কর্ম। বৃদ্ধার সঙ্গে তাহার সুখ-দুঃখের কত কথাই হইত। সেটেলমেণ্টের হাঙ্গামার সময় সে যেদিন গ্রেপ্তার হয়, সেদিন বৃদ্ধার ভাবাবেগ তাহার মনে পড়িল। সে জেলে গেলে বিলুর খোঁজখবর সে নিয়মিতভাবে লইয়াছে। নিকটতম আত্মীয়স্বজনের মত গভীর অকপট তাহার মমতা, বিলুর মৃত্যুর পর সমস্ত দিন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার ঘোলা চোখের সেই সজল বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

পিছন হইতে তারাচরণ বলিল। একটুকুন ঘুরে যাওয়াই ভাল পণ্ডিত মশায়।

—কেন ?

—ঘোষের কাছারির সামনে দিয়ে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে।

—গোলমাল ? দেবু বিস্মিত হইয়া গেল। একটা মানুষ মরিতেছে, সেখানে গোলমালের ভয় কিসের ? আত্মীয়স্বজনহীনা বৃদ্ধা মরিতে বসিয়াছে—তাহার আজ কত দুঃখ, সে কাহাকেও রাখিয়া যাইতেছে না। মৃত্যুর পর এ সংসারে কেহ তাহার নাম করিবে না,

তাহার জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলিবে না। আজ তো সারা গাঁয়ের লোকের ভিড় করিয়া তাহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে আসা উচিত ; বুড়ী দেখিয়া যাক, গোটা গ্রামের লোকই তাহার আপনার ছিল। সে বলিল—এর মধ্যে লুকোচুরি কেন তারাচরণ ? গোলমালের ভয় কিসের ?

একটু হাসিয়া তারাচরণ বলিল—আছে পণ্ডিত মশাই। বুড়ীর তো ওয়ারিশ নাই। মলেই শ্রীহরি ঘোষ এসে চেপে বসবে, বলবে—বুড়ী 'ফৌত' হয়েছে ; ফৌত প্রজার বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি সমস্ত কিছুরই মালিক হল জমিদার। আসুন, এই গলি দিয়ে আসুন।

কথাটায় দেবুর খেয়াল হইল। তারাচরণ ঠিক বলিয়াছে, খাঁটি মাটির মানুষ সে, অদ্ভুত তাহার হিসাব, অদ্ভুত তাহার অভিজ্ঞতা। ওয়ারিশহীন ব্যক্তির সম্পত্তি জমিদার পায় বটে। আসলে প্রাপ্য রাজার বা রাজশক্তির ; কিন্তু এদেশে জমিদারকে রাজশক্তি এমনভাবে তাহার অধিকার সমর্পণ করিয়াছে যে হক-হুকুম, অধঃ-ঊর্ধ্ব সবেরই মালিক জমিদার। জমি চাষ করে প্রজা, সেই প্রজার নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ করিয়া দেয় জমিদার। কাজ সে এইটুকু করে। কিন্তু জমির তলায় খনি উঠিলে জমিদার পায়, গাছ জমিদার পায়, নদীর মাছ জমিদার পায়। জমিদার খায়-দায়, ঘুমায়, অনুগ্রহ করিয়া কিছু দানধ্যান করে। কেহ নদীর বন্যা-রোধের জন্য বাঁধ বাঁধিতে খরচ দেয়, সেচের জন্য দীঘি কাটাইয়া দেয় ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দাবী করে, খাজনাবৃদ্ধি তাহার প্রাপ্য হইয়াছে !

যাহার ওয়ারিশ নাই তাহার সম্পত্তির আসল মালিক দেশের লোক। দেশের লোকের সর্কল সাধারণ কাজের ব্যবস্থা করে তাহাদেরই প্রতিনিধি-হিসাবে রাজা বা রাজশক্তি ; সেই কারণে সকল সাধারণ সম্পত্তির মালিক ছিল রাজা। সেইজন্য চণ্ডীমণ্ডপ সাধারণে তৈয়ারী করিয়াও বলিত রাজার চণ্ডীমণ্ডপ, সেইজন্য দেবতার সেবাইত ছিলেন রাজা, সেইজন্য ফৌত প্রজার সম্পত্তি যাইত রাজসরকারে। এসব কথা দেবু ন্যায়রত্ন এবং বিশ্বনাথের কাছে শুনিয়াছে। তাহাদের কপাল ! আজ রাজা জমিদারকে তাঁহার সমস্ত অধিকার দিয়া বসিয়া আছেন। জমিদার দিয়াছে পত্তনিদারকে। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু আজ সে এমন গোপনে যাইবে কোন্ অধিকারে ? সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

তারাচরণ বলিল—পণ্ডিত, আসুন।

গলিটার ও-মাথা হইতে কে বলিল—পরামানিক, পণ্ডিত আসছে ? দুর্গার কণ্ঠস্বর।

তারাচরণ বলিল—দাঁড়ালেন কেন গো ?

—আরও দু-চারজনকে ডাক তারাচরণ।

—ডাকবে পরে। আগে তুমি এস জামাই—দুর্গা আগাইয়া আসিল।

দেবু বলিল—কিন্তু তুই জুটলি কি করে ?

মৃদুস্বরে দুর্গা বলিল—কামার-বউয়ের বাড়ী এসেছিলাম। ক'দিন থেকেই একটুকুন করে জ্বর হচ্ছিল রাঙাদিদির ; কামার-বউ যেত আসত, মাথার গোড়ায় একঘটি জল ঢেকে রেখে আসত। রাঙাদিদিও কামার-বউয়ের অসময়ে অনেক করেছে। আমি দুধ দুয়ে দিতাম

দিদির গরুর, বউ জাল দিয়ে দিয়ে আসত। বাকিটা আমি বেচে দিতাম। আজ দুপুরে গেলাম তো দেখলাম বুড়ীর হুঁশ নাই জ্বরে। কামার-বউ কপালে হাত দিয়ে দেখলে—খুব জ্বর। বিকেলে যদি দুজনায় দেখতে গেলাম তো দেখি দাঁতি লেগে বুড়ী পড়ে আছে। চোখ-মুখে জল দিতে দিতে দাঁতি ছাড়ল, কিন্তু 'বিগার' বকতে লাগল। এখন গল্‌গলিয়ে ঘামছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

দেবু বলিল—ডাক্তারকে ডাকতে হত। তারাচরণ, তুমি যাও, জগনভাইকে ডেকে আন আমার নাম করে।

—না। বাধা দিয়া দুর্গা বলিল—আমরা বলেছিলাম, তা রাঙাদিদি বারণ করলে।

—বারণ করলে? এখন জ্ঞান হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ, খানিক আগে থেকে জ্ঞান হয়েছে। বললে—ডাক্‌তার-কোবরেজে কাজ নাই দুগ্‌গা, তুই আর ছেনালি করিস না। ডাকবি তো দেবাকে ডাক্। তা কামার-বউকে একা ফেলে যেতেও পারি না, লোকও পাই না তোমাকে ডাকতে। শেষে পরামানিককে ডেকে বললাম।

দেবু একটু চিন্তা করিয়া বলিল—না। তারাচরণ, তুমি ডাক্তারকে ডাক একবার।

বুড়ীর শেষ অবস্থাই বটে। হাত-পায়ের গোড়ার দিকটা বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘোলা চোখ দুইটি আরও ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছে। মাথার শিয়রে তাহার মুখের দিকে পদ্ম বসিয়া ছিল; দেবুকে দেখিয়া সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তাহার জীবনেও এই বৃদ্ধা অনেক-খানি স্থান জুড়িয়া ছিল। প্রায়ই খোঁজখবর করিত; গালিগালাজও দিত, আবার নুন, তেল, ডাল—পদ্মর যখন যেটার হঠাৎ অভাব পড়িত, আসিয়া ধার চাহিলেই দিত; শোধ দিলে লইত, কিন্তু বিলম্ব হইলে কখনও কিছু বলিত না। নিজের বাড়ীতে শশা, কলা, লাউ যখন যেটা হইত বুড়ী তাহাকে দিত। বুড়ী যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা করিত—তাহার উপকরণ-গুলি আনিয়া পদ্মের দাওয়ায় রাখিয়া দিয়া বলিত—আমাকে তৈরী করে দিস্। উপকরণগুলি তাহার একার উপযুক্ত নয়; দুই-তিনজনের উপযুক্ত উপকরণ দিত। বৃদ্ধা আজীবন দুধ বেচিয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, ছাগল-গরু পালন করিয়া, বেচিয়া বেশ কিছু সঞ্চয় করিয়াছে। অবস্থা তাহার মোটেই খারাপ নয়। লোকে বলে বুড়ীর টাকা অনেক। হায়দার শেখ পাইকার হিসাব দেয়—আমি রাঙাদির ঠেনে পাঁচ-পাঁচটা বলদবাছুর কিনেছি। পাঁচটাতে তিনশো টাকা দিছি। ছাগল-বক্‌না তো হামেশাই কিনেছি। উয়ার টাকার হিসাব নাই।

দেবু আসিয়া পাশে বসিয়া ডাকিল—রাঙাদিদি!

দুর্গা বলিল—জোরে ডাক, আর শুনতে পাচ্ছে না।

দেবু জোরেই ডাকিল—রাঙাদিদি! রাঙাদিদি!

বুড়ী স্তিমিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিয়া দেবু বলিল—আমি দেবু! বুড়ীর দৃষ্টিতে তবু কোন পরিবর্তন ঘটিল না। দেবু এবার কানের কাছে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া বলিল—আমি দেবা, রাঙাদিদি! দেবা!

এবার বুড়ী ক্ষীণ মৃদুস্বরে থামিয়া-থামিয়া বলিল—দেবা ! দেবু-ভাই !

—হ্যাঁ।

বুড়ী মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি চললাম দাদা।

পরক্ষণেই তাহার পাণ্ডুর ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতে লাগিল, ঘোলাটে চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল ; সে বলিল—আর তোদিকে দেখতে পাব না।…একটু পরে বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—বিলুকে—তোর বিলুকে কি বলব বল্ ; সেখানেই তো যাচ্ছি !

দশ

পদ্ম মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুড়ী রাঙাদিদির জন্য কাঁদিতেছিল। বুড়ী সত্যই তাহাকে ভালবাসিত। পদ্ম অনেকদিন ভাল করিয়া কাঁদিবার কোন হেতু পায় নাই। সংসারে তাহার থাকিবার মধ্যে ছিল অনিরুদ্ধ—সে তাহাকে কবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ; তাহার জন্য কান্না আর আসেও না। যতীন-ছেলে দিন কয়েকের জন্য আসিয়াছিল, সে চলিয়া গেলে কয়েক দিন পদ্ম কাঁদিয়াছিল। তাহাকে মনে পড়িলে এখনও চোখে জল আসে, কিন্তু বেশ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারে না।

বুড়ী শেষরাত্রেই মরিয়াছে। মরিবার আগে জগন ডাক্তার প্রভৃতি পাঁচজনে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দিদি, তোমার শ্রাদ্ধশান্তি আছে। টাকাকড়ি কোথায় রেখেছ বল, আমরা শ্রাদ্ধ করব। আর যাতে যেমন খরচ করতে বলবে তাতেই তেমন করব।

বুড়ী উত্তর দেয় নাই। পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্বেই দেবুকে বুড়ী বলিয়াছিল—তখন সেখানে ছিল কেবল সে ও দুর্গা। বলিয়াছিল—দেবা, ষোল কুড়ি টাকা আমার আছে, এই আমার বিছানা বালিশের তলায় মেজেতে পোঁতা আছে। কোন-মতে আমার ছেরাদ্দটা করিস্, বাকীটা তুই নিস্—আর পাঁচ কুড়ি দিস্ কামারণীকে।

যে কথা বুড়ী তাহাকে একরূপ গোপনে বলিয়াছিল, সেই কথা দেবু ঘোষ ভোরবেলা সকলকে ডাকিয়া একরকম প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিল। শ্রীহরি ঘোষকে পর্যন্ত ডাকিয়া সে বলিয়া দিল—রাঙাদিদি এই বলিয়া গিয়াছে এবং টাকাটার গুপ্তস্থানটা পর্যন্ত দেখাইয়া দিল।

ফলে যাহা হইবার হইয়াছে। জমিদার শ্রীহরি ঘোষ তখন পুলিসে খবর দিয়া ওয়ারিশহীন বিধবার জিনিসপত্র, গরু-বাছুর, টাকাকড়ি সব দখল করিয়া বসিয়াছে। দেবুর কথা কানেই তোলে নাই। দুর্গা অযাচিতভাবে দেবুর কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া সাক্ষ্য দিতে আগাইয়া আসিয়াছিল, জমাদার এবং শ্রীহরি ঘোষ তাহাকে একরূপ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। পুনরায় ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করিয়াছে। সে তিরস্কারের ভাগ পদ্মকেও লইতে হইয়াছে।

জমাদার দুর্গাকে পুনরায় ডাকাইয়া বলিয়াছিল—তুই মুচীর মেয়ে, আর বুড়ী ছিল সদগোপের মেয়ে ; তুই কি রকম তার মরণের সময় এলি ? তোকে ডেকেছিল সে ?

দুর্গা ভয় করিবার মেয়ে নয়, সে বলিয়াছিল—মরণের সময় মানুষ ভগবানকে ডাকতেও ভুলে যায়, তা বুড়ী আমাকে ডাকবে কী? আমি নিজেই এসেছিলাম।

শ্রীহরি পরুষকণ্ঠে বলিয়াছিল—তুই যে টাকার লোভে বুড়ীকে খুন করিস্ নাই, তার ঠিক কি?

দুর্গা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, তারপর হাসিয়া একটি প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—তা বটে, কথাটা তোমার মুখেই সাজে পাল।

জমাদার ধমক দিয়া বলিয়াছিল—কথা বলতে জানিস্ না হারামজাদী? ঘোষ মশায়কে 'পাল' বলছিস, 'তোমার' বলছিস?

দুর্গা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল—লোকটি যে এককালে আমার ভালবাসার নোক ছিল, তখন পাল বলেছি, তুমি বলেছি, মাল খেয়ে তুইও বলেছি। অনেক দিনের অভ্যেস কি ছাড়তে পারি জমাদারবাবু? এতে যদি তোমাদের সাজা দেবার আইন থাকে দাও।

শ্রীহরির মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। জমাদারও আর ইহা লইয়া ঘাঁটাইতে সাহস করে নাই। কয়েক মূহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—সদ্‌গোপের মেয়ের মৃত্যুকালে তার জাত-জ্ঞাত কেউ এল না, তুই এলি আর ওই কামার-বউ এল, ওর মানে কি? কেন এসেছিলি বল্?

পদ্মর বুকটা এবার ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়াছিল।

দুর্গাকে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই জমাদার বলিয়াছিল—কামার-বউকে জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দাও না গো।

সমবেত সমস্ত লোক এই অপ্রত্যাশিত সন্দেহে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। উত্তর দিয়াছিল দেবু পণ্ডিত; সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এবার সামনে আসিয়া বলিল—মশায়, পথের ধারে মানুষ পড়ে মরছে, সে হয়তো মুসলমান—কোন হিন্দু দেখে যদি তার মুখে জল দেয়, কি কোন মুমূর্ষু হিন্দুর মুখেই কোন মুসলমান জল দেয়—তবে কি আপনারা বলবেন—লোকটাকে খুন করেছে? তাকে কি জিজ্ঞাসা করবেন—ওর কোন স্বজাতকে না ডেকে, তুই কেন ওর মুখে জল দিলি?

জমাদার বলিয়াছিল—কিন্তু বুড়ীর টাকা আছে।

—পথের ধারে যারাই মরে তারাই ভিখারী নয়, পথিক হতে পারে, তাদের কাছেও টাকা থাকতে পারে।

—সেক্ষেত্রে আমরা সন্দেহ করব বই কি, বিশেষ টাকা যদি না পাওয়া যায়!

—টাকার কথা তো আমি বলেছি আপনাদের।

—আরও টাকা ছিল না তার মানে কি?

—ছিল তারই বা মানে কি?

—আমাদের মনে হয় ছিল। লোকে বলে···বুড়ীর টাকা ছিল হাজার দরুণে।

—পরের ধন আর নিজের আয়ু—এ মানুষ কম দেখে না, বেশীই দেখে। সুতরাং বুড়ীর

টাকা হাজার দরুণেই তারা বলে থাকে।

শ্রীহরি বলিল—বেশ কথা। কিন্তু যখন দেখলে বুড়ীর শেষ অবস্থা, তখন আমাকে ডাকলে না কেন?

—কেন? তোমাকে ডাকব কেন?

—আমাকে ডাকবে কেন! শ্রীহরি আশ্চর্য হইয়া গেল।

জমাদার উত্তর যোগাইয়া দিল—কেননা উনি গ্রামের জমিদার।

—জমিদার খাজনা আদায় করে সরকারের কালেকটারিতে জমা দেয়। মানুষের মরণ-কালেও তাকে ডাকতে হবে, এমন আইন আছে নাকি? না ধর্মরাজ, যমরাজ, ভগবান এদের দরবার থেকেও তাকে কোন সনন্দ দেওয়া আছে? কামার-বউ প্রতিবেশী, দুর্গা কামার-বউয়ের বাড়ী এসেছিল, এসে রাঙাদিদির খোঁজ করতে গিয়ে—

—তাই তো বলছি, জাত-জ্ঞাত কেউ খোঁজ করলে না, শ্রীহরি ঘোষ মশায় জানলেন না, ওরা জানলে—ওরা খোঁজ করলে কেন?

—জাত-জ্ঞাত খোঁজ করলে না কেন, সেকথা জাত-জ্ঞাতকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার ঘোষ মশাই বা জানলেন না কেন, সে কথা বলবেন আপনার ঘোষ। অন্যের জবাবদিহি ওরা কেমন করে করবে? ওরা খোঁজ করেছে সেটা ওদের অপরাধ নয়। আর অপরে খোঁজ কেন করলে না, সে কৈফিয়ৎ দেবার কথা তো ওদের নয়।

—তোমাকে খবর দিলে, ঘোষ মশাইকে খবর দিলে না কেন?

—আইনে এমন কিছু লেখা আছে নাকি যে, ঘোষকে অর্থাৎ জমিদারকেই এমন ক্ষেত্রে খবর দিতেই হবে? ওরা আমাকে খবর দিয়েছিল, আমি ডাক্তার ডেকেছিলাম, মৃত্যুর পর ভূপাল চৌকিদারকে দিয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছি। এর মধ্যে বার বার ঘোষ মশাই আসছে কেন?

জগন ডাক্তার এবার আগাইয়া আসিয়াবলিয়াছিল—আমি রাঙাদিদির শেষ সময়ে দেখেছি। মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু। বৃদ্ধ বয়স—তার ওপর জ্বর। সেই জ্বরে মৃত্যু হয়েছে। আপনাদের সন্দেহ হয় লাস চালান দিন। পোস্ট মর্টেম্ হোক, আপনারা প্রমাণ করুন অস্বাভাবিক মৃত্যু। তারপর এসব হাঙ্গামা করবেন। ফাঁসী, শূল, দ্বীপান্তর যা হয়—বিচারে হবে।

শ্রীহরি বলিয়াছিল—ভাল, তাই হোক। না জমাদার বাবু?

জমাদার এতটা সাহস করে নাই। অনাবশ্যকভাবে এবং যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুটাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া চালান দিয়া থানার কাজ বাড়াইতে গেলে তাহাকেই কৈফিয়ৎ খাইতে হইবে। তবুও সে নিজের জেদ একেবারে ছাড়ে নাই। শ্রীহরিকে বলিয়া জংশনের পাস-করা এম-বি ডাক্তারকে 'কল' পাঠাইয়াছিল এবং হাঙ্গামাটা আরও খানিকক্ষণ জিয়াইয়া রাখিয়াছিল।

জংশনের ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইয়াই বলিয়াছিল—আন্‌ন্যাচারাল ডেথ ভাববার কারণটা কি শুনি?

শ্রীহরি উত্তর দিতে পারে নাই। উত্তর দিয়াছিল জমাদার।—মানে, বুড়ীর টাকা আছে কিনা। দেবু ঘোষ, দুর্গা মুচীনী বলছে—সে টাকার একশো টাকা দিয়ে গেছে কামার-বউকে আর বাকীটা দিয়ে গেছে দেবু ঘোষকে।

ডাক্তার ইহাতেও অস্বাভাবিক কিছুর সন্ধান পায় নাই। সে বলিয়াছিল—বেশ তো!

—বেশ তো নয়, ডাক্তারবাবু। এর মধ্যে একটু লট্‌-খটি ব্যাপার আছে। মানে দেবু ঘোষই আজকাল অনিরুদ্ধের স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করে। তার মধ্যে আছে দুর্গা মুচীনী। এখন বুড়ীর মৃত্যুকালে এল কেবল দুর্গা মুচীনী আর কামার-বউ। তারা এসেই ডাকলে দেবু ঘোষকে। দেবু এল, ডাক্তারকে খবর পাঠালে। বুড়ীর মুখে-মুখে উইল কিন্তু হয়ে গেল ডাক্তার আসবার আগেই। সন্দেহ একটু হয় না কি?

হাসিয়া ডাক্তার বলিয়াছিল—সেটা তো উইলের কথায়। তার সঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে ব্যাপারটাকে অনাবশ্যক—আমার মতে অনাবশ্যক ভাবেই ঘোরালো করে তুলছেন আপনারা।

—অনাবশ্যক বলছেন আপনি?

—বলছি। তা ছাড়া জগনবাবু নিজে ছিলেন উপস্থিত।

—বেশ। তা হলে মৃতদেহের সৎকার করুন। টাকাকড়ি, জিনিসপত্র, গরু-বাছুর আমি থানায় জিম্মা রাখছি। ঘরে যদি দেবু পণ্ডিত আর কামারণীর হক্ পাওনা হয়—বুঝে নেবে আদালত থেকে।

রাঙাদিদির সৎকারে দেবু শ্রীহরিকে হাত দিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল—রাঙাদিদির দেহখানির ভেতরে সোনা-দানা নাই। রাঙাদিদির দেহখানা এখন আর কারও প্রজা নয়, খাতকও নয়। জমিদার হিসাবে তোমাকে সৎকার করতে আমরা দোব না। আর যদি তুমি আমাদের স্বজাত হিসাবে আসতে চাও তবে এস—যেমন আর পাঁচজনে কাঁধ দিচ্ছে তুমিও কাঁধ দাও। মুখে আগুন আমি দোব। সে আমাকে বলে গিয়েছে। তার জন্যে কোন সম্পত্তি বা তার টাকা আমি দাবী করব না।

শ্রীহরি উঠিয়া পড়িয়া বলিয়াছিল—কালু, বস ঐখানে। জমাদারবাবু নমস্কার, আমি এখনই যাই। আপনি সব জিনিসপত্রের লিষ্টি করে যাবেন তা হলে। আর যাবার সময় চা খেয়ে যাবেন কিন্তু।

শ্রীহরির এই চলিয়া যাওয়াটাকে লোকে তাহার পলাইয়া যাওয়াই ধরিয়া লইল। জগন ঘোষ খুশী হইয়াছিল সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু তার চেয়েও খুশী হইয়াছিল পদ্ম নিজে। ওই বর্বর চেহারার লোকটাকে দেখিলেই সে শিহরিয়া উঠে। সেদিনকার সেই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাপের মত চাহিয়া থাকার কথাটা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সে দেবুর প্রতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। লোকে যখন দেবুর প্রশংসা করিতেছিল, তখন সে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ঠোঁট বাঁকাইয়াছিল। জীবনে দেবুর প্রতি বিরাগ তাহার সেই প্রথম। পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কৃতজ্ঞতা করুণার তার সীমা ছিল না, কিন্তু দেবুর সেদিনকার

আচরণে সে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কেন সে সকলের কাছে টাকার কথাটা প্রকাশ করিয়া দিল? দুর্গা বলে—জামাই আমাদের পাথর। পাথরই বটে। পণ্ডিতের টাকার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পদ্মর তো প্রয়োজন ছিল। তাহার স্বামী তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, এককণা খাইবার সংস্থান নাই; তাহাকে যদি দয়া করিয়া একজন টাকা দিয়া গেল তো দেবু ধার্মিক বৈরাগী সাজিয়া তাহাকে সে প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দিল। দেবুর খাইয়া-পরিয়া সে আর কতদিন থাকিবে? কেন থাকিবে? দেবু তাহার কে?

রাঙাদিদি ছিল সেকালে সিধা মানুষ। সে কতদিন পদ্মকে বলিয়াছে—ওলো, দেবাকে একটুকুন ভাল করে যত্ন-আত্যি করিস্। ও বড় অভাগা, ওকে একটু আপনার করে নিস্।

পদ্মর সামনেই দেবুকে বলিয়াছে—দেবা, বিয়ে-থাওয়া না করিস্ তো একটা যত্ন-আত্যির লোক তো চাই ভাই। পদ্মকে তুই তো বাঁচিয়ে রেখেছিস্—তা ওই তোর সেবা-যত্ন করুক। ওকে বরং তুই ঘরেই নিয়ে যা। মিছে কেনে দুটো জায়গায় রান্নাবান্না, আর তুই-ই বা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাস্ কেনে!

দেবু পণ্ডিত, পণ্ডিতের মতই গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল—না দিদি! মিতেনি নিজের ঘরেই থাকবে।

বুড়ী তবু হাল ছাড়ে নাই, পদ্মকে বলিয়াছিল—তুই একটুকুন বেশ ভাল করে যত্ন-আত্যি করবি, বুঝলি?

যত্ন-আত্মীয়তা করিবার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে তাহা করিতে পারে নাই। দেবুই তাহাকে সে সুযোগ দেয় নাই। সে-ই বা কেন দেবুর দয়ার অন্ন এমন করিয়া খাইবে? বুড়ী রাঙাদিদির টাকাটা পাইলে সে এখান হইতে কোথাও চলিয়া যাইত। তাই সে বুড়ীর জন্য এমন করিয়া কাঁদিতেছে।

দুর্গা উঠান হইতে ডাকিল—কামার-বউ কোথা হে!

পদ্ম উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সাড়া দিল—এই যে আছি।

দুর্গা কাছে আসিয়া বলিল—কাঁদছিলে বুঝি? তাহলে শুনেছ নাকি?

পদ্ম সবিস্ময়ে বলিল—কি? হঠাৎ এমন কি ঘটিল যাহা শুনিয়া সে আরও খানিকটা কাঁদিতে পারে? অনিরুদ্ধের কি কোন সংবাদ আসিয়াছে? যতীন-ছেলের কি কোন দুঃসংবাদের চিঠি আসিয়াছে দেবু পণ্ডিতের কাছে? উচ্চিংড়ে কি জংশন শহরে রেলে কাটা পড়িয়াছে?

দুর্গার মুখ উত্তেজনায় থম্ থম্ করিতেছে।

—কি দুর্গা? কি?

—তোমাকে আর দেবু পণ্ডিতকে পতিত করছে ছিরু পাল! দুর্গা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল। উত্তেজনায় রাগে ঘৃণায় সে শ্রীহরিকে সেই পুরানো ছিরু পাল বলিয়াই উল্লেখ করিল।

—পতিত করবে? আমাকে আর পণ্ডিতকে?

—হ্যাঁ। পণ্ডিত আর তোমাকে। হাসিয়া দুর্গা বলিল—তা তোমার ভাগ্যি ভাল ভাই, তবে আমিও বাদ যাব না।

একদৃষ্টে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া পদ্ম প্রশ্ন করিল—তাই বলছে? কে বলছে!

—ঘোষ মশায়—ছিরে পাল গো, যে এককালে মুচীর মেয়ের এঁটো মদ খেয়েছে, মুচীর মেয়ের ঘরে রাত কাটিয়েছে, মুচীর মেয়ের পায়ে ধরেছে। রাঙাদিদির ছেরাদ্দ হবে, সেই ছেরাদ্দে পঞ্চগেরামী জাত-জ্ঞাত আসবে, বামুন-পণ্ডিত আসবে, সেইখানে তোমাদের বিচার হবে। পতিত হবে তোমরা।

মৃদু হাসিয়া পদ্ম বলিল—আর তুই?

—আমি! দুর্গা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।—আমি! দুর্গার সে হাসি আর থামে না। দুই দিকে পাড় ভাঙিয়া বর্ষার নদী খল্-খল্ করিয়া অবিরাম যে হাসি হাসে সেই হাসির উচ্ছ্বাস। তাহার মধ্যে যত তাচ্ছিল্য তত কৌতুক ফেনাইয়া উঠিতেছে। খানিকক্ষণ হাসিয়া সে বলিল—আমি সেদিন সভার মাঝে একখানা ঢাক কাঁধে নিয়ে বাজাব আর নাচব, আমার যত নষ্ট কীর্তি সব বলব। সতীশ দাদাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে লোব। বামুন, কায়েত, জমিদার, মহাজন সবারই নাম ধরে বলব। ছিরু পালের গুণের কথা হবে আমার গানের ধুয়ো।

দুর্গা যেন সত্য সত্যই নাচিতেছে। পদ্মরও এমনই করিয়া নাচিতে ইচ্ছা হয়। সে বলিল—আমাকেও সঙ্গে নিস্ ভাই, আমি কাঁসি বাজাব তোর ঢাকের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পর দুর্গা বলিল—যাই ভাই, একবার জামাই পণ্ডিতকে বলে আসি। বলিয়া সে তেমনিভাবে প্রায় নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত শুনিয়া কি বলিবে! পদ্মর বড় কৌতূহল হইল—সঙ্গে সঙ্গে সে অপরিমেয় কৌতুকও বোধ করিল। যাক্, আজ দেখা হইল না, নাই-বা হইল। দেখিতে তো সে পাইবে, পঞ্চগ্রামের সমাজপতিগণের সম্মুখে যেদিন বিচার হইবে সেদিন সে দেখিবে। কি বলিবে দেবু পণ্ডিত, কি করিবে সে? তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করিবে, লম্বা ওই মানুষটি আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছে মনে হইবে। কিন্তু পাঁচখানা গাঁয়ের জাত-জ্ঞাতি, নবশাখার মাতব্বরবর্গ তাহাকে কি বাগ মানিবে? পদ্ম জোর করিয়া বলিতে পারে—মানিবে না। এ চাকলার লোকে শ্রীহরি ঘোষের চেয়ে পণ্ডিতকে বহুগুণে বেশী ভালবাসে, এ কথা খুব সত্য; তবু তাহারা দেবুর কথা সত্য বলিয়া মানিবে না; লোককে চিনিতে তো তাহার বাকি নাই! প্রতিটি মানুষ তাহার দিকে যখন চাহিয়া দেখে, তখন তাহাদের চোখের চাহনি যে কি কথা বলে সে তা জানে। তাহারা এমন একটি অনাত্মীয়া যুবতী মেয়েকে অকারণে ভরণ-পোষণ করিবার মত রসালো কথা শুনিয়া, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে-নাতে পাইয়াও বিশ্বাস করিবে না—এমন কখনও হয়? আকাশ হইতে দেবতারাও যদি ডাকিয়া বলেন কথাটা মিথ্যা, তবু তাহারা মিথ্যাই বিশ্বাস করিবে। তাহার উপর শ্রীহরি ঘোষ করিবে লুচি-মণ্ডার

বন্দোবস্ত। বিশেষ করিয়া পাকামাথা বুড়াগুলি ঘন ঘন ঘাড় নাড়িবে আর বলিবে—"উঁহু, বাপু হে, শাক দিয়া মাছ ঢাকা যায় না!" তখন পণ্ডিত কি করিবে? তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে! কে জানে? পণ্ডিতের সম্বন্ধে ও কথাটা ভাবিতে তাহার কষ্ট হইল।

পণ্ডিত তাহাকে পরিত্যাগ না করুক, সে এইবার পণ্ডিতের সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিবে। তাহার সহিত কোন সংস্রব সে রাখিবে না। ওই পঞ্চায়েতের সামনেই সে-কথা সে মুখের ঘোমটা খুলিয়া দুর্গার মত ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিবে—পণ্ডিত ভালমানুষ গো, তোমরা যেমন সে তেমন নয়। তার চোখের উপর চাউনিতে কেরোসিনের ডিবের শীর্ষের মত কালি পড়ে না। আমাকে নিয়েও তোমরা ঘোঁট পাকিয়ো না। আমি চলে যাব; যাব নয় যাচ্ছি—এ গাঁ থেকে চলে যাচ্ছি। কারুর দয়ার ভাত আমি আর খাব না। তোমাদের পঞ্চায়েতকে আমি মানি না, মানি না, মানি না।

কেন সে মানিবে? কিসের জন্য মানিবে? ঘোষ যখন চুরি করিয়া তাহাদের জমির ধান কাটিয়া লইয়াছিল, তখন পঞ্চায়েৎ তাহার কি করিয়াছে? ঘোষের অত্যাচারে তাহার স্বামী সর্বস্বান্ত হইয়া গেল, তাহার কি করিয়াছে পঞ্চায়েৎ? তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, কে তাহার খোঁজ করিয়াছে? সে খাইতে পায় নাই, পঞ্চায়েৎ কয় মুঠা অন্ন তাহাকে দিয়াছে? তাহাকে রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছে? তাহারা তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া আনুক তবে বুঝি। তাহাদের যে সব সম্পত্তি শ্রীহরি ঘোষ লইয়াছে সেগুলি ফিরাইয়া দিক, তবেই পঞ্চায়েৎকে মানিবে। নতুবা কেন মানিতে যাইবে?

দেবু পণ্ডিত পাথর। দুর্গা বলে সে পাথর। নহিলে সে আপনাকে তাহার পায়ে বিকাইয়া দিত। তাহাকে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে, এই বর্ষা-কালের রাত্রির জোনাকি-পোকা-ভরা গাছের মত জল্‌-জল্‌ করিয়া জলিয়া উঠে, কিন্তু পর-ক্ষণেই নিভিয়া যায়। আজ সে সব ঝরিয়া যাক, ঝরিয়া যাক। দেবুর ভাত সে আর খাইবে না। সে আবার মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

দুর্গা আসিয়া দেখিল পণ্ডিত নাই। দরজায় তালা বন্ধ। বাহিরের তক্তাপোশের উপর একটা কুকুর শুইয়া আছে। রোঁয়া-ওঠা একটা ঘেয়ো কুকুর। পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া ওইখানেই বসিবে, বেশী ক্লান্ত হইয়া আসিলে হয়তো ওইখানেই শুইয়া পড়িবে। তাহার বিলু-দিদির সাধের ঘর। একটা ঢেলা লইয়া কুকুরটাকে সে তাড়াইয়া দিল। সেই রাখাল ছোঁড়া খামারের মধ্যে একা মনের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া একেবারে সপ্তম সুরে গান ধরিয়া দিয়াছে—

"কেঁদো নাকো পান-পেয়সী গো,
তোমার লাগি আনব ফাঁদি নৎ।"

মরণ আর কি ছোঁড়ার! কতই বা বয়স হইবে? পনরো পার হইয়া হয়তো ষোলোয়

পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাণ-প্রেয়সীর কান্না থামাইবার জন্ম ফাঁদি নং কিনিবার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে! দুর্গা ছোঁড়াকে কয়েকটা শক্ত কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে খামারবাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়া তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছে আর খস্ খস্ করিয়া আঁটিখড় কাটিতেছে। দুর্গার পায়ের শব্দ তাহার কানেই ঢুকিল না। দুর্গা হাসিয়া ডাকিল—ওরে ওই! ও পান-পেয়সী!

ছোঁড়া মুখ ফিরাইয়া দুর্গাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। গান বন্ধ করিয়া আপন মনেই খুক্ খুক্ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তোর কাছে এলাম ফাঁদি নতের জন্যে। দিবি আমাকে?

ছোঁড়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিল—ধেৎ!

—কেনে রে? আমাকে সাঙা কর্ না কেনে! শুধু ফাঁদি নং দিলেই হবে।

ছোঁড়া আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

দুর্গা বলিল—মরণ তোমার! গলা টিপলে দুধ বেরোয়, একবার গানের ছিরি দেখ!

ছোঁড়া এবার ভ্রূ নাচাইয়া বলিল—মরণ লয়! এইবার সাঙা করব আমি!

—কাকে রে?

—হুঁ! দেখ্‌বা এই আশ্বিন মাসেই দেখ্‌বা!

—ভোজ দিবি তো?

—মুনিবকে টাকার লেগে বলেছি।

—মুনিব গেল কোথা তোর?

ছোঁড়া এবার সাহসী হইয়া ন্যাকামির সুরে জিজ্ঞাসা করিল—একবার দেখে পরানটো জুড়োতে আইছিলি বুঝি?

দেবুর প্রতি দুর্গার অনুরাগের কথা গোপন কিছু নয়, সে মুখে বলে না, কিন্তু কাজে-কর্মে ব্যবহারে তাহার অনুরাগের এতটুকু সঙ্কোচ নাই—দ্বিধা নাই, সেটা সকলের চোখেই পড়ে। তাহার উপর দুর্গার মা কন্যার এই অনুরাগের কথা লইয়া আক্ষেপের সহিত পাড়াময় প্রচার করিয়া ফেরে। এই অযথা অনুরাগের জন্যই তাহার হতভাগী মেয়ে যে হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতেছে, এ দুঃখ সে রাখিবে কোথায়? কঙ্কণার বাবুদের বাগানের মালীগুলো এতদিন আসা-যাওয়া করিয়া এইবার হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, আর আসে না। কন্যার উপার্জনে তাহার অবশ্য কিছু স্বার্থ নাই, তাহার একমুঠা করিয়া ভাত হইলেই দিন যায় তবু তাহার দেখিয়া সুখ হইত। তাই তাহার এত আক্ষেপ! দুর্গার মায়ের সেই আক্ষেপ-পীড়িত কাহিনী ছোঁড়াটাও শুনিয়াছে। দুর্গার রসিকতার উত্তরে সে এইবার কথাটা বলিয়া শোধ লইল।

দুর্গা কিন্তু রাগ করিল না—উপভোগ করিল। হাসিয়া বলিল—ওরে মুখপোড়া! দাঁড়া, পণ্ডিত আসুক ফিরে, এলেই আমি বলে দোব তুই এই কথা বলেছিস।

এবার ছোঁড়ার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—মুনিব নাই। মুনিব গিয়েছে কুসুমপুর, সেঁথা থেকে যাবে কঙ্কণা।

—ফিরবে তো ?

ছোঁড়া বলিল—কঙ্কণা থেকে হয়ত জংশন যাবে। হয়ত সদরে যাবে। আজ-কাল হয়ত ফিরবে না। পরশুও ফিরবে কিনা কে জানে !

দুর্গা সবিস্ময়ে বলিল—জংশনে যাবে, সদরে যাবে, পরশুও হয়ত ফিরবে না—কেন রে ? কি হয়েছে ?

দুর্গাকে চিন্তিত দেখিয়া ছোঁড়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এইবার দুর্গা সে কথাটা ছাড়িয়াছে। সে খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—মুনিবের কারণ মুনিবকেই ভাল। কে জানে বাপু! হেথা ঝগড়া হল লোকে লোকে, ছুটল মুনিব। হোথা দাঙ্গা হল রামায় শামায়, মুনিব আমার ছুটল। কুসুমপুরে শ্যাখেদের সাথে কঙ্কনার বাবুদের দাঙ্গা হয়েছে না কি হয়েছে—মুনিব গেল ছুটতে ছুটতে।

—কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে কুসুমপুরের সেখদের দাঙ্গা হয়েছে ? কোন্ বাবু ? কোন্ সেখদের ? কিসের দাঙ্গা রে ?

—কঙ্কণার বড়বাবুদের সাথে আর রহম সেখ—সেই যি সেই গাঁট্টা-গাঁট্টা চেহারা, এ্যাই চাপদাড়ী—শ্যাখজী, তারই সাথে।

—দাঙ্গা কিসের শুনি ?

—কে জানে বাপু ! শ্যাখ বাবুদের তালগাছ কেটে নিয়েছে, না কি কেটে নিয়েছে, বাবুরা তাই শ্যাখকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, থাম্বার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। শ্যাখেরা সব দল বেঁধে গেঁইছে কঙ্কণা। দেখুড়ের তিনকড়ি পাল—বানের আগু হাদি সেই আইছিল ; মুনিবও চাদরটা ঘাড়ে ফেলে ছুটল।

—জংশন যাবে, সদর যাবে, তোকে কে বললে ?

—দেখুড়ের সেই পাল বললে যি ! বললে—কঙ্কণার থানায় নেকাতে হবে সব। তারপরে সদরে গিয়ে নালিশ করতে হবে।

বহুক্ষণ দুর্গা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বাড়ী আসিয়া ডাকিল—বউ !

পাতুর বউ বাহির হইয়া আসিল।

—দাদা কোন্ মাঠে খাটতে গিয়েছে ?

—অমর-কুড়োর মাঠে।

দুর্গা অমর-কুণ্ডার মাঠের দিকে চলিল। মাঠে গিয়া পাতুকে বলিল—তুই একবার দেখে আয় দাদা। ধান পোঁতার কাজ আমি করতে পারব।

পাতু সতীশের মজুর খাটিতেছিল, সে কোন আপত্তি করিল না। দুর্গা আপনার পরনের ফর্সা কাপড়খানা বেশ আঁট করিয়া কোমরে জড়াইয়া ধান পুঁতিতে লাগিয়া গেল। মেয়েরাও ধান পোঁতে, লঘু ক্ষিপ্র হাতে তাহারা পুরুষদের সঙ্গে সমানেই কাজ করিয়া যায়। দুর্গাও এককালে করিয়াছে, অল্প বয়সে সে তাহার দাদার জমিতে ধান পুঁতিত। এখন অবশ্য অনেকদিনের অনভ্যাস। প্রথম কয়েকটা গুচ্ছ কাদায় পুঁতিতে খানিকটা আড়ষ্টতা বোধ

করিলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাবটা কাটিয়া গেল। জমিভরা জলে তাহার রেশমী চুড়ি-পরা হাত ডুবাইয়া জলের ও চুড়ির বেশ একটা মিঠা শব্দ তুলিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সারবন্দী ধানের গুচ্ছ পুঁতিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

সে একা নয়, মাঠে অনেক মেয়ে ধান-চারা পুঁতিতেছে। কোলের ছেলেগুলিকে মাঠের প্রশস্ত আলের উপর শোয়াইয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘলা আকাশ হইতে ফিনফিনে ধারায় বৃষ্টি ঝরিতেছে। ছেলেগুলির উপর আচ্ছাদন দিয়া তালপাতার ছাতা ভিজা মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছে। অপরিমেয় আনন্দের সহিত নিরবসর কাজ করিয়া চলিয়াছে কৃষক-দম্পতি। স্বামী করিতেছে হাল, স্ত্রী পুঁতিতেছে ধানের গুচ্ছ; প্রচণ্ড বিক্রমে স্বামী ভারী কোদাল চালাইয়া চলিয়াছে, স্ত্রী পায়ের চাপে টিপিয়া বাঁধিতেছে আল। বৃষ্টির জলে সর্বাঙ্গ ভিজিয়াছে, কাদায় ভরিয়া গিয়াছে সর্ব-দেহ। মধ্যে মধ্যে রোদ উঠিয়া গায়ের জল-কাদা শুকাইয়া দরদরধারে ঘাম বহাইয়া দিতেছে, শ্রাবণ-শেষের পূবালী বাতাসে মাথার চুলের গুচ্ছ উড়িতেছে। পুরুষদের কণ্ঠে মেঠো দীর্ঘ সুরের গান দূর-দূরান্তে গিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

মেয়েরা ধান পুঁতিতে পুঁতিতে এক পা করিয়া পিছাইয়া আসিতেছে—একতালে পা পড়িতেছে, হাতগুলিও উঠিতেছে নামিতেছে একসঙ্গে, একসঙ্গেই বাজিতেছে রূপা-দস্তার কাঁকন ও চুড়ি। পুরুষেরা ক্লান্ত হইয়া গান বন্ধ করিলে তাহারা ধরিতেছে সেই গানেরই পরের কলি, অথবা ওই গানের উত্তরে কোন গান। পঞ্চগ্রামের সুবিস্তীর্ণ মাঠে শত শত চাষী এবং শ্রমিক চাষীর মেয়ে—বিশেষভাবে সাঁওতাল মেয়েরা চাষ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মিশিয়া দুর্গা ধান পুঁতিতে পুঁতিতে মধ্যে মধ্যে চাহিতেছিল কঙ্কণার পথের দিকে।

এগার

সমগ্র অঞ্চলটা একদিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উত্তেজনায় চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া উঠিল। সামান্য চাষী প্রজারও যে মান-মর্যাদার অনেকখানি দাবি আছে, দেশের শাসনতন্ত্রের কাছে জমিদার ধনী মহাজন এবং তাহার মান-মর্যাদার কোন তফাত নাই—এই কথাটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাহারা না বুঝিলেও আভাসে অনুভব করিল। ব্যাপারটা ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে কুসুমপুরের পাঠশালার মৌলভী ইরসাদ এবং দেবু।

রহম তিনকড়িকে সেদিন একটা তালগাছ বিক্রয়ের কথা বলিয়াছিল। আসন্ন ঈদলফেতর পর্ব এবং শ্রাবণ-ভাদ্রের অনটনে বিব্রত হইয়া যখন সে ধান বা টাকা ঋণের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরিতেছিল, তখনই সে শুনিয়াছিল জংশন শহরে কলিকাতার কলওয়ালার কলে নূতন শেড্ তৈয়ারী হওয়ার কথা। শেডের জন্য ভাল পাকা তালগাছের প্রয়োজন—এ খবর সে তাহাদের গ্রামের করাতীদের কাছে শুনিয়াছিল। করাতী আবু শেখ বলিয়াছিল—বড় ভাই, সোনা-ডাঙ্গালের মাঠে আউশের ক্ষ্যাতের মাথার গাছটারে দাও না কেনে বেচ্যা। মিলের মালিক দাম দিচ্ছে এক্কারে চরম। কুড়ি টাকা তো মিলবেই ভাই!

গরু-ছাগলের পাইকার ব্যবসায়ীরা যেমন কোথায় কাহার ভাল পশু আছে খোঁজ রাখে, কাঠ-চেরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত এই করাতীরাও তেমনি কোথায় কাহার ভাল গাছ আছে খোঁজ রাখে। অভ্যাসও বটে এবং প্রয়োজনও আছে। কাহারও নূতন ঘর-দুয়ার তৈয়ারী হইতেছে সন্ধান পাইলেই সেখানে গিয়া হাজির হয়। ঘরের কাঠ চিরিবার কাজ ঠিকা করিয়া লয়; গাছের অভাব পড়িলে তাহারাই সন্ধান বলিয়া দেয় কোথায় তাহার প্রয়োজনমত ঠিক গাছটি পাওয়া যাইবে। কলওয়ালার শেডটা প্রকাণ্ড বড়, তার চালকাঠামোর জন্য তালগাছ চাই—সাধারণ গাছ অপেক্ষা অনেক লম্বা গাছ, শুধু লম্বা হইলেই হইবে না—সোজা গাছ চাই এবং আগাগোড়া পাকা অর্থাৎ সারসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। লোহার 'টি' এবং 'এ্যাঙ্গেলের' কাজ চালাইতে হইবে—এই কাঠগুলিকে। লোহা এবং কাঠের দাম হিসাব করিয়া কলওয়ালা দেখিয়াছে—ওখানে গাছ যে দরে কেনা-বেচা হয়, তাহা অপেক্ষা তিনগুণ দাম দিলেও তাহার খরচ অর্ধেক কমিয়া যাইবে। সে চলতি দর অপেক্ষা দ্বিগুণ দাম ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। যে গাছটির দিকে আবুর দৃষ্টি পড়িয়াছিল—এখানকার দরে সে গাছটির দাম পনরো টাকার বেশী হয় না; তাই সে কুড়ি টাকা বলিয়াছিল।

অন্য সময় কেহ এ প্রস্তাব করিলে রহম তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকাইয়া দিত—প্যাটে কি আমার আগুন লেগেছে না নক্ষী ছেড়েছে যে ঐ গাছটা বেচতি যাব? ভাগ্, ভাগ্ বুলছি, শয়তান কুথাকার!

গাছটা তাহাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তাহার দাদু গাছটা লাগাইয়া গিয়াছিল। কোথায় কোন্ মেহমান অর্থাৎ কুটুম্ব বাড়ী গিয়া সেখান হইতে একটা প্রকাণ্ড বড় পাকা তাল আনিয়াছিল। তালটার মাড়ি অর্থাৎ ঘন রস যেমন মিষ্ট তেমনি সুগন্ধ। সাধারণ তালের তিনটি আঁটি, এ তালটার আঁটি ছিল চারিটি। সোনা-ডাঙ্গালের উঁচু ডাঙ্গায় তখন সে সদ্য মাটি কাটিয়া জমি তৈয়ারী করিয়াছে। সেই জমির আলে সে ওই চারিটি আঁটিই পুঁতিয়া দিয়াছিল। গাছ হইয়াছিল একটা। আজ তিনপুরুষ ধরিয়া গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়াছে। সার তাহার আগাগোড়া। তা ছাড়া খোলা সমতল মাঠের উপর জন্মিবার সুযোগ পাইয়া গাছটা একেবারে সোজা তীরের মত উপর দিকে উঠিয়াছিল। এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকিয়াছিল; এই সময় পনেরো টাকার স্থলে কুড়ি টাকা দামও প্রলুব্ধ করিবার মত; আবুর কথায় তাই প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়াই ছিল। আরও একটা কথা তাহার মনে হইয়াছিল।—আবু যখন কুড়ি বলিয়াছে, তখন সে নিশ্চয় কিছু হাতে রাখিয়াছে। তাই সে সেদিন নিজেই গিয়াছিল কলওয়ালার কাছে। কলওয়ালাও পূর্বেই গাছটির সন্ধান করিয়াছিল। সে এক কথাতেই নিজের হিসাব মত বলিয়াছিল—যদি গাছ বেচ আমি ত্রিশ টাকা দাম দিব।

—তিরিশ টাকা? রহম অবাক হইয়া গিয়াছিল।

—রাজী হও যদি টাকা নিয়ে যাও। দরদস্তর আমি করি না। এর পর আর কোন কথা আমি বলব না।

রহম আর রাজী না হইয়া পারে নাই। চাষের সময় চলিয়া যাইতেছে, ঘরে ধান-চাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। মুনিষ-জনকে ধান দিতে হয়, তাহারা খোরাকী ধানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ধান না পাইলেই বা কি খাইয়া চাষে খাটিবে? তাহার উপর রমজানের মাস; রোজা উদ্‌যাপনের দিন দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে; তাহার ছেলেমেয়েরা ও স্ত্রী-দুইটি কত আশা করিয়া রহিয়াছে—কাপড়-জামা পাইবে। এ সময় রাজী না হইয়া তাহার উপায় কি? এক উপায় জমিদারের কাছে মাথা হেঁট করিয়া বুদ্ধি দেওয়া; কিন্তু সে তাহা কোন-মতেই পারিবে না। 'বাৎ' যখন দিয়াছে তখন জাতের হলফ করিয়াছে; সে বাৎ খেলাপী হইলে তাহার ইমান্ কোথায় থাকিবে? রমজানের পবিত্র মাস, সে রোজা রক্ষা করিয়া যাইতেছে, আজ ইমান্-ভঙ্গের গুণাহ্ করিতে পারিবে না।

এইখানেই কলওয়ালার সঙ্গে তাহার দাদনের কথাও হইয়াছিল। মিলের গুদামঘরে ও বাহিরের উঠানে রাশি রাশি ধান দেখিয়া রহম আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, বলিয়াছিল—আমাদের কিছু ধান 'বাড়ি', মানে দাদন ছ্যান কেনে? পৌষ মাঘ মাসে লিবেন। সুদ সমেত পাবেন।

কলওয়ালা তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—ধান না, টাকা দাদন দিতে পারি।

—টাকা নিয়ে কি করব গো বাবু? আমাদের ধান চাই। আমরা বুঝি ধান।

—ধানেই টাকা, টাকাতেই ধান। টাকার দাদন নিয়ে ধান কিনে নেবে।

—তা আপনার কাছেই কিনব তো—

—না। আমি ধান বেচি না। চাল বেচি। তাও দু'মণ চার মণ দশ মণ না। দুশো-চারশো মণের কম হলে বেচি না। তোমরা টাকা নিয়ে এখানকার গদিওয়ালার কাছে কিনে নাও।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া রহম বলিয়াছিল—সুদ কত নেবেন টাকায়?

—সুদ নেব না; পৌষ-মাঘ মাসে—কিস্তির মুখে টাকার পরিমাণে ধান দিতে হবে। যে দর থাকবে, দরে টাকায় এক আনা কম দরে দিতে হবে। আর একটি শর্ত আছে।

—বলেন কি শর্ত?

—তোমরা যারা দাদন নেবে, তারা অন্য কাউকে ধান বেচতে পারবে না। এর অবিশ্যি লেখাপড়া নাই, কিন্তু কথা দিতে হবে। তোমরা মুসলমান—ইমানের উপর কথা দিতে হবে।

রহম সেদিন বলিয়াছিল—আজ্ঞা আমরা শলা-পরামর্শ কর‍্যা বলব।

—বেশ। মিলওয়ালা মনে মনে হাসিয়াছিল। তালগাছের টাকাটা আজই নিয়ে যেতে পার।

—আজ্ঞা, পরশু আসব। সব ঠিক কর‍্যা যাব।

মজলিশে টাকা দাদন লওয়া স্থির হইয়াছিল, রহম তালগাছ বিক্রি করিতে মনস্থ করিয়া-

ছিল। তাহার দুই স্ত্রীই কিন্তু গাছের শোকে চোখের জল ফেলিয়াছিল—এমন মিঠা তাল! তিন পুরুষের গাছ। কত লোকে তাহাদের বাড়ীতে তাল চাহিতে আসে। ভাদ্র মাসে তাল পাকিয়া আপনি খসিয়া পড়ে, ভোররাত্রি হইতে নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা তাল কুড়াইয়া লইয়া যায়। খসিয়া পড়া তালে এ অঞ্চলে কাহারও স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই। তাই রহম তালগুলিতে পাক ধরিলে খসিয়া পড়িবার পূর্বেই কাটিয়া ঘরে আনে। দুঃখ তাহারও যথেষ্ট হইতেছিল; কিন্তু তবুও উপায় কি? সেদিন গিয়া সে গাছ বিক্রি করিয়া টাকা লইয়া আসিল; এবং টাকা দাদন লওয়ারও পাকা কথা দিয়া আসিল।

একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেইটাই আসল কথা। ওই গাছটার স্বামিত্বের কথা। তিন পুরুষের মধ্যে স্বামিত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে—কথাটা তাহার মনেও হয় নাই। তাহার পিতামহ জমিদারের কাছে ডাঙ্গা বন্দোবস্ত লইয়া নিজ হাতে জমি কাটিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুয্যেবাবুকে। মুখুয্যেবাবুরা মস্ত মহাজন—লক্ষপতি লোক। এমনি ধারার ঋণের টাকায় এ অঞ্চলের বহু জমির স্বামিত্ব তাহাদিগকে অর্শিয়াছে। হাজার হাজার বিঘা জমি তাহাদের কবলে। এত জমি কাহারও নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করানো অসম্ভব। আর তাহারা চাষীও নয়; আসলে তাহারা মহাজন জমিদার। তাই সকল জমিই তাহাদের চাষীদের কাছে ভাগে বিলি করা আছে। তাহারা চাষ করে; ফসল উঠিলে বাবুদের লোক আসে। দেখিয়া শুনিয়া প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া যায়। রহমের বাপ জমি বিক্রি করিবার পর বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে, রহমও চষিতেছে। কোন দিন একবারের জন্য তাহাদের মনে হয় নাই যে জমিটা তাহাদের নয়। খাজনার পরিবর্তে ধানের ভাগ দেয় এই পর্যন্ত। সেই মতই সে জমিগুলির তদ্বির-তদারক করিতেছে। মজুর নিযুক্ত করিয়া, উন্নতিসাধনের প্রয়োজন হইলে সে-ই করিয়াছে; বাবুদের নিকট হইতে সেই বাবদ টাকা চাহিবার কথা কোন দিন মনে উঠে নাই। মুখে বরাবর দশের কাছে বলিয়া আসিয়াছে—আমার বাপুতি জমি। মনে মনে জানিয়া আসিয়াছে—আমার জমি। ওই জমির ধান কাটিয়াই নবান্ন পর্ব করিয়াছে। তাই তালগাছটা যখন সে বেচিল, তখন তাহার একবারের জন্যও মনে হইল না সে অন্যের গাছ বেচিতেছে, একটা অন্যায় কাজ করিতেছে।

গাছটা কাটিয়া মিলওয়ালা তুলিয়া লইয়া যাইবার পর, হঠাৎ আজ সকালে রহমের বাড়ীতে ভোরবেলায় একজন চাপরাসী আসিয়া হাজির হইল। বাবুর তলব, এখনি চল তুমি।

রহম বলদ-গরু দুইটিকে খাইতে দিয়া তাহাদের খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল—উ বেলায় যাব, বলিয়ো বাবুকে হে।

—উঁহু! এখুনি যেতে হবে।

রহম মাতব্বর চাষী, গোঁয়ার লোক—সে চটিয়া গেল; বলিল—এখুনি যেতে হবে মানে? আমি কি তুর বাবুর খরিদ-করা বান্দা—গোলাম?

লোকটা রহমের হাত চাপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী দুর্ধর্ষ রহম তাহার গালে কষাইয়া দিল প্রচণ্ড একটা চড়—আস্পর্ধা বটে, আমার গায়ে হাত দিস্!

লোকটা জমিদারের চাপরাসী। ইন্দ্রের ঐরাবতের মতই তাহার দম্ভ, তেমনি হেলিয়া দুলিয়াই চলা-ফেরা করে। তাহাকে এ অঞ্চলে কেহ এমনি করিয়া চড় মারিতে পারে এ তাহার ধারণার অতীত ছিল। চড় খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গেলেও—সামলাইয়া উঠিয়া সে একটা হুঙ্কার ছাড়িল। রহম সঙ্গে সঙ্গে কষাইয়া দিল অন্য গালে আর একটা চড়; এবং দাওয়ার উপর হইতে লাঠি লইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

এবার চাপরাসীটার হুঁশ হইল। কোন কিছু না বলিয়া সে ফিরিয়া গিয়া জমিদারের পায়ে গড়াইয়া পড়িল। রহমের চপেটচিহ্নাঙ্কিত বেচারার স্ফীত ব্যথিত গাল দুইটা চোখের জলে ভাসিয়া গেল—আর আপনার চাকরি করতে পারব না হুজুর। মাপ করুন আমায়।

ব্যাপার শুনিয়া বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে গেল পাঁচ-পাঁচজন লাঠিয়াল। রহমকে চাষের ক্ষেত হইতে তাহারা উঠাইয়া লইয়া গেল। সম্রাট আলমগীর যেমন আপনার শক্তি ও ঐশ্বর্যের চরম প্রদর্শনীর মধ্যে বসিয়া 'পার্বত্য মূষিক' শিবাজীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন—বাবুও ঠিক তেমনি ভাবে রহমের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহার খাস বৈঠকখানার বারান্দায় রহমকে হাজির করা হইল। সেখানে পাইক-চাপরাসী-পেশ্‌কার-গোমস্তা গিস্‌গিস্ করিতেছিল; বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়া ফরসী টানিতে-ছিলেন।

রহম সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বাবু কথাও বলিলেন না।

সে ক্ষুব্ধ হইয়া একটা বসিবার কিছু খুঁজিতেছিল, কিন্তু খানকয়েক চেয়ার ছাড়া আর কোন আসনই ছিল না। শুধু মাটির উপর বসিতেও তাহার মন চাহিতেছিল না। তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান চাষী যাহাদের জমি-জেরাত আছে, তাদের সবারই এ আত্মাভিমানটুকু আছে। কতক্ষণ মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? তাহা ছাড়া তাহাকে কেহ একটা সম্ভাষণ পর্যন্ত করিল না। চারিদিকের এ নীরব উপেক্ষা ও বাবুর এই একমনে তাম্রকূট সেবন যে তাহাকে শুধু অপমান করিবার জন্যই—ইহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না।

সে এবার বেশ দৃঢ়স্বরেই বলিল—সালাম! নিজের অস্তিত্বটা সে সংক্ষেপে জানাইয়া দিল।

রহমান বলিল—আমাদের চাষের সময়, ইটা আমাদের বস্যা থাকবার সময় লয় বাবু। কি বলছেন বলেন?

বাবু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—আমার চাপরাসীকে চড় মেরেছ তুমি?

—উ আমার হাতে ধরেছিল কেনে? আমার ইজ্জৎ নাই! চাপরাসী আমার গায়ে হাত দিবার কে?

ঘাড় ফিরাইয়া বক্রহাস্যে বাবু বলিলেন—এইখানে যত চাপরাসী আছে, সবাই যদি

তোমাকে ছুটো করে চড় মারে, কি করতে পার তুমি ?

রহম রাগে কথা বলিতে পারিল না। দুর্বোধ্য ভাষায় একটা শব্দ করিয়া উঠিল।

একটা চাপরাসী ধাঁ করিয়া তাহার মাথায় একটা চড় কষাইয়া দিয়া বলিল—চুপ বেয়াদপ !

রহম হাত তুলিয়াছিল ; কিন্তু তিন-চারজন একসঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চুপ ! বস্—ওইখানে বস্ !

তাহারা পাঁচজনে মিলিয়া চাপ দিয়া তাহাকে মাটির উপর বসাইয়া দিল। সে এবার বুঝিল তাহার শক্তি যতই থাক, এতজনের কাছে তাহা নিষ্ফল—মূল্যহীন। ক্ষুব্ধ রোষে চাপরাসীর দিকে সে একবার চাহিল। পনরোজন চাপরাসী ; তাহার মধ্যে দশজন তাহার স্বধর্মী স্বজাতি মুসলমান। রমজানের মাসে সে রোজা করিয়া উপবাসী আছে ; তবু তাহাকে অপমান করিতে তাহাদের বাধিল না। রমজানের ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে ইহাদের সঙ্গেই আলিঙ্গন করিতে হইবে। মাটির দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবু ঘোষের রাখালটা দুর্গাকে তিনকড়ির প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—'বানের আগু হাদি' ; অর্থাৎ বন্যার অগ্রগামী জলস্রোতের মাথায় নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাওয়া বস্তুসমূহ। 'হাদি' বলিতে প্রায়ই জঞ্জাল বুঝায়। তিনকড়ি জঞ্জাল কিনা জানি না—তবে সর্বত্র সর্বাগ্রে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু তাহাকে কেহ ভাসাইয়া লইয়া যায় না, সে-ই অন্যকে ভাসাইয়া লয়। বন্যার অগ্রগামী জলস্রোত বলিলেই বোধ হয় তিনকড়িকে ঠিক বলা হয়। মুখে মুখে সংবাদটা সর্বত্র ছড়াইয়াছে। কুসুমপুরের আরও কয়েকজন মুসলমান চাষী রহমের জমির কাছাকাছি চাষ করিতেছিল। তাহারা ব্যাপারটা দেখিয়াও কিন্তু হাল ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। তিনকড়ি ছিল অপেক্ষাকৃত দূরে। সে ব্যাপারটা দূর হইতে দেখিয়া ঠিক ঠাওর করিতে পারে নাই। কয়েকজন লোক আসিল, রহম-ভাই হাল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু লোকগুলির মাথার লাল পাগড়ি তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। সে তৎক্ষণাৎ কৃষাণটার হাতে হালখানা দিয়া আগাইয়া আসিল। সমস্ত শুনিয়া সে ছুটিয়া গেল কুসুমপুর। ইরসাদকে সমস্ত জানাইয়া বলিল—দেখ, খোঁজ কর।

ইরসাদ চিন্তিত হইয়া বলিল—তাই তো !

ভাবিয়া চিন্তিয়া ইরসাদ একজন লোক পাঠাইয়া দিল। লোকটা আসিয়া প্রকৃত সংবাদ দিতেই ইরসাদ যেন ক্ষেপিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ গ্রামের চাষীদের খবর পাঠাইল। তাহারা আসিবামাত্র ইরসাদ বলিল—যাবে তুমরা আমার সাথে ? ছিনায়ে নিয়ে আসব রহম-ভাইকে !

পঞ্চাশ-ষাটজন চাষী সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া উঠিল।

মুসলমানদের সাহস জিনিসটা অনেকাংশে সম্প্রদায়গত সাধনায়ত্ত জিনিস। তাহার উপর অজ্ঞতা অসামর্থ্য দারিদ্র্য-নিপীড়িত জীবনের বিক্ষোভ, যাহা শাসনে-পেষণে লুপ্ত হয় না

—সুপ্ত হইয়া থাকে অন্তরে অন্তরে, সেই বিক্ষোভ তাহাদিগকে স্বতঃই সম্মিলিত করে একই সমবেদনার ক্ষেত্রে। ইহাদের সদ্যজাগ্রত বিক্ষোভ কিছুদিন হইতে জমিদারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের মুক্তিপথে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল—আগ্নেয়গিরির গহ্বরমুখ-মুক্ত অগ্নিধূমের মত।

তাহারা দল বাঁধিয়া চলিল, রহমকে তাহারা ছিনাইয়া আনিবে। তাহাদের স্বজাতি, স্বধর্মী—তাহাদের পাঁচজনের একজন, তাহাদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহাদের রহম ভাই। তাহারা ইরসাদকে অনুসরণ করিল। তিনকড়ি সেই মুহূর্তে ছুটিল শিবকালীপুরের দিকে। এ সময় দেবুকে চাই। সে সত্য সত্যই জোর কদমে ছুটিল।

এইভাবে দল বাঁধিয়া তাহারা ইহার পূর্বেও জমিদার-কাছারিতে কতবার আসিয়াছে। ক্ষেত্রও অনেকটা একই ভাবের। জমিদারের কাছারিতে জমিদার কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তির মুক্তির জন্য গ্রামসুদ্ধ লোক আসিয়া হাজির হইয়াছে। সবিনয় নিবেদন—অর্থাৎ বহুত সেলাম জানাইয়া দণ্ডিতের কসুর গাফিলতি স্বীকার করিয়া হুজুরের দরবারে মাপ করিবার আরজ পেশ করিয়াছে। আজ কিন্তু তাহারা অন্য মূর্তিতে ভিন্ন মনোভাব লইয়া হাজির হইয়াছে।

জমিদারের কাছারি-প্রাঙ্গণে দলটি প্রবেশ করিল। তাহাদের সর্বাগ্রে ইরসাদ। বারান্দায় জমিদার চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—নিঃশব্দে নিজের চেহারাখানা দেখাইয়া দিলেন। তিনি জানেন তাঁহাকে দেখিলে এ অঞ্চলের লোকেরা ভয়ে শুম্ভিত হইয়া পড়ে। চাপরাসীরা বেশ দম্ভ সহকারে যেন সাজিয়া দাঁড়াইল—যাহার পাগড়ি খোলা ছিল সে পাগড়িটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া মাথায় পরিল।

দলটি মুহূর্তে বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

জমিদার গম্ভীরস্বরে হাঁকিয়া বলিলেন—কে? কোথাকার লোক তোমরা? কি চাই? প্রত্যাশা করিলেন—মুহূর্তে দলটির মধ্যে সম্মুখে আসিবার জন্য ঠেলাঠেলি বাধিয়া যাইবে, সকলেই আপন-আপন সেলাম তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে চাহিবে; একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক নত হইবে—মাটিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাদের কথা তাঁহার দাওয়ার উপর আসিয়া উঠিবে সসম্ভ্রমে—সালাম হুজুর।

দলটি তখন স্তব্ধ। অল্প খানিকটা স্তিমিত ভাবের চাঞ্চল্যও যেন পরিলক্ষিত হইল।

জমিদার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাঁকিলেন—কি চাই সেরেস্তায় গিয়ে বল।

ইরসাদ এবার সোজা উপরে উঠিয়া গেল; নিতান্ত ছোট একটি সেলাম করিয়া বলিল—সালাম! দরকার আপনার কাছেই।

—একসঙ্গে অনেক আর্জি বোধ হয়? এখন আমার সময় নাই। দরকার থাকলে—

এবার কথার মাঝখানেই প্রতিবাদ করিয়া ইরসাদ বলিল—রহম চাচাকে এমন করে চাপরাসী পাঠিয়ে ধরে এনেছেন কেন? তাকে বসিয়ে রেখেছেন কেন?

জমিদার এবং রহম এবার একসঙ্গে ক্ষুব্ধ রোষে গর্জন করিয়া উঠিল।

জমিদার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—চাপরাসী! কিষণ সিং! জোবেদ আলি!

রহম উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার মাথায় চড় মারছে; আমার

ঘাড়ে ধরে বস্ করিয়ে দিছে! আমার ইজ্জতের মাথার পরে পয়জার মারছে!

চাপরাসী কিষণ সিং হাঁকিয়া উঠিল—এ্যাও রহম আলি, বইঠ্ রহো।

জোবেদ আগাইয়া আসিল খানিকটা, অন্য চাপরাসীরা আপন-আপন লাঠি তুলিয়া লইল।

ইরসাদও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—খবরদার!

তাহার পিছনের সমগ্র জনতাও এবার চীৎকার করিয়া উঠিল—নানা কথায়; কোন একটা কথা স্পষ্ট বোঝা গেল না, নানা শব্দ-সমন্বিত বিপুল ধ্বনি শুধু জ্ঞাপন করিল এক সবল প্রতিবাদ।

পরের মুহূর্তটি আশ্চর্য রকমের একটি স্তব্ধ মুহূর্ত। দুই পক্ষই দুই পক্ষের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথম কথা বলিলেন জমিদার। তিনি প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রজার দল, দরিদ্র মানুষগুলো এমন হইল কেমন করিয়া? পরমুহূর্তে মনে হইল—কুকুরও কখনও কখনও পাগল হয়। ওটা উহাদের মৃত্যু-ব্যাধি হইলেও ওই ব্যাধি-বিষের সংক্রমণ এখন উহাদের দন্তে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহাদের দাঁত অঙ্গে বিদ্ধ হইলে মালিককেও মরিতে হইবে। তিনি সাবধান হইবার জন্যই বলিলেন—কিষণ সিং, বন্দুক নিকালো!

তারপর জনতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমরা দাঙ্গা করতে চাইলে বাধ্য হয়ে আমি বন্দুক চালাবো।

একটা 'মার মার' শব্দ সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ধ্বনিটা উঠিবার প্রারম্ভ-মুহূর্তেই পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—না ভাই সব, দাঙ্গা করতে আমরা আসি নাই। আমরা আমাদের রহম চাচাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। এস রহম চাচা, উঠে এস।

সকলে দেখিল নীচের সমবেত জনতার পাশ দিয়া আসিয়া জনতাকে অতিক্রম করিয়া দেবু ঘোষ প্রথম সিঁড়িতে উঠিতেছে। সমস্ত জনতা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—উঠে এস! উঠে এস! চাচা! বড়-ভাই! রহম-ভাই এস উঠে এস!

সমস্ত চাপরাসীরা জমিদারের মুখের দিকে চাহিল। এমন ক্ষেত্রে তাহারা তাঁহার মুখ হইতে প্রচণ্ড একটা ধমক বা তাহাদের প্রতি একটা জোরালো বেপরোয়া হুকুমজারির প্রত্যাশা করিল। কিন্তু বাবু শুধু বলিলেন—রহম আমার তালগাছ বিক্রি করেছে চুরি করে, আমি তাকে থানায় দেব।

দেবু বলিল—থানায় আপনি খবর দিন, ধরে নিয়ে যেতে হয় দারোগা এসে ধরে নিয়ে যাবে। থানায় খবর না দিয়ে আপনার চাপরাসী দিয়ে গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা আপনার নাই। আপনার কাছারিটা গভর্নমেন্টের থানাও নয়, হাজতও নয়। উঠে এস চাচা! এস! এস!

রহম দাঁড়াইয়াই ছিল। দেবু তাহার হাত ধরিয়া বারান্দা হইতে নামিতে আরম্ভ করিল।

ইরসাদ তাহার সঙ্গ ধরিল। দেবু জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—চল ভাই, বাড়ী চল সব।

বন্য কুকুর ও মৃগ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু গণ্ডার, বাঘ বা সিংহ থাকে না। ওটা জীবধর্ম। শক্তি যেখানে অসমান আধিক্যে একস্থানে জমা হয়, সেখানে নির্ভয়ে একক থাকিবার প্রবৃত্তি তাহার স্বাভাবিক। আদিম মানুষের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠজনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই দুর্বল মানুষেরা জোট বাঁধিয়া তাহাকে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিল। পরে আবার শক্তিশালীকেই দলপতি করিয়া সম্মানের বিনিময়ে তাহার স্কন্ধে দলের সকলের প্রতি কর্তব্যের বোঝা চাপাইয়া দিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু তবুও দলের মধ্যে শক্তিশালীদের প্রতি ঈর্ষা চিরকাল প্রচ্ছন্ন ছিল এবং আছে। ধনশক্তি আবিষ্কারের পর ধনপতিদের কাছে শৌর্যশালী মানুষ হার মানিয়াছে। ধনপতিদের ইঙ্গিতেই আজ এক দেশের শৌর্যশক্তি অপর দেশের শৌর্যশক্তির সহিত লড়াই করে, বন্ধুত্ব করে। কিন্তু একই দেশের ছোট-বড় ধনপতিদের পরস্পরের মধ্যেও সেই ঈর্ষা পুরাতন নিয়মে বিদ্যমান। একের ধ্বংসে তাহাদের অন্যেরা আনন্দ পায়। বর্তমান ক্ষেত্রে সেইরূপ ঈর্ষান্বিত এক ব্যক্তির প্রতিনিধি আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কঙ্কণারই একজন মধ্যবিত্ত জমিদারের নায়েব আসিয়া দেবু এবং ইরসাদকে ডাকিল। লোকটা পথে তাহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল—আমাদের বাবু পাঠালেন আমাকে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—কেন, কেন?

বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। ছি ছি! এই কি মানুষের কাজ! পয়সা হলে কি এমনি করে মানুষের মাথায় পা দিয়ে চলে!

ইরসাদ বলিল—বাবুকে আমাদের সালাম দিয়ো।

—বাবু বলে দিলেন, থানায় ডায়রি করতে যেন ভুল না হয়। নইলে এর পর তোমাদেরই ফ্যাসাদে ফেলবে। এই পথে তোমরা থানায় চলে যাও।

ইরসাদ দেবুর মুখের দিকে চাহিল। দেবুর মনে পড়িল যতীনবাবু রাজবন্দীর কথা। আরও একবার গাছ কাটার হাঙ্গামার সময় যতীনবাবু থানায় ডায়রি করিতে বলিয়াছিল; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, কমিশনার সাহেবকে দুখানা টেলিগ্রাম করে দাও। এইভাবে ডায়রি করো—চাপরাসীরা গলায় গামছা বেঁধে টেনে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে, কাছারিতে মারপিঠ করেছে, থামে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তোমরা গেলে বন্দুকের গুলি ছুঁড়েছে, ভাগ্যক্রমে কাউকে লাগে নাই।

দেবু অবাক হইয়া নায়েবটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই নায়েবের মনিব ক্ষুদে জমিদারটির সঙ্গেও তাহাদের করবৃদ্ধির কিছু কিছু বিরোধ আছে। বৃদ্ধির ব্যাপার লইয়া ইনিও মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে দল পাকাইয়াছেন, আবার সেই লোকই গোপনে গোপনে মুখুয্যেদের শত্রুতা করিতেছে তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়া!

ইরসাদ এবং অন্য সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; ইরসাদ বলিল—নায়েব মশায় মন্দ বলেন নাই দেবু-ভাই।

নায়েব বলিল—আমি চললাম। কে কোথায় দেখবে! হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা আছে তো। তবে যা বললাম—তাই করো যেন। সে চলিয়া গেল।

ইরসাদ বলিল—দেবু-ভাই! তুমি কিছু বলছ নাই যে?

দেবু শুধু বলিল—নায়েব যা বললে, তাই কি করতে চাও ইরসাদ-ভাই?

রহম বলিল—হ্যাঁ, বাপজান। নায়েব ঠিক বুলেছে।

—ডায়রি করতে আমার অমত নাই। কিন্তু গলায় গামছা দেওয়া, দড়ি দিয়ে থামে বাঁধা, গুলি ছোঁড়া—এই সব লিখাবে নাকি?

—হাঁ, কেসটা জোর হবে তাতে।

—কিন্তু এ যে মিথ্যে কথা রহম-চাচা!

রহম ও ইরসাদ অবাক হইয়া গেল। রহম মামলা-মকদ্দমায় অভ্যস্ত লোক, ইরসাদ নিজে মামলা না করিলেও দৌলত হাজীর সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীর মকদ্দমায় সলা-পরামর্শ দেয়, তদ্বির-তদারক করে। পুরাপুরি সত্য কথা বলিয়া যে দুনিয়ায় মামলা-মকদ্দমা হয় না—এ তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ নিছক বাস্তব জ্ঞান। রহম বলিল—দেবু-চাচা আমাদের ছেল্যা মানুষই থেকে গেল হে!

দেবু বলিল—তাহলে তোমরাই যা হয় করে এস চাচা। ইরসাদ-ভাইও যাচ্ছে। আমি এই পথে বাড়ী যাই।

—বাড়ী যাবা?

—হ্যাঁ। অন্য সময় আমি রইলাম তোমাদের সঙ্গে। এ কাজটা তোমরাই করে এসো।

ইরসাদ-রহম মনে মনে খানিকটা চটিয়া গেল, বলিল—বেশ। তা যাও।

কয়েকদিন পর। টেলিগ্রাম এবং ডায়রি দু-ই করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজনটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজা-ধর্মঘটের আয়োজনটা এই আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে অভাবনীয় রকমে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ইহাতে খাজনা-বৃদ্ধির হিসাবনিকাশের আঙ্কিক ক্ষতিবৃদ্ধি একেবারেই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে প্রজাদের কাছে। ইহা অকস্মাৎ তাহাদের জীবনের ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত চিন্তা ও কর্মকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। লাভ-লোকসানের হিসাবনিকাশের অতিরিক্ত একটা বস্তু আছে—সেটার নাম জেদ। এই জেদটা তাহাদের আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দলগত স্বার্থ ও নীতির খাতিরে।

এই উত্তেজিত জীবন-প্রবাহের মধ্য হইতে দেবু যেন অকস্মাৎ নিষ্প্রবাহের একপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। সে আপনার দাওয়ায় তক্তাপোশখানির উপর বসিয়া সেই কথাই

ভাবিতেছিল। দুর্গা তাহাকে পঞ্চায়েতের কথাটা বলিয়া গিয়াছে। সে প্রথমটা উদাসভাবে হাসিয়াছিল। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যেই তাহাকে এবং পদ্মকে লইয়া নানা আলোচনা গ্রামের মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নানা জনের নানা কথার আভাস তাহার কানে পৌছিতেছে।

আজ আবার তিনকড়ি আসিয়া বলিয়া গেল—লোকে কি বলছে জান, দেবু-বাবা ?

লোকে যাহা বলিতেছে দেবু তাহা জানে। সে নীরবে একটু হাসিল।

তিনকড়ি উত্তেজিত হইয়া বলিল—হেসো না বাবা! তোমার সবতাতেই হাসি! ও আমার ভাল লাগে না।

দেবু তবুও হাসিয়া বলিল—লোকে বললে তার প্রতিবিধান আমি কি করব বলুন ?

কি প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, সে কথা তিনকড়ি জানে না। কিন্তু সে অধীর ভাবেই বলিল—লোকের নরকেও ঠাঁই হবে না। সে কথা আমি কুসুমপুরওয়ালাদের বলে এলাম।

—কুসুমপুরওয়ালারাও এই কথা আলোচনা করছে নাকি ?

—তারাই তো করছে। বলছে—দেবু ঘোষ মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে তলায় তলায় 'ষড়্' করছে। নইলে ডায়রি করতে তার করতে সঙ্গে গেল না কেন ?

শুনিয়া দেবুর সর্বাঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল—আরও বলছে দেবু ঘোষ যখন কাছারিতে ওঠে, তখুনি বাবু ইশারায় দেবুকে চোখ টিপে দিয়েছিল। তাতেই দেবু মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে।

দেবু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে ; কোন উত্তর দিল না, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

বার

সংবাদটা আরও বিশদভাবে পাওয়া গেল তারাচরণ নাপিতের কাছে। পাঁচখানা গ্রামেই তাহার যজমান আছে। নিয়মিত যায় আসে। সে বিবৃতির শেষে মাথা চুলকাইয়া বলিল—কি আর বলব বলুন, পণ্ডিত!

দেবু চুপ করিয়া ভাবিতেছিল—মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা।

তারাচরণ আবার বলিল—কলিকালে কারুর ভাল করতে নাই! তারাচরণ এসব বিষয়ে নির্বিকার ব্যক্তি, পরনিন্দা শুনিয়া শুনিয়া তাহার মনে প্রায় ঘাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু দেবনাথের প্রসঙ্গে এই ধারার ঘটনায় সে ব্যথা অনুভব না করিয়া পারে নাই।

দেবু বলিল—এর মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ী গিয়েছিলে ?

—গিয়েছিলাম ; ঠাকুর মশাইও শুনেছেন।

—শুনেছেন ?

—হ্যাঁ। ঘোষ একদিন ঠাকুর মশায়ের কাছেও গিয়েছিল কিনা।

—কে ? শ্রীহরি ?

—হ্যাঁ। ঘোষ খুব উঠে-পড়ে লেগেছে। কাল দেখবেন একবার কাণ্ডখানা।

—কাণ্ড?

—পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে কঙ্কণা-কুসুমপুরের কথা বাদ দেন। বাদবাকী গাঁয়ের মাতব্বর মোড়লদের কাণ্ডকারখানা দেখবেন। ঘোষ কাল ধানের মরাই খুলবে!

—শ্রীহরি ধান দেবে তা হলে?

—হ্যাঁ। যারা এই পঞ্চগেরামী মজলিশের কথায়, ঘোষের কথায় সায় দিয়েছে, তাদিকে ঘোষ ধান দেবে। অবশ্যি অনেক লোক রাজী হয় নাই, তবে মাতব্বরেরা সবাই ঢলেছে। মোড়লদের মধ্যে কেবল দেখুড়ের তিনকড়ি পাল বলেছে—আমি ওসবের মধ্যে নেই।

দেবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আজ তাহার মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নানা উন্মত্ত ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। মনে হয় দেখুড়িয়ার ওই দুর্দান্ত ভল্লাদের নেতা হইয়া এ অঞ্চলের মাতব্বরগুলোকে ধ্বংস করিয়া দেয়। সর্বাগ্রে ওই শ্রীহরিকে। তাহার সর্বস্ব লুঠতরাজ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া তাহার ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দেয়।

তারাচরণ বলিল—চাষের সময় এই ধানের অভাব না হলে কিন্তু ব্যাপারটা এমন হত না, ধর্মঘট করে মাতব্বরেরাই ক্ষেপেছিল। আপনাকে ওরাই টেনে নামালে। কিন্তু ধান বন্ধ হতেই মনে মনে সব হায়-হায় করছিল। এখন ঘোষ নিজে থেকে যেই মজলিশ করে আপনাকে পতিত করবার কথা নিয়ে মোড়লদের বাড়ী গেল, মোড়লরা দেখলে—এই ফাঁক, সব একেবারে ঢলে পড়ল। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া? স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেবু প্রশ্ন করিল।

—তা ছাড়া—তারাচরণ আবার একটু থামিয়া বলিল—একালের লোকজনকে তো জানেন গো, স্বভাব-চরিত্র কটা লোকের ভাল বলুন? কামার-বউয়ের, দুর্গার কথা শুনে লোকে সব রসস্থ হয়ে উঠেছে।

—হুঁ। এ সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মশায় কি বলেছেন জান? শ্রীহরি গিয়েছিল বললে যে?

হাত দুইটি যুক্ত করিয়া তারাচরণ প্রণাম জানাইয়া বলিল—ঠাকুর মশায়? সে হাসিল, হাসিয়া বলিল—ঠাকুর মশায় বলেছেন, আহা—বেশ কথাটি বলেছেন গো! পণ্ডিত লোকের কথা তো! আমি মুখস্থ করেছিলাম, দাঁড়ান মনে করি।

একটু ভাবিয়া সে হতাশভাবে বলিল—নাঃ, আর মনে নাই। হ্যাঁ, তবে বলছেন—আমাকে ছাড়ান দাও। তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ, তুমিই তো মস্ত পণ্ডিত হে! যা হয় কঙ্কণার বাবুদের নিয়ে করগে।

ন্যায়রত্ন শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন—আমার কাল গত হয়েছে ঘোষ। আমি তোমাদের বাতিল বিধাতা। আমার বিধি তোমাদের চলবে না। আর বিধি-বিধানও আমি দিই না। তারপরও হাসিয়া বলিয়াছেন—কঙ্কণার বাবুদের কাছে যাও তাঁরাই তোমাদের মহামহোপাধ্যায়; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ—নিজেই তো একজন উপাধ্যায় হে!

দেবু সান্ত্বনায় যেন জুড়াইয়া গেল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের উন্মত্ততাকে সে শাসন করিল।—ছি ছি! সে এ কি কল্পনা করিতেছে?

তারাচরণ বলিল—কঙ্কণার বাবুদের কথা উঠল তাই বলছি, কুসুমপুরের সেখদের ব্যাপারে আপনাকে নিয়ে কথাটা কে রটিয়েছে জানেন? ওই বাবুরাই!

—বাবুরা? কি রটিয়েছে?

—হ্যাঁ। বাবুদের নায়েব নিজে বলেছে ইরসাদকে। বলেছে, দেবু ঘোষ কাছারিতে উঠেই বাবুকে চোখ টিপে ইশেরা করেছিল যে, হাঙ্গামা বেশী বাড়বে না—আমি ঠিক করে দিচ্ছি। তা নইলে বাবু রহমকে ছেড়ে দিতেন না। বাবুও বুঝে দেবুকে ইশেরা করে এক হাত দেখিয়ে দিয়েছেন—আচ্ছা, মিটিয়ে দাও; তা হলে পাঁচশো টাকা দোব।

দেবু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। বাবুদের নায়েব এই কথা বলিয়াছে!

দেবু অবাক হইয়া গেলেও কথাটা সত্য। মুখুয্যেবাবুর মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি সত্যই বিরল। মুসলমানেরা যখন দল বাঁধিয়া আসিয়াছিল তখন তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন, একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ভয় পান নাই। বরং তিনি এমন ক্ষেত্রে তাহাই চাহিয়াছিলেন; তাহা হইলে মরিলে মরিত কয়েকজন দারোয়ান চাপরাসী এবং জনকয়েক মুসলমান চাষী; তিনি সর্বপশ্চাতে আগ্নেয়াস্ত্রের আড়ালে অক্ষত থাকিতেন। তারপর মামলা-পর্বে—তাঁহার বাড়ী চড়াও করিয়া লুঠতরাজ এবং দাঙ্গার অভিযোগে এই চাষীকুলকে তিনি নিষ্পেষিত করিয়া দিতেন। কিন্তু দেবু আসিয়া ব্যাপারটা অন্য রকম করিয়া দিল। দেবুর জীবনের কাহিনীও তিনি শুনিয়াছেন, সে কাহিনী দেবুকে এমন একটা মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব দিয়াছে, যাহার সম্মুখে তাঁহার মত ব্যক্তিকেও সঙ্কুচিত হইতে হয়। কারণ দেবু জীবনে যাহা পারিয়াছে, তিনি পারেন নাই। দেবু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, জনতাকে শান্ত রাখিয়া নিমেষে রহমকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত অপরাধ এখন তাঁহার ঘাড়ে।

ঠিক এই সময় তাঁহার কানে আসিল—কঙ্কণার অপর কোন বাবুর নায়েব যে পরামর্শ দিয়াছে সেই কথা; আরও শুনিলেন দেবু মিথ্যা ডায়রি করিতে এবং তার পাঠাইতে চায় না বলিয়া থানায় যায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ইশারায় একটা কথা খেলিয়া গেল। মনুষ্য-প্রকৃতি তিনি ভাল করিয়াই জানেন। দেবুর কথা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু পাঁচশো টাকার লোভ ইহাদের অন্য কেহ সংবরণ করিতে পারে না, ইহা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। তখন অপবাদটা রটাইয়া তাহার জনপ্রিয়তাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলে কেমন হয়? তিনি তাঁহার নায়েবকেও তৎক্ষণাৎ পাল্টা একটা ডায়রি করিতে থানায় পাঠাইলেন এবং মিথ্যা কথাটা ইরসাদ-রহমের কানে তুলিতে বলিয়া দিলেন। উত্তেজনায় অধীর জনতা সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বিশ্বাস করিয়া লইল। রহম-ইরসাদের প্রথমটা দ্বিধা হইলেও কথাটা তাহারা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিল না।

হাফ-হাতা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া দেবু সেই আসন্ন দ্বিপ্রহর মাথায় করিয়াই বাহির হইয়া

পড়িল। তারাচরণ অনুমান করিল পণ্ডিত কোথায় যাইবে, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল—এই দুপুরে কোথায় যাবেন গো ?

—ঠাকুর মশাইকে একবার প্রণাম করে আসি তারু-ভাই। নইলে মনের আগুন আমার নিভবে না। দেবু রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

তারাচরণ আপনার ছাতাটা তাহার হাতে দিয়া বলিল—ছাতা নিয়ে যান। বেজায় কড়া রোদ।

কথা না বলিয়া দেবু ছাতাটা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া পথ। শ্রাবণ সদ্য শেষ হইয়াছে। ভাদ্রের প্রথম। চাষের ধান পোঁতার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বিশেষ করিয়া যাহারা সচ্ছল অবস্থার লোক, তাহাদের রোয়ার কাজ কয়দিন আগেই শেষ হইয়াছে। ধান ধান করিয়া তাহাদের কাজ বন্ধ হয় নাই, তাহার উপর প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ মজুর লাগাইয়াছে। যাহাদের জমির ধান ইহারই মধ্যে উঠিয়াছে, তাহাদের ক্ষেতে চলিতেছে নিড়ানের কাজ। বিস্তীর্ণ মাঠে ধানের সবুজ রঙে গাঢ়তার আমেজ আসিয়াছে। দেবু কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া আজ চলিল।

একটা অতি বিস্ময়কর ঘটনাও আজ তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিল না। এত বড় মাঠে চাষ এখনও অনেক লোকে করিতেছে ; পূর্বে মাঠের প্রতিটি জন তাহার সহিত দু-একটা কথা বলিয়া তবে তাহাকে যাইতে দিত। দূরের ক্ষেতের লোক ডাকিয়া তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া কাছে আসিয়া সম্ভাষণ করিত। আজ কিন্তু অতি অল্প লোকই তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিল। আজ কথা বলিল—সতীশ বাউড়ী, দেখুড়িয়ার জনকয়েক ভল্লা আর দুই-একজন মাত্র। তাহাদের জ্ঞাতি-গোত্রীয়দের সকলে দেবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া নিবিষ্টমনে চাষেই ব্যস্ত হইয়া রহিল। তিনকড়ি আজ এ মাঠে নাই।

দেবুর সেদিকে খেয়ালই হইল না। প্রথমটা দুরন্ত ক্রোধে মনের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আদিমযুগের ভয়াবহতা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সান্ত্বনা-বাণীর আভাস পাইয়া তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিযোগ শীতলবায়ু-প্রবাহ-স্পৃষ্ট কালবৈশাখীর মেঘের মত ঝর ঝর ধারায় গলিয়া গিয়াছে। সে-মুহূর্তে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল ; তারাচরণের সম্মুখে সে বহুকষ্টে চোখের জল সংবরণ করিয়াছে। পথেও সে আজ চলিয়াছিল এক নিবিষ্ট চিত্তে, আত্মহারার মত। হাতের ছাতাটাও খুলিয়া মাথায় দিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ··

ন্যায়রত্ন মহাশয় পূজার্চনা সবে শেষ করিয়া গৃহদেবতার ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন। দেবুকে দেখিয়া স্মিতমুখে তাহাকে আহ্বান করিলেন—এস, পণ্ডিত এস !

দেবুর ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবীর হৃদয়হীন অবিচারের সকল বেদনা এই মানুষটিকে দেখিবামাত্র যেন ফেনিল আবেগে উথলিয়া উঠিল—শিশুর অভিমানের মত।

ন্যায়রত্ন সাগ্রহে বলিলেন—বস। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে রৌদ্রে, ঘেমে নেয়ে

গেছ যেন। দেবুর হাতেই বন্ধ ছাতাটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ছাতাটা এখনও ভিজে রয়েছে দেখছি। বেশ বৃষ্টি হয়েছিল সকালে। তারপর প্রহরখানেক তো সূর্যদেব ভাস্কররূপ ধারণ করেছেন। মনে হচ্ছে তুমি ছাতাটা মাথায় দাও নি পণ্ডিত! একটু ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এলে পারতে।

দেবু এতক্ষণ আত্মসংবরণ করিয়াছিল, ঠাকুর মহাশয়ের যুক্তি ও মীমাংসা শুনিয়া এবার একটু বিনম্র হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে নতজানু হইয়া বলিল—পায়ের ধুলো নেব কি?

অর্থাৎ আমায় ছোঁবে কিনা জিজ্ঞাসা করছ? সম্মুখে আমাকে দেখছ, আমার পূজার্চনা শেষ হয়ে গিয়েছে। তুমি পণ্ডিত মানুষ, সিদ্ধান্ত তুমি করে নাও।

দেবু কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। সে ঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় দেবতার নির্মাল্য সমেত হাতখানি দেবুর মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন—আমার পায়ের ধুলোর আগে ভগবানের আশীর্বাদ নাও। পণ্ডিত, তাঁর সেবা করি বলেই সংসারের ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার করি। যে বস্তু যত নির্মল, তাতে স্পর্শদুষ্টি তত শীঘ্র সংক্রামিত হয় কিনা। তাই সাবধানে থাকি। নইলে আমি তোমাকে স্পর্শ করব না এমন স্পর্ধা আমার হবে কেন?

দেবু ন্যায়রত্নের পায়ের উপর মাথা রাখিল।

ন্যায়রত্ন সস্নেহে বলিলেন—ওঠ, পণ্ডিত ওঠ।...বলিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, ভো ভো—রাজন্! দাদু হে—

দেবু ব্যগ্রভাবে বলিল—বিশু-ভাই এসেছে নাকি?

—হ্যাঁ। ন্যায়রত্ন হাসিলেন।

—কি দাদু? বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল বিশ্বনাথ। এবং দেবুকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—এ কি, দেবু-ভাই! এই রৌদ্রে?

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—দেখছ পণ্ডিত? রাজ্ঞীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপমগ্ন রাজচিত্ত অসময়ে আহ্বানের জন্য কেমন বিক্ষুব্ধ হয়েছে দেখছ?

বিশ্বনাথ লজ্জিত হইল না, বলিল—আপনার ঠাকুর মাতবেন ঝুলনে, রাজ্ঞী সেই নিয়ে ব্যস্ত। এ বেচারার দিকে চাইবার তাঁর অবকাশ নাই মুনিবর!

—আমার দেবতার প্রসাদে এই পূর্ণিমারাত্রে তুমিও হিন্দোলায় দুলবে রাজন্! তুমি ঘরে ঝুলনার দড়ি টাঙিয়েছ—আমি উঁকি মেরে দেখেছি। আমার ঠাকুরের ঝুলনের অজুহাতেই তুমি কলকাতা থেকে আসবার সুযোগ পেয়েছ, সেটা ভুলে যেয়ো না। আমি অবশ্য তুমি সাতদিন পরে এলেও কিছু বলি না। কিন্তু তুমি তো প্রতিবারেই আমার ঠাকুরের প্রতি ভক্তির ছলনা করে কৈফিয়ৎ দিতে ভোল না রাজন্!

বিশ্বনাথ এবার হাসিতে লাগিল। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বিলুকে তাহার মনে পড়িয়া গেল। ঝুলনে তাহারাও একবার দোল খাইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—জয়া যদি ব্যস্ত থাকে, তবে তুমিই পণ্ডিতের জন্য এক গ্লাস সরবৎ প্রস্তুত করে আন দেখি।

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—গৃহস্থ্যকে আতিথ্য-ধর্ম পালনে ব্যাঘাত দিতে নাই। তারপর বিশ্বনাথকে বলিলেন—যাও ভাই, পণ্ডিতের বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। বড় শ্রান্ত-ক্লান্ত ও।···

কিছুক্ষণ পরে ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি সব শুনেছি পণ্ডিত।

দেবু তাঁহার পায়ে হাত দিয়াই বসিয়াছিল; সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি কি করব বলুন!

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বিশ্বনাথ পাশেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

দেবু আবার প্রশ্ন করিল—বলুন আমি কি করব?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—বলবার অধিকার নিজে থেকেই অনেকদিন ত্যাগ করেছি। শশীর মৃত্যুর দিন উপলব্ধি করেছিলাম—কাল পরিবর্তিত হয়েছে, পাত্রেরাও পূর্ব কাল থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে; দৈবক্রমে আমি ভূতকালের মন এবং কায়া সত্ত্বেও ছায়ার মত বর্তমানে পড়ে রয়েছি। সেদিন থেকে আমি শুধু দেখে যাই। বিশ্বনাথকে পর্যন্ত কোন কথা বলি না।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। দেবু চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন আবার বলিলেন—দেখ, বলবার অধিকার আমার আর সত্যিই নাই। শশীর কালেও যাদের দেখেছি, একালের মানুষ তাদের চেয়েও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে।

বিশ্বনাথ এবার বলিল—তাদের যে সত্যিই দেহের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে দাদু, নৈতিক মেরুদণ্ড সোজা থাকবে কি করে? অভাব যে অনিয়ম; নিয়ম না থাকলে নীতি থাকবে কোন্ অবলম্বনে বলুন? চুরিতে লুটতরাজে যার সব যায়, সে বড় জোর নীতি মেনে চুরি না করতে পারে, কিন্তু ভিক্ষে না করে তার উপায় কি বলুন? ভিক্ষার সঙ্গে হীনতার বড় নিকট সম্বন্ধ, আর হীনতার সঙ্গে নীতির বিরোধকে চিরন্তন বলা চলে।

ন্যায়রত্ন হাসিলেন, বলিলেন—তাই-ই কালক্রমে সত্য হয়ে দাঁড়াল বটে। হয়তো মহাকালের তাই অভিপ্রায়। নইলে দীনতা—সে হোক্ না কেন নিষ্ঠুরতম দীনতা—তার মধ্যে থেকেও হীনতার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার সাধনাই তো ছিল মহদ্ধর্ম। কৃচ্ছ্রসাধনায়, সর্বস্ব ত্যাগে ভগবানকে পাওয়া যাক না-যাক—পার্থিব দৈন্য ও অভাবকে মালিন্য-মুক্ত করে মনুষ্যত্ব একদিন জয়যুক্ত হয়েছিল।

বিশ্বনাথ বলিল—যে শিক্ষায় আপনার পূর্ববর্তীরা এটা সম্ভবপর করেছিলেন—সে শিক্ষা যে তাঁরাই সার্বজনীন হতে দেয় নি দাদু। এ তারই প্রতিফল। মণি পেয়ে মণি ফেলে

দেওয়া যায়, কিন্তু মণি যে পায় নি—সে মণি ফেলে দেবে কি করে? লোভই বা সংবরণ করবে কি করে?

ন্যায়রত্ন পৌত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—কথা তুমি বেশ চিন্তা করে বলে থাক দাদু। অসংযত বা অর্থহীনভাবে কথা তো বল না তুমি!

বিশ্বনাথ দেখিল—পিতামহের দৃষ্টিকোণে প্রখরতা অতি ক্ষীণ আভায় চমকিয়া উঠিতেছে। দেবুও লক্ষ্য করিয়াছিল, সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বিশ্বনাথের কোন্ কথায় ন্যায়রত্ন এমন হইয়া উঠিয়াছেন—অনুমান করিতে পারিল না।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—আমার পূর্ববর্তী সম্মুখে বর্তমান; আমি এখন রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যে অবস্থান করছি। সেইজন্যই বললাম—আপনার পূর্বগামী।

ন্যায়রত্নও হাসিলেন—নিঃশব্দ বাঁকা হাসি, বলিলেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের দিব্যাস্ত্রের সম্মুখে পার্থসারথি রথের ঘোড়া দুটোকে নতজানু করে রথীর মান বাঁচিয়েছিলেন। অর্জুনকে পেছন ফিরতেও হয় নি, কর্ণের মহাস্ত্রও ব্যর্থ হয়েছিল। বাগ্‌যুদ্ধে তুমি কৌশলী বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ এবার খানিকটা শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ইহার পর ন্যায়রত্ন যাহা বলিবেন, সে হয় তো বজ্রের মত নিষ্ঠুর অথবা ইচ্ছামৃত্যুশীল শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের অন্তিম মৃত্যু-ইচ্ছার মত সকরুণ মর্মান্তিক কিছু। ন্যায়রত্ন কিন্তু তেমন কোন কিছুই বলিলেন না, ঘাড় নিচু করিয়া তবু আপনার ইষ্টদেবতাকে ডাকিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

পরমুহূর্তে তিনি সোজা হইয়া বসিলেন—যেন আপনার সুপ্ত শক্তিকে টানিয়া সোজা করিয়া জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। তারপর দেবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—বিবেচনা করে দেখ পণ্ডিত। আমার উপদেশ নেবে অথবা তোমাদের এই নবীন ঠাকুর মশায়ের উপদেশ নেবে?

বিশ্বনাথও সোজা হইয়া বসিল, বলিল—আমি যে সমাজের ঠাকুর মশায় হব দাদু, সে সমাজে আপনার দেবু পণ্ডিত হবে আপনাদেরই মত পূর্বগামী। সে সমাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই হয় দেবু কাশীবাস করবে অথবা আপনার মত দ্রষ্টা হয়ে বসে থাকবে।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—তা হলে আমার পাঁজি-পুঁথি এবং শাস্ত্রগ্রন্থ ফেলে দিয়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করে ফেলি, বল? আমার ঠাকুরের তা হলে মহাভাগ্য! পাকা নাটমন্দির হবে। তুমিই সেদিন বলেছিলে—যুগটা বণিকের এবং ধনিকের যুগ; কথাটা মহাসত্য। এ অঞ্চলের নব সমাজপতি—মুখুয্যেদের প্রতিষ্ঠা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—আপনি রেগে গেছেন দাদু। কথাগুলো আপনার যুক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে; সেদিন আরও কথা বলেছিলাম—সেগুলো আপনি ভুলে গেছেন।

ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—ভুলি নাই। তোমার সেই ধর্মহীন—ইহলোক সর্বস্ব সাম্যবাদ।

—ধর্মহীন নয়। তবে আপনারা যাকে ধর্ম বলে মেনে এসেছেন সে ধর্ম নয়। সে আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়, ন্যায়নিষ্ঠ সত্যময় জীবনধারা। আপনাদের বাহ্যানুষ্ঠান ও ধ্যানযোগের

পরিবর্তে বিজ্ঞানযোগে পরম রহস্যের অনুসন্ধান করব আমরা। তাকে শ্রদ্ধা করব কিন্তু পূজা করব না।

ন্যায়রত্ন গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন—বিশ্বনাথ!

—দাদু!

—তা হলে আমার অন্তে তুমি আমার ভগবানকে অর্চনা করবে না?

বিশ্বনাথ বলিল—আগে আপনি দেবু পণ্ডিতের সঙ্গে কথা শেষ করুন।

ন্যায়রত্ন দেবুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্নের জীবনে আবার এ কি আগুন জ্বলিয়া উঠিল? কুড়ি-বাইশ বৎসর পূর্বে নীতির বিতর্কে এক বিরোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সংসারটা ঝল্সিয়া গিয়াছে; ন্যায়রত্নের একমাত্র পুত্র—বিশ্বনাথের পিতা ক্ষোভে অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

দেবুকে নীরব দেখিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—পণ্ডিত!

দেবু বলিল—আমি আজ যাই ঠাকুর মশায়!

—যাবে? কেন?

—অন্যদিন আসব।

—আমার এবং বিশ্বনাথের কথা শুনে শঙ্কিত হয়েছ? ন্যায়রত্ন হাসিলেন। না-না, ওর জন্যে তুমি চিন্তিত হয়ো না। বল, তুমি কি জানতে চাও! বল?

দেবু বলিল—আমি কি করব? শ্রীহরি পঞ্চায়েৎ ডেকে আমাকে পতিত করতে চায় অন্যায় অপবাদ দিয়ে—

—হ্যাঁ, এইবার মনে হয়েছে। ভাল, পঞ্চায়েৎ তোমাকে ডাকলে তুমি যাবে, সবিনয়ে বলবে-আমি অন্যায় কিছু করি নি। তবু যদি শাস্তি দেন নেব; কিন্তু নিরাশ্রয়া বন্ধুপত্নীকে পরিত্যাগ করতে পারব না। তাতে যা পারে পঞ্চায়েৎ করবে। ন্যায়ের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে।

বিশ্বনাথ হাসিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন প্রশ্ন করিলেন—হাসলে যে বিশ্বনাথ? তোমাদের ন্যায় অনুসারে কি মেয়েটাকে ত্যাগ করা উচিত?

—আমাদের উপর অবিচার করছেন আপনি। আমাদের ন্যায়কে আপনাদের ন্যায়ের উল্টো অর্থাৎ অন্যায় বলেই ধরে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে আপনি যা বলছেন—আমাদের ন্যায়ও তাই বলে। তবে আমি হাসলাম পঞ্চায়েৎ পতিত করবে এবং তাতে দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে।

—তার মানে তুমি বলছ পঞ্চায়েৎ পতিত করবে না বা পতিত করলেও দুঃখ-কষ্ট নাই!

—পঞ্চায়েৎ পতিত করবেই। কারণ তার পিছনে রয়েছে ওদের সমাজের ধনী সমাজপতি শ্রীহরি ঘোষ এবং তার প্রচুর ধন ধান্য। তবে দুঃখ যতখানি অনুমান করেছেন ততখানি নাই।

* *

ন্যায়রত্ন হাসিয়া বলিলেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিশ্বনাথ।

—বৃদ্ধত্বের দাবি করি না দাদু, তাতে আমার রুচিও নাই। তবে ভেবে দেখুন না, পঞ্চায়েৎ কি করতে পারে? আপনি সেযুগের কথা ভেবে বলছেন। সেযুগে সমাজ পতিত করলে তার পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোর বন্ধ হত। কর্মজীবন, ধর্মজীবন দুই-ই পঙ্গু হয়ে যেত। সমাজের বিধান লঙ্ঘন করে তাকে কেউ সাহায্য করলে তারও শাস্তি হত। গ্রামান্তর থেকেও কোন সাহায্য পাওয়া যেত না। এখন ধোপা-নাপিত-কামার-পুরুতই সমাজের নিয়ম মেনে চলে না। পয়সা দিলেই ওগুলো এখন মিলবে। সেযুগে ধোপা-নাপিত সমাজের হুকুম অমান্য করলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হত। এখন ঠিক উল্টো। ধোপা-নাপিত-ছুতোর-কামাররা যদি বলে যে তোমাদের কাজ আমি করব না—তাহলে আমরাই জব্দ হয়ে যাব। আর বেশী পেড়াপীড়ি করলে হয় তারা অন্যত্র উঠে যাবে, নতুবা জাত-ব্যবসা ছেড়ে দেবে। ভয় কি দেবু, জংশন থেকে ক্ষুর কিনে নিয়ো একখানা, আর কিছু সাবান। তা যদি না পারো তো জংশন শহরেই বাসা নিও, তোমাকে দাড়িও রাখতে হবে না—ময়লা কাপড়ও পরতে হবে না। জংশন পঞ্চায়েতের এলাকার বাইরে।

দেবু অবাক হইয়া বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্নও তাহার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া শেষে হাসিলেন; বলিলেন—তুমি আর রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে নেই দাদু, তুমি আবির্ভূত হয়েছ। আমিই বরং প্রস্থান করতে ভুলে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে অযথা মঞ্চে অবস্থান করছি।

বিশ্বনাথ বলিল—অন্তত মহাগ্রামের মহামান্য সমাজপতি হিসেবে আপনার কাছে লোকে এলে তখন কথাটা অতি সত্য বলে মনে হয়। দেশে নতুন পঞ্চায়েৎ সৃষ্টি হল—ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কোর্ট, বেঞ্চ; তারা ট্যাক্স নিয়ে বিচার করছে, সাজা দিচ্ছে। তবু লোকে যখন সমাজপতির বংশ বলে আমাদের, তখন যাত্রার দলের রাজার কথা মনে পড়ে।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—ওরে বিদূষক! না, যাত্রার দলের রাজা নই, সত্যকারের রাজ্যভ্রষ্ট রাজা আমি। আমার রাজ্যভ্রষ্টতা সম্বন্ধে আমি সচেতন। এখানে রয়েছি ভ্রষ্ট রাজ্যের মমতায় নয়, সে আর ফিরবে না সে কথাও জানি। তবু রয়েছি, আমার কাছে যে গচ্ছিত আছে গুপ্তসম্পদ। কুলমন্ত্র, কুলপরিচয়, কুলকীর্তির প্রাচীন ইতিহাস। তোরা যদি নিস্—হাসি মুখে মরব। না নিস, তাও দুঃখ করব না। সব তাঁকে সমর্পণ করে চলে যাব।

ঠিক এই সময়েই ভিতর-বাড়ীর দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল জয়া। সে বলিল—দাদু, একবার এসে দেখেশুনে নিন, তখন যদি কোনটা না পাওয়া যায়, তবে কি হবে বলুন তো? তা ছাড়া আপনার-আমার না হয় উপোস, কিন্তু অন্য সবার খাওয়া-দাওয়া আছে তো! টোলের ছোট ছাত্রটি এরই মধ্যে ছুতোনাতা করে দু-তিনবার রান্নাঘর ঘুরে গেল। মুখখানা বেচারার শুকিয়ে গেছে।

—চল যাই।

—কি এত কথা হচ্ছে আপনাদের?

—শিবকালীপুরের পণ্ডিত এসেছেন, তাঁরই সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ন্যায়রত্নের আড়ালে তাঁহার পায়ের তলায় দেবু বসিয়া ছিল; জয়া তাহাকে দেখিতে পায় নাই। দাদাশ্বশুরের কথায় দেবুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া জয়া মাথার কাপড়টা অল্প টানিয়া বাড়াইয়া দিল। তারপর বলিল—পণ্ডিতকে বলুন, এইখানেই দুটি প্রসাদ পেয়ে যাবেন। বেলা অনেক হয়েছে।

দেবু মৃদুকণ্ঠে বলিল—আমার আজ পূর্ণিমার উপবাস।

—বেশ, তবে এখন বিশ্রাম কর। ও বেলায় রাত্রে ঝুলন দেখে ঠাকুরের প্রসাদ পাবে। রাত্রে বরং এইখানেই থাকবে।

দেবুর মন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। পিতামহ-পৌত্রের কথায় জটিলতার মধ্যে সে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে; তাছাড়া বাড়ীতে কাজও আছে, রাখাল কৃষাণেরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি ওবেলায় আবার আসব। রাখালটার ঘরে খাবার নাই; কৃষাণদেরও তাই। ধান দিই-দিই করে দেওয়া হয় নাই। আজ আবার পূর্ণিমা, ধার-ধোর পাবে না বেচারারা। বলেছি খাবার মত চাল দোব। তারা আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে।

পথে নামিয়া দেবু বিভ্রান্ত হইয়া গেল। আপনার কথা ভাবিয়া নয়, ন্যায়রত্নের এবং বিশ্বনাথের কথা ভাবিয়া। বার বার সে আপনাকে ধিক্কার দিল, কেন সে আবেগের বশবর্তী হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল? তাহার ইচ্ছা হইল সে এই পথে-পথেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এমন সোনার সংসার ঠাকুর মশায়ের, বিশ্বনাথের মত পৌত্র, জয়ার মত পৌত্র-বধূ, অজয়-মণির মত প্রপৌত্র, কত সুখ—সব হয়তো অশান্তির আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। নতুবা ঠাকুর মহাশয় হয়ত ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া কাশী চলিয়া যাইবেন, অথবা বিশ্বনাথ স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। কিংবা হয়তো একাই সে ঘর ছাড়িবে। সঠিক না জানিলেও সে তো আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়াছে—বিশু-ভাই কোন্ পথে ছুটিয়াছে। তাহার পরিণাম যে কি, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। এই দ্বন্দ্বের আঘাতে বিশু-ভাই আরও সেই পথে ছুটিবে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্যের মত। তারপর হয়ত আন্দামান নয়ত কারাবাস! আহা, এমন সোনার প্রতিমার মত স্ত্রী—এমন চাঁদের মত ছেলে…!

—ওই! পণ্ডিত মশায় যে গো! এই ভত্তি দুপুরে ই-দিক পানে—কোথায় যাবেন গো?

দেবু সচকিত হইয়া লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিল, বক্সা দেখুড়িয়ার রাম ভল্লা। দেবু হাসিয়া বলিল—রামচরণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এত বেলায় যাবেন কোথা গো?

—গিয়েছিলাম মহাগ্রামে ঠাকুর মশায়ের বাড়ী। বাড়ী ফিরছি।

—তা ই-ধার পানে কোথা যাবেন?

দেবু এবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাই তো! অন্যমনস্কভাবে সে ভুল পথেই আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ। মাঠে বাঁদিকের পথে না-ঘুরিয়া সে বরাবর সোজা চলিয়া আসিয়াছে। বাঁধের ওপারেই শ্মশান। শিবকালীপুর, মহাগ্রাম এবং দেখুড়িয়া—তিনখানা গ্রামে শবদাহ হয় এখানে। তাহার বিলু, তাহার খোকা—বিশ্বনাথের জয়া, অজয়-মণির চেয়ে তাহারা দেখিতে বেশি খারাপ ছিল না, গুণেও খাটো ছিল না—বিলু-খোকা তাহার ওই শ্মশানে মিশিয়া আছে। কোন চিহ্ন আর নাই, ছাইগুলাও কবে ধুইয়া গিয়াছে, তবু স্থানটা আছে। সে ওইখানে একবার বসিবে। অনেক দিন সে তাহাদের জন্য কাঁদে নাই। পাঁচখানা গ্রামের হাজারো লোকের কাজের বোঝা ঘাড়ে লইয়া মাতিয়া ছিল। মান-সম্মানের প্রলোভনে—হ্যাঁ, মান-সম্মানের প্রলোভনেই বই কি! সে সব ভুলিয়া—মস্ত বড় কাজ করিতেছি ভাবিয়া প্রমত্ত মানুষের মত ফিরিতেছিল। আজ সম্মান-প্রতিষ্ঠার বদলে লোকে সর্বাঙ্গে অপমান-কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই আজ বিলু-খোকাই তাহাকে পথ ভুলাইয়া আনিয়াছে। তাহার চোখের উপর বিলু ও খোকার মূর্তি জ্বল্-জ্বল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

রাম আবার জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবেন আজ্ঞা?—দিবা-দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মানুষ গ্রামের পথ ভুল করিয়াছে, একথা সে ভাবিতেই পারিল না।

দেবু বলিল—একটু শ্মশানের দিকে যাব।

—শ্মশানে?

—হ্যাঁ। দরকার আছে।

রাম অবাক্ হইয়া গেল।

দেবু বলিল—তুমি আমার একটু কাজ করবে?

—বলুন আজ্ঞা?

পকেট হইতে দড়িতে বাঁধা কয়েকটা চাবি বাহির করিয়া বলিল—এই চাবি নিয়ে তুমি—তাই তো কাকে দেবে ও? ক্ষণিক চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল—চাবিটা তুমি কামার-বউ—অনিরুদ্ধ কামারের বউকে দিয়ে বলবে যে, ভাঁড়ার থেকে আট সের চাল নিয়ে আমার রাখাল ছোঁড়াকে দু'সের আর কৃষাণ দুজনকে তিন সের করে ছ'সের দিয়ে দেয় যেন। আমার ফিরতে দেরি হবে। এখনি যেতে হবে না, চাষের কাজ শেষ করে যেয়ো।

রাম বলিল—আজকের কাজ হয়ে গিয়েছে। আজ পুন্নিমে, হাল বন্ধ, আগাম পোঁতা জমিগুলোতে নিড়েন্ দিচ্ছিলাম। তা যে রোদ, আর পারলাম না। আমি এখুনি না হয় যাচ্ছি। কিন্তুক আপনি শ্মশানে গে কি করবেন গো?

—একটু কাজ আছে। দেবু বাঁধের দিকে অগ্রসর হইল।

রাম তবু সন্তুষ্ট হইল না। দেবুর গতিবিধি তাহার কাছে বড় রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। দেবুকে লইয়া যে সমস্ত কথা উঠিয়াছে সে সবই জানে। পদ্ম-সংক্রান্ত কথাও জানে, রহম ও কঙ্কণার বাবুদের মধ্যে বিবাদ-প্রসঙ্গে যে কথা উঠিয়াছে তাহাও জানে।

পদ্মের কথা সে অপরাধের মধ্যে গণ্য করে না। বিপত্নীক জোয়ান লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে, তার যদি ওই স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েটিকে ভালই লাগিয়া থাকে—সে যদি ভালই বাসিয়া থাকে তাহাকে, তাহাতে দোষ কোথায়? কঙ্কণার বাবুদের দেওয়া অপবাদ সে বিশ্বাস করে না। এ সম্বন্ধে তিনকড়ি হলফ করিয়া বলিয়াছে। তিনকড়ি অবশ্য পদ্মের কথাও বিশ্বাস করে না।

তাই সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও দেবুকে আরও খানিকটা আটকাইয়া কথাপ্রসঙ্গে ভিতরের কথাটা জানিবার জন্যই বলিল—কুসুমপুরের মিটিংয়ে যান নাই আপনি?

—কুসুমপুরের মিটিং! কিসের মিটিং?

—মস্ত মিটিং আজ কুসুমপুরে গো। তিনু-দাদা গিয়েছে। বাবুদের সঙ্গে রহমের হাঙ্গামার কথা—ধর্মঘটের কথা—

মৃদু হাসিয়া দেবু বলিল—আমি আর ওসবের মধ্যে নাই, রাম-ভাই।

রাম চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—শ্মশানে কি করবেন আপনি? এই দুপুরবেলা—খান নাই দান নাই। চলুন, ঘর চলুন।

ঠিক এই সময়েই একটা হাঁক ভাসিয়া আসিল। চাষীর হাঁক, চড়া গলায় লম্বা টানা ডাক। রাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ডাকটার শেষ—অ-আ ধ্বনিটা স্পষ্ট। রাম কানের পিছনে হাতের আড়াল দিয়া শুনিয়া বলিল—তিনু-দাদা আমাকেই ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মুখের দুই পাশে হাতের তালুর আড়াল দিয়া সাড়া দিল—এ—এঃ!

তিনু হন-হন করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দেবুও যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা কি?

তিনু অত্যন্ত উত্তেজিত। কাছে আসিয়া এমন জায়গায় রামের সঙ্গে দেবুকে দেখিয়া সে কোন বিস্ময় প্রকাশ করিল না। বিস্ময়-প্রকাশের মত মনের অবস্থাই নয় তাহার। সে বলিল—ভালই হয়েছে, দেবু বাবাও রয়েছে। তোমার বাড়ী হয়েই আসছি আমি। পেলাম না তোমাকে। কুসুমপুরের শেখেরা বড় গোল পাকিয়ে তুললে বাবা। রামা, তোরা সব লাঠি-সড়কি বার কর্।

দেবু সবিস্ময়ে বলিল—কেন? আবার কি হল?

—আর বলো না বাবা। আজ মিটিং ডেকেছিল। তোমাকে বাদ দিয়ে ডেকেছিল—আমি যেতাম না, কিন্তু ভাবলাম—যাই, কড়া-কড়া কটা কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। গিয়ে দেখি সে মহা হাঙ্গামা! শুনলাম কঙ্কণার বাবুরা নাকি বলেছে, কুসুমপুর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে; আগে কুসুমপুর ছিল হিঁদুর গাঁ—আবার হিঁদু বসাবে বাবুরা। এই সব শুনে শেখেরা ক্ষেপে উঠেছে, তারা বলছে—আমাদের গাঁ ছারখার করলে আমরাও হিঁদুর গাঁ ছারখার করে দোব।

—বলেন কি! তারপর?

—তারপর সে অনেক কথা। তা আমার বাড়ীতে এস কেনে, সব বলব। তেষ্টায় বুক

আমার শুকিয়ে গিয়েছে।

কথাট্য বলিতে বলিতে সে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবু এবং রামও আগাইয়া চলিল।

তিনকড়ি বলিল—গাঁয়ের জগন-টগন সব ধর্মঘটের মাতব্বরেরা মিটিংয়ে গিয়েছিল। যায় নাই কেবল পঞ্চায়েতের মোড়লরা। শুনেছ তো তোমাকে পতিত করা নিয়ে ছিরে বেটার সঙ্গে খুব এখন পীরিত। ছিরে ধান দেবে কিনা।

—শুনেছি। কিন্তু কুসুমপুরে কি হল?

—আমরা বললাম বাবুরা তোমাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, তোমরা বাবুদের সঙ্গে বোঝ, অন্য হিঁদুরা তার কি করবে? তারা বললে—বাবুরা বলেছে হিঁদু বসাবে, তখন সব হিঁদুই একজোট্ হবে। আসবার সময় আবার শুনলাম—।...স্বর্ন মা রে!

তিনকড়ির দরজায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল।

দেবু প্রশ্ন করিল—আর কি শুনলেন?

—বলি। দাঁড়াও বাবা, আগে জল খাই একঘটি।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল স্বর্ণ, তিনকড়ির বিধবা মেয়েটি। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, চমৎকার মুখশ্রী, গৌরবর্ণ দেহ। পনরো-ষোল বছরের মেয়েটিকে দেখিয়া কে বলিবে সে বিধবা! কিশোরী কুমারীর মত স্বপ্নবিভোর দৃষ্টি তাহার চোখে; মুখের কোথাও কোন একটি রেখার মধ্যে এতটুকু বেদনা বা উদাসীনতা লুকাইয়া নাই। সে বাহির হইয়া আসিল —তাহার হাতে একখানি বই। দেবুকে দেখিয়া লজ্জিতভাবে চকিতে সে বইখানি পিছনের দিকে লুকাইল।

জটিল চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও দেবু হাসিয়া বলিল—বই লুকোচ্ছ কেন? কি বই পড়ছিলে?

তিনকড়ি ঘরের ভিতর যাইতে যাইতে বলিল—মা স্বন্ন, দেবু-বাবাকে একটু সরবৎ করে দে তো।

—না, না। আমার আজ পূর্ণিমার উপবাস। একবার সরবৎ আমি খেয়েছি।

—তবে একটুকু হাওয়া কর্। যে গরম, গল্‌গল্ করে ঘামছে।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিল। দেবু বলিল—পাখাটা আমাকে দাও।

—না, আমি হাওয়া করছি।

—না, না। দাও, আমাকে দাও। তুমি বরং বইখানা নিয়ে এস। কি পড়ছিলে দেখি? যাও নিয়ে এস।

কুণ্ঠিতভাবেই স্বর্ণ বইখানা আনিয়া দেবুর হাতে দিল।

বইখানি একখানি স্কুলপাঠ্য সাহিত্য-সঞ্চয়ন। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের ছাত্রোপযোগী লেখা চয়ন করিয়া সাজানো হইয়াছে। প্রবন্ধ, গল্প, জীবনী, কবিতা।

দেবু বলিল—কোন্‌টা পড়ছিলে বল!

স্বর্ণ নতমুখে বলিল—ও একটা পদ্য পড়ছিলাম।

দেবু হাসিয়া বলিল—পদ্য বলে না, কবিতা বলতে হয়। কোন্ কবিতা পড়ছিলে?

স্বর্ণ একটু চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা।

দেবু বইখানার কবিতার দিকটা খুলিতেই একটা কবিতা যেন আপনি বাহির হইয়া পড়িল; অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা পাতা খোলা থাকিলে বই খুলিতে গেলে আপনা-আপনিই সেই পাতাটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দেবু দেখিল কবিতাটির শেষে লেখকের নাম লেখা রহিয়াছে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাটির নামের দিকে চাহিয়া দেখিল—'স্বামীলাভ'। তাহার নিচে ব্র্যাকেটের ভিতর ছোট অক্ষরে লেখা 'ভক্তমাল'। সে প্রশ্ন করিল—এইটে পড়ছিলে বুঝি?

স্বর্ণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, ওইটাই সে পড়িতেছিল।

দেবু স্নিগ্ধস্বরে বলিল—পড় তো, আমি শুনি। বইখানা সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

রাম ভল্লা বলিল—স্বন্ন মা যা সুন্দর রামায়ণ পড়ে পণ্ডিত মশায়! আহা-হা, পরান জুড়িয়ে যায়।

দেবু হাসিয়া বলিল—পড় পড়, শুনি।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—বাবাকে খেতে দিতে হবে, আমি যাই। বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। লজ্জিতা মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেবু সস্নেহে হাসিল। তারপর সে কবিতাটি পড়িল—

একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে নির্জন শ্মশানে

... ...

হেরিলেন, মৃত পতি-চরণের তলে বসিয়াছে সতী
তারি সনে একসাথে এক চিতানলে মরিবারে মতি।

... ...

তুলসী কহিল, "মাত যাবে কোন্‌খানে এত আয়োজন?"

... .

কহে করজোড় করি, "স্বামী যদি পাই স্বর্গ দূরে যাক।"
তুলসী কহিল হাসি, "ফিরে চল ঘরে কহিতেছি আমি,
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে আপনার স্বামী!"
রমণী আশার বশে গৃহে ফিরে যায় শ্মশান তেয়াগি;
তুলসী জাহ্নবী-তীরে নিস্তব্ধ নিশায় রহিলেন জাগি।

... ...

এক মাস পরে প্রতিবেশীরা আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল—তুলসীর মন্ত্রে কি ফল হইয়াছে? মেয়েটি হাসিয়া বলিল—পাইয়াছে, সে তাহার স্বামীকে পাইয়াছে।

শুনি' ব্যগ্র কহে তারা, "কহ তবে কহ, আছে কোন ঘরে ?"
নারী কহে, "রয়েছেন প্রভু অহরহ আমারি অন্তরে।"

কবিতাটি শেষ করিয়া দেবু স্তব্ধ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। স্বর্ণকে দেখিয়া যে কথা তাহার মনে হয় নাই, সেই কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—স্বর্ণ বিধবা, সাত বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে। নীরবে নতমুখে সে চলিয়া গেল, তখন তাহার ওই নতমুখের ভঙ্গির মধ্যে—শান্ত পদক্ষেপের মধ্যে যাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহাই সে এখন স্পষ্ট অনুভব করিল। তাহার গোপন-পোষিত সুগভীর বিরহ-বেদনা। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তুলসীদাসের মন্ত্রের মত কোন মন্ত্র যদি তাহার জানা থাকিত, তবে স্বর্ণকে সেই মন্ত্র সে দিত। তিনকড়ি-কাকা আক্ষেপ করিয়া বলে—স্বর্ণ আমার প্রতিমা—সে কথা মিথ্যা নয়। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল।

তিনকড়ি এই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করিল; বাহির হইতেই সে কথা আরম্ভ করিয়াছিল —এই পাক্‌টি, বুঝলে বাবাজী, বেশী করে লাগালে তোমার গে দৌলত শেখ। দৌলত গিয়েছিল মুখুয্যেবাবুদের বাড়ী, বাবুরা নাকি তাকেই কথাটা বলেছে।...

তের

কঙ্কণার মুখুয্যেবাবু ঠিক ওই কথাটা বলেন নাই।

দৌলত শেখকে তিনিই ডাকিয়াছিলেন। শেখজী অর্থশালী লোক; বর্তমানে তাহার চামড়ার ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বেশ সমৃদ্ধ। স্বজাতি স্বসম্প্রদায়ের লোক না হইলেও বর্তমান সমাজে ধনীতে ধনীতে একটি লৌকিকতার সম্বন্ধ আছে; সেই সূত্রে মুখুয্যেবাবুদের সঙ্গে, শ্রীহরির সঙ্গে এবং অন্য জমিদার, মহাজনের সঙ্গে হাজী সাহেবের সৌহার্দ্য আছে। এ ছাড়া শেখজী মুখুয্যেবাবুদের একজন বিশিষ্ট প্রজা; তাঁহাদের সেরেস্তায় দৌলত শেখের নামে খাজনার অঙ্কটা বেশ মোটা। ধনী দৌলতের সঙ্গে গ্রামের সাধারণ লোকের মনের অমিলের কথাও মুখুয্যেবাবুরা জানেন। তাই শেখজীকে তাঁরা ডাকিয়াছিলেন।

জংশন শহরে থানার দারোগাবাবু ও জমিদারবাবু ক্রমবর্ধমান পাথরের মত ভারী এবং মূক হইয়া উঠিতেছেন। ডায়রি করিতে গেলে ডায়রি করিয়া লন—কোন কথা বলেন না। মুখুয্যেবাবুদের বাড়ী হইতে একটা দশ-পনরো সের মাছ পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহারা ফেরত দিয়াছেন। নায়েবকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন—হাওয়া যে রকম গরম, তাতে হজম হবে না মশায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছে, কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম গিয়েছে। বাপ রে! আবার শুনছি নাকি মিনিস্টারের কাছেও যাবে টেলিগ্রাম। ওসব আর আনবেন না দয়া করে।

পরশু তারিখে সার্কেল অফিসার সফরে আসিয়াছিলেন—ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শনে। তিনি—শুধু তিনি কেন, সরকারী কর্মচারী মাত্রই—এস্‌-ডি-ও, ডি-এস্‌-পি, মধ্যে মধ্যে

ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সাহেব পর্যন্ত এ অঞ্চলে আসিলেই কঙ্কণার বাবুদের ইংরাজী-কেতায় সাজানো দেবোত্তরের গেস্ট-হাউসে উঠিয়া আতিথ্য-স্বীকার করিয়া থাকেন। সরকারের ঘরে বাবুদের নামডাক যথেষ্ট, লোকহিতকর কাজও তাঁহাদের যথেষ্ট আছে, স্কুল হাসপাতাল বালিকা বিদ্যালয় তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। সরকারী কাজে চাঁদার খাতায় তাঁহাদের নাম সর্বদাই উপরের দিকেই থাকে। তাঁহারা যে পথে চলিয়া থাকেন, সে পথটি বাহ্যতঃ স্পষ্ট আইনের পথ। টাকা ধার দেন, সুদ লন। খাজনা বাকি পড়িলে অমার্জনীয় কঠোরতার সঙ্গে সুদ আদায় করেন, নালিশ করেন। বৃদ্ধির ব্যাপারেও মুখুয্যেবাবুরা আদালতের মধ্য দিয়া চলিতেছেন। বে-আইনী আদায় হয়ত কিছু আছে, কিন্তু সেও এমনভাবে আইনের গঙ্গাজল প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া যায় যে সে আদায়ের অশিদ্ধতা অশুদ্ধতার কথা কখনও উঠিতেও পায় না। যেমন দেবোত্তরের পার্বণী আদায়, খারিজ-ফি বাবদ উদ্বৃত্ত আদায় ইত্যাদি, এই আদায়ের জন্য বাবুদের জবরদস্তি নাই। শুধু পার্বণী না দিলে টাকা আদায় লনও না, দেনও না। না-লওয়া বা না-দেওয়াটা ইচ্ছাধীন, বে-আইনী নয়। এবং পরিশেষে বাধ্য হইয়া আদালতে যান এবং অন্যকে যাইতে বাধ্য করেন; তাহাও বে-আইনী নয়। সুতরাং আইনের ক্ষুরধারে যাহারা চলিয়া থাকেন—তাহাদের নিকট মাথা কামাইতে আসিয়া দুই-এক বিন্দু রক্তপাত সকলে মানিয়া লইয়াছে। ইহার উপর সরকারের প্রতি বাবুদের ভক্তিশ্রদ্ধার কথা লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল হইতে আজ পর্যন্ত এ জেলার প্রত্যেক সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই রাজভক্ত বাবুদের অতিথি-নিকেতনে আতিথ্য স্বীকার করাকে তাঁহারা কিছু অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরশু তারিখে সার্কেল-অফিসার এখানে আসিয়াও বাবুদের অতিথি-নিকেতনে আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। মুখুয্যেবাবু দুইটা কারণে সচকিত হইয়া উঠিলেন। দেশ-কালের কোথায় কি যেন পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পারেন নাই। প্রজাদের টেলিগ্রামের মূল্য যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মামলার কূট-কৌশল প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে আজ যেন অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া মনে হইতেছে। অথচ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে এখান হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী গ্রামের জমিদার প্রজাদের জনতার উপর গুলি চালাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় করিয়া সদরে গিয়া সাহেবকে সেলাম দিয়া প্রণাম করিলেন—তিনি ঘটনার সময় সদরে ছিলেন। প্রজাদের মামলা ফাঁসিয়া গিয়াছিল। ঘরে বসিয়া তিনি অনুভব করিলেন, রাজশক্তি যেন এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাদের তার পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

দেবুকে ইহাদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই। একেবারে হয় নাই তা নয়, তবে যেটুকু হইয়াছে তাহার মূল্য খুব বেশি নয়, অন্ততঃ তাঁহার তাই মনে হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দৌলত শেখকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

শেখজীর বয়স ষাট বৎসর পার হইয়া গেলেও এখনো দেহ বেশ সমর্থ আছে। মাঝারি আকারের একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া এখনও যাওয়া-আসা করেন; সেই ঘোড়াটায় চড়িয়া শেখজী বাবুদের কাছারিতে উঠিলেন। বাবু সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

দৌলত শেখও রহম এবং ইরসাদকে ভাল চোখে দেখেন না। তিনি বলিলেন—ভুল খানিকটা করেছেন কর্তা। চুরি করে তালগাছটা বেচলে একটা চুরির চার্জে নালিশ করে দিলেই ঠিক হত।

কর্তা বলিলেন—সে তো করবই—এখন তোমায় ডেকেছি, তুমি কুসুমপুরের মাতব্বর লোক, তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও গে, ব্যাপারটা ভাল করছে না। আমার কিছুই হবে না এতে। সাহেব তদন্তে এলেও বিনা মামলায় কিছু করতে পারবে না। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত চলে। মিথ্যে নালিশ হাইকোর্টে টিঁকবে না। তা ছাড়া হাইকোর্টের মামলা ধান বেচে হয় না।

দাড়িতে হাত বুলাইয়া শেখ বলিল—দেখেন কর্তা, আমাকে বলা আপনার মিছা। রহম শেখ হল বদমাস বেতমিজ লোক; ইরসাদ দুকলম লিখাপড়া শিখে নামের আগে লিখে মৌলভী; ফরজ্ জানে না কলেমা জানে না—নিজেরে বলে মোমেন। আমি হাজী হজ করে আসছি—বয়স হল ষাট, আমাকে বলে—বুড়া সুদ খায়, লোকেরে ঠকায়—উ হাজী নয়, কাফের। আমি বললে উয়ারা শুনবেই না!

কর্তা বলিলেন—ভাল। তুমি গ্রামের মাতব্বর লোক—আমাদের সঙ্গে অনেক দিনের সুবাদ তোমার, তাই তোমাকে বললাম। এর পর আমাকে তুমি দোষ দিয়ো না। রহম-ইরসাদ আর তার দলে যারা আছে, এ অঞ্চল থেকে আমি তাদের বাস তুলে ছাড়ব। বলিয়াই মুখুয্যে-কর্তা উঠিয়া গেলেন। দৌলত শেখের সঙ্গে আর বাক্যালাপও করিলেন না। তাহার মনে হইল হাজী ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটা হইতে সরিয়া থাকিতে চাহিতেছে। কঙ্কণার তাহার ছোটখাটো সমধর্মীদের মত, শেখজীও বোধ হয় তিনি বিব্রত হওয়ায় আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

দৌলত শেখ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিল। অবহেলাটা তাহার গায়ে বড় লাগিল। বুড়া ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিবার পথে বার বার তাহার ইচ্ছা হইল সে-ও রহম এবং ইরসাদদের সঙ্গে যোগ দেয়। সে জীবনে নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে বড় হইয়াছে। বড় পরিশ্রম করিয়াছে, বহু লোকের সহিত কারবার করিয়াছে, বহুজনের মন তাহাকে রাখিতে হইয়াছে। মানুষকে বুঝিবার একটা ক্ষমতা তাহার জন্মিয়া গিয়াছে। সে বেশ বুঝিল—আজ রহম এবং ইরসাদ তাহাকে মানে না, সে তাহাদিগকে মানাইতে পারে না—এই সত্যটা জানিবার পর মুখুয্যেবাবু আর তাহাকে মান্য করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। আজ একটা বিপাকের সৃষ্টি করিয়া সামান্য রহম ও ইরসাদ বাবুর কাছে তাহার চেয়েও বড় হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল—রহম এবং ইরসাদকে সে যদি বাগ মানাইয়া আপনার আয়ত্তে আনিতে পারে তবে এ অঞ্চলের এই ধুরন্ধর কর্তাটিকে ছিপে-গাঁথা হাঙরের মত খেলাইয়া লইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাসি আসিল। মুখুয্যেবাবু শের ছিল, হঠাৎ যেন শিয়াল বনিয়া গিয়াছে। যখন তাহাকে বলিল—রহম ইরসাদ আর তার দলে যারা আছে এ অঞ্চল থেকে তাদের বাস তুলে ছাড়ব—বাবুর তখনকার গলার আওয়াজটা পর্যন্ত হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। শাসানিটা

নিতান্তই মৌখিক। মুখুয্যেবাবুর-মুখখানা পর্যন্ত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। আরে হায় রে, হায় রে মুখুয্যেবাবু! তুমি দেখিতেছি বাঘের খাল (চামড়া) পরিয়া থাক—আসলে তুমি ভেড়া! রহম আর ইরসাদকে ভয় কর তুমি? ফুঃ ফুঃ!

ঘোড়ার পিঠে বসিয়া আপন মনে হাজী সাহেব বারকয়েক ফুঃ ফুঃ শব্দ করিল। ইরসাদ—রহম? তাদের মুরদ কি? মুখুয্যেবাবুদের মত তাহার যদি টাকা থাকিত, তবে সে কোন্ দিন ওই অসভ্য বেতমিজ দুইটাকে সাফ করিয়া দিত। মানুষের খাল (চামড়া) দাগাবাত (পরিষ্কার) করিতে নাই, নইলে উহাদের খাল ছাড়াইয়া দাগাবাত করিয়া তাহার কারবারের চামড়ার সঙ্গে মিশাইয়া দিত। ইরসাদ-রহমের মুরদ কি?

গ্রামে ঢুকিয়া দৌলত শেখ অবাক হইয়া গেল। গ্রাম লোকে-লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। শিবকালীপুর, মহাগ্রাম, দেখুড়িয়ার হিন্দু চাষীরা আসিয়া জমিয়াছে, গ্রামের মুসলান চাষীরা সকলে হাজির আছে; মাঝখানে ইরসাদ, রহম, শিবকালীপুরের জগন ডাক্তার, দেখুড়িয়ার তিনকড়ি। সে ঘোড়ার লাগামটা টানিয়া ধরিল। দেবু ঘোষ নাই। মুখুয্যেবাবু ও-চালটা মন্দ চালে নাই! ওদিকে শ্রীহরি ঘোষও চালিয়াছে ভাল চাল; ছোঁড়াটা বসিয়া গিয়াছে।

জগন ডাক্তার মুখফোঁড় লোক—ধনীর উপর তাহার অত্যন্ত আক্রোশ, সে দৌলতকে দাঁড়াইতে দেখিয়া হাসিয়া রহস্য করিয়াই বলিল—শেখজী, কঙ্কণা গিয়াছিলেন নাকি হাওয়া খেতে? মুখুয্যে-বাড়ী? বেশ! বেশ!

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটি হাসির কানাকানি পড়িয়া গেল।

শেখের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এই উদ্ধত ডাক্তারটির কথাবার্তার ধরনই এই রকম। কিন্তু এই সব নগণ্য চাষী—যাহারা সেদিনও ধান-ধান করিয়া কুত্তার মত তাহার দুয়ারে আসিয়া লেজ নাড়িয়াছে—তাহারাও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া হাসিতেছে! তাহার ইচ্ছা হইল মুখুয্যেবাবুর সংকল্পের কথাটা একবার হতভাগ্যদের শুনাইয়া দেয়।

রহম এবার হাসিয়া বলিল—কি বড়-ভাই, কথা বলছেন না যি গো?

জগন ডাক্তার বলিল—শেখজী দেখছেন কে কে আছেন এখানে। কাল আবার যাবেন তো, গিয়ে নামগুলো বলতে হবে বাবুকে, রিপোর্ট করতে হবে।

দৌলতের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে হাজী, হজ্ করিয়া আসিয়াছে, মুসলমান সমাজে তাহার একটা সম্মান প্রাপ্য আছে। রহম-ইরসাদই এতদিন তাহাকে অমান্য করিত; বলিত—টাকা থাকলেই জাহাজের টিকিট কেটে মক্কা শরীফ যাওয়া যায়। হজ্ করে এসেও যে সুদ খায়, লোকের সম্পত্তি ঠকিয়ে নেয়—হজের পুণ্যি তার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাকে মানি না। তাহাদের সেই অবজ্ঞা সমস্ত লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। সে সঞ্চরণ তাহাকে কোন্ স্তরে টানিয়া নামাইতে চাহিতেছে, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল সে। চকলার হিঁদুরা সমেত তাহাকে উপহাস করে, অশ্রদ্ধা করে।

ইরসাদ বলিল—কি চাচা, গরিবানদের সাথে কথাই বলেন'নি গো।

দৌলত বলিল—কি বুলব ইরসাদ, বুলতে শরম লাগছে আমার।

জগন বলিয়া উঠিল—আরে বাপরে! শেখজীর শরম লাগছে যখন—তখন না-জানি সে কি কথা!

দৌলত বলিল—তুমার সাথে আমার কোন বাত নাই ডাক্তার। আমি বলছি রহমকে আর ইরসাদকে—আমার জাতভাইদিগে। আমাদিগের বড়ো সর্বনাশ! এখানে কি সাধে দৌড়াইছি? শুন হে রহম, তুমিও শুন ইরসাদ, আজ মুখুয্যেবাবু আমাকে বুললে—তুমি বলিয়ো দৌলত, তুমাদের জাতভাইদিগে—হাঙ্গাম সহজে মিটিয়ে না নিলে, তামাম কুসুমপুর আমি ছারখার করে দিব।

'গ্রামের লোকে'র পরিবর্তে 'জাতভাই' এবং 'যাহারা হাঙ্গামা করবে' তাহাদের পরিবর্তে 'তামাম কুসুমপুর' বলিয়া দৌলত নিজেও রহম-ইরসাদের আত্মীয় হইবার চেষ্টা করিল।

রহম গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিল—তামাম কুসুমপুর ছারখার করে দিবে?

ইরসাদ হাসিয়া বলিল—আপনি—আপনি তো মিয়া মোকাদিম লোক, বাবুদের সঙ্গে দহরম-মহরম—তামাম কুসুমপুর গেলেও আপনি থাকবেন, আপনার ভয় কি?

—না, আমিও থাকব না। আমারেও বাদ দিবে না রে। আমি বুললাম—আমি বুড়া হলাম কর্তা, আমার আর কয়টা দিন? মুসলমান হয়ে মুসলমানের সর্বনাশ আমি দেখতে পারব না। বাবু বুললে—তবে তুমিও থাকবা না, দৌলত, কুসুমপুরে আমি হিঁদুর গাঁ বসাব। ওই জগন ডাক্তারই তখুনই গাঁয়ে এসে ভিটে তুলবে। দেবু ঘোষও আসবে। দেখুড়ার তিনুও আসবে। ব্যাপারটা বুঝেছ?

সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কী খেলিয়া গেল।

সঙ্ঘবদ্ধ জনতা দুই ভাগ হইয়া পরস্পরের দিকে প্রথমটা চাহিল বেদনাতুর দৃষ্টিতে, তারপর চাহিল সন্দেহপূর্ণ নেত্রে।

জগন প্রতিবাদ করিয়া একবার কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শুধু 'কক্ষণও না'—এই কথাটি ছাড়া আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

রহম উঠিয়া দাঁড়াইল। দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি, উদ্ধত কোপন স্বভাব—তাহার উপর রমজানের রোজার উপবাসে মস্তিষ্ক উষ্ণ স্নায়ুমণ্ডলী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া আছে—সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া সদম্ভে বলিল—তা হলে চাকলার হিঁদুর গাঁগুলানও আমরা ছারখার করে দিব।

দারুণ হট্টগোলের মধ্যে মিটিং ভাঙিয়া গেল।

রমজানের পবিত্র মাস। 'রমজে'র অর্থ জ্বলিয়া যাওয়া। রমজানের মাসে রোজার উপবাসের কৃচ্ছ্রসাধনের বহ্নিতে মানুষের পাপ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। আগুনে পুড়িয়া লোহার যেমন জংমরিচার কলঙ্ক নষ্ট হয়—তেমনি ভাবেই ক্ষুধার আগুনে পুড়িয়া মানুষ খাঁটি হইবে—এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সময়টিতে উপবাসক্লিষ্ট মুসলমানদের মনে দৌলতের ওই

কথাটা বারুদখানায় অগ্নিসংযোগের কাজ করিল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তেজনা নেহাত অল্প হইল না। গ্রামে গ্রামে লোক জটলা পাকাইতে আরম্ভ করিল।

ইহার উপর দিন দিন নূতন নূতন গুজব রটিতে লাগিল—ভীষণ আশঙ্কাজনক গুজব। কোথা হইতে ইহার উদ্ভব তাহার সন্ধান কেহ করিল না, সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিয়া দেখিল না। উত্তেজনার উপর উত্তেজনায় দুই সম্প্রদায়ই মাতিয়া উঠিল।

থানায় ক্রমাগত ডায়রি হইতেছে। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যাইতেছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে, কমিশনারের কাছে, মুসলিম লীগের অফিসে, হিন্দু মহাসভায়। বাবুদের মোটর গাড়িটা এই বর্ষার দিনেও কাদাজল ঠেলিয়া গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ীতে ঘুরিতেছে বাবুদের নায়েব ও বাবুদের উকীল। সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায় বিপন্ন। প্রকাণ্ড এক মিটিং হইবে বাবুদের নাটমন্দিরে। কুসুমপুরের মসজিদে মুসলমানেরা মজলিশ করিতেছে। আশেপাশের গ্রামে যেখানে মুসলমান আছে খবর পাঠানো হইয়াছে। দৌলত শেখ রহমকে পাশে লইয়া বসিয়াছে।

একা ইরসাদ কেবল ক্রমশ যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। সে কথাবার্তা বিশেষ বলে না। নীরবে বসিয়া শুধু দেখে আর শোনে। অবসর সময়ে আপনার বাড়ীতে বসিয়া ভাবে। ইরসাদ সংসারে একা মানুষ, তাহার স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসে না। ইরসাদের বিবাহ হইয়াছে কয়েক মাইল দূরবর্তী গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবারে। শ্যালকেরা কেহ উকীল, কেহ মোক্তার। তাহাদের ঘরের মেয়ে আসিয়া ইরসাদদের দরিদ্র সংসারে থাকিতে পারে না। তাহার এবং তাহার বাপ-ভাইয়ের দাবি ছিল--ইরসাদ আসিয়া শ্যালকদের কাহারও মুহুরীর কাজ করুক। শহরে তাহাদের বাসাতেই থাকিবে—রোজগারও হইবে। কিন্তু ইরসাদ সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নাই। মেয়েটি সেই কারণেই আসে না। ইরসাদও যায় না। তালাক দিতেও তাহার আপত্তি নাই। তবে সে বলে—তালাকের দরখাস্ত সে করিবে না, করিতে হয় তাহার স্ত্রী করিতে পারে। আপনার ঘরে একা বসিয়া সে সমস্ত ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে। রহম চাচা আজও বুঝিতে পারিতেছে না—কি হইতে কি ঘটিয়া গেল! সমস্ত গ্রামটা গিয়া পড়িয়াছে দৌলত শেখের মুঠার মধ্যে।

দৌলত অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে। রমজানের উপবাসের সময় গৃহস্থকে দান করিতে হয়, দীন-দুঃখী মুসলমানকে গম, ময়দা, কিসমিস বা তাহার মূল্যের পরিমাণ চাল কলাই দান করিয়া ঈশ্বরের দরবারে 'ফেতরা' আদায় দিতে হয়। সম্পদশালী ব্যক্তিদের উপর শাস্ত্রের নির্দেশ—তাহারা সোনারূপা দান করিয়া 'ফেতরা' আদায় দিবে। ধনী দৌলত 'ফেতরা' আদায় দিত তাহার রাখাল কৃষাণ মারফৎ। সেরখানেক করিয়া চাল দিয়া সে এক ঢিলে দুই পাখী মারিত। পর্ব উপলক্ষে রাখাল কৃষাণদের বকশিশ দেওয়াও হইত, আবার খোদাতালার দরবারে পুণ্যের দাবিও জানানো হইত। এই লইয়া গ্রামে প্রতিজনে দৌলতের সমালোচনা করিয়াছে, তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। সে সবই দৌলতের

কানে যাইত। কিন্তু এতকালের মধ্যে সে এসব গ্রাহ্যও করে নাই। এবার সেই দৌলত ঘোষণা করিয়াছে, লোকেরা সেই কথা নির্লজ্জের মত সগৌরবে বলিয়া বেড়াইতেছে—শেখজী এবার খাঁটি আমিরের মত 'ফেতরা' আদায় দিবে। শেখের দলিজা হইতে অর্থী-প্রার্থী শুধু হাতে ফিরিবে না। রমজানের সাতাশ রাত্রিতে "শবে কদর" উপলক্ষে সে সমস্ত রাত্রি জাগিবে, গোটা গাঁয়ের লোককে সমাদর করিয়া খাওয়াইবে। বুদ্ধিহীন লোকগুলি হাঁ করিয়া আছে সেই রাত্রির অপেক্ষায়। রহম চাচা পর্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছে—শেখের এতদিনে মতি ফিরিয়াছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দৌলত শেখ রহমকে বলিয়াছে—মামলা হয়—টাকা লাগে—আমি দিব তুয়াদিকে!

ইরসাদের হাসি আসিল। মনে পড়িল—ছেলেবেলায় সে একখানা ছবিওয়ালা ছেলেদের বইয়ে পড়িয়াছিল—কুমীরের বাড়ীর নিমন্ত্রণের গল্প। গল্পের শেষের ছবিটা তাহার চোখের উপর জ্বল্-জ্বল্ করিয়া ভাসিতেছে, নিমন্ত্রিতদের খাইয়া স্ফীতোদর কুমীর বসিয়া গড়গড়ার নল টানিতেছে।

—ইরসাদ! বাপজান! ইরসাদ! উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল রহম।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইরসাদ সাড়া দিল—আসুন, ভিতরে আসুন, চাচা।

—আরে বাপজান—তুমি বাইরিয়া এস। জলদি এস। দেখ দেখ!

—কি? ইরসাদ ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

—দেখ!

ইরসাদ কিছু দেখিতে পাইল না। শুধু বহুজনের সমবেত পদধ্বনির মত একটা শব্দ কানে আসিল। পরক্ষণেই রাস্তার বাঁক ঘুরিয়া আবির্ভূত হইল—খাকী পোশাক-পরা আর্মড কনস্টেবল। দুই-চারিজন নয়—প্রায় জন-পঁচিশ। তাহারা মার্চ করিয়া পথের ধুলা উড়াইয়া চলিয়া গেল; কঙ্কণার জমাদারও তাহাদের সঙ্গে ছিল—সে ইরসাদ এবং রহমকে দেখিয়া আর্মড কনস্টেবলের নেতাকে কি বলিল।

রহম বলিল—আমাদিগে দেখায়ে কি বুললে বল তো?

ইরসাদ ঈষৎ হাসিল, কিছু বলিল না।

রহম বলিল—পঞ্চাশ জনা ফৌজ আসছে বাপজান। সঙ্গে ডিপুটি আছে একজনা। দেখ কি হয়!

হইল না বিশেষ কিছু।

ডেপুটি সাহেবের মধ্যস্থতায় বিবাদটা মিটিয়া গেল। কঙ্কণার মুখুয্যেবাবু পঞ্চাশ টাকার মিঠাই পাঠাইয়া দিলেন কুসুমপুরের মসজিদে। রহমকে ডাকিয়া তাহাকে সম্মুখে বেঞ্চিতে বসাইয়া বলিলেন—কিছু মনে করো না রহম।

দৌলত শেখও গিয়াছিল। সে বলিল—দেখেন দেখি, জমিদার আর প্রজা—বাপ আর বেটা। বেটার কসুর হলে বাপ শাসন করে, যুগ্যি বেটা হলে তার গোসা হয়। বাপ আবার

পেয়ার করলি পরেই সে গোসা ছুটে যায়।

রহমও এ আদরে গলিয়া গেল ; সেও বলিল—হুজুরকে অনেক সালাম আমার। আমাদের কসুরও হুজুর মাপ করেন।

ইরসাদকে ডাকা হয় নাই, ইরসাদও যায় নাই ; রহম অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ইরসাদ বলিয়াছিল—মুরুব্বী শেখজী যাচ্ছেন—তুমি যাচ্ছ, আমার শরীরটা ভাল নাই চাচা।

দৌলত এবং রহম চলিয়া গেল।

খানিক পরে ইরসাদের ডাক আসিল। একজন কনস্টেবল থানা হইতে জরুরী তলব লইয়া আসিল। ইরসাদ একটু চকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে জামাটা গায়ে দিয়া মাথায় টুপিটি পরিয়া কনস্টেবলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

থানায় গিয়া দেখিল—আরও একজনকে ডাকা হইয়াছে। দেবু থানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে।

—দেবু-ভাই ! থানার বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচে সে দেবুকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিল। সেদিনের কথা মনে করিয়াও তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না।

দেবু হাসিয়া বলিল—এস ভাই।

ইরসাদ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সব ঝুট হয়ে গেল দেবু-ভাই, সব বরবাদ গেল।

দেবু বলিল—তার আর করবে কি বল ? উপায় কি ?

ইরসাদ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার কাছে আমার কসুর হয়ে আছে, দেবু-ভাই !

দেবু তাহার হাতখানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া বলিল—আমাদের শাস্ত্রে কি আছে, জানো ভাই ? সুখে, দুঃখে, রাজার দরবারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে যারা পাশাপাশি থাকে তারাই হল প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুর কাছে বন্ধুর ভুলচুক হয় বই কি, তার জন্যে মাপ চাইতে নাই। দেবু তাহার স্বভাবসুলভ প্রীতির হাসি হাসিল।

ইরসাদও তাহার মুখের দিকে চাহিল। ঠিক এই সময়েই তাহাদের ডাক পড়িল।

ডেপুটি সাহেব দুজনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—লীডারি হচ্ছে বুঝি ?

দেবু আপত্তির সুরে কি দুই-এক কথা বলিতে গেল।

ডেপুটি বলিলেন—থাম।

তারপর বলিলেন—এবার খুব বেঁচে গেলে, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান !

দুজনে একসঙ্গে থানা হইতে বাহির হইল। থানার ব্যাপারটা দুইজনের অন্তরেই আঘাত দিয়াছিল। কথাবার্তা ওই কঠিন শাসনবাক্য ছাড়া আর কিছু হয় নাই, যে বিচিত্র দৃষ্টিতে ডেপুটি সাহেব তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল—সেই দৃষ্টি দারোগাবাবু, জমাদার, কনস্টেবল, এমন কি চৌকিদারদের চোখেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

নীরবেই দুইজনে পথে চলিতেছিল। ক্ষুদ্র শহরের জনাকীর্ণ কলরবমুখর পথ নীরবেই অতিক্রম করিয়া তাহারা আসিয়া উঠিল ময়ূরাক্ষীর রেলওয়ে ব্রীজে। ব্রীজ পার হইয়া তাহারা ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের পথ ধরিল। নির্জন পথ। বাঁধের দুই পাশে বর্ষার জল পাইয়া শরবন ঘন সবুজ প্রাচীরের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ ইরসাদ উপরের দিকে মুখ তুলিয়া হাত বাড়াইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল—খোদা, তুমি তো সব জানছ, সব দেখছ! বিচার করো—তুমি এর বিচার করো। অন্যায় যদি আমার হয়, হে খোদাতালা, তুমি আমাকে সাজা দিয়ো—আমার চোখের দৃষ্টি নিয়ো, আমি যেন পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াই। লা-ইলাহা-ইল্লা-লাহ্! তুমি ছাড়া আমার কেউ নাই। তুমি বিচার করো। রোজা করে তোমার গোলাম—আমি—তোমার কাছে হাত জোড় করে বলছি—তুমি এর বিচার করো। তোমার ইন্সাফে দোষী সাব্যস্ত হবে যারা, সেই বেইমানদের মাথায়—

ইরসাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

দেবু পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ইরসাদ-ভাইয়ের মর্মদাহের জ্বালা সে অনুভব করিয়াছিল। মর্মদাহ তাহারও কম নয়। কিন্তু তাহার যেন সব সহিয়া গিয়াছে। কানুনগোর অপমান, জেল, বিলু এবং খোকনমণির মৃত্যু, সদ্য সদ্য তাহার দুই-দুইটা জঘন্য অপবাদ, ছিরু ঘোষের চক্রান্ত—তাহাকে ক্রমশঃ যেমন সংবেদন-শূন্য, তেমনি সহনশীল করিয়া তুলিয়াছে। এই সেদিনও তাহার মনে আগুন উঠিয়াছিল অকস্মাৎ নিষ্ঠুর প্রজ্বলনে; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহা নিভিয়া গিয়াছিল। সেদিন হইতে সে যেন আরও প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। দেবু বুঝিল, —ইরসাদ বিপক্ষদিগকে নিষ্ঠুর অভিসম্পাতে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে—সে তাহার পিঠে হাত দিয়া গাঢ় স্নেহস্পর্শ জানাইয়া স্নিগ্ধস্বরে বাধা দিয়া বলিল—থাক, ইরসাদ-ভাই, থাক।

ইরসাদ তাহার মুখের দিকে চাহিল।

দেবু বলিল—কাউকে শাপ-শাপান্ত করতে নেই, ইরসাদ-ভাই।

ইরসাদের চোখ দুইটা দপ-দপ করিয়া জ্বলিতেছিল।

দেবু হাসিয়া বলিল—নিজে যদি ভগবানের কাছে অপরাধ করি—সংসারে পাপ করি, তবে ভগবানকে বলতে হয় আমাকে সাজা দাও। সে সাজা মাথা পেতে নিতে হয়। কিন্তু অন্য কেউ যদি পাপ করে সংসারে, আমার অনিষ্ট করে, তবে ভগবানকে বলতে হয়—ভগবান, ওকে তুমি ক্ষমা কর, মাফ কর!

ইরসাদ স্থিরদৃষ্টিতে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল; এবার দুইটি তপ্ত অশ্রুর ধারা তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু হইতে গড়াইয়া পড়িল।

দেবু বলিল—এস। মাথার ওপর রোদ চড়ছে। রোজার সময়। পা চালিয়ে এস।

চাদরের খুঁটে চোখ মুছিয়া ইরসাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—আমদের গাঁ হয়ে চল। আমার বাড়ীতে একটু বসবে, জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ী যাবে, কেমন?

ইরসাদ এবার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—চল।

গ্রামের মধ্যে তাহারা দুইজনে যখন ঢুকিল, তখন গ্রামের পথ লোকজনে পরিপূর্ণ। পল্লী-পথের জনবিরলতাই স্বাভাবিক রূপ। এমন অস্বাভাবিক জনতা দেখিয়া দেবু ও ইরসাদ দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। ইরসাদ বলিল—ব্যাপার কি দেবু-ভাই?

দেবু ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিয়াছে। ভিড় শুধু মানুষেরই নয়, রাস্তার ধারে গাছতলায় গাড়ীরও ভিড় জমিয়া গিয়াছে। দেবু বলিল—দেখবে চল। বিপদ কিছু নয়—সে একটু হাসিল।

ইরসাদও চাষী মুসলমানের ঘরের ছেলে। সুস্থ অবস্থা হইলে ব্যাপারটা সে মুহূর্তে বুঝিতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার চিত্ত ও মস্তিষ্ক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।

পথের ভিড় অতিক্রম করিয়া অল্প খানিকটা আসিয়াই শ্রীহরি ঘোষের বাড়ী। তাহার খামারবাড়ীর প্রবেশের দরজাটা সম্প্রতি পাকা ফটকে পরিণত করিয়াছে শ্রীহরি। প্রশস্ত ফটকটা দিয়া গাড়ী পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। ফটকটার মুক্তপথে আঙুল বাড়াইয়া দেবু বলিল—ওই দেখ!

তকতকে খামারের উঠানে একখানা ঘরের সমান উচ্চ স্তূপ বাঁধিয়া রাশি রাশি ধান ঢালা হইয়াছে। ভাদ্রের নির্মেঘ আকাশে প্রখর সূর্যের আলোতে শরতের শুভ্রতা। সেই শুভ্র উজ্জ্বল রৌদ্রের প্রতিফলনে পরিপুষ্ট সিঁদুরমুখী ধানের রাশি ঠিক যেন পাকা-সোনার বর্ণে ঝলমল করিতেছিল।

শ্রীহরি একখানা চেয়ারে বসিয়া আছে—একটা লোক একটা ছাতা ধরিয়াছে তাহার মাথার উপর। মধ্যস্থলে বাঁশের তে-কাটায় প্রকাণ্ড এক দাঁড়িপাল্লায় সেই ধান ওজন হইতেছে।—রাম-রাম রাম-রাম, রামে-রামে দুই-দুই; দুই রামে তিন-তিন!

আশপাশ ঘিরিয়া বসিয়া আছে গ্রাম-গ্রামান্তরের মোড়ল-মাতব্বরেরা। বাহিরে পাঁচিলের গায়ে ঘরের দেওয়ালের পাশে সঙ্কীর্ণ চালের ছায়ায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে সাধারণ চাষীরা লুব্ধ প্রত্যাশায়। তাহারা সকলেই দেবুকে দেখিয়া মাথা নত করিল।

দেবু কাহাকেও কোন কথা বলিল না। ইরসাদকে লইয়া সে আপনার দাওয়ায় গিয়া উঠিল। সেখান হইতে শুনিল জগন ডাক্তার উচ্চকণ্ঠে লোকগুলিকে গালিগালাজ করিতেছে।—বড়লোকের পা-চাটা কুত্তার দল! বেইমান বিশ্বাসঘাতক সব! ইতর ছোটলোক সব!

বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা। ইরসাদকে দেখিয়া সে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—ওই, কুসুমপুরের পণ্ডিত মিয়া যি গো!

ইরসাদ বলিল—হ্যাঁ। ভাল আছ তুমি?

দুর্গা বলিল—হ্যাঁ, ভাল আছি। তারপর সে দেবুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—পথ দিয়ে এলে, দেখে এলে?

—কি?

—ঘোষের দুয়ারে ভিড়?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ নয়, ইহার ঠেলা তোমাকে সামলাতে হবে। ই সব হচ্ছে তোমার লেগে। দেবু হাসিল।

দুর্গা বলিল—হাসি লয়। রাঙাদিদির ছেরাদ্দ 'নিকটিয়ে' এসেছে। পঞ্চায়েৎ বসবে।

দেবু আরও একটু হাসিল। তারপর ভিতর হইতে এক বালতি জল ও একটি ঘটি আনিয়া ইরসাদের সামনে নামাইয়া দিয়া বলিল—মুখ-হাত-পা ধুয়ে ফেল। রোজার উপোস, জল খাবার তো জো নাই।

ইরসাদ বলিল—কুল্লি করবার পর্যন্ত হুকুম নাই।

দেবু একখানা পাখা লইয়া নিজের গায়ে—সঙ্গে সঙ্গে ইরসাদের গায়েও বাতাস দিতে আরম্ভ করিল।

দুর্গা বলিল—আমাকে দেন, পণ্ডিত, আমি দুজনাকেই বাতাস করি।

চোদ্দ

পঞ্চগ্রামের জীবন-সমুদ্রে একটা প্রচণ্ড তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। সেটা শতধা ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সমুদ্রের গভীর অন্তরে অন্তরে যে স্রোতধারা বহিয়া চলিয়াছে, তরঙ্গবেগটা অস্বাভাবিক স্ফীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই স্রোতের ধারায় টান দিয়াছিল, একটা প্রকাণ্ড আবর্তনের আলোড়নের টানে নিচের জলকে উপরে টানিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। সমুদ্রের অন্তঃস্রোতধারার আকর্ষণেই সে উচ্ছ্বাস ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরুৎসাহ নিস্তেজ জীবনযাত্রায় আবার দিনরাত্রিগুলি কোন রকমে কাটিয়া চলিল। মাঠে রোয়ার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। ভোরে উঠিয়া চাষীরা মাঠে গিয়া নিড়ানের কাজে লাগে। হাতখানেক উঁচু ধানের চারাগুলির ভিতর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আগাছা তুলিয়া ধান ঠেলিয়া আগাইয়া যায়; এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, আবার ও-প্রান্ত হইতে এ-প্রন্তের দিকে আগাইয়া আসে। মাঠের আলের উপর দাঁড়াইয়া মনে হয় মাঠটা জনশূন্য।

মাথার উপর ভাদ্রের প্রখর রৌদ্র। সর্বাঙ্গে দরদরধারে ঘাম ঝরে, ধানের ধারালো পাতায় গা-হাত চিরিয়া যায়। তবু অন্তর তাহাদের আশায় ভরিয়া থাকে, মাঠের ঐ সতেজ ধানের গাঢ় সবুজের প্রতিচ্ছায়াই যেন অন্তরে প্রতিফলিত হয়। আড়াই প্রহর পর্যন্ত মাঠে খাটিয়া বাড়ী ফেরে। স্নানাহার সারিয়া ছোট ছোট আড্ডায় বিভক্ত হইয়া বসিয়া তামাক খায়, গল্পগুজব করে। গল্পগুজবের মধ্যে বিগত হাঙ্গামার ইতিহাস, আর দেবু ঘোষ ও পদ্ম-সংবাদ। দুইটাই অত্যন্ত মুখরোচক এবং উত্তেজনাকর আলাপ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—এমন বিষয়বস্তু লইয়া আলাপ-আলোচনা যেন জমে না। কেন জমে না তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। সীতাকে অযোধ্যার প্রজারা জানিত না চিনিত না এ কথা নয়, কিন্তু তবু সীতার অশোকবনে বন্দিনী অবস্থার আলোচনার নানা কুৎসিত কল্পনায় তাহারা মাতিয়া

উঠিয়াছিল—ওই মাতিয়া উঠার আনন্দেই। কিন্তু লঙ্কায় রাক্ষসেরা মাতে নাই। অবশ্য তাহারা সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। মন্দোদরীর কথা লইয়া রাক্ষসেরা মাতে নাই। কারণ মাতনের আনন্দ অনুভব করিবার মত তাহাদের মানসিকতা লঙ্কার যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছিল। তেমনি ভাবেই বোধ হয় এ অঞ্চলের লোকের মনের কাছে কোন আলোচনাই জমিয়া উঠে না। আষাঢ়ের রথযাত্রার দিন হইতে ভাদ্রের কয়েকদিন তাহাদের জীবনে একটা অদ্ভুত কাল। দিন যেন হাওয়ায় চড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামের এত বড় মাঠে গোটা চাষটা হইয়া গেল—হাজার দু-হাজার লোক খাটিল, একদিন একটা বচসা হইল না, মারপিট হইল না। আরও আশ্চর্যের কথা—এবার বীজধানের আঁটি কদাচিৎ চুরি গিয়াছে। চাষের সময় সে কি উৎসাহ! সে কত কল্পনা-রঙীন আশা! মাঠে এবার চার-পাঁচখানা গানই শোনা গিয়াছে এই লইয়া। বাউড়ীর কবি সতীশের গানখানাই সব চেয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—

"কলিকাল ঘুচল অকালে !
দুখের ঘরে সুখ যে বাসা বাঁধলে কপালে ॥
কারু ভুঁয়ে কেউ জল না কাটে, মাঠের জল রইচে মাঠে,
(পরে) দেয় পরের কাটে আলের গোঙালে ॥
ভুলল লোকে গালাগালি, ভাই বেরাদার-গলাগলি,
অঘটনের ঘটন খালি— কলিতে কে ঘটালে।
দীন সতীশ বলে—কর জোড়ে— তেরশো ছত্তিশ সালে ॥"

সতীশের কল্পনা ছিল আবার চাষ হইয়া গেলে ভাসানের দলের মহড়ার সময় সে এই ধরনের আরও গান বাঁধিয়া ফেলিবে। কিন্তু রোয়ার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখনও বাউড়ী-ডোমপাড়ায় ভাসানের দল জমিয়া উঠে নাই। ছোট ছেলেদের দল বকুলতলায় সাজার হ্যারিকেনের আলোটা জ্বালাইয়া ঢোলক লইয়া বসে—কিন্তু বয়স্কেরা বড় আসে না। সমস্ত অঞ্চলটার মানুষগুলির মধ্যে একটা অবসন্ন ছত্রভঙ্গের ভাব।

অন্ধকার-পক্ষ চলিয়াছে! দেবু আপনার দাওয়ায় তক্তাপোশের উপয় হ্যারিকেন জ্বালাইয়া বসিয়া থাকে। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে। কুসুমপুরের লোকে তাহাকে ঘৃণ্য ঘুষ লওয়ার অপবাদ দিয়াছিল। ইরসাদ-ভাই সত্য-মিথ্যা বুঝিয়াছে—তাহার কাছে ইহা স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছে ;—সে অপবাদের গ্লানি তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সেজন্য তাহার দুঃখ নাই। শ্রীহরি ঘোষ তাহার সহিত পদ্মকে ও দুর্গাকে জড়াইয়া জঘন্য কলঙ্ক রটনা করিয়াছে, পঞ্চায়েতের বৈঠক বসাইবার উদ্যোগে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে —সেজন্যও তাহার কোন দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, রাগ নাই। স্বয়ং ঠাকুর মহাশয় তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। পঞ্চায়েৎ যদি তাহাকে পতিতও করে, তবুও সে দুঃখ করিবে না, কোন ভয়ই সে করে না। কিন্তু তাহার গভীর দুঃখ—ধর্মের নামে শপথ করিয়া যে ঘট এ

অঞ্চলের লোকে পাতিয়াছিল, সেই ঘট তাহারাই চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। ইরসাদ-রহম কি ভুলটাই করিল! সামান্য ভুলটা যদি তাহারা না করিত! তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাতেও ক্ষতি ছিল না। তাহাকে বাদ দিয়াও কাজ চলিত। কিন্তু এক ভুলেই সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

লণ্ডভণ্ডই বটে। এই হাঙ্গামা মিটমাটের উপলক্ষে কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে কুসুমপুরের শেখেদের বৃদ্ধির ব্যাপারটাও চুকিয়া গিয়াছে। দৌলত এবং রহমকে মধ্যস্থ রাখিয়া বৃদ্ধির কাজ চলিতেছে। টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি। সেদিকে হয়ত খুব অন্যায় হয় নাই। কিন্তু জমি বৃদ্ধিরও বৃদ্ধি দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। কথাটা শুনিতে বা প্রস্তাবটা দেখিতে অন্যায় কিছু নাই। পাঁচ বিঘা জমির দশ টাকা খাজনা দেয় প্রজারা, সেখানে জমি ছয় বিঘা হইলে এক বিঘার বাড়তি খাজনা প্রজারা দেয় এবং জমিদারের ন্যায্য প্রাপ্য—ইহা তো আইনসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, ধর্মসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অনেক গোলমাল আছে ইহার মধ্যে। জমিদার-সেরেস্তায় বহুক্ষেত্রে জমি-জমার অঙ্ক ঠিক নাই। মাপের গোলমাল তো আছেই। সেকালের মাপের মান একাল হইতে পৃথক ছিল।

দৌলতের বৃদ্ধি কি হারে হইয়াছে বা হইবে তাহা কেহ এখনও জানে না। রহম ওই হারেই বৃদ্ধি দিয়াছে। সে গোমস্তার পাশে বসিয়া মধ্যস্থতা করিবার সম্মান পাইয়াই সব ভুলিয়া গিয়াছে।

কুসুমপুরে বৃদ্ধি অস্বীকার করিয়াছে একা ইরসাদ।

শিবকালীপুরে শ্রীহরি ঘোষের সেরেস্তাতেও বৃদ্ধির কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ওই মুখুয্যেবাবুদের দাগেই দাগা বুলাইবে সকলে। এ গ্রামে জগন এবং আরো দুই-একজন মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী কোনদিন ধর্মঘটে নাই, কিন্তু প্রাচীনকালের আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধি দিতে রাজী হয় নাই। সে আপনার সংকল্পে অবিচলিত আছে।

দেখুড়িয়ায় আছে কেবল তিনকড়ি। ভল্লারাও আছে, কিন্তু তাহাদের জমি কতটুকু? কাহারও দুই বিঘা—কাহারও বড় জোর পাঁচ, কাহারও বা মাত্র দশ-পনের কাঠা।

শ্রীহরি ঘোষের বৈঠকখানায় মজলিশ বসে। একজন গোমস্তার স্থলে এখন দুইজন গোমস্তা। সাময়িকভাবে একজন গোমস্তা রাখিতে হইয়াছে। বৃদ্ধির কাগজপত্র তৈয়ারী হইতেছে। ঘোষ বসিয়া তামাক খায়। হরিশ, ভবেশ প্রভৃতি মাতব্বরেরা আসে। মধ্যে মধ্যে এ অঞ্চলের পঞ্চায়েতমণ্ডলীর মণ্ডলেরাও আসে। দু-চারজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও পায়ের ধুলা দেন। শাস্ত্র-আলোচনা হয়। শ্রীহরির উৎসাহের অন্ত নাই। সে নিজের গ্রামের উন্নতির পরিকল্পনা দশের সম্মুখে সগর্বে প্রকাশ করিয়া বলে।

দুর্গোৎসব মহাযজ্ঞ—আগামী বৎসর সে চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসব করিবে। সকলে শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠে। গ্রামে দশভুজার আবির্ভাব—সে তো গ্রামেরই মঙ্গল। গ্রামের

ছেলেদের লইয়া যাইতে হয় দ্বারকা চৌধুরীর বাড়ী, মহাগ্রামে ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী, কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ী।

—সেই তো! শ্রীহরি উৎসাহভরে বলে—সেইজন্যেই তো! চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হবে; আপনারা দশজনে আসবেন, বসবেন, পূজা করাবেন। ছেলেরা আনন্দ করবে, প্রসাদ পাবে। একদিন গ্রামের জাত-জ্ঞাত খাবে। একদিন হবে ব্রাহ্মণভোজন। অষ্টমীর দিন রাত্রে লুচি-ফলার। নবমীর দিন গাঁয়ের যাবতীয় ছোটলোক খিচুড়ী যে যত খেতে পারে। বিজয়ার বিসর্জনের রাত্রে বারুদের কারখানা করব।

লোকজন আরও খানিকটা উৎসাহিত হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কেহ উপস্থিত থাকিলে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া—ঘোষের পরিকল্পনাকে রাজকীর্তির সহিত তুলনা করিয়া বলে—দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ, যজ্ঞ করবার ভারই তো রাজার! করবে বই কি! ভগবান যখন তোমাকে এ গ্রামের জমিদারী দিয়েছেন, মা-লক্ষ্মী যখন তোমার ঘরে পা দিয়েছেন—তখন এ যে তোমাকেই করতে হবে। তিনিই তোমাকে দিয়ে করাবেন।

শ্রীহরি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়, বলে—তিনি করাবেন, আমি করব সে তো বটেই। করতে আমাকে হবেই। তবে কি জানেন, মধ্যে মধ্যে মনে হয়—করব না, কিছু করব না আমি গাঁয়ের জন্যে। কেন করব বলুন? কিছুদিন ধরে আমার সঙ্গে সব কি কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি? আরে বাপু, রাজার রাজ্য। তাঁর রাজ্যে আমি জমিদারী নিয়েছি। তিনি বৃদ্ধি নেবার একতিয়ার আমাকে দিয়েছেন তবে আমি চেয়েছি—দোব না দোব না করে নেচে উঠল সব গেঁয়ো পণ্ডিত একটা চ্যাংড়া ছোঁড়ার কথায়। মুসলমানদের নিয়ে জোট বেঁধে শেষ পর্যন্ত কি কাণ্ডটা করলে বলুন দেখি!

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। সব মনে পড়িয়া যায়। সুস্থ জীবনোচ্ছ্বাসের আনন্দ-আস্বাদ, সুস্থ আত্মশক্তির ক্ষণিক নির্ভীক প্রকাশের ঘুমন্ত মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কেহ মাথা নামায়, কাহারও দৃষ্টি শ্রীহরির মুখ হইতে নামিয়া মাটির উপর নিবদ্ধ হয়।

শ্রীহরি বলিয়া যায়—যাক্ ভালয় ভালয় সব চুকে গিয়েছে ভালই হয়েছে। ভগবান মালিক, বুঝলেন, তিনিই বাঁচিয়ে দিয়েছেন!

—নিশ্চয়ই। ভগবান মালিক বই কি।

—নিশ্চয়। কিন্তু ভগবান তো নিজে কিছু করেন না। মানুষকে দিয়েই করান। এক-একজনকে তিনি ভার দেন। সে ভার পেয়ে যে তাঁর কাজ না করে, সেই হল আসল স্বার্থপর—অমানুষ, জন্মান্তরে তার দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। তাদের অবহেলায় সমাজ ছারখার হয়।

ব্রাহ্মণেরা এ কথায় সায় দেয়, বলে—নিশ্চয়, রাজা রাজকর্মচারী সমাজপতি এরা যদি কর্তব্য না করে প্রজা দুঃখ পায়, সমাজ অধঃপাতে যায়। কথায় বলে, রাজা বিনে রাজ্য-নাশ।

শ্রীহরি বলে—এ গ্রামে বদমায়েশি করে কেউ আর রেহাই পাবে না, দুষ্ট বদমাশ যারা—

তাদের আমি দরকার হলে গাঁ থেকে দূর করে দোব।

সে তাহার বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা বলিয়া যায়। এ অঞ্চলে নবশাখা সমাজের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর সে পুনর্গঠন করিবে; কদাচার, ব্যভিচার, ধর্মহীনতাকে দমন করিবে। কোথাও কোন দেবকীর্তি রক্ষা করিবার জন্য করিবে পাকা আইনসম্মত ব্যবস্থা। দেবতা, ধর্ম এবং সমাজের উদ্ধারের ও রক্ষার একটি পরিকল্পনা সে মুখে মুখে ছকিয়া যায়।

সে বলে—আপনারা শুধু আমার পিছনে দাঁড়ান। কিছু করতে হবে না আপনাদের। শুধু পেছনে থেকে বলুন—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমরা আছি। দেখুন আমি সব সায়েস্তা করে দিচ্ছি। ঝড়-ঝঞ্ঝাট আসে সামনে থেকে মাথা পেতে নোব। টাকা খরচ করতে হয় আমি করব। পাঁচ-সাত কিস্তি উপরি উপরি নালিশ করলে—যত বড়লোক হোক জিভ বেরিয়ে যাবে এক হাত। স্ত্রী-পুত্র যায় আবার হয়। কত দেখবেন—

সে আঙুল গনিয়া বলিয়া যায়—কাহার কাহার স্ত্রী-পুত্র মরিয়াছে, আবার বিবাহ করিয়া তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে। সত্যই দেখা গেল, এ গ্রামের ত্রিশজনের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার মধ্যে আটাশজনেরই বিবাহ হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র দুই-ই গিয়াছে পাঁচজনের, তাহার মধ্যে চারজনেরই আবার স্ত্রী-পুত্র দুই-ই হইয়াছে। হয় নাই কেবল দেবু ঘোষের। সে বিবাহ করে নাই।

—কিন্তু—শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—সম্পত্তি লক্ষ্মী, গেলে আর ফেরেন না। বড় কঠিন দেবতা। আর প্রজা যত বড় হোক—কিস্তি কিস্তি বাকী খাজনার নালিশ হলে সম্পত্তি তার যাবেই।

স্তিমিত শুদ্ধ লোকগুলি মাটির পুতুলের মত হইয়া যায়। শ্রীহরি তাহাদের সহায়, তাহারা ঘোষেরই সমর্থনকারী। শ্রীহরি বলিতেছে—তাহাদের জোরেই তাহার জোর, তবু তাহাদের মনে হয় তাহাদের মত অসহায় দুঃখী এ সংসারে আর নাই। উপরের দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ গভীর স্বরে ভবেশ ভগবানকে ডাকিয়া উঠে—গোবিন্দ গোবিন্দ! তুমিই ভরসা!

শ্রীহরি বলে—এই কথাটিই লোকে ভুলে যায়। মনে করে আমিই মালিক। হামসে দিগর নাস্তি। আরে বাপু—তাহলে ভগবান তো তোকে রাজার ঘরেই পাঠাতেন।

সকলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হয়, আপন আপন কাজের কথাগুলি যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিয়া সবিনয়ে ব্যক্ত করে।

—আমার ওই জোতটার পুরানো খরিদা দলিল খুঁজে পেয়েছি শ্রীহরি। জমি যে বাড়ছে তার মানে হল গিয়ে—ওতে আবাদী জমি তোমার বারো বিঘেই ছিল; তা ছাড়া ঘাস-বেড় ছিল পাঁচ বিঘে। এখন বাবা ঘাস-বেড় ভেঙে ওটাকে সুদ্ধ আবাদী জমি করেছে। তাতেই তোমার সতেরোর জায়গায় কুড়ি বিঘে হচ্ছে।

—আচ্ছা, সুবিধেমত একদিন দেখাবেন দলিল।

ব্রাহ্মণরা বলেন—আমার দুবিঘে ব্রহ্মোত্তর মালের জমির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।

—বেশ, নমুদ আনবেন।

সকলে উঠিয়া যায়। শ্রীহরি সেরেস্তার কাজ খানিকটা দেখে, তারপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া কল্পনা করে—এবার সে লোকাল বোর্ডে দাঁড়াইবে। লোকাল বোর্ডে না দাঁড়াইলে এ অঞ্চলের পথঘাটগুলির সংস্কার করা অসম্ভব। শিবকালীপুর এবং কঙ্কণার মধ্যবর্তী সেই খালটার উপর এবার সাঁকোটা করিতেই হইবে। আর এই লোকগুলার উপর রাগ করিয়া কি হইবে? নির্বোধ হতভাগার দল সব। উহাদের উপর রাগ করাও যা—ঘাসের উপর রাগ করাও তাই।

হঠাৎ একটা জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নিত্যই আকৃষ্ট হয়। জানালা দিয়া দেখা যায় অনিরুদ্ধের বাড়ী। সে নিত্যই জানালা খুলিয়া দিয়া চাহিয়া দেখে। অন্ধকারের মধ্যে কিছু ঠাওর হয় না। তবে এক-একদিন দেখা যায় কেরোসিনের ডিবে হাতে দীর্ঘাঙ্গী কামারনী এ-ঘর হইতে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দেখুড়িয়ার তিনকড়ি আপন দাওয়ার উপর বসিয়া গোটা অঞ্চলটার লোককে ব্যঙ্গভরে গাল দেয়। তিনকড়ির গালিগালাজের মধ্যে অভিসম্পাত নাই, আক্রোশ নাই, শুধু অবহেলা আর বিদ্রূপ। সে বৃদ্ধি দিবে না। ভূপাল তাহকে ডাকিতে আসিয়াছিল; বেশ সম্মান করিয়া নমস্কার করিয়া বলিয়াছিল—যাবেন একবার মণ্ডল মশায়! বৃদ্ধির মিটমাটের কথা হচ্ছে, মোড়লরা সব আসবে। আপনি একটু—

হঠাৎ ভূপাল দেখিল তিনকড়ি অত্যন্ত রূঢ়দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, সে থমকিয়া থামিয়া গেল এবং কয়েক পা পিছাইয়া আসিল। হঠাৎ মণ্ডল মহাশয়ের চিতাবাঘের মত ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া মোটেই আশ্চর্য নয়।

তিনকড়ির মুখের পেশীগুলি এবার ধীরে ধীরে নড়িতে লাগিল। নাকের ডগাটা ফুলিয়া উঠিল, দুইপাশে জাগিয়া উঠিল অর্ধ-চন্দ্রাকারে দুইটা বাঁকা রেখা, উপরের ঠোঁটটা খানিকটা উল্টাইয়া গেল; দুরন্ত ঘৃণাভরে প্রশ্ন করিল—কোথায় যাব?

—আজ্ঞে?

—বলি কোথায় যেতে হবে?

—আজ্ঞে ঘোষ মহাশয়ের কাছারিতে।

—ওরে বেটা, ব্যাঙাচির লেজ খসলে ব্যাঙ হয়, হাতি হয় না। ছিরে পাল ঘোষ হয়েছে বেশ কথা, তার আবার মশায় কিসের রে ভেমো বাগ্দা? কাছারিই বা কিসের?

ভূপালের আর উত্তর করিতে সাহস হইল না।

তিনকড়ি হাত বাড়াইয়া আঙুল দিয়া পথ দেখাইয়া বলিল—যা, পালা।

ভূপাল চলিয়াই যাইতেছিল—হঠাৎ দাঁড়াইল, খানিকটা সাহস করিয়া বলিল—আমার কি দোষ বলেন? আমি হুকুমের গোলাম, আমাকে বললেন আমি এসেছি। আমার উপর ক্যানে—

তিনকড়ি এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—হুকুমের গোলাম! বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে কোথাকার, বেরো বলছি, বেরো!

ভূপাল পলাইয়া বাঁচিল। তিনকড়ির কথায় কিন্তু তাহার রাগ হইল না। বিশেষ করিয়া ভল্লা, বাগ্দী, বাউড়ী, হাড়ি—ইহাদের সঙ্গে তিনকড়ির বেশ একটি হৃদ্যতা আছে। তিনকড়ির বাছ-বিচার নাই; সকলের বাড়ী যায়, বসে, গল্প করে, কল্কে লইয়া হাতেই তামাক খায়। এককালে সে মনসার গানের দলেও ইহাদের সঙ্গে গান গাহিয়া ফিরিত। আজও রসিকতা করে, গালিগালাজও করে, তাহাতে বড় একটা কেহ রাগ করে না। ভূপাল বরং পথে আপন মনেই পরম কৌতুকে খানিকটা হাসিয়া লইল। গালাগালখানি বড় ভাল দিয়েছে মোড়ল। 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে'—অর্থাৎ ঘোষ মহাশয় ছুঁচো। তাহার নিজের চামচিকে হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু ঘোষ মহাশয়কে ছুঁচো বলিয়াছে—এই কৌতুকেই সে হাসিল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। মাঝে মাঝে মেঘ আসে, উতলা ঠাণ্ডা বাতাস দেয়, গাছ-পালার ঘন পত্রপল্লবে শন্-শন্ শব্দে সাড়া জাগিয়া উঠে, খানাডোবায় ব্যাঙগুলা কলরব করে, অশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক উঠে, মধ্যে মধ্যে ফিন্‌ফিনে ধারায় বৃষ্টি নামে; তিনকড়ি দাওয়ার উপর অন্ধকারে বসিয়া তামাক টানে আর গালিগালাজও করে। বসিয়া শোনে রাম ভল্লা—তারিণী ভল্লা।

—শেয়াল, শেয়াল! বেটারা সব শেয়াল, বুঝলি রাম, শেয়ালের দল সব।

রাম ও তারিণী অন্ধকারের মধ্যেই সমঝদারের মত জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে, বলে—তা বৈকি!

তিনকড়ির কোন গালিগালাজই মনঃপূত হয় না, সে বলিয়া উঠে—বেটারা শেয়ালও নয়। শেয়ালে তো তবু ছাগল-ভেড়াও মারতে পারে। ক্ষেপেও কামড়ায়। বেটারা সব খেঁকশেয়াল।

ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়া পড়ে গৌর আর স্বর্ণ। তাহারা বাপের উপমা শুনিয়া হাসে।

—ভল্লুকের বাচ্চা বেটারা সব উল্লুকের দল।

এবার স্বর্ণ আর থাকিতে পারে না—সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

তিনকড়ি ধমকাইয়া উঠে—গৌর বুঝি ঢুলছিস?

গৌর হাসিয়া বলে—কৈ, না!

—তবে? তবে সন্ন হাসছিল কেন?

গৌর বলে—তোমার কথা শুনে হাসছে সন্ন।

—আমার কথা শুনে? তিনকড়ি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—হাসির কথা নয় মা। অনেক দুঃখে বলছি মা। অনেক তিতিক্ষেতে। ছেলেমানুষ তোরা, কি বুঝবি!

স্বর্ণ অপ্রস্তুত হইয়া বলে—না বাবা, সেজন্য নয়। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচভরেই আবার বলে—তুমি বললে না—ভল্লুকের বাচ্ছা উল্লুক—তাই। ভল্লুকের পেটে উল্লুক হয় ?

এবার তিনকড়িও হাসিয়া উঠে। ও, তা বটে ! ওটা আমারই ভুল বটে !

রাম আর তারিণীও এবার হাসে। ঘরের মধ্যে গৌর-স্বর্ণও আর এক চোট হাসে ; তিনকড়ি স্বর্ণের তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা ভাবিয়া খুশিও হয় খানিকটা। উৎসাহিত হইয়া বলে—খানিক মনসার পাঁচালী পড় সন্ন। আমরা শুনি। এই প্রসঙ্গেই সে আবৃত্তি করে—

"দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে,
না ভজিনু রাধা-কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।"

দিনরাত যত বেটা ভেড়ার কথা ভেবে কি হবে ? ভেড়া—ভেড়া, সব ভেড়া। বুঝলি রামা—শেয়াল দেখলে ভেড়াগুলা চোখ বুজে দেয়। ভাবে আমরা যখন শেয়ালটাকে দেখতে পাচ্ছি না, শেয়ালটাও তখন আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। বেটা শেয়ালের তখন পোয়াবারো হয়ে যায়, কঁ্যাক্ করে ধরে আর নলীটি ছিঁড়ে দেয়। এ হয়েছে ঠিক তাই ! ব্যাটা ছিরে পাল—শুধু ছিরে পাল ক্যানে, কঙ্কণার বাবুরা পর্যন্ত ধুত্ত শেয়াল। আর এ বেটারা হল সব ভেড়া। মটামট ঘাড় ভাঙছে।

এবার জুৎসই উপমা-সম্মত গালাগালি পাইয়া তিনকড়ি খুশি হইয়া উঠে।

স্বর্ণ ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করে—কোন্ জায়গাটা পড়ব বাবা ?

মনসার পাঁচালী তিনকড়ির মুখস্থ। এককালে সে ভাসানের গানের মূল গায়েন ছিল। সেই সময়েই কলিকাতা হইতে ছাপা বইখানা সে আনাইয়াছিল। সেকালে ভাসানের দল ছিল পাঁচালীর দল ; তিনকড়িই তাহাকে যাত্রার ঢঙে রূপান্তরিত করিয়াছিল। তখন সে সাজিত 'চান্দোবেনে' , মধ্যে মধ্যে 'গোধা'র ভূমিকাতেও অভিনয় করিত। চন্দ্রধর সাজিয়া আঁকড়ের একটা এব্ড়ো-খেব্ড়ো ডালের লাঠিকে 'হেমতালের লাঠি' হিসাবে আস্ফালন করিয়া বীররসের অভিনয়ে আসর মাত করিয়া দিত। যতবার সে আসরে প্রবেশ করিত, বলিত—

"যে হাতে পূজিনু আমি চণ্ডিকা জননী,
সে হাতে না পূজিব কবু চ্যাঙ্-মুড়ি কানি !"

তারপর সনকার সম্মুখে গম্ভীরভাবে বলিত—চন্দ্রধরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবেছে, ছয় ছয় বেটা আমার বিষে কালো হয়ে অকালে কালের মুখে গিয়েছে, ওই—ওই চ্যাঙ-মুড়ি কানির জন্য। আমার মহাজ্ঞান হরণ করেছে। বন্ধু ধন্বন্তরিকে বধ করেছে। আর যা আছে তাও যাক। তবু—তবু আমি তাকে পুজব না। না—না—না !

আজ সে বলিল—পড় না এক জায়গা।

রাম বলিল—সন্ন মা, সেই ঠাঁইটে পড়। কলার মাঞ্চাসে করে বেউলো জলে ভেসেছে মরা নখীন্দরকে নিয়ে ; বেশ সুর করে পড় মা।

তিনকড়ি বলিয়া দিল—ওইখান থেকে পড় সন্ন। ওই যে—যেখানে চন্দ্রধর বলছে—

"যদিরে।কালির লাইগ পাই একবার।
কাটিয়া সুদিব আমি মরা পুত্রের ধার॥

স্বর্ণ বই খুলিয়া সুর করিয়া পড়িল—

"যে করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিয়া গাঙ্গে।
শ্বশুরের শুনিয়া বেউলা নিষ্ঠুর বচন।
বিষাদ ভাবিয়া পাছে করয়ে ক্রন্দন॥"

তারপর সুর করিয়া ত্রিপদী ছন্দে আরম্ভ করিল—

"মালি নাগেশ্বর খানিক উপকার করহ বেউলারে!
তুমি বড় গুণমণি তোরে ভাল আমি জানি
হের, আইস বুলি হে তোমারে!
যাও তুমি সাধু পাশ খুঁজিয়া লও রাম-কলার গাছ
বান্ধ ভুরা যেমন প্রকারে,
হাতে কঙ্কণ ধর, খোলের মাঞ্জস গড়
অমূল্য রতন দিমু তোরে॥"

বেহুলা বিলাপ করে আর আপনার বিবাহের বেশ খুলিয়া ফেলে; হাতের কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিল—বাজুবন্ধ, জসম খুলিল—কানের কুণ্ডল, নাকের বেসর ফেলিয়া দিল; সিঁথির সিন্দুর মুছিল, বাসরঘরে সোনার বাটা ভরা ছিল পানের খিলি, বেহুলা সে সব ফেলিয়া লখীন্দরের মৃতদেহ কোলে করিয়া এক অনির্দিষ্টের উদ্দেশে ভাসিয়া চলিল। মৃত লখীন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া খেদ করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল—

"জাগরে প্রভু গুঞ্জড়ি সাগরে।
তোমারে ভাসায়ে মাও চলিয়া যায় ঘরে।
বাপ মোগদ তাস পাষাণে বাঁধে হিয়া।
ছাড়িল তোমার দয়া সাগরে ভাসাইয়া॥

বেহুলা ভাসিয়া যায়। কাক কাঁদে, সে বেহুলার সংবাদ লইয়া যায় তাহার মায়ের কাছে, অন্য পাখীরা কাঁদে। পশুরা কাঁদে, শিয়াল আসে লখীন্দরের মৃতদেহের গন্ধে, কিন্তু বেহুলার কান্না দেখিয়া সেও কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যায়।...

তিনকড়ি, রাম, তারিণী ইহারাও কাঁদে। স্বর্ণের গলাও ভারী হইয়া আসে, সেও মধ্যে মধ্যে চোখের জল মোছে। সেই অধ্যায়টা শেষ হইতেই তিনকড়ি বলিল—আজ আর থাক্ মা সন্ন।

স্বর্ণ বইখানি বন্ধ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া তুলিয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতর গেল; গৌর খানিক আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তারিণী এবং রামও উঠিল।

—আজ উঠলাম মোড়ল।

—হ্যাঁ। অন্যমনস্ক তিনকড়ি একটু চকিতভাবেই বলিল—হ্যাঁ।

অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল। মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে বিছানায় শুইয়াও তাহার ঘুম আসে না। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি, রিমি-ঝিমি বৃষ্টি। চারিদিক নিস্তব্ধ—গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকজন সব অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহারা পেটের দায়ে মান বলি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শ্রীহরি ঘোষের গোলা খুলিয়াছে, কঙ্কণার বাবুদের গোলা খুলিয়াছে, দৌলত শেখের গোলা খুলিয়াছে তাহাদের জন্য। কিন্তু তাহাকে কেহ দিবে না। সে শহরে কলওয়ালার কাছে টাকা লইয়া একবার কিনিয়াছিল। সেই ধানের কিছু কিছু সে ভল্লাদের দিয়াছে। আবার ধান চাই। বড়লোকের—ওই জমিদারের সঙ্গে বাদ করিয়াই চৌদ্দ ডিঙা মধুকর ডুবিয়া গেল। পৈতৃক পঁচিশ বিঘা জমির বিশ বিঘা গিয়াছে, অবশিষ্ট আর পাঁচ বিঘা। বেহুলার মত তার স্নেহের স্বর্ণময়ী বাসরে বিধবা হইয়া অথৈ সাগরে ভাসিতেছে। একালে লখীন্দর বাঁচে না। উপায় নাই। কোন উপায় নাই। হঠাৎ তাহার মনে পড়ে, সদর শহরে ভদ্রলোকের ঘরেও আজকাল বিধবা-বিবাহ হইতেছে। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সেকথা একবার সে তাহার স্ত্রীর কাছে তুলিয়াছিল; কিন্তু স্বর্ণ তাহার মাকে বলিয়াছিল—না মা, ছিঃ!··· আর এক উপায়—স্বর্ণকে লেখাপড়া শেখানো। জংশনে সে মেয়ে-ডাক্তারকে দেখিয়াছে, মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারণীদের দেখিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া এমনই যদি স্বর্ণ হইতে পারে!···সে বারান্দায় শুইয়া ভাবে!

কৃষ্ণপক্ষের আকাশে চাঁদ উঠিল। মেঘের ছায়ায় জ্যোৎস্না-রাত্রির চেহারা হইয়াছে ঠিক ভোররাত্রির মত। মধ্যে মধ্যে ভুল করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিতেছে—বাসা হইতে মুখ বাড়াইয়া পাখার ঝাপট মারিতেছে।

তিনকড়ি মনের সংকল্পকে দৃঢ় করিল। বহুদিন হইতেই তাহার এই সংকল্প; কিন্তু কিছুতেই কাজে পরিণত করিতে সে পারিতেছে না; কালই দেবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবে।

—মণ্ডল মশায়! ও মণ্ডল মশায়! মণ্ডল মশায় গো!

তিনকড়ির নাসিকাধ্বনির সাড়া না পাইয়া চৌকিদারটা আজ তাহাকে ডাকিতেছে।

কুসুমপুরের মুসলমানেরা দৌলত শেখের কাছে ধান ঋণ পাইয়াছে। সারাটা দিন রমজানের রোজার উপবাস করিয়া ও সারাটা দিন মাঠে খাটিয়া জমিদারের সেরেস্তায় বৃদ্ধির জটিল হিসাব করিয়াছে। সূর্যাস্তের পর 'এফতার' অর্থাৎ উপবাস ভঙ্গ করিয়া অসাড়ে ঘুমাইতেছে।

ইরসাদ প্রতি সন্ধ্যায় রোজার উপবাস ভঙ্গ করিবার পূর্বে তাহার একজন গরীব জাত-ভাইকে কিছু খাইতে দিয়া তবে নিজে খায়। তাহার মনে শক্তি নাই, অহরহ একটা অব্যক্ত জ্বালায় সে জ্বলিতেছে। দেবু-ভাই তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল—সে কথা মনে করিয়াও সে মনকে মানাইতে পারে না।

সে স্পষ্ট চোখের উপর দেখিতে পাইতেছে কি হইতেছে। শুধু কি হইতেছে নয়, কি হইবে তাহাও তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। দৌলতের ঋণ সর্বনাশা ঋণ! তাহার কাছে টাকা কর্জ লইয়া কলওয়ালার দেনা শোধ করা হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ঋণের দায়ে সম্পত্তি সমস্ত গিয়া ঢুকিবে দৌলতের ঘরে। কলওয়ালার ঋণে যাইত ধান; দৌলতের ঋণ সুদে-আসলে যুক্ত হইয়া প্রবালদ্বীপের মত দিন দিন বাড়িবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই গোটা গ্রামটার জমির মালিক হইবে দৌলত। শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষের মত সে-ই হইবে তামাম জমির মালিক। রহম চাচাকেও খাজনা দিতে হইবে দৌলতকে।

অন্ধকার রাত্রের মধ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া সে ঈশ্বরকে ডাকে—'আল্লাহ্-নূর'ইয়াহ্,' তুমি এর বিচার কর। প্রতিকার কর। গরীবদের বাঁচাও।

এ প্রার্থনা তার নিজের জন্য নয়। সে ঠিক করিয়াছে এ গ্রাম ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইবে। তাহার শ্বশুরবাড়ীর আহ্বানকে সে আর অগ্রাহ্য করিবে না। সে যাইবে। কাজ করিবার সঙ্গে পড়িবে, ম্যাট্রিক পাস করিয়া সে মোক্তারি পড়িবে। মোক্তার হইয়া তবে সে দেশে ফিরিবে। তার আগে নয়। তারপর সে যুদ্ধ করিবে। দৌলত, কঙ্কণার বাবু, শ্রীহরি ঘোষ—প্রতিটি দুশমনের সঙ্গে সে জেহাদ্ করিবে।

মহাগ্রামে ন্যায়রত্ন বসিয়া ভাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপে হ্যারিকেন জ্বলে, কুমারেরা দুর্গাপ্রতিমায় মাটি দেয়, অজয় বসিয়া থাকে। ওই-টুকু ছোট ছেলে—উহার চোখেও ঘুম নাই। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে প্রতিমা-গঠন দেখে। শশীশেখরও এমনি ভাবে দেখিত; বিশ্বনাথও দেখিত; অজয়ও দেখিতেছে। পাড়ার ছেলেপিলেরা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিরকাল থাকে। কিন্তু এ দাঁড়াইয়া থাকা সে দাঁড়াইয়া থাকা নয়—অর্থাৎ তাঁহারা ছেলেবেলায় যে মন লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এ তাহা নয়।

জমজমাট মহাগ্রাম—ধন-ধান্যে ভরা সচ্ছল পঞ্চগ্রাম—অথচ উৎসব-সমারোহ কিছুই নাই। প্রাণধারা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। সম্পদ গিয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্য গিয়াছে; বর্ণাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা আজ বিনষ্টপ্রায়; জাতিগত কর্মবৃত্তি মানুষের হস্তচ্যুত—কেহ হারাইয়াছে, কেহ ছাড়িয়াছে। আজই সকালে আসিয়াছিল কয়েকটি বিধবা মেয়ে। তাহারা ধান ভানিয়া অন্নের সংস্থান করিত, কিন্তু ধান-কল হইয়াছে জংশনে, তাহাদের কাজ এত কমিয়া গিয়াছে যে তাহাতে আর তাহাদের ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইতেছে না। তিনি শুধু শুনিলেন। শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু উপায় কিছু তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারিলেন না। এখনও ভাবিয়া পান নাই।

এ বিষয়ে তিনি অনেকদিন হইতেই সচেতন। এককালে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বৈদেশিক মনোভাবকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের উৎসাহে আপন পুত্রই বিদ্রোহী হইয়াছিল। তারপরও তিনি প্রত্যাশা

করিয়াছিলেন, হোক্ বিশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে আবার একদিন সব ফিরিবে। আজ স্বয়ং ঈশ্বরই বুঝি হারাইয়া যাইতেছেন।

তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথ কালধর্মে আজ নাস্তিক, জড়বাদী।

বিশ্বনাথ চলিয়া গিয়াছে। দেবুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে সেদিন যে কথা উঠিয়াছিল—সেই আলোচনার পরিণতিতে সে বলিয়াছিল—আমার জীবনের পথ, আদর্শ, মত আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি আমার জন্যে শুধু কষ্ট পাবেন দাদু। তার চেয়ে জয়া আর অজয়কে নিয়ে—

ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন—না ভাই, সে যেয়ো না। হোক আমাদের মত ও পথ ভিন্ন, তা বলে কি এক জায়গায় দুজনে বাসও করতে পারব না?

বিশ্বনাথ পায়ের ধুলা লইয়া বলিয়াছিল—বাঁচালেন দাদু। জয়া, অজয় আপনার কাছে থাক, আর আমি—

—আর তুমি? তুমি কি—

—আমি? বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল।—আমার কর্মক্ষেত্র দিন দিন যেমন বিস্তৃত তেমনি জটিল হয়ে উঠছে দাদু।

—এইখানে—তোমার দেশে থেকে কাজকর্ম কর তুমি।

—আমার কর্মক্ষেত্র গোটা দেশটাতে দাদু। আমি আপনার মত মহা-মহোপাধ্যায়ের পৌত্র, আমার কর্মক্ষেত্র বিরাট তো হবেই। এখানে কাজ করবে দেবু, দেবুর সঙ্গে আরও লোক আসবে ক্রমশ, দেখবেন আপনি। মানুষ চাপা পড়ে মরে, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব পুরুষানুক্রমে মরে না। তার অন্তরাত্মা উঠতে চাচ্ছে—উঠবেই। আপনাদের সমাজ-ব্যবস্থা কোটি কোটি লোককে মেরেছে—তাই তাদের মাথা-চাড়ায় সে চৌচির হয়ে ফেটেছে। সে একদিন ভাঙবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমাজের কল্যাণ-চিন্তাই করতে চেয়েছিলেন, তাতে আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু কালক্রমে তার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুল ঢুকেছে। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই আমরা এ সমাজকে ভাঙব—ধর্মকে বদলাব।

প্রাচীন কাল হইলে ন্যায়রত্ন আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদ্গার করিতেন। কিন্তু শশীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি শুধু নিরাসক্ত দ্রষ্টা ও শ্রোতা। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি শুষ্ক হাসি হাসিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ বলিয়া গিয়াছে—একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন আসন্ন, দাদু। আমার কলকাতা ছাড়লে চলবে না। জয়াকে কোন কথা বলবেন না। আর আপনার দেব-সেবার একটা পাকা বন্দোবস্ত করুন। কোন টোলের ছেলেকে দেবতা বা সম্পত্তি আপনি লেখাপড়া করে দিন।

ন্যায়রত্ন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—যদি জয়াকে ভার দিই, বিশ্বনাথ? তাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিয়াছিল—দিতে পারেন, কারণ জয়া আমার ধর্ম গ্রহণ করতে কোনদিনই পারবে না।

ন্যায়রত্ন অন্ধকার দিগন্তের দিকে চাহিয়া ওই কথাই ভাবিতেছিলেন আর বিদ্যুচ্চমকের আভাস দেখিতেছিলেন। কোন অতি দূর-দূরান্তের বায়ুস্তরে মেঘ জমিয়া বর্ষা নামিয়াছে, সেখানে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে; তাহারই আভাস দিগন্তে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মেঘ-গর্জনের কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। শব্দতরঙ্গ এ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আসিতে ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া শেষে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। ভাদ্র মাস হইলেও এখনও সময়টা বর্ষা। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রবল বর্ষা নামিয়াছিল; জলঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুচ্চমক এবং মেঘগর্জনের বিরাম ছিল না। আবার আজ মেঘ দেখা দিয়াছে; খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের আনাগোনা চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। দিগন্তে এ সময়ে মেঘের রেশ থাকেই এবং চিরদিনই এ সময় দূর-দূরান্তের মেঘভারের বিদ্যুৎ-লীলার প্রতিচ্ছটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তসীমায় ক্ষণে ক্ষণে আভাসে ফুটিয়া উঠে। সমস্ত জীবনভোরই ন্যায়রত্ন এ খেলা দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ তিনি এই ঋতুরূপের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্যে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক অসাধারণ কিছু দেখলেন যেন। তাঁহার নিজের তাই মনে হইল।

গভীর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু তিনি। বাস্তব জগতের বর্তমান এবং অতীত কালকে আঙ্কিক হিসাবে বিচার করিয়া, সেই অঙ্ক-ফলকেই ধ্রুব, ভবিষ্যৎ, অখণ্ড সত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তাহারও অধিক কিছু—অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্বে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস; মধ্যে মধ্যে তিনি তাহাকে যেন প্রত্যক্ষ করেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, সমস্ত মন দিয়া পর্যন্ত অনুভব করেন। আকস্মিকতার মত অপ্রত্যাশিতভাবে জটিল রহস্যের আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সে আসে; বাস্তববাদের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া অঙ্কফল ওলট-পালট বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া যায়।

বিশ্বনাথ বলে—অঙ্ক কষিয়া আমরা সূর্যের আয়তন বলিতে পারি, ওজন বলিতে পারি।

হয়তো বলা যায়। জ্যোতিষীরা অঙ্ক কষিয়া গ্রহ-সংস্থান নির্ণয় করে। পুরাতন কথা। নূতন করিয়া সূর্যের এবং অন্যান্য গ্রহের আয়তন তোমরা বলিয়াছ। কিন্তু ওই অঙ্কটাই কি সূর্যের আয়তন—ওজন? কোটি কোটি মণ—। ন্যায়রত্ন হাসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—যে লোক দু মণ বোঝা বইতে পারে, চার মণ তার ঘাড়ে চাপালে তার ঘাড় ভেঙে যায়, দাদু। সুতরাং দু মণের দ্বিগুণ চার মণ অঙ্ক কষে বললেও সেটা কত ভারী সে জ্ঞান তার নেই। অনুভূতি দিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। যার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নেই—নির্ভুল হলেও সর্বতত্ত্বের অঙ্কফল তার কাছে নিষ্ফল। যার আছে, সে বুঝতে পারে আজকের অঙ্কফল কাল পাল্টায়—সূর্য ক্ষয়িত হয়, বৃদ্ধি পায়। অঙ্কাতীতকে এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়।

বিশ্বনাথ উত্তর দেয় নাই।

বিশ্বনাথ বুঝিয়াছিল নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের সংস্কার-বশেই ন্যায়রত্ন এ কথা বলিতেছেন। তাঁহার সে সংস্কার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার মত তর্কযুক্তিও তাহার ছিল, কিন্তু স্নেহময় বৃদ্ধের হৃদয়, বেশী আঘাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সে চুপ করিয়াই ছিল, কেবল একটু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ন্যায়রত্নও আর আলোচনা বাড়ান নাই। বিশ্বনাথ স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন তিনি শুধু দ্রষ্টা। অন্ধকার রাত্রে একা বসিয়া ন্যায়রত্ন ওই কথাই ভাবেন। ভাবেন অজয় আবার কেমন হইবে কে জানে!

একটা বিপর্যয় যেন আসন্ন, ন্যায়রত্ন তাহার আভাস মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করেন। নূতন কুরুক্ষেত্রের ভূমিকা এ। অভিনব গীতার বাণীর জন্য পৃথিবী যেন উন্মুখ হইয়া আছে।

তবু তিনি বেদনা অনুভব করেন বিশ্বনাথের জন্য। সে এই বিপর্যয়ের আবর্তে ঝাঁপ দিবার জন্য যোদ্ধার আগ্রহ লইয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

জয়ার মুখ, অজয়ের মুখ মনে করিয়া তাঁহার চোখের কোণে অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু জমিয়া উঠে। পরমুহূর্তেই তিনি চোখ মুছিয়া হাসেন।

ধন্য সংসারে মায়ার প্রভাব! মহামায়াকে তিনি মনে মনে প্রণাম করেন।

পনের

আরও একজন জাগিয়া থাকে। কামার-বউ, পদ্ম। অন্ধকার রাত্রে ঘরের মধ্যে অন্ধকার স্পর্শসহ, গাঢ়তর হইয়া উঠে। পদ্ম অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলিয়া জাগিয়া থাকে। এলোমেলো চিন্তা। শুধু এক বেদনার একটানা সুরে সেগুলি গাঁথা।

উঃ, কি অন্ধকার! নিস্তেজ হাতখানা চোখের সামনে ধরিয়াও দেখা যায় না।

গ্রামখানায় লোক অঘোরে ঘুমাইতেছে। সাড়া-শব্দ নাই, শুধু ব্যাঙের শব্দ, বোধ হয় হাজার ব্যাঙ একসঙ্গে ডাকিতেছে। দুইটা বড় ব্যাঙ—এখানে বলে হাঁড়া-ব্যাঙ—পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে। এটা ডাকিতেছে ওটা থামিয়া আছে, এটা থামিলেই ওটা ডাকিবে। যেন কথা বলিতেছে। একটা পুরুষ অন্যটা তাহার স্ত্রী। বেঙা চলিয়াছে জলে, পরমানন্দে জলে সাঁতার কাটিয়া আহারের সন্ধানে, পূর্ণ বেগে তীরের মতন। বেঙী ছানাগুলি লইয়া পিছনে পড়িয়া আছে—কচি কচি পায়ে এত জোরে জল কাটিয়া যাইবার তাহাদের শক্তি নাই, বেঙী তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পারে না; সে ডাকিতেছে—

"যেও না যেও না বেঙা—আমাদিগে ছেড়ে,
মুই নারী অভাগিনী ভাসি যে পাথারে—
ও-হায় কচি-কাচা গিয়ে!"

বেঙা গম্ভীর গলায় শাসন করিয়া বলে—

"মর্—মর্—একি জ্বালা—পিছে ডাকিস কেনে ?
কেতাথ করেছ আমায়—ছেলেপিলে এনে—
মরতে কেন করলাম বিয়ে !"

পুরুষগুলা এমনি বটে। প্রথম প্রথম ক-ত ভালবাসা! তারপর ফিরিয়াও চায় না।··· অনিরুদ্ধ গেল—বলিয়া গেল না—কাকের মুখে একটা বার্তাও পাঠাইল না। একখানা পোস্টকার্ড, কিই বা তাহার দাম! হঠাৎ মনে হয়, সে কি বাঁচিয়া আছে? না মরিয়া গিয়াছে? সে নাই -নিশ্চয় মরিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে একটা খবরও সে কখনও-না-কখনও দিত। বেঙারা এমনি করিয়াই মরে। শোলমাছের পোনার ঝাঁকের লোভে, কাঁকড়াবাচ্চার ঝাঁকের লোভে বেঘোরে ছুটিয়া যায়—কালকেউটে যম ওৎ পাতিয়া থাকে—সে খপ করিয়া ধরে।···সে দুঃখের মধ্যেও হাসে। তখন বেঙার কি কাতরানি!

"ও বেঙী—ও বেঙী—আমায় যমে ধরেছে।"

এবার সে অন্ধকারের মধ্যে হাসিয়া সারা হয়।

বাহিরে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; বিদ্যুতের ছটা জানালা-দরজার ফাঁক দিয়া – দেওয়ালের ফটক দিয়া—চালের ফুটা দিয়া ঘরের ভিতর চক্-চক্ করিয়া খেলিয়া গেল। উঃ, কি ছটা!

ঘরের ভিতরে অন্ধকার পরমুহূর্তেই হইয়া উঠিল দ্বিগুণিত। পদ্ম ঘরের চারিদিক সেই অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া দেখিল। আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বিদ্যুতের এক চমকেই সব দেখা গিয়াছে। শিবকালীপুরের কর্মকারের ঘর ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে, চালে অজস্র ফুটা—এইবার ধ্বসিয়া গিয়া ঢিপিতে পরিণত হইবে। কর্মকার মরিল—তাহার ঘর ভাঙিল, এখন শুধু টিকিয়া রহিল কামারের বউ। কিন্তু কর্মকার মরিয়াছে, এমন কথাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে!

সকল বেঙাই কি মরে? তাহারা শোলের পোনা খাইয়া আরও আগাইয়া চলে—শেষে গাঙে গিয়া পড়ে, সেখানে পায় রুই-কাতলের ডিম, পোনার ঝাঁক। সেই ঝাঁকের সঙ্গে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। গাঙের ধারের বেঙীর দেখা হয়, সেইখানে জমিয়া যায়। আবার এমনও হয় যে বেঙা সারারাত্রি খাইয়া-দাইয়া সকালে ফেরে, ফিরিয়া দেখে—বেঙী-ই নাই; তাহাকে ধরিয়া খাইয়াছে গ্রামের গোখুরা। ছেলেগুলারও কতক খাইয়াছে, কতকগুলা চলিয়া গিয়াছে, কোথায় কে জানে! আবার কত বেঙী ছেলে ফেলিয়া পলাইয়া যায়। ওই উচ্চিংড়ের মা তারিণীর বউ! ওই উচ্চিংড়ে ছেলেটা! আবার তাহাদের মিতেকে—দেবু পণ্ডিতকে দেখ না কেন! মিতেনী মরিয়াছে, মিতে কাহারও দিকে কি ফিরিয়া চাহিল?

হঠাৎ মনে পড়ে রাঙাদিদিকে। রাঙাদিদি কতই না রসিকতা করিত। কত কথা বলিত। তাহাকে গাল দিয়া বলিত—মরণ তোমার! মর তুমি! ভাল করে যত্ন-আত্যি করতে পারিস না?

পদ্ম একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—আমি পারব না। তুমি বরং চেষ্টা করে দেখ দিদি।

—ওলো আমার বয়েস থাকলে—রাঙাদিদি তাচ্ছিল্যভরে একটা পিচ্ কাটিয়া বলিয়াছিল—দেখ্‌তিস দেবা আমার পায়ে গড়াগড়ি যেতো। দেখ্ না—এই বুড়ো বয়সে আমার রঙের জৌলুসটা দেখ না!···ওই একজন ছিল তাহার দরদী জন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় দুর্গাকে। ওই এক দরদী আছে তার। দুর্গা বলে—জামাই পণ্ডিত পাথর! পাথর হাসে না, পাথর কাঁদে না, পাথর কথা বলে না, পাথর গলে না। পাথর সে অনেক দেখিল। বকুলতলার ষষ্ঠী-পাথরকে দেখিয়াছে, শিবকে দেখিয়াছে, কালীকে দেখিয়াছে,—অনেক মাথা কুটিয়াছে। তাহার গলায় হাতে এখনও একবোঝা মাদুলি!

পণ্ডিতও পাথর। বেশ হইয়াছে—লোকে পাথরের গায়ে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিয়াছে—বেশ হইয়াছে! খুশি হইয়াছে সে।

বাহিরে পাখার ঝাপটের শব্দ উঠিল; কাক ডাকিতেছে। সকাল হইয়া গেল কি? আঃ, তাহা হইলে বাঁচে! পদ্ম বিছানার পাশের জানালাটা খুলিয়া অবাক হইয়া গেল। আহা, এ কি রাত্রি! আকাশে কখন চাঁদ উঠিয়াছে। পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদের আলো ফুট ফুট করিতেছে—ফিনফিনে নীলাম্বরী শাড়ী-পরা ফর্সা বউয়ের মত।

সে দরজা খুলিয়া মাঠ-কোঠার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিক নিঝুম। উপরের বারান্দা হইতে দেখিয়া অদ্ভুত মনে হইতেছে। বাড়ীটা যেন হাঁ করিয়া গিলিতে চাহিতেছে। মাটির উঠান জলে ভিজিয়া নরম হইয়া আছে, কিন্তু তবু রুপালী জোৎস্নায় তক্ তক্ করিতেছে; কোথাও একমুঠা জঞ্জাল, কোথাও একটা পায়ের দাগ নাই। দক্ষিণ-দুয়ারী বারান্দাটা পড়িয়া আছে—কোথাও একটা জিনিস নাই। বারান্দাটা মনে হইতেছে কত বড়! পোড়ো বাড়ী জঞ্জালে ময়লায় ভরিয়া পড়িয়া থাকে—মরা মানুষের মত। চালে খড় থাকে না, দেওয়াল ভাঙিয়া যায়, দুয়ার জানালা খসিয়া যায়—মড়ার মাথায় যেমন চুল থাকে না, মাংস থাকে না, চোখের গর্ত মুখের গহ্বর হাঁ হইয়া থাকে, তেমনি ভাবে। আর এ বাড়ীটা ঝক্‌-ঝক্ তক্‌-তক্ করিতেছে, চাল আজও খড়ে ঢাকা, দরজা জানালা জীর্ণ হইলেও ঠিক আছে; শুধু নাই কোথাও মানুষের কোন চিহ্ন। না আছে পায়ের ছাপ, না আছে জিনিসপত্র, জামা—জুতা—ছড়ি—হুঁকা—কল্কে—কল্কে-ঝাড়া গুল; সব থাকিত দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটার দাওয়ায়। লোকের বাড়ীর উঠানে থাকে ছেলের খেলাঘর; যতীন-ছেলে থাকিতে উচ্চিংড়ে, গোবরা ছিল—তখন উঠানটায় ছড়াইয়া থাকিত কত জিনিস, কত উদ্ভট সামগ্রী। এখন কিছুই নাই। আর কিছুই নাই। মনে হইতেছে—বাড়ীটা নিঃসাড়ে মরিতেছে ক্ষুধার জ্বালায়—যেন হাঁ করিয়া আছে খাদ্যের জন্য; মানুষের কর্ম-কোলাহলে—মানুষের জিনিসপত্রে পেটটা তাহার ভরিয়া দাও। একা পদ্মকে নিত্য চিবাইয়া চুষিয়া তাহার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাক—সে বাঁচিয়া থাকিতেও পারিতেছে না। উঠানের একপাশে কাহার পায়ের দাগ পড়িয়াছে যেন! দুর্গার পায়ের দাগ। সন্ধ্যাতেও সে

আসিয়াছিল। অন্যদিন সে এইখানে শোয়। আজ আসে নাই।

হয়তো—! ঘৃণায় পদ্মের মনটা রি-রি করিয়া উঠিল। হয়তো কঙ্কণা গিয়াছে। অথবা জংশনে। কাল জিজ্ঞাসা করিলেই অবশ্য বলিবে। লজ্জা বা কুণ্ঠা তাহার নাই, দিব্য হাসিতে হাসিতে সবিস্তারে সব বলিবে। দম্ভ করিয়াই সে বলে—পেটের ভাত পরনের কাপড়ের জন্য দাসীবিত্তিও করতে নারব ভাই, ভিক্ষেও করতে নারব।

ভিক্ষা কথাটা তাহার গায়ে বাজিয়াছিল। মনে করিলেই বাজে। ছিঃ, সে ভিক্ষার অন্ন খায়! হ্যাঁ, ভিক্ষার ভাত ছাড়া কি? পণ্ডিতের কাছে এ সাহায্য লইবার তাহার অধিকার কি? নিজের ভাগ্যের উপর একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আক্রোশ আকাশ-ছাওয়া মেঘের মত গিয়া পড়িল প্রথমটা অনিরুদ্ধের উপর, পরে শ্রীহরির উপর, তারপর সে আক্রোশ গিয়া পড়িল দেবুর উপর। সে-ই বা কেন এমনভাবে করে তাকে? কেন?

দুর্গা বলে মিথ্যা নয়; বলে পণ্ডিতকে দেখে আমার মায়া হয়। আহা বিলু-দিদির বর! নইলে ওর ওপর আবার টান! ও কি মরদ কামার-বউ, ওর কি আছে বল?··· তারপর তাচ্ছিল্যভাবে পিচ্ কাটিয়া বলে—ও আক্ষেপ আমার নাই ভাই। বামুন, কায়েত, সদ্গোপ, জমিদার, পেসিডেন, হাকিম, দারোগা—কত কামার-বউ।···সে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে, বলে—ওলো, আমি মুচির মেয়ে; আমাদের জাতকে পা ছুঁয়ে পেন্নাম করতে দেয় না, ঘরে ঢুকতে দেয় না; আর আমারই পায়ে গড়াগড়ি সব! পাশে বসিয়ে আদর করে—যেন স্বগ্গে তুলে দেয়, বলব কি ভাই! সে আর বলিতেই পারে না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

দুর্গা আজও হয়তো অভিসারে গিয়াছে। হয়তো তাহার পায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে কোন মান্যগণ্য ধনী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কঙ্কণায় গিয়াছে হয়তো। বাবুদের বাগানের কত অভিজ্ঞতা দুর্গা বলিয়াছে। বাগানে জ্যোৎস্নার আলোয় বাবুদের শখ হয় দুর্গার হাত ধরিয়া বেড়াইতে। গ্রীষ্মের সময় ময়ূরাক্ষীর জলে স্নান করিতে যায়। আজও হয়তো তেমনি কোন নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিবে। কালই তার পরনে দেখা যাইবে নূতন ঝলমলে শাড়ী, হাতে নূতন কাচের চুড়ি। অবশ্য এ সন্দেহ সত্য না হইতেও পারে। কারণ আজকাল দুর্গা আর সে দুর্গা নাই। আজকাল দুর্গা আর বড় একটা অভিসারে যায় না। বলে—ওতে আমার অরুচি ধরেছে ভাই। তবে কি করি, পেটের দায় বড় দায়! আর আমি না বললেই কি ছাড়ে সব? কামার-বউ, বলব কি—ভদ্দনোকের ছেলে—সন্দেবেলায় বাড়ীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। জানালায় ঢেলা মেরে সাড়া জানায়। জানালা খুলে দেখি গাছের তলায় অন্ধকারের মধ্যে ফটফটে জামা-কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। আবার রাতদুপুরে—ভাই কি বলব, কোঠার জানলায় উঠে শিক ভেঙে ডাকাতের মত ঘরে ঢোকে।

—বাপ রে! পদ্ম শিহরিয়া উঠে। সর্বাঙ্গ তাহার থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল

মুহূর্তের জন্য ; উঃ, পশুর জাত সব ! পশু ! পরমুহূর্তেই তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার শিয়রে আছে বগি-দা, সে নির্ভয়ে রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া মেঘচ্ছায়া-মলিন জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল। ভাদ্রের গুমোট গরমে ওই ঘরে জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া কি শোয়া যায় ? মিঠে মৃদু হাওয়া বেশ লাগিতেছে। শরীর জুড়াইয়া যাইতেছে। চাঁদের উপর দিয়া সাদা-কালো খানা-খানা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। কখনও আলো, কখনও আঁধার।

হঠাৎ সে চমকাইয়া উঠিল। ও কে ! ওই যে দক্ষিণ-দুয়ারীর দাওয়ার উপর এক কোণে সাদা ফটফটে কে দাঁড়াইয়া আছে চোরের মত ? কে ও ? পদ্মের বুকের ভিতরটা দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া দাখানা হাতে লইয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছিরু পাল ? সে হইলে কি এমন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত ? লম্বা মানুষটি। কে ? পণ্ডিত—হ্যাঁ, পণ্ডিত বলিয়াই মনে হইতেছে। তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। স্পন্দন হ্রাস হইল না, কিন্তু ভয়-বিহ্বলতা তাহার চলিয়া গেল। পাথর গলিয়াছে। হাজার হউক তুমি বেঙার জাত। আহা, বেচারা আসিয়াও কিন্তু সঙ্কোচভরে দাঁড়াইয়া আছে !

পদ্ম ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। পণ্ডিত স্থির হইয়া তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। পদ্ম অগ্রসর হইল। চাপা গলায় ডাকিল—মিতে ?

না। মিতে নয়। পণ্ডিত নয়। মানুষই নয়। দাওয়াটার ওই কোণটার মাথার উপরে চালে একটা বড় ছিদ্র রহিয়াছে। সেই ছিদ্রপথে চাঁদের আলো পড়িয়াছে দীর্ঘ রেখায়, ঠিক যেন কোণে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি লম্বা মানুষ।

দরজায় ধাক্কা দেয় কে ? দরজা ঠেলিতেছে। হ্যাঁ, বেশ ইঙ্গিত রহিয়াছে এই আঘাতের মধ্যে। কামার-বউ আসিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিল। তারপর ডাকিল —কে ?

কে ? কে ?

দেবু বিছানায় শুইয়া জাগিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল। হঠাৎ সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া নজরে পড়িল—তাহার বাড়ীর কোলের রাস্তাটার ওপারে শিউলি গাছটার তলায় ফটফটে সাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া কে দাঁড়াইয়া আছে। কে ? দেবু উঠিয়া বসিল। সে চমকিয়া উঠিল, এ যে স্ত্রীলোক ! আকাশের একস্থানে মেঘ ঘন হইয়া আসিয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইয়াছে। গাছের পাতায় টুপ-টাপ শব্দ শোনা যায়। এই গভীর রাত্রে মেঘজল মাথায় করিয়া কে দাঁড়াইয়া আছে এখানে ?

দুর্গা ? এক তাহাকেই বিশ্বাস নাই। সে সব পারে। কিন্তু সত্যই কি সে ? সে সব পারে, তবু দেবু এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না যে সে তাহার জানালার সম্মুখে আসিয়া এমনভাবে বিনা প্রয়োজনে দাঁড়াইয়া থাকিবে। সে ডাকিল—দুর্গা ?

মূর্তিটি উত্তর দিল না, নড়িল না পর্যন্ত।

কে? দুর্গা হইলে কি উত্তর দিত না? তবে? তবে কে?

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—এ কি তাহলে তাহার পরলোকবাসিনী বিলু? শিউলি-তলায় ঝরাফুলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছে! হয়তো নিত্যই দেখিয়া যায়। নানা পার্থিব চিন্তায় অন্যমনস্ক দেবু তাহাকে লক্ষ্য করে না। সে কাঁদে, কাঁদিয়া চলিয়া যায়। দেবুর আর সন্দেহ রহিল না। সে ডাকিল—বিলু! বিলু!

মূর্তিটি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল—ঈষৎ, মুহূর্তের জন্য।

দেবুর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা ভরিয়া উঠিল এক অনির্বচনীয় আবেগে। পার্থিব অপার্থিব দুই স্তরের কামনার আনন্দে অধীর হইয়া সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া দাওয়া হইতে পথে নামিল—পথ অতিক্রম করিয়া শিউলি তলায় আসিয়া মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া মূর্তির হাত ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভ্রম ভাঙিয়া গেল। রক্তমাংসের স্থূল দেহ, স্নিগ্ধ উষ্ণতাময় স্পর্শ—স্পর্শের মধ্যে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক প্রবাহ; হাতখানার মধ্যে নাড়ীর গতি দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে,—এ কে! সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে তুমি?

আকাশ একখানা ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে—চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেবু আবার প্রশ্ন করিল—কে? আভাসে ইঙ্গিতে মনের চেতনায় তাহাকে চিনিয়াও তবু প্রশ্ন করিল—কে?

পদ্ম আপনার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আমি।

কামার-বউ?

—হ্যাঁ, তোমার মিতেনী—পদ্ম হাসিল।

দেবুর শরীরের ভিতর একটা কম্পন বহিয়া গেল; কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

চাপা গলায় ফিস-ফিস করিয়া পদ্ম বলিল—আমি এসেছি মিতে।

দেবু স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

পদ্মের কণ্ঠস্বর সঙ্কোচলেশশূন্য—তাহার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কামনার আবেগ, স্নায়ুমণ্ডলীতে অধীর উত্তেজনা—শিরায় শিরায় প্রবহমাণ রক্তধারায় ক্রমবর্ধমান জর্জর উষ্ণতা। সে বলিল—আমি এসেছি মিতে। ও-ঘরে আর আমি থাকতে পারলাম না। তোমার ঘরে থাকব আমি। দুজনায় নতুন ঘর বাঁধব। তোমার খোকন আবার ফিরে আসবে আমার কোলে। যে যা বলে বলুক। না-হয় আমরা চলে যাব দুজনায়—দেশান্তরে!

এই কয়টি কথা বলিয়াই সে হাঁপাইয়া উঠিল।

দেবু তেমনি মূঢ়-স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া দেবুকে জিজ্ঞাসুভাবে ডাকিল—মিতে!

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—সে সচেতন হইবার চেষ্টা করিল; তারপর

সহজভাবে বলিল—চেপে জল আসছে, বাড়ী যাও কামার-বউ।

সে আর দাঁড়াইল না, সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া খিলটা আঁটিয়া দিবার জন্য উঠাইল—

সেই অবস্থায় হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কতক্ষণ সে খিলে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহার নিজেরই খেয়াল ছিল না। খেয়াল হইল—বিদ্যুতের একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চমকে নীলাভ দীপ্তিতে যখন চোখ ধাঁধিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রগর্জনে চারিদিক থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরের বর্ষণের প্রবল ধারাপাতে গাছের পত্র-পল্লবে ঝর্ ঝর্ শব্দে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। সত্যই বৃষ্টি নামিয়াছে প্রবল বেগে। দেবু সচকিত হইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইল। দাওয়ায় দাঁড়াইয়া রাস্তার ওপারের শিউলিগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল—কিন্তু কিছুই দেখা গেল না, গাছটাকেও পর্যন্ত দেখা যায় না। ঘন প্রবল বৃষ্টিধারায়, গাঢ় কালো মেঘের ছায়ায় সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মিতেনীর অবশ্য চলিয়া যাওয়ারই কথা; আর কি সে দাঁড়াইয়া থাকে, না থাকিতে পারে? তবুও সে দাওয়া হইতে নামিয়া ছুটিয়া গেল শিউলিতলার দিকে। শিউলিতলা শূন্য। কিছুক্ষণ সে সেই বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। একবার কয়েক পা অগ্রসরও হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল। ঘরে আসিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভিজা কাপড় বদলাইয়া সে চুপ করিয়া বসিল। হতভাগিনী মেয়ে! ইহার প্রতিবিধান করার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু কি প্রতিবিধান? তাহার মনে পড়িল—স্বর্ণ সেদিন যে কবিতাটি পড়িতেছিল সেই কবিতাটির কথা—'স্বামীলাভ'। যে মন্ত্র তুলসীদাস সেই বিধবাকে দিয়াছিলেন সে মন্ত্র সে কোথায় পাইবে?

বাহিরে মুষলধারে বর্ষণ চলিয়াছে।

সকালে ঘুম ভাঙিল অনেকটা বেলায়। অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত তাহার ঘুম আসে নাই। বোধ হয় শেষরাত্রি পর্যন্ত জাগিয়াছিল সে। এখনও বর্ষণ থামে নাই। আকাশে ঘোর ঘনঘটা। উতলা এলোমেলো বাতাসও আরম্ভ হইয়াছে। একটা বাদল নামিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। দেবু ওই শিউলী গাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাত্রির কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। হতভাগিনী মেয়ে! সংসারে এমনি ভাগ্যহতা কতকগুলি মেয়ে থাকে, যাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিবিধান নাই। যে প্রতিবিধান করিতে যায়, সে পর্যন্ত দুর্ভাগিনীর অনিবার্য দুঃখে আগুনের আঁচে ঝলসিয়া যায়। অনিরুদ্ধ দেশত্যাগী হইয়াছে, তাহার জমিজেরাত সব গিয়াছে—সে বোধ হয় ওই মেয়েটির ভাগ্যফলের তাড়নায়। সে তাহাকে আশ্রয় দিল—তাহার দিকেও আগুনের আঁচ আগাইয়া আসিতেছে। শ্রীহরি তাহার চারিদিকে পঞ্চায়েতমণ্ডলীর শাস্তির বেড়া-আগুন জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছে। পরশু পঞ্চায়েত বসিবে, চারিদিকে খবর গিয়াছে। উদ্যোগ-আয়োজন ঘোষ প্রচুর করিয়াছে। রাঙাদিদির এক উত্তরাধিকারী খাড়া করিয়াছে—সে-ই শ্রাদ্ধ করিবে। সেই উপলক্ষে পঞ্চায়েত

বসিবে। পরন্তু রাঙাদিদির শ্রাদ্ধ। মেয়েটা নিজে তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিবার জন্য পাপের আগুন জ্বালাইয়াছে বারুদের রঙীন বাতির মত। আপনার আদর্শ অনুযায়ী—সংস্কার অনুযায়ী দেবু পদ্মকে কঠিন শুচিতা সংযমে অনুপ্রাণিত করিবার সংকল্প করিল। সে কোনমতেই আর কামার-বউয়ের বাড়ী যাইবে না। ছাতা মাথায় দিয়া সে মাঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

রাত্রে প্রবল বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের নালায় হুড় হুড় করিয়া জল চলিতেছে। কয়েকটা স্থানে নালার জল রাস্তা ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। পুকুর-গড়েগুলি পূর্ব হইতেই ভরিয়া ছিল, তাহার উপর কাল রাত্রে জলে এমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে যে, জল-প্রবেশের নালা দিয়া এখন পুকুরের জল বাহির হইয়া আসিতেছে। জগন ডাক্তারের বাড়ীর খিড়কি-গড়েটার ধারে জগন দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পুকুর হইতে জল বাহির হইতেছে; ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া মাহিন্দারটাকে নিয়া নালার মুখে বাঁশের তৈরী বার পোঁতাইতেছে। জগনও আজকাল তাহার সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলে না। সে পঞ্চায়েতের মধ্যে নাই, থাকিবার কথাও নয়; ডাক্তার কায়স্থ—নবশাখা সমাজের পঞ্চায়েতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? তবুও গ্রাম্য সমাজে—গ্রামবাসী হিসাবে তাহার মতামত—সহযোগিতা—এ সবের একটা মূল্য আছে; বিশেষ যখন সে ডাক্তার, প্রাচীন প্রতিপত্তিশালী ঘরের ছেলে—তখন বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু ডাক্তার শ্রীহরির নিমন্ত্রিত পঞ্চায়েতের মধ্যে নাই। আবার দেবুর সঙ্গেও সম্বন্ধ সে প্রায় ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তারও কামার-বউয়ের কথাটা বিশ্বাস করিয়াছে। নেহাৎ চোখাচোখি হইতে ডাক্তার শুষ্কভাবে বলিল—মাঠে চলেছ?

হাসিয়া দেবু বলিল—হ্যাঁ। বার পোঁতাচ্ছ বুঝি?

—হ্যাঁ। পোনা আছে, বড় মাছও ক'টা আছে, এবারও পোনা ফেলেছি। তারপর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—আকাশ যা হয়েছে, যে রকম 'আওলি-বাউলি' (এলোমেলো বাতাস) বইছে—তাতেও তো মনে হচ্ছে বাদলা আবার নামল। এর ওপরে জল হলে বার পুঁতেও কিছু হবে না।

দেবুও একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—হুঁ।

প্রায় সকল গৃহস্থই, যাহাদের পুকুর-গড়ে আছে—তাহারা সকলেই জগনের মত নালার মুখে বেড়ার আটক দিতে ব্যস্ত। পল্লী-জীবনে মাঠে—ধান, কলাই, গম, আলু, আখ; বাড়ীতে—শাক-পাতা, লাউ, কুমড়া; গোয়ালে—গাইয়ের দুধের মত পুকুরের মাছও অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ। বারো মাস তো খায়ই, তাহা ছাড়া কাজ-কর্মে, অতিথি-অভ্যাগত সমাগমে ঐ মাছই তাহাদের মানরক্ষা করিয়া থাকে। "পেটের বাছা, ঘরের গাছা, পুকুরের মাছা"—পল্লী-গৃহস্থের সৌভাগ্যের লক্ষণ।

সদ্গোপ-পাড়া পার হইয়া বাউড়ী ডোম ও মুচী পাড়া। ইহাদের পাড়াটা গ্রামের প্রান্তে এবং অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে। গ্রামের সমস্ত জলই এই পাড়ার ভিতর দিয়া নিকাশ হয়। পল্লীটার ঠিক মাঝখান দিয়া চলিয়া গিয়াছে একটা বালুময় প্রস্তরপথ বা নালা;—সেই পথ

বাহিয়া জল গিয়া পড়ে পঞ্চগ্রামের মাঠে। পাড়াটা প্রায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কোথাও একহাঁটু, কোথাও গোড়ালি-ডোবা জল। পাড়ার পুরুষেরা কেহ নাই, সব মাঠে গিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবল বর্ষণে ধানের ক্ষতি তো হইবেই, তাহার উপর জলের তোড়ে আল ভাঙিবে, জমিতে বালি পড়িবে ; সেই সব ভাঙনে মাটি দিতে গিয়াছে। মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা হাত-জালি ঝুড়ি লইয়া মাছ ধরিতে ব্যস্ত। ছোট ছেলেগুলার উৎসব লাগিয়া গিয়াছে। কেহ সাঁতার কাটিতেছে—কেহ লাফাইতেছে ; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কয়টা ছেলে কাহারও একটা কাটা তালগাছের অসার ডগার অংশ জলে ভাসাইয়া নৌকা-বিহারে মত্ত। ইহারই মধ্যে কয়েকজনের ঘরের দেওয়ালও ধ্বসিয়াছে।

দেবুর মন তাহাকে এ পথে টানিয়া আনিয়াছিল—দুর্গার উদ্দেশে। দুর্গাকে দিয়া কামার-বউয়ের সন্ধান লইবার কল্পনা ছিল তাহার। দুর্গাকে কিছু প্রকাশ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় ছিল না। ইঙ্গিতে কতকগুলা কথা জানাইবার এবং জানিবার আছে তাহার। সে সমস্ত রাত্রে ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল—রাত্রির ঘটনাটার পুণাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া সে শুধু কামার-বউয়ের মন্ত্রদীক্ষা লওয়ার প্রস্তাব করিবে। বলিবে—দেখ, মানুষের ভাগ্যের উপর তো মানুষের হাত নাই। ভাগ্যফলকে মানিয়া লইতে হয়। ভগবানের বিধান। মানুষের স্ত্রী-পুত্র যায়, স্ত্রীলোকের স্বামী-পুত্র যায়, থাকে শুধু ধর্ম। তাহাকে মানুষ না ছাড়িলে সে মানুষকে ছাড়ে না। যে মানুষ তাহাকে ধরিয়া থাকে—সে দুঃখের মধ্যেও সুখ না হোক শান্তি পায়, পরকালের গতি হয়, পরজন্মে ভাগ্য হয় প্রসন্ন। তুমি এবার মন্ত্রদীক্ষা লও। তোমাদের গুরুকে সংবাদ দিই, তুমি মন্ত্র লও, সেই মন্ত্র জপ কর ; বার কর, ব্রত কর। মনে শান্তি পাইবে।

দুর্গার বাড়ীতে আসিয়া সে ডাকিল—দুর্গা !

দুর্গার মা একটা খাটো কাপড় পরিয়া ছিল—তাহাতে মাথায় ঘোমটা দেওয়া যায় না ; সে তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া গামছা মাথার উপর চাপাইয়া বলিল —সি তো সেই ভোরে উঠেই চলে যেয়েছে বাবা। কাল রেতে মাথা ধরেছিল ; কাল আর কামার মাগীর ঘরে শুতে যায় নি। উঠেই সেই ভাবা সাবির লোকের বাড়ীই যেয়েছে।

পাতুর বিড়ালীর মত বউটা ঘরের মেঝে হইতে খোলায় করিয়া জল সেচিয়া ফেলিতেছে। চালের ফুটা দিয়া জল পড়িয়া মাটির মেঝেয় গর্ত হইয়া গিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে অনিরুদ্ধের বাড়ীর দিকটা দিয়া গ্রামে ঢুকিল। গ্রামের এই দিকটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। এদিকটায় কখনও জল জমে না, কিন্তু আজ এই দিকটাতেই জল জমিয়া গিয়াছে—পায়ের গোড়ালি ডুবিয়া যায়। ওদিকে রাঙাদিদির ঘরের দেওয়ালের গোড়াটা বেশ ভিজিয়া উঠিয়াছে। কারণটা সে ঠিক বুঝিল না। সে কামার-বাড়ীর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—দুর্গা—দুর্গা রয়েছিস ?

কেহ সাড়া দিল না। সে আবার ডাকিল। এবারও কোন সাড়া না পাইয়া সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। বাড়ীর মধ্যেও কাহারও কোন সাড়া নাই। উপরের ঘরের দরজাটা খোলা

হাঁ-হাঁ করিতেছে। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের একটা কোণে চালের ছিদ্র দিয়া অজস্র ধারায় জল পড়ায় দেওয়ালের একটা কোণ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, কাদায় মাটিতে দাওয়াটা একাকার হইয়া গিয়াছে। সে আরও একবার ডাকিল, এবার ডাকিল-- মিতেনী রয়েছ? মিতেনী!

মিতেনী বলিয়াই ডাকিল। হতভাগিনী মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথাও যে সে না ভাবিয়া পারে না। এ-দেশের বালবিধবাদের মত কামার-বউ হতভাগিনী। সংযম যে শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহাতে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদের বঞ্চনার দিকটাও যে বড় সকরুণ। যে যুগে দেবু জন্মিয়াছে এবং তাহার জীবনে যে সংস্কার ও শিক্ষা সে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাতে তাহার কাছে দুইটা দিকই গুরুত্বে প্রায় সমান মনে হয়। বিশেষ করিয়া কিছুদিন আগে সে শরৎ-চন্দ্রের বইগুলি পড়িয়া শেষ করিয়াছে, তাহার ফলে এই ভাগ্যহতা মেয়েগুলির প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পাল্টাইয়া গিয়াছে। কাল রাত্রে সংযমের দিকটাই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তখন সে তাহাকে বিচার করিতে চাহিয়াছিল কঠিন বিচারকের মত প্রাচীন বিধান অনুসারে। আজ এই মুহূর্তে করুণার দিকটা যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে ডাকিল—মিতেনী রয়েছ? মিতেনী!

এ ডাকেও কোন সাড়া মিলিল না। বোধ হয় দুর্গার সঙ্গে মিলিয়া মিতেনী ঘাটের দিকে গিয়াছে গা ধুইতে। সে ফিরিল। পথের জল ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পথের দু-পাশে যাহাদের ঘর—তাহাদের মধ্যে জনকয়েক আপন আপন দাওয়ায় বসিয়া আছে নিতান্ত বিমর্ষভাবে। অদূরে হরেন ঘোষাল শুধু ইংরেজীতে চিৎকার করিতেছে। প্রথমেই দেখা হইল—হরিশ ও ভবেশখুড়োর সঙ্গে। দেবু প্রশ্ন করিল—আপনাদের পাড়ায় এত জল খুড়ো!

তাহারা কোন কিছু বলিবার পূর্বেই হরেন ঘোষাল তাহাকে ডাকিল—কাম্ হিয়ার—সি, সি—সি উইথ ইয়োর ওন আইজ! দি জমিণ্ডার—শ্রীহরি ঘোষ এস্কোয়ার—মেম্বার অব দি ইউনিয়ন বোর্ড—হ্যাজ ডান ইট!

দেবু আগাইয়া গেল। দেখিল—নালা দিয়া জল শ্রীহরির পুকুরে ঢুকিবার আশঙ্কায় শ্রীহরি নালায় একটা বাঁধ দিয়াছে। জলের স্রোতকে ঘুরাইয়া দিয়াছে উঁচু পথে। সে পথে জল মরিতেছে না, জমিয়া জমিয়া গোটা পাড়াটাকেই ডুবাইয়া দিয়াছে।

দেবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া ভাবিল। তারপর বলিল—ঘরে কোদাল আছে ঘোষাল?

—কোদাল? ব্যাপারটা অনুমান করিয়া কিন্তু ঘোষালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—হ্যাঁ, কোদাল—কি টামনা! যাও নিয়ে এস।

বিবর্ণমুখে ঘোষাল বলিল—বাঁধ কাটলে ফৌজদারি হবে না তো?

—না। যাও নিয়ে এস।

—বাট দেয়ার ইজ কালু শেখ—হি ইজ এ ডেঞ্জারাস্ ম্যান।

—নিয়ে এস ঘোষাল, নিয়ে এস। না হয় বল—আমি আমার বাড়ী থেকে নিয়ে আসি।—দেবু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দীর্ঘ দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

ঘোষাল এবার ঘর হইতে একটা টামনা আনিয়া দেবুর হাতে আগাইয়া দিল। দেবু মাথার ছাতাটা বন্ধ করিয়া ঘোষালের দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিয়া কাপড় সাঁটিয়া টামনা হাতে বাঁধের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। চিৎকার করিয়া বলিল—আমাদের বাড়ী-ঘর ডুবে যাচ্ছে! এ বে-আইনী বাঁধ কে দিয়েছে বল—আমি কেটে দিচ্ছি!

শ্রীহরির ফটক হইতে কালু শেখ বাহির হইয়া আসিল। কালুর পিছনে নিজে শ্রীহরি। দেবু টামনা উঠাইয়া বাঁধের উপর কোপ বসাইল—কোপের পর কোপ।

শ্রীহরি হাঁকিয়া বলিল—দিচ্ছে দিচ্ছে—আমারই লোক কেটে দিচ্ছে। দেবু-খুড়ো, নামো তুমি। আমার পুকুরের মুখে একটা বড় বাঁধ দিয়ে নিলাম—তাই জলটা বন্ধ করেছি। হয়ে গেছে বাঁধ। ওরে যা যা—কেটে দে বাঁধ। যা যা, জল্‌দি যা।

পাঁচ-সাতজন মজুর ছুটিয়া আসিল। এই গ্রামেরই মজুর, দেবুকে আর সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা করে নাই। একজন শ্রদ্ধাভরে বলিল—নেমে দাঁড়ান পণ্ডিত মশায়, আমরা কেটে দিই।

ঘোষালের দাওয়ায় টামনাটা রাখিয়া দিয়া দেবু আপনার ছাতাটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। শ্রীহরির পাশ দিয়াই যাইবার পথ। শ্রীহরি হাসিমুখে বলিল—খুড়ো!

দেবু দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল।

শ্রীহরি তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—অনিরুদ্ধের বউটার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে নাকি?

দেবুর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—চোখ দুটিতে যেন ছুরির ধার খেলিয়া গেল। তবুও সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—মানে?

—মানে কাল রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা কি দুটো, বৃষ্টিটা মুষলধারে এসেছে, ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে ছাট আসছিল, গেলাম জানালা বন্ধ করতে। দেখি রাস্তার উপরেই কে দাঁড়িয়ে। ডাকলাম—কে? মেয়েগলায় উত্তর এল—আমি। কারও কিছু হয়েছে মনে করে তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। দেখি কামার-বউ দাঁড়িয়ে। আমাকে বললে—আপনার ঘরে তো দাসী-বাঁদী আছে পাঁচটা—আমাকে একটু ঠাঁই দেবেন আপনার ঘরে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বল দেখি? দেবু খুড়োর কাছে ছিলে, সে তো তোমাকে আদর-যত্ন না করে এমন নয়। সে কথার উত্তর দিলে না, বললে—যদি ঠাঁই না দেন, আমি চলে যাব—যে দিকে দুই চোখ যায়।—কি করব বাবা? বললাম—তা এস।

শ্রীহরি সগর্বে হাসিতে লাগিল। দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রীহরি আবার বলিল—ভালই হয়েছে বাবা। পেত্নী নেমেছে তোমার ঘাড় থেকে। এখন ঐ মুচী ছুঁড়ীটাকে বলে দিয়ো—যেন বাড়ী-টাড়ী না আসে। পঞ্চায়েতকে আমি একরকম করে বুঝিয়ে দোব। একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল। বিয়ে-থাওয়া কর, ভাল কনে আমি দেখে দিচ্ছি।

দেবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শ্রীহরির সব কথা শুনিতেছিল না, বিস্ময় এবং ক্রোধের

উত্তেজনা সংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া সে হাসিয়া বলিল—আচ্ছা আমি চললাম।

ষোল

পদ্মর জীবনের নিরুদ্ধ কামনা—যাহা এতদিন শুধু তাহার মনের মধ্যেই আলোড়িত হইত, সেই কামনা অকস্মাৎ তাহারই মনের ছলনায় গোপন দ্বারপথে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে কামনা আসিল সহস্রমুখী হইয়া। মানুষ যাহা চায়, নারী যাহা চায়, যে পাওনার তাগিদ নারীর প্রতি দেহকোষে প্রতি লোমকূপে-- চেতনার প্রতি স্তরে স্পন্দিত হয়, সেই দাবি তাহার। দেহের তৃপ্তি—উদরের তৃপ্তি ; স্বামী-সন্তান— অন্ন-বস্ত্র-সম্পদ, ঘর-সংসারের দাবি। একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে শুধু তাহার নিজস্ব করিয়া এইগুলি সে পাইতে চায়। ঐ কামনাগুলিকে কৃচ্ছ্রসাধনের নিগ্রহে নিগৃহীত সে অনেক করিয়াছে। বারব্রত করিয়াছে, উপবাস করিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রাণশক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস কিছুতেই দমিত হয় নাই। গোপন মনে অনেক কল্পনা অনেক সংকল্প মৃত্তিকাতলস্থ বীজাঙ্কুরের মত উপ্ত হইতেছিল, অকস্মাৎ তাহারা সেদিন জীবনের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রের উপর চাপানো সামাজিক সংস্কারের পাথরখানার একটা ফাটল দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আলোর রেখাকে মানুষ ভাবিয়া সে নিচে নামিয়া আসিয়াছিল। তারপর বাতাসে দরজা নড়িয়া উঠিতে সে তাহার মধ্যে শুনিয়াছিল কাহার আহ্বানের ইঙ্গিত। দাখানা হাতে করিয়াই সে দরজা খুলিয়াছিল। দরজার সামনে কেহ ছিল না, কিন্তু তাহার মনে হইয়াছিল—কে যেন সট্ করিয়া সরিয়া গেল। তাহার অনুসন্ধানে সে পথে নামিয়াছিল। সে যত আগাইয়াছিল—মরুভূমির মরীচিকার মত তাহার কল্পনার আগন্তুকও তত সরিয়া সরিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল ওই শিউলিতলায়। অদূরে দেবুর ঘরখানা নজরে পড়িবামাত্র তাহার অজ্ঞাতসারেই দাখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দেবুর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাহার চেতনা ফিরিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহার জীবনের সযত্ন-পোষিত নিরুদ্ধ কামনা গুহানির্মুক্ত নির্ঝরের মত শতধারায় মাটির বুকে নামিবার উপক্রম করিয়াছে। উথলিত বাসনায় ভয় নাই—সঙ্কোচ নাই ; তাহার সর্বাঙ্গে লক্ষ লক্ষ জৈব-দেহকোষে খল খল হাসি উঠিয়াছে, শিরায় শিরায় উঠিয়াছে কলস্বরা গান, অজস্র অপার সুখে সাধে আনন্দে প্রাণ উচ্ছ্বসিত ; ঘর-সংসার-সন্তানের মুকুলিত কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। সে দেবুকে বলিল তাহার কথা—যে কথা এতদিন তাহার গোপন মনের আগল খুলিয়া ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলে নাই, আভাসে ইঙ্গিতেও জানায় নাই।

দেবুর নিরাসক্ত নির্মম উপদেশে তাহার চমক ভাঙ্গিল—'চেপে জল আসছে—বাড়ী যাও কামার-বউ !'

নিরুচ্ছ্বসিত নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানের অপমানে সে যেন অধীর হইয়া গেল। বাধার আক্রোশে

আবর্তময়ী স্রোতধারার মত কূল ভাঙিয়া দেবুকে ছাড়িয়া লাফ দিয়া শ্রীহরির অবজ্ঞাত জীবন-তটের দিকে ছুটিয়া চলিল। বিচার করিল না—শ্রীহরির মরুভূমির মত বিশাল বালুস্তর, সেখানে জলস্রোত কলকলনাদে ছুটিতে পায় না—বালুস্তরের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একবার ভবিষ্যৎ ভাবিল না, ভালমন্দ বিচার করিল না—পদ্ম সরাসরি শ্রীহরির ঘরে গিয়া উঠিল।

সে গিয়া দাঁড়াইল শ্রীহরির কোঠাঘরের পিছনে। শ্রীহরির কথা সত্য—সে জাগিয়াই ছিল। কিন্তু তখন হইতেই পদ্ম ঘুমাইতেছিল। অঘোরে অবচেতনের মত ঘুমাইতেছিল। দেবুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সহসা তাহার নিদ্রাতুর চেতনার মধ্যে জাগরণের স্পন্দন তুলিল। জাগিয়া উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, দেবু ও শ্রীহরি মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল; এতক্ষণে উপলব্ধি করিল সে কোথায়! রাত্রের কথাটা একটা দুঃস্বপ্নের মত ধীরে ধীরে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আর উপায় কি?

দুর্গা দেবুর ঘরেই বসিয়া ছিল। সে সংবাদ দিতেই আসিয়াছিল যে কামার-বউ বাড়ীতে নাই।

দেবু শুনিয়া সংক্ষেপে বলিল—জানি।

দেবুর মুখ দেখিয়া দুর্গা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবু বলিল—তুই এখন বাড়ী যা দুর্গা, পরে সব বলব।

দুর্গা উঠিল।

দেবু আবার বলিল—না। বোস, শোন্। তোর যদি অসুবিধে না হয় দুর্গা, তবে তুই আমার বাড়ীতেই থাক্ না।

দুর্গা অবাক হইয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জামাই-পণ্ডিত এ কি বলিতেছে!

দেবু বলিল—ঘরদোরগুলোয় ঝাঁট পড়ে না, নিকোনো হয় না; রাখাল ছোঁড়া যা পাজী হয়েছে! তুই এসব কাজকর্মগুলো কর। এইখানেই খাবি। মাইনে যদি নিস, তাও দোব।

অকস্মাৎ চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত দুর্গা সচকিত হইয়া উঠিল। বলিল—ঝিয়ের কাজ তো আমি করতে পারি না, জামাই-পণ্ডিত। আমার বাড়ীঘর ঝাঁটপাটের জন্যে দাদার বউকে দিনে এক সের করে চাল দিই।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ঝি, কেন? তুই তো বিলুকে দিদি বলতিস্। আমার শালীর মত থাকবি; মাইনে বলাটা আমার ভুল হয়েছে। হাত-খরচও তো মানুষের দরকার হয়।

দুর্গা তাহার মুখের দিকে মূঢ়ের মত স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দেবু বলিল—পরশু পঞ্চায়েত বসবে দুর্গা, অন্তত এ কদিন তুই আমার এখানে থাক।

দুর্গা এবার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া হাসিয়া ফেলিল। পরম কৌতুক অনুভব করিল সে।

পঞ্চায়েতের মজলিশে জামাই-পণ্ডিতের সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া মজার আলোচনা হইবে।

দেবু গম্ভীরভাবেই বলিল—কি বলছিস বল্?

—চাবিটা দাও, ঘরদোর ঝাঁট দিই। দুর্গা চাবির জন্য হাত বাড়াইল।

দেবু চাবিটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। বলিল—দেখ্ কলসীতে জল আছে কিনা?

—জল! দুর্গা বলিল—সে আমি দেখব কি গো? তুমি দেখ!

দেবু বলিল—তুই-ই দেখ। না থাকে নিয়ে আসবি; যতীনবাবু তোকে বলেছিল—মনে আছে? তা ছাড়া তুই আমাকে যে মায়া-ছেদ্দা করিস, সে তো কারুর মা-বোনের চেয়ে কম নয়। তোর হাতে আমি জল খাব। জাত আমি মানি না। পঞ্চায়েতের কাছে আমি সেকথা খুলেই বলব।

—না। সে আমি পারব না জামাই-পণ্ডিত। আমার হাতের জল কঙ্কণার বামুন-কায়েত বাবুরা লুকিয়ে খায়, মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে দিই, মুখে গ্লাস তুলে ধরি—তারা দিব্যি খায়। সে আমি দিই—কিন্তু তোমাকে দিতে পারব না। দুর্গার চোখে জল আসিয়াছিল—গোপন করিবার জন্যই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সে ঘুরিয়া দরজার চাবি খুলিতে আরম্ভ করিল।

দেবু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

সম্মুখেই রাস্তার ওপারে সেই শিউলিগাছটা। একা বসিয়া কেবলই মনে হইতেছে গত-রাত্রির কথা। ছি—ছি—ছি! পদ্ম এ কি করিল? কোনমতেই আর সে পদ্মের প্রতি এক কণা করুণা করিতে পারিতেছে না।

আকাশের মেঘটা এতক্ষণে কাটিতেছে। এক ঝলক রোদ উঠিল। আবার মেঘে ঢাকিল। আবার মেঘ কটিয়া রোদ উঠিল। বৃষ্টি ধরিয়াছে।

—পেন্নাম গো পণ্ডিত মশায়! প্রণাম করিল সতীশ বাউড়ী; সঙ্গে আছে আরও কয়েকজন বাউড়ী মুচী চাষী মজুর। সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, ভিজিয়া ভিজিয়া কালো রঙ্ও ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে, পায়ের পাতার পাশগুলা—আঙুলের ফাঁক—হাতের তেলো মড়ার হাতের মত সাদা এবং আঙুলের ডগাগুলি চুপসিয়া গিয়াছে।

প্রতিনমস্কার করিয়া দেবু কেবলমাত্র কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিল—জল কেমন?

—ভাসান বইছে মাঠে। ধান-পান সব ডুবে গিয়েছে। গুছি-টুছি খুলে নিয়ে যাবে। বড়ো ক্ষেতি করে দিলে পণ্ডিত মশায়!

পণ্ডিতকে এই দুঃখের কথা কয়টি বলিবার জন্য সতীশের ব্যগ্রতা ছিল। পণ্ডিত মশায়কে না বলিলে তাহার যেন তৃপ্তি হয় না।

দেবু সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আবার দু-দিন রোদ পেলেই ধান তাজা হয়ে উঠবে। ভাসান মরে যাক, যেসব জায়গায় গুছি খুলে গিয়েছে—নতুন বীজের 'পরিনে' লাগিয়ে দিও।

সতীশ কিন্তু সান্ত্বনা পাইল না, বলিল—ভেবেছিলাম এবার দুমুঠো হবে। তা ভাসানের যে রকম গতিক!

—তা হোক। ভাসান মরে যাবে। কতক্ষণ ? এবার বর্ষা ভাল। দিনে রোদ রেতে জল—ফসল এবার ভাল হবে, জলও শেষ পর্যন্ত হবে।

—তা বটে। কিন্তু এত জলও যি ভাল নয়।

হঠাৎ দেবুর মনে একটা কথা চকিতের মত খেলিয়া গেল। নদী! ময়ূরাক্ষী! সে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—নদী কেমন বল দেখি ?

—আজ্ঞে নদী দু-কানা। তবে ফেনা ভাসছে। ওই দেখেন, ইয়ের ওপর ময়ূরাক্ষী যদি পাথার হয়—বান যদি ঢোকে, তবে তো সব ফরসা হয়ে যাবে।

—বাঁধের অবস্থা কি ? দেখেছ ? ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু প্রশ্ন করিল।

মাথা চুলকাইয়া সতীশ বলিল—গেলবার বান হয় নাই কিনা! উবারেও বান হয় নাই! তারপর নিজেই একটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—বাঁধ আপনার ভালই আছে। তা ছাড়া ইদিকে বাঁধ ভেঙে বান আসবে না। সে হলে পিথিবীই থাকবে না মাশায়। বলিয়া সতীশ একটু পারমার্থিক হাসি হাসিল।

দেবু উত্তর দিল না। বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। নিজ হইতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহারা কোন কাজ করে না—করিবে না।

সতীশ প্রণাম করিয়া বলিল—যাই এখন পণ্ডিত মশায়, সেই ভোরবেলা থেকে—বলিতে গিয়া সে হাসিয়া ফেলিল ; হাসিয়া বলিল—চৌপর রাতই ভিজছি মাশায়। তার ওপর ভোরবেলা থেকে ভাসান ভেঙে হালুনি লেগে গিয়েছে। বাড়ী যাই। ইয়ের পর একবার পলুই নিয়ে বেরুব। উঃ, মাছে মাঠ একেবারে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে !

অন্য একজন বলিল—কুসুমপুরের জনাব স্যাখ আপনার কোঁচে গেঁথে একটা সাত সের কাতলা মেরেছে।

আর একজন বলিল—কঙ্কণার বাবুদের লারান (নারায়ণ) দীঘি ভেসেছে। দেবু উঠিয়া পড়িল।

পদ্মের এই অতি শোচনীয় পরিণতিতে সে একটা নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়াছে। তাহার নিজের শিক্ষা-সংস্কার-জ্ঞান-বুদ্ধি-মত অপরাধ ষোল আনা পদ্মেরই, সে নিজে নির্দোষ। সে তাহাকে স্নেহ করিয়াছে—আপনার বিধবা ভ্রাতৃবধূর মত সসম্মানে তাহার অন্নবস্ত্রের ভার সাধ্যমত বহন করিয়াছে। গতরাত্রে সে যেভাবে আপনাকে সংযত রাখিয়া অতি মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে তাহাতে অন্যায় কোথায় ? মিথ্য অপবাদ দিয়া শ্রীহরি পদ্মের জন্যই সমাজকে ঘুষ দিয়া তাহাকে পতিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাও সে গ্রাহ্য করে নাই ; নির্ভয়ে পঞ্চায়েতের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার দোষটা কোন্‌খানে ?

তবুও কিন্তু মন মানিতেছে না। মানুষের ভগ্নী বা কন্যার এমন পরিণামের জন্য গভীর বেদনা-দুঃখ-লজ্জার সঙ্গে থাকে যে নিরুপায় অক্ষমতার অপরাধ-বোধ, পদ্মের জন্য দুঃখ-বেদনা-লজ্জার সঙ্গে সেই অক্ষমতার অপরাধ-বোধও অনাবিষ্কৃত ব্যাধির পীড়নের মত তাহাকে পীড়িত,

করিতেছিল। দুঃখ-বেদনা-লজ্জা—সবই ওই অক্ষমতার অপরাধ-বোধের বিভিন্ন রূপান্তর। তাহার মন শত যুক্তিতর্কসম্মত নির্দোষিতা সত্ত্বেও সেই পীড়নে পীড়িত হইতেছিল। দুর্গাকে বাড়ীতে থাকিতে বলিয়া তাহার হাতে জল খাইতে চাহিয়া বিদ্রোহের উত্তেজনায় মনকে উত্তেজিত করিয়াও সে ওই দুঃখ-বেদনা হইতে মুক্তি পাইল না। উপস্থিত বন্যারোধী বাঁধের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া দেবু বাঁধ দেখিতে বাহির হইয়া পড়িল—সে কেবল ওই আত্মপীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। দুর্গাকে ডাকিয়া বলিল—দুর্গা, আমি এসে রান্না চড়াব। তুই বাড়ী-টাড়ী যাস্ তো একবার ঘুরে আয় ততক্ষণ।

বিস্মিত হইয়া দুর্গা বলিল—কোথা যাবে এখন? পিথিমীতে আবার কার কোথা দুঃখু ঘটল?

গম্ভীরভাবে দেবু বলিল—ময়ূরাক্ষীতে বান বাড়ছে। বাঁধটা একবার দেখে আসি।

দুর্গা অবাক হইয়া গালে হাত দিল।

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি?

—কি? "কাঁদি-কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আত্মি মিটছে, রাজাদের হাতী মরেছে, একবার তার গলা ধরে কেঁদে আসি"—সেই বিত্তান্ত। আচ্ছা, বাঁধ ভেঙে বান কোন্ কালে ঢুকেছে শুনি?

—বকিস্ নে। আমি আসি—দেবু ছাতাটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

দুর্গা মিথ্যা কথা বলে নাই। প্রকাণ্ড চওড়া বাঁধের দুই পাশে ঘন শরবনের শিকড়ের জালের জটিল বাঁধনে বাঁধের মাটি একেবারে জমিয়া এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দশ-বিশ বৎসর অন্তর হড়পা বান আসে—বা খুব প্রবল বান হয়, তখন অবশ্য একটু-আধটু বাঁধ ভাঙে; পরে সেখানে মাটি ফেলিয়া মেরামত করা হয়। কিন্তু বর্ষার আগে হইতে কোথাও বাঁধ দুর্বল আছে—এ ভাবনা কেহ ভাবে না।

আগে কিন্তু ভাবিত। এই বাঁধ-রক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল।

দেবু মনে মনে সেই কথাগুলিকেই খুব বড় করিয়া তুলিল। ওই বাঁধের ভাবনাকেই একমাত্র ভাবনার কথা করিয়া তুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

অর্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত এই পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠখানার প্রান্তে ধনুকের ছিলার মত বহিয়া গিয়াছে পাহাড়িয়া নদী ময়ূরাক্ষী। পাহাড়িয়া মেয়ের মতই প্রকৃতি। সাধারণতঃ বেশ থাকে। জল বাড়ে কমে। কিন্তু বন্য প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের মত বন্যা আসে অকস্মাৎ হু-হু করিয়া—আবার তেমনি দ্রুতবেগেই কমিয়া যায়। তাহাতে বড় ক্ষতি হয় না। পঞ্চগ্রামের মাঠের প্রান্তে বন্যারোধী বাঁধ আছে—তাহাতেই বন্যাবেগ প্রতিহত হয়। বাঁধটি মাত্র পঞ্চগ্রামের সীমাতেই আবদ্ধ নয়। নদী-কূলের বহুদূর পঞ্চগ্রামের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কবে কে এই বাঁধ বাঁধিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। লোকে বলে 'পাঁচের জাঙাল' বা পঞ্চজনের জাঙাল। লোকে ব্যাখ্যা করিয়া বলে—পঞ্চজন মানে পঞ্চপাণ্ডব। মা কুন্তীকে লইয়া যখন তাহারা আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছিল, তখন এ অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর

বন্যা আসিয়াছে, দেশঘাট ভাসিয়া গিয়াছে, ধান ডুবিয়াছে, ঘর ভাঙিয়াছে, দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দশার আর সীমা নাই। রাজার মেয়ে, রাজার রানী, পঞ্চপাণ্ডব-জননীর চোখে জল আসিল লোকের এই দুর্দশা দেখিয়া। ছেলেরা বলিল—কাঁদ কেন মা? মা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন লোকের দুর্দশা। যুধিষ্ঠির বলিল—এর জন্য কাঁদ কেন? তোমার চোখে যেখানে জল আসিয়াছে, সেখানে কি লোকের দুর্দশা থাকে, না থাকিতে পারে? এমন প্রতিকার আমরা করিতেছি, যাহাতে আর কখনও বন্যায় এ অঞ্চলের লোকের ক্ষতি না হয়। বলিয়াই পাঁচ ভাই বাঁধ বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন। বাঁধ বাঁধা হইল। পঞ্চপাণ্ডব চাষীদের ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—দেখ বাপু, বাঁধ বাঁধিয়া দিলাম। রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের রহিল। প্রতি বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে রথযাত্রা, অম্বুবাচী, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি হল-কর্ষণের নিষিদ্ধ দিনগুলিতে প্রত্যেকে কোদাল-ঝুড়ি লইয়া আসিবে—আপন আপন গ্রামের সীমানার বাঁধে প্রত্যেকে পাঁচ ঝুড়ি করিয়া মাটি দিয়া যাইবে; তিন দিনে তিন-পাঁচ পনের ঝুড়ি মাটি দিবে।

সেই প্রথাই প্রচলিত ছিল আবহমানকাল। যখন হইতে জমিদার হইল গ্রামের সর্বময় কর্তা—হাঁসিল-পতিত-খাল-বিল-খানা-খন্দ, ঘাসকর, বনকর, জলকর, ফলকর, পাতামহল, লতা-মহল, এমন কি ঊর্ধ্ব-অধঃ-দরবস্ত হক-হকুমের মালিক—তখন হইতেই বাঁধ হইয়াছে জমিদারের খাস সম্পত্তি; জমিদারের বিনা হুকুমে কাহারও বাঁধের গায়ে মাটি দিবার বা কাটিবার অধিকার রহিল না। যখন এ প্রথা উঠিয়া গেল, তখন জমিদার বেগার ধরিয়া বাঁধ মেরামত করাইতেন। হাল আমলে বাঁধ ভাঙিলে সেই রেওয়াজ অনুযায়ী বাঁধ বাঁধিবার খরচের কতক দেয় জমিদার, কতক দেয় প্রজা। বৎসরে বাঁধে মাটি দেওয়ার দায়িত্ববোধ লোকের চলিয়া গিয়াছে। বাঁধ ভাঙিলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত যাইবে, তদন্ত হইবে, এস্টিমেট হইবে—জমিদার-প্রজাকে নোটিস্ হইবে, তারপর ধীরে-সুস্থে বাঁধ মেরামত হইতে থাকিবে।

বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ জলে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। দেবু ঠাহর করিয়া আল-পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। রাত্রে আকাশে যে ঘনঘটা জমিয়াছিল— সে ঘনঘটা এখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। প্রখর রৌদ্র উঠিয়াছে। রৌদ্রের ছটা জলে পড়িয়া বিস্তীর্ণ মাঠখানা আয়নার মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। ধানের চারাগুলি বড় দেখা যায় না।

জল কোথাও এক-হাঁটু—কোথাও এক-কোমর। বর্ষার জল-নিকাশের যে দুইটা নালা আছে সেখানে জল এক-বুক, স্রোতও প্রচণ্ড। বাকী মাঠের মধ্যে জলস্রোত মন্থর, প্রায় স্থির রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; মধ্যে মধ্যে সেই মন্থর জলস্রোত চিরিয়া একটি রেখা অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই রেখার পিছনে পিছনে লোক ছুটিয়াছে—হাতে পলুই অথবা কোঁচ। ওগুলি মাছ, বড় মাছ। মাঠে মৎস্য-সন্ধানী লোক অনেক। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ।

দেবু সমস্ত মাঠটা অতিক্রম করিয়া বাঁধের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল; মনে পড়িয়া গেল, যেখানটায় সে উঠিবে, ওপাশে তাহারই নিচে ময়ূরাক্ষীর চরভূমির উপর শ্মশান; তাহার বিলু

ও খোকার চিতা। বিলু আজ থাকিলে ঠিক এমনটা হইত না। পদ্মের এ পরিণাম হইতে পারিত না। যে মন্ত্র সে জানে না—সে মন্ত্র তাহার বিলু জানিত। বিলু থাকিলে কামার-বউকে দেবু নিজের বাড়ীতেই রাখিতে পারিত। বিলু হাসিমুখে তাহার কোলে খোকাকে তুলিয়া দিত। সকাল-সন্ধ্যায় তাহার কানে মন্ত্র দিত। সকালে দুর্গানাম স্মরণ করিতে শিখাইত—"সকালে উঠিয়া যেবা দুর্গানাম স্মরে, সূর্যোদয়ে তার সব পাপ-তাপ হরে।" শিখাইত কৃষ্ণের শতনাম। শিখাইত পুণ্যশ্লোক নাম স্মরণ করিতে, পুণ্যশ্লোক নলরাজা, পুণ্যশ্লোক ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, পুণ্যশ্লোক জনার্দন নারায়ণ সর্বপুণ্যের আধার। সন্ধ্যায় গল্প বলিত, পরে সতীর গল্প, সীতার গল্প, সাবিত্রীর গল্প। কামার-বউয়ের সব ক্ষুধা, সব ক্ষোভ, সব লোলুপতার নিবৃত্তি হইত।

সে বাঁধের উপরে উঠিল। শরবনে—উতলা বাতাসে সর্-সর্ সন্-সন্ শব্দ উঠিয়াছে। তাহারই সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে একটা একটানা ক্ষীণ গোঙানির শব্দ। নদীর ডাক। নদীর বুকে ডাক উঠিয়াছে। এ ডাক তো ভাল নয়! ওপাশের ঘন শরবনের আড়াল ঠেলিয়া দেবু নদীর বুকের দিকে চাহিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। এ যে ময়ূরাক্ষী ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, ভয়ঙ্কর-বেশে সাজিয়াছে! এপারে বাঁধের কোল হইতে ওপারে জংশনের কিনারা পর্যন্ত ভাসিয়া উঠিয়াছে। জলের রঙ গাঢ় গিরিমাটির মত। দুই তটভূমির মধ্যে ময়ূরাক্ষী কুটিল আবর্তে পাক খাইয়া তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। গেরুয়া রঙের জলস্রোতের বুক ভরিয়া ভাসিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যতদূর দেখা যায়—ততদূর শুধুই ফেনা। তাহার উপর ময়ূরাক্ষীর বুকে জাগিয়াছে ডাক, ওই অস্ফুট গোঙানি। দেবু বন্যার কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া বাঁধের বুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল—শরবনের গায়ে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে পিঁপড়ে এবং পোকার পুঞ্জ; বড় বড় গাছগুলির কাণ্ড বাহিয়া লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—মাত্র পায়ের পাতাটা ডুবিয়াছিল—ইহারই মধ্যে জল প্রায় গোড়ালির কাছ পর্যন্ত উঠিয়াছে। দেবু আবার বাঁধের উপর উঠিল। বাঁধটার অবস্থা দেখিতে সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ময়ূরাক্ষীতে এখন যে বন্যা, সে বন্যায় বেশী আশঙ্কার কারণ নাই। বর্ষায় নদীর বন্যা স্বাভাবিক। তবে এটা ভাদ্র মাস; ভাদ্রে বন্যা হইলে মড়ক হয়। ডাকপুরুষের কথায় আছে—"চৈত্রে কুয়া ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।" ভাদ্রের বন্যায় ফল পচিয়া অজন্মা হয়, গরীব গুণায় না-খাইয়া মরে। আর হয় বন্যার পরেই সংক্রামক ব্যাধি—যত জর-জ্বালা—কাল ম্যালেরিয়া। ছোটখাটো বন্যার ফলও কম অনিষ্টকর নহে। কিন্তু দেবু আজ যে বন্যার কথা ভাবিতেছে—সে বন্যা ভীষণ ভয়ঙ্কর। হড়পা বান, কেহ কেহ বলে ঘোড়া বান। হড়্ হড়্ শব্দে, উন্মত্ত হ্রেষাধ্বনি তুলিয়া প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান একপাল বন্য ঘোড়ার মতই এ বান ছুটিয়া আসে। কয়েক ফিট উঁচু হইয়া এক বিপুল উন্মত্ত জলরাশি আবর্তিত হইতে হইতে দুই কূল আকস্মিকভাবে ভাসাইয়া, ভাঙিয়া, দুই পাশের প্রান্তর, গ্রাম, ক্ষেত, খামার, বাগান,

পুকুর তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সেই হড়পা বান বা ঘোড়া বান আসিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ময়ূরাক্ষীতে অবশ্য এ বন্যা একেবারে নূতন নয়। পাহাড়িয়া নদীতে ক্বচিৎ কখনও এ ধারার বন্যা আসে। যে পাহাড়ে নদীর উদ্ভব, সেখানে আকস্মিক প্রবল প্রচণ্ড বর্ষণ হইলে সেই জল পাহাড়ের ঢালু পথে বেগ সঞ্চয় করিয়া এমনিভাবে নিম্নভূমিতে ছুটিয়া আসে। ময়ূরাক্ষীতেই ইহার পূর্বে আসিয়াছে।

একবার বোধ হয় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। সে বন্যার স্মৃতি আজও লোকে ভুলিয়া যায় নাই। নবীনেরা যাহারা দেখে নাই, তাহারা সে বন্যার বিরাট বিক্রমচিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠে। দেখুড়িয়ার নিচেই মাইলখানেক পূর্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ঘুরিয়াছে। সেই বাঁকের উপর বিপুল-বিস্তার বালুস্তূপ এখনও ধু ধু করিতেছে। একটা প্রকাণ্ড আমবাগান দেখা যায়—ওই বন্যার পর হইতে এখন বাগানটার নাম হইয়াছে গলাপোঁতার বাগান; বাগানটার প্রাচীন আমগাছগুলির শাখা-প্রশাখার বিশাল মাথার দিকটাই শুধু জাগিয়া আছে বালুস্তূপের উপর। সেই বন্যায় ময়ূরাক্ষী বালি আনিয়া গাছগুলার কাণ্ড ঢাকিয়া আকণ্ঠ পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছে। বাগানটার পরই 'মহিষডহরে'র বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি, এখনও বালিয়াড়ির উপর ঘাস জন্মে নাই। 'মহিষডহর' ছিল তৃণশ্যামল চরভূমির উপর একখানি ছোট গোয়ালার গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর উর্বর চরভূমির সতেজ সরস ঘাসের কল্যাণে গোয়ালাদের প্রত্যেকেই পুষিত মহিষের পাল। 'মহিষডহর' গ্রামখানা সেই বন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর দুকূলভরা বন্যায় গোয়ালার ছেলেদের পিঠে লইয়া যে মহিষগুলা এপার ওপার করিত, সেবারের সেই হড়পা বানে মহিষগুলা পর্যন্ত নিতান্ত অসহায়ভাবে কোনরূপে নাক জাগাইয়া থাকিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল।

এবার কি আবার সেই বন্যা আসিতেছে? শিবকালীপুরের সম্মুখে বাঁধের গায়ে বান বাঁধের বুক ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পিঁপড়েগুলা চাপ বাঁধিয়া গাছের উপরে উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মুখে তাহাদের লক্ষ লক্ষ ডিম। শুধু পিঁপড়েই নয়, লাখে-লাখে কত বিচিত্র পোকা। বাঁধের গায়ে ছিল উহাদের বাসা। বন্যা আসিবার আগেই ইহারা কেমন বুঝিতে পারে। বৃষ্টি আসন্ন হইলে উহারা যেমন নিম্নভূমির বাসা ছাড়িয়া উঁচু জায়গায় উঠিয়া আসে, বন্যা আসিবার পূর্বেও তেমনি করিয়া উহারা বুঝিতে পারে এবং উপরে উঠিয়া আসে। সাধারণতঃ বাঁধের মাথায় গিয়া আশ্রয় লয়। এবার উহারা গাছের উপরে আশ্রয় লইতেছে। আরও আশ্চর্য—পিঁপড়েরা ডিম লইয়া উপরে উঠিলেই অন্য পিঁপড়ের দল তাহাদের আক্রমণ করে; ডিম কাড়িয়া লয়; এবার সে রকম যুদ্ধ পর্যন্ত নাই; এতটা পথ আসিতে সে মাত্র দুইটা স্থানে এ যুদ্ধ দেখিয়াছে। এখানে যাহারা আক্রমণ করিয়াছে—তাহারা গাছেই থাকে, বিষাক্ত হিংস্র কাঠ-পিঁপড়ের দল। যাহারা নিচে হইতে উপরে উঠিয়াছে—তাহারা যেন অতিমাত্রায় বিপন্ন। বন্যার জলে ভাসমান চালায় মানুষ ও সাপ যেমন নির্জীবের মত পড়িয়া থাকে, উহাদের তেমনি নির্জীব অবস্থা।

* * *

বাঁধের অবস্থাও ভাল নয়। দীর্ঘকাল কেহ লক্ষ্য করে নাই। বাঁধের গায়ে অজস্র ছোট গর্ত দিয়া জল ঢুকিতেছে। ইঁদুরে গর্ত করিয়াছে। এ গর্ত রোধ করিবার উপায় নাই। সর্বনাশা জাত। শস্যের আপদ—ঘরের আপদ, পৃথিবীর কোন উপকারই করে না। বাঁধের ভিতরটা বোধ হয় সুড়ঙ্গ কাটিয়া ফোঁপরা করিয়া দিয়াছে। বাঁধটা প্রকাণ্ড চওড়া এবং ওই শরবনের শিকড়ের জালের বাঁধনে বাঁধা বলিয়া সাধারণ বন্যায় কিছু হয় না। কিন্তু প্রমত্ত স্রোতের মুখে যে ডাক জাগিয়াছে—সে যদি তাহার মনের ভ্রম না হয়—তবে ময়ূরাক্ষীর বুকের মধ্যে হইতে ঘুমন্ত রাক্ষসী জাগিয়া উঠিবে। এবার ঘোড়া বানই আসিবে। সে বন্যার মুখে এই সংস্কার-বঞ্চিত প্রাচীন বাঁধ কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

আবার আকাশে মেঘ করিয়া আসিল।

বাতাস বাড়িতেছে; ফিন্-ফিন্ ধারায় বৃষ্টি নামিল। বাতাসের বেগে ফিন্-ফিনে বৃষ্টি কুয়াশাপুঞ্জের মত ভাসিয়া যাইতেছে। এ বাদলা সহজে ছাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। দুর্ভাগ্য—এ শুধু তাহাদেরই দুর্ভাগ্য। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তৈয়ারী-করা বুকের রক্ত-সেচা—মাঠ-ভরা ধান পচিয়া যাইবে, গ্রাম ভাসিয়া যাইবে, ঘর-দুয়ার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে, সমগ্র দেশটায় হাহাকার উঠিবে। মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত—; সহসা তাহার একটা কথা মনে হইল,—লোকে বলে সেকালের লোক পুণ্যাত্মা ছিল। কিন্তু সেকালেও তো এমনি ভাবে এই হড়পা বান আসিত! এমনি ভাবেই শস্য পচিত, ঘর ভাঙিত। লোকে হাহাকার করিত।···ভাবিতে ভাবিতে মহাগ্রামের সীমানা পার হইয়া সে দেখুড়িয়ার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাঁধের উপর দুটি লোক দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় ছাতা নাই, সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। একজনের হাতে একটা লাঠির মত একটা-কিছু, অন্য জনের হাতে একটা কি—বেশ ঠাওর করা গেল না। কুয়াশা-পুঞ্জের মত বৃষ্টিধারার মধ্যে তাহাদের স্পষ্ট পরিচিতিকে ঝাপসা করিয়া রাখিয়াছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেবু চিনিল—একজন তিনকড়ি, অন্যজন রাম ভল্লা, তিনকড়ির হাতে কোঁচ, রামের হাতে পলুই। তাহারা বাহির হইয়াছে মাছের সন্ধানে।

দেবু আসিয়া বলিল—মাছ ধরতে বেরিয়েছেন?

নদীর দিকে অখণ্ড মনোযোগের সহিত চাহিয়া তিনকড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, দৃষ্টি না ফিরাইয়াই সে বলিল—বেরিয়েছিলাম। নদীর কাছ বরাবর এসেই যেন কানে গেল গোঁ গোঁ শব্দ! নদী ডাকছে।

রাম বলিল—পর পর তিনটে লাঠি পুঁতে দিলাম, দুটো ডুবেছে, ওই দেখেন—শেষটার গোড়াতে উঠেছে বান। গতিক ভাল নয় পণ্ডিত মশায়।

দেবু বলিল—আমিও সেই কথা ভাবছি। ডাক আমিও শুনেছি। ভাবছিলাম আমার মনের ভুল।

—উঁহু! ভুল নয়। ঠিক শুনেছ তুমি।

—বাঁধের অবস্থা দেখেছেন ? ইঁদুরে ফোঁপরা করে দিয়েছে।

রাম বলিল—ওতে কিছু হবে না। ভয় আপনার কুসুমপুরের মাথায়—কঙ্কণার গায়ে বাঁধ ফেটে আছে।

—ফেটে আছে ?

—একেবারে ইমাথা-উমাথা ফাটল। সেই যে শিমুলগাছটা ছিল—বাবুরা কেটে নিয়েছে, তখুনি ফেটেছে। পাহাড়ের মতন গাছটা বাঁধের ওপরেই পড়েছিল তো, তার ওপর এইবার শেকড়গুলা পচেছে। লোকে কাঠ করতে শেকড় বার করে নিয়েছে। ভয় সেই জায়গায় ; সেখানটা মেরামত না করলে, ও মাটি ময়ূরাক্ষী তো ভুয়োর মতন চেটে মেরে দেবে।

দেবু বলিল—যাবেন তিনু-কাকা ?

তিনু তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত, সে যেন এতক্ষণ বল পাইতেছিল না। লোকে তাহাকে বলে 'হোপো'। হই-হই করা নাকি তাহার অভ্যাস। রামাও সেই কথা বলিয়াছে—কথাটা তাহাদের মধ্যে আগেই হইয়াছে। তিনকড়ি তখনই যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু রামা বলিয়াছিল—যাবা তো! যেতে বলছ—যাচ্ছি—চল! কিন্তুক—যেয়ে করবা কি শুনি ? কেউ আসবে বাঁধ বাঁধতে ?

—আসবে না ?

—তুমিও যেমন, আসবে! তার চেয়ে লোকে খপর পেলে ঘর-দুয়ার সামলাবে, ঘরে মাচান বাঁধবে। চুপ করে বসে থাক। চল বরং নিজেজের ঘর সামলাই গিয়ে, মাচান বেঁধে রাখি। হরি করে—রাতারাতি বান আসে—সব শালাকে ভাসিয়ে লিয়ে যায়!

তিনকড়ি তাহাতে গররাজি নয়। উৎফুল্ল হইয়া বলিল—মন্দ বলিস নাই রামা, ঠিকই বলেছিস! সেই হলেই শুয়ারের বাচ্ছাদের ভাল হয়। শুয়ারের বাচ্ছা, সব শুয়ারের বাচ্ছা। ঘুরে-ফিরে পেট ভরণের জন্যে হুড়মুড় করে সব শালা সেই ছিরে পালের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ল।

দেবু তাগিদ দিল—চলুন কাকা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দেখুড়িয়ার সীমানার পর মহাগ্রাম, তারপর শিবকালীপুর, তারপর কুসুমপুর। গোটা কুসুমপুরের সীমানাটা পার হইয়া কঙ্কণার সীমানার সঙ্গে সংযোগ-স্থলে বাঁধের গায়ে বেশ একটি ফাটল দেখা দিয়াছে। পূর্বে এখানে ছিল প্রকাণ্ড একটা শিমুলগাছ। সেকালে দেবু যখন ইস্কুলে পড়িত তখন গাছটাকে দেখিলেই মনে পড়িত—"অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু।"···গাছটায় অসংখ্য বনটিয়ার বাস ছিল। দেবুর বয়স তো অল্প, এমন কি তিনকড়ি এবং রামও বাল্যকালে এই গাছে উঠিয়া বনটিয়ার বাচ্ছা পাড়িয়াছে।

শিমুলের তক্তা ওজনে খুব হাল্কা এবং তক্তাগুলিকে যথেষ্ট পাতলা করিয়া চিরিলেও ফাটে না ; সেই হিসাবে পালকি তৈয়ারীর পক্ষে শিমুল-তক্তাই প্রশস্ত। কঙ্কণার বাবুদের জমিদারী অনেক—দুর্গম পল্লীগ্রাম অঞ্চলেও বিস্তৃত। এই বিংশ-শতাব্দীর উনত্রিশ বৎসর চলিয়া গেল, এখনও সব গ্রামে গরুর গাড়ী যাইবারও পথ নাই। পূর্বকালে বরং পথ ছিল, কাঁচা

মেঠো পথ ; মাঠের মধ্য দিয়া একখানা গাড়ী যাইবার মত রাস্তা। বর্ষায় কাদা হইত, শীতে কাদা শুকাইয়া গাড়ীর চাকায় গরুর খুরে গুঁড়া হইয়া ধুলা উড়িত—নামই ছিল গো-পথ। ওই পথে মাঠ হইতে ধান আসিত, গ্রামান্তরে যাওয়া চলিত। পঞ্চায়েৎ রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কিন্তু জমিদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—গো-চরের পতিতভূমির সঙ্গে গো-পথও প্রজাবিলি করিয়াছে। ভূমিলোভী চাষীরাও অনেক ক্ষেত্রে আপন জমির পাশে যেখানে গো-পথ পাইয়াছে সেখানে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজকাল ইউনিয়ন বোর্ড পাকা রাস্তা লইয়া ব্যস্ত, এদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশও নাই। কাজেই এই মোটর-ঘোড়াগাড়ীর যুগেও জমিদারের পালকির প্রয়োজন আছে ; সেই পালকির জন্যই শিমূলগাছটা কাটা।

দীর্ঘকালের সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বনস্পতি যখন মাটিতে পড়িল, তখন তাহারই বত্রিশ নাড়ীর টানে—মাটির বাঁধটার উপরের খানিকটা ফাটিয়া বসিয়া গেল। সেই তখন হইতেই বাঁধটার এইখানটায় ফাট ধরিয়া আছে। উপরের অর্ধাংশে ফাটল; নিচেটা ঠিকই আছে। বন্যা সচরাচর বাঁধের উপরের দিকে উঠে না। তাই ওদিকে কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই। এবার বন্যা হু-হু করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। দেবু, তিনকড়ি ও রাম তিনজনে ফাটল-জীর্ণ বাঁধটাকে দেখিয়া একবার পরস্পরের দিকে চাহিল। তিনজনের দৃষ্টিতেই নীরব-শঙ্কিত প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনকড়ি বলিল—এ তো দু-চারজনের কাজ নয় বাবা!

রাম হাসিয়া বলিল—বান যে রকম বাড়ছে, তাতে লোক ডাকতে ডাকতেই বাঁধ বেসজ্জনের মা কালীর মত 'কেতিয়ে' পড়বে।

তিনকড়ি গাল দিয়া উঠিল—হারামজাদা, হাসতে তোর লজ্জা লাগে না?

রাম প্রবলতর কৌতুক অনুভব করিল, সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার ঘর বলিতে একখানা কুড়ে ; সম্পদ বলিতে খানকয়েক থালা কাঁসা, একটা টিনের পেঁটরা, কয়েক-খানা কাঁথা, একটা হুঁকো আর কয়েকখানা লাঠি ও সড়কী। নিজে সে এই প্রৌঢ় বয়সেও ভীমের মত শক্তিশালী, সাঁতারে সে কুমীর ; তাহার শঙ্কাও কিছু নাই—গ্রাম্য গৃহস্থদের উপরেও মমতা কিছু নাই। তাহারা তাহাকে ভয় করে, ঘৃণা করে, নির্যাতনে সাহায্য করে—বি-এল কেসে সাক্ষ্য দেয় ; তাই তাহাদের চরমতম দুর্দশা হইলেও সে ফিরিয়া চায় না। তাহাদের দুর্দশায় রামের মহা-আনন্দ। সে হাসিয়া সারা হইল।

দেবু ফাটল-ভরা বাঁধটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল।

দুরন্ত প্লাবনে পঞ্চগ্রাম ভাসিয়া যাইবে। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলটার ছবি। রাক্ষসী ময়ূরাক্ষী যুগে যুগে এমনি করিয়া পঞ্চগ্রামের শস্য-সম্পদ, ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু সেকালে মানুষের অবস্থা ছিল আলাদা। মানুষের দেহে ছিল অসুরের মত শক্তি। সেকালে চাষীর হাতে থাকিত সাত-আট সের ওজনের কোদালি, গ্রামের মধ্যে ছিল একতা। ময়ূরাক্ষী বাঁধ ভাঙিয়া সব ভাসাইয়া দিয়া যাইত, শক্তিশালী চাষীরা আবার বাঁধ বাঁধিত ; জমির বালি ঠেলিয়া ফেলিত। সেকালের বলদগুলাও ছিল

ওই চাষীদের মত সবল—সেই বলদে হাল জুড়িয়া আবার জমি চষিত, পর বৎসরেই পাইত অফুরন্ত ফসল। আবার ঘর-দুয়ার হইত, নূতন সুন্দরতর ঘর গড়িত মানুষ। গ্রামগুলি নূতন সাজে সাজিয়া গড়িয়া উঠিত, সংসারে বৃদ্ধা গিন্নীর অন্তর্ধানের পর নূতন গিন্নীর হাতে সাজানো সংসারের মত চেহারা হইত গ্রামের। কিন্তু একাল আলাদা। অনাহারে চাষীর দেহে শক্তি নাই, গরুগুলাও না খাইয়া শীর্ণ দুর্বল। এখন জমিতে বালি পড়িলে মাঠের বালি মাঠেই থাকিবে, ক্ষেত হইবে বালিয়াড়ি; ভাঙা ঘর মেরামত করিয়া কুড়ে হইবে, মানুষ মরিবার দিনের দিকে চাহিয়া কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকিবে, এই পর্যন্ত। এই বিপদের মুখে ডাক দিলে তবু মানুষ আসিবে, কিন্তু বিপদ ঘটিয়া গেলে—তারপর বাঁধ বাঁধিতে আর কেহ আসিবে না। মানুষের একতার বোঁটা কোথায় কে কাটিয়া দিয়াছে—আর বাঁধা যায় না। তবু এই সময়—এই সময় ডাক দিলে, মানুষ আসিলেও আসিতে পারে।

সে বলিল—তিনু-কাকা, লোক যোগাড় করতেই হবে। আপনি দেখুড়ে আর মহাগ্রাম যান। আমি কুসুমপুর আর শিবকালীপুরে যাই।

তিনু বলিল—রামা, তোর নাগরা নিয়ে এসে পেট্।

রাম বলিল—মিছে নাগরা পিটিয়ে আমার হাত বেথা করাবে মোড়ল। কেউ আসবে না।

তিনু বলিল—তুই সব জানিস্! ভল্লারাও আসবে না?

রাম বলিল—দেখো। আমাদের গাঁয়ের ভল্লাদের কথা ছাড়, তারা আসবে। কিন্তুক আর এক মামুও আসবে না—তুমি দেখো।

সতের

রামের কথাই সত্য হইল। অবস্থাপন্ন চাষী কেহ আসিল না, আসিল শুধু দরিদ্রের দল। আর মাত্র দু-একজন। তাহাদের মধ্যে ইরসাদ।

দেবু কুসুমপুরে ছুটিয়া গিয়াছিল। ইরসাদ বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল। কাল অমাবস্যা, রমজান মাসের শেষদিন, পরশু হইতে শওয়াল মাসের আরম্ভ। শওয়ালের চাঁদ দেখিয়া ঈদ মোবারক ঈদল্-ফেতর পর্ব। রোজার উপবাস-ব্রতের উদ্‌যাপন। এ পর্বে নূতন পোশাক চাই, সুগন্ধি চাই, মিষ্টান্ন চাই। জংশনের বাজারে যাইবার জন্য সে বাহির হইতেছিল। দেবু ছুটিয়া গিয়া পড়িল। বাজার করা স্থগিত রাখিয়া ইরসাদ দেবুর সঙ্গে বাহির হইল। গ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী মুসলমানেরা কেহই প্রায় বাড়ীতে নাই। সকলেই গিয়াছে জংশনের বাজারে। ওই বাঁধের উপর দিয়াই গিয়াছে, বন্যার অবস্থা দেখিয়া চিন্তাও তাহাদের হইয়াছে, কিন্তু আসন্ন উৎসবের কল্পনায় আচ্ছন্ন চিন্তাটাকে এড়াইয়া গিয়াছে। ইরসাদ দুয়ারে দুয়ারে ফিরিল। গরীবেরা বাড়ীতে ছিল, টাকা পয়সার অভাবে তাহাদের বাজারে যাওয়া হয় নাই; তাহারা সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

ওদিকে বাঁধের উপর বসিয়া রাম নাগরা পিটিতেছে—হুম্—হুম্—হুম্—

শিবকালীপুর হইতে বাহির হইয়া আসিল—সতীশ, পাতু ও তাহাদের দলবল। চাষীরা কেহ আসে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীহরির ওখানে নাকি মজলিশ বসিয়াছে।

দেখুড়িয়ার ভল্লারা পূর্বেই জুটিয়াছে। মহাগ্রামেরও জন কয়েক আসিয়াছে। মোটমাট প্রায় পঞ্চাশজন লোক। এদিকে বন্যার জল ইতিমধ্যেই প্রায় হাত খানেকের উপর বাড়িয়া গিয়াছে। বাঁধের গায়ে ফাটলটার নিচেই একটা গর্তের ভিতর দিয়া বন্যার জল সরীসৃপের মত মাঠের ভিতর ঢুকিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের উপর পঞ্চাশজন লোক বুক দিয়া পড়িল।

এই ধারার সুড়ঙ্গের মত গর্তের গতি অত্যন্ত কুটিল। বাঁধের ওপারে কোথায় তাহার মুখ, সেই মুখ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কোনমতেই বন্ধ হইবে না। পঞ্চাশ জোড়া চোখ ময়ূরাক্ষীর বন্যার জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—বাঁধের গায়ে কোথায় জল ঘুরপাক খাইতেছে—ঘূর্ণির মত।

ঘূর্ণি একটা নয়—দশ-বারোটা। অর্থাৎ গর্তের মুখ দশ-বারোটা। এপাশেও দেখা গেল জল একটা গর্ত দিয়াই বাহির হইতেছে না—অন্তত দশ জায়গা দিয়া জল বাহির হইতেছে। বাঁধের ফাটলের মাটি গলিয়া ঝুপ-ঝুপ করিয়া খসিয়া পড়িতেছে; ফাটলটা বাড়িতেছে; বাঁধের মাটি নিচের দিকে নামিয়া যাইতেছে।

তিনকড়ি বলিল—দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হবে না।

জগন—লেগে যাও কাজে।

হরেন উত্তেজনায় আজ হিন্দী বলিতেছিল—জলদি! জলদি! জলদি!

দেবু নিজে গিয়া ফাটলের গায়ে দাঁড়াইয়া বলিল—ইরসাদ-ভাই, গোটাকয়েক খুঁটো চাই। গাছের ডাল কেটে ফেল। সতীশ, মাটি আন।

মাঠের সাদা জলের উপর দিয়া পাটল রঙের একটা অজগর যেন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বিসর্পিল গতিতে, ক্ষুধার্ত উদ্যত গ্রাসে।

বাঁধের গায়ে গর্তটার মুখ কাটিয়া, গাছের ডালের খুঁটা পুঁতিয়া, তালপাতা দিয়া তাহারই মধ্যে ঝপাঝপ মাটি পড়িতেছিল—ঝুড়ির পর ঝুড়ি। পঞ্চাশজন লোকের মধ্যে জগন ও হরেন মাত্র দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আটচল্লিশ জনের পরিশ্রমের মধ্যে এতটুকু ফাঁকি ছিল না। কতক লোক মাটি কাটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিতেছিল—কতক লোক বহিতেছিল; দেবু, ইরসাদ, তিনকড়ি এবং আরও জনকয়েক—বন্যার ঠেলায় বাঁকিয়া যাওয়া খুঁটাগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

—মাটি—মাটি—মাটি!

বন্যার বেগের মুখে তালপাতার আড় দেওয়া বেড়ার খুঁটাগুলিকে ঠেলিয়া ধরিয়া রাখিতে হাতের শিরা ও মাংসপেশীসমূহ কঠিন হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে; এইবারে বোধ হয় তাহারা ফাটিয়া যাইবে। দাঁতে দাঁত চাপিয়া দেবু চীৎকার করিয়া উঠিল—মাটি, মাটি, মাটি!

রাম ভল্লার মূর্তি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে ; নিশীথ অন্ধকারের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্র হাতে তাহার যে মূর্তি হয়—সেই মূর্তি। সে তিনকড়িকে বলিল—একবার ধর।···সে চট্‌ করিয়া পিছনে ফিরিয়া মাটিতে পায়ের খুঁট দিয়া—পিঠ দিয়া বেড়াটাকে ঠেলিয়া ধরিল। তারপর বলিল—ফেল মাটি !

ইরসাদ হাঁপাইতেছিল। রমজানের মাসে সে এক মাস যাবৎ উপবাস করিয়া আসিতেছে। আজও উপবাস করিয়া আছে। দেবু বলিল—ইরসাদ-ভাই, তুমি ছেড়ে দাও। উপরে গিয়ে একটু বরং বস।

ইরসাদ হাসিল, কিন্তু বেড়া ছাড়িল না। ঝপ্‌ ঝপ্‌ মাটি পড়িতেছে। আকাশে মেঘ একবার ঘোর করিয়া আসিতেছে, আবার সূর্য উঠিতেছে।

একবার সূর্য উঠিতেই ইরসাদ সূর্যের দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল—একবার ধর, আমি এখুনি আসছি। নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে ভাই।

বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছে। মানুষের আকারের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘ হইয়া ছায়া পড়িয়াছে। জোহরের নামাজের সময় চলিয়া যাইতেছে। দেবু রাম ভল্লার মত পিছন ফিরিয়া পিঠ দিয়া বেড়াটায় ঠেলা দিয়া বলিল—যাও তুমি।

শ্রমিকের দল কাদা ও জলের মধ্যে প্রাণপণে দ্রুতগতিতে আসিয়া ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি ফেলিতেছিল। মাটি নয় কাদা। ঝুড়ির ফাঁক দিয়া কাদা তাহাদের মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত লিপ্ত করিয়া গলিয়া পড়িতেছে। ওই কাদার মত মাটিতে বিশেষ কাজ হইতেছে না। বানের জলের তোড়ে কাদার মত মাটি মুহূর্তে গলিয়া যাইতেছে। ওদিকে ময়ূরাক্ষী ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। বান বাড়িতেছে, উতলা বাতাসে প্রবহমাণ বন্যার বুকে শিহরণের মত চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছে।

নদীর বুকের ডাক এখন স্পষ্ট। খরস্রোতের কল্লোল-ধ্বনি ছাপাইয়া একটা গর্জন-ধ্বনি উঠিতেছে।

জলস্রোত যেন রোলারের মত আবর্তিত হইয়া চলিতেছে। নদীর বুক রাশি রাশি ফেনায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ফেনার সঙ্গে আবর্জনার স্তূপ—শুধু আবর্জনাই নয়—খড়, ছোটখাটো শুকনা ডালও ভাসিয়া চলিয়াছে।

সহসা হরেন আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—Doctor, look, one চালা ! একটা ছোট ঘরের চাল ভাসিয়া চলিয়াছে।

—There—There—ওই একটা—ওই একটা। ওই আর একটা। By God—a big গাছের গুঁড়ি !

ঘরের চাল, কাটা গাছের গুঁড়ি, বাঁশ, খড় ভাসিয়া চলিয়াছে ;—নদীর উপরের দিকে গ্রাম ভাসিয়াছে।

জগন ডাক্তার আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—গেল ! গেল !

তিনকড়ি এতক্ষণ পর্যন্ত পাথরের মানুষের মত নির্বাক হইয়া সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বেড়াটা ঠেলিয়া ধরিয়াছিল। এবার সে দেবুর হাত ধরিয়া বলিল—পাশ দিয়ে সরে যাও। থাকবে না, ছেড়ে দাও। রামা, ছাড়্! মিছে চেষ্টা। দেবু, পাশ দিয়ে সর। নইলে জলের তোড়ে মাটির মধ্যে হয়তো গুঁজে যাবে! গেল—গেল—গেল!

গিয়াছে। দ্রুত প্রবর্ধমান বন্যার প্রচণ্ডতম চাপে বাঁধের ফাটলটা গলিয়া সশব্দে এপাশের মাঠের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। রাম পাশ কাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তিনকড়ি সুকৌশলে ওই জলস্রোতের মধ্যে ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল। দেবু জলস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেল।

জগন চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু! দেবু!

রাম ভল্লা মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলস্রোতের মধ্যে।

ইরসাদের নামাজ সবে শেষ হইয়াছিল; সে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু-ভাই!

মজুরদের দল হায় হায় করিয়া উঠিল। সতীশ বাউড়ী, পাতু বায়েনও জলস্রোতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পিছনে বন্যারোধী বাঁধের ভাঙন ক্রমশ বিস্তৃততর হইতেছে, গৈরিক বর্ণের জলস্রোত ক্রমবর্ধিত কলেবরে হুড়-হুড় শব্দে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মাঠের সাদা জলের উপর এবার গৈরিক বর্ণের জল—কালবৈশাখীর মেঘের মত ফুলিয়া ফুলিয়া চারপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁটুজল প্রায় এক-কোমর হইয়া উঠিল। ইরসাদও এবার জলের স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

বন্যার মূল স্রোতটি ছুটিয়া চলিয়াছে—পূর্ব মুখে। ময়ূরাক্ষীর স্রোতের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। পাশ দিয়া ঠেলিয়া চলিয়াছে গ্রামগুলির দিকে। মূল স্রোত মাঠের সাদা জল চিরিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়াছে কুসুমপুরের সীমানা পার হইয়া শিবকালীপুর, শিবকালীপুরের পর মহাগ্রাম, মহাগ্রামের পর দেখুড়িয়া, দেখুড়িয়ার সীমা পার হইয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠ পার হইয়া, বালুময় মহিষডহর—গলাপোঁতা বাগানের পাশ দিয়া ময়ূরাক্ষীর বাঁকের মুখে ময়ূরাক্ষীর নদীস্রোতে গিয়া পড়িবে।

রাম ওই জলস্রোতের সঙ্গেই চলিয়াছে, এক-একবার মাথা তুলিয়া উঠিতেছে—আবার ডুব দিতেছে। তিনকড়িও চলিয়াছে। সে যখন মাথা তুলিয়া উঠিতেছে - তখন চিৎকার করিয়া উঠিতেছে—হায় ভগবান্!

বন্যার জলে মাটির ভিতরের জীব-জন্তু-পতঙ্গ ভাসিয়া চলিয়াছে। একটা কালকেউটে জলস্রোতের উপর সাঁতার কাটিয়া তিনকড়ির পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তিনকড়ি মুহূর্তে জলের মধ্যে ডুব দিল। জল-প্লাবনে মাঠের গর্ত ভরিয়া গিয়াছে, সাপটা খুঁজিতেছে একটা আশ্রয়স্থল, কোন গাছ অথবা একটুকরা উচ্চভূমি। এ সময়ে মানুষকে পাইলেও মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিতে চাহিবে। কীট-পতঙ্গের তো অবধি নাই। খড়-কুটা-ডাল-পাতার

উপর লক্ষ কোটি পিঁপড়া চাপ বাঁধিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা ডিম, ডিমের মমতা এখনও ছাড়িতে পারে নাই।

কুসুমপুরে কোলাহল উঠিতেছে—বান গ্রামের প্রান্তে গিয়া উঠিয়াছে। শিবকালীপুরেও বান ঢুকিয়াছে। বাউড়ী-পাড়া মুচী-পাড়ায় জল জমিয়াই ছিল, বন্যার জল ঢুকিয়া এখন প্রায় এককোমর জল হইয়াছে। সতীশ ও পাতু ছাড়া সকলেই পাড়ায় ফিরিল। প্রতি ঘরে মেয়েরা ছেলেরা কলরব করিতেছে। ইহারই মধ্যে অনেকের ঘরে জল ঢুকিয়াছে। তৈজসপত্র হাঁড়িকুড়ি মাথায় করিয়া, গরু-ছাগলগুলাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহারা পুরুষদেরই অপেক্ষা করিতেছিল ; উহারা ফিরিতেই সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—চল—চল—চল।

গ্রামও আছে—নদীও আছে চিরকাল। বানও আসে, গ্রামও ভাসে। কিন্তু সর্বাগ্রে ভাসে এই হরিজন-পল্লী। ঘর ডুবিয়া যায়, অধিবাসীরা এমনিভাবেই পলায়, কোথায় পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইবে সেও তাহাদের ঠিক হইয়া থাকে। তাহাদের পিতৃপিতামহ ওইখানেই আশ্রয় লইত। গ্রামের উত্তর দিকের মাঠটা উঁচু—ওই মাঠের মধ্যে আছে পুরানো কালের মজা দীঘি। ওই উত্তর-পশ্চিম কোণটায় প্রকাণ্ড সুবিস্তৃত একটা অর্জুন গাছ আছে, সেই গাছের তলায় গিয়া আশ্রয় লইত , আজও তাহারা সেইখানেই চলিল।

দুর্গার মা অনেকক্ষণ হইতেই চিৎকার করিতেছিল। দুর্গা সকাল হইতে দেবুর বাড়ীতে ছিল। দেবু বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিল না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া উপরে উঠিয়াছে, আর নামে নাই। রঙ্গিণী বুকে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া জানালা দিয়া বান দেখিতেছে। শুধু বান দেখা নয়, গানও গাহিতেছে।—

"কলঙ্কিনী রাইয়ের তরে কানাই আজ লুটায় ধুলাতে।
ছিদ্রকুম্ভে আনিবে বারি—কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ভুলাতে।"

দুর্গার মা বার বার ডাকিতেছে—দুগ্‌গা বান আসছে। ঘর-দুয়োর সামলিয়ে নে। চল্ বরং দীঘির পাড়ে যাই।

দুর্গা বারকয়েক সাড়াই দেয় নাই। তারপর একবার বলিয়াছে—দাদা ফিরে আসুক। তারপর সে আবার আপন মনে গানের পর গান গাহিয়া চলিয়াছে। এখন সে গাহিতেছিল—

"এ পারেতে রইলাম আমি, ও পারেতে আর-একজনা—
মাঝেতে পাথার নদী পার করে কে সেই ভাবনা,
কোথায় তুমি কেলে সোনা ?"

হঠাৎ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল মাঠ হইতে প্রত্যাগত লোকগুলির কোলাহল। সে বুঝিল পণ্ডিতের ব্যর্থ উত্তেজনায় লোকগুলি অনর্থক বানের সঙ্গে লড়াই করিয়া হার মানিয়া বাড়ী ফিরিল। সে একটু হাসিল। পণ্ডিতের যেন খাইয়াদাইয়া কাজ নাই, এই বান আটক দিতে গিয়াছিল !···দুর্গার মা নিচে হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা ! অ দুগ্‌গা !

—যা-না তু দীঘির পাড়ে। মরণের ভয়েই গেলি হারামজাদী !

—ওলো, না।

—তবে এমন করে চেঁচাইছিস কেনে ?

দুর্গার মা এবার কাঁদিয়া বলিল—ওলো, জামাই-পণ্ডিত ভেসে যেয়েছে লো !

দুর্গা এবার ছুটিয়া নামিয়া আসিল—কি ? কে ভেসে যেয়েছে ?

—জামাই-পণ্ডিত। বানের তোড়ের মুখে পড়ে—

দুর্গা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পথে জল থৈ থৈ করিতেছে, এই জল ভাঙিয়া সে কোথায় যাইবে ? যাইয়াই বা কি করিবে ? মনকে সান্ত্বনা দিল—দেবু শক্তিহীন পুরুষ নয়, সে সাঁতারও জানে। কিন্তু বাঁধভাঙা বানের জলের তোড—সে যে ভীষণ ! বড় গাছ সম্মুখে পড়িলে শিকড়সুদ্ধ টানিয়া ছিঁড়িয়া পাড়িয়া ফেলে—জমির বুক খাল করিয়া চিরিয়া ফাঁড়িয়া দিয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতেই সে পথের জলে নামিয়া পড়িল। এক কোমরেব বেশী জল। ইহারই মধ্যে পাড়াটা জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কেবল মুর্গীগুলা ঘরের চালায় বসিয়া আছে। হাঁসগুলা বন্যার জলে ভাসিতেছে। গোটাকয়েক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে একটা ভাঙা পাঁচিলের মাথায়। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—একটা লোক জল ঠেলিয়া এক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অন্য একটা বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল। দুঃখের মধ্যে সে হাসিল। রতনা বাউড়ী। লোকটা ছিঁচকে চোর। কে কোথায় কি ফেলিয়া গিয়াছে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। সে অগ্রসর হইল। তাই তো পণ্ডিত—জামাই-পণ্ডিত ভাসিয়া গেল !

যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে মাকে ডাকিয়া বলিল—দাদা না-ফেরা পর্যন্ত ওপরে উঠে বস্ মা। বউ, তুইও ওপরে যা। জিনিসপত্তরগুলা ওপরে তোল্।

মা বলিল—ঘর পড়ে মরব নাকি ?

—নতুন ঘর, এত শীগ্‌গিরি পড়বে না।

—তু কোথা চললি ?

--আসি আমি।

সে আর দাঁড়াইল না। অগ্রসর হইল।

দিনের আলো পড়িয়া আসিতেছে। দুর্গা পথের জল ভাঙিয়া অগ্রসর হইল। নিজেদের পাড়া ছাড়াইয়া ভদ্র পল্লীতে আসিয়া উঠিল। ভদ্র-পল্লীর পথে জল অনেক কম, কোমর পর্যন্ত জল কমিয়া হাঁটুতে নামিয়া আসিল। কিন্তু কম থাকিবে না। বান বাড়িতেছে। ভদ্র-পল্লীর ভিটাগুলি আবার পথ অপেক্ষাও উঁচু জমির উপর অবস্থিত, পথ হইতে মাটির সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে হয়। আবার ঘরগুলির মেঝে দাওয়া আরও খানিকটা উঁচু। সিঁড়িগুলা ডুবিয়াছে--এইবার উঠানে জল ঢুকিবে। গ্রামের মধ্যে প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে। স্ত্রী পুত্র, গরু-বাছুর, জিনিসপত্র লইয়া ভদ্র গৃহস্থেরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ওই বাউড়ী-হাড়ি-ডোম-মুচীদের মত সংসারটিকে বস্তা-ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। গ্রামের

চণ্ডীমণ্ডপটা ইহারই মধ্যে ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা চিরকাল বন্যার সময় এই চণ্ডীমণ্ডপেই আসিয়া আশ্রয় লয়। এবারও লইয়াছে।

পূর্বকালে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল মাটির, ঘর-দুয়ারগুলিও তেমনি ভাল ছিল না। এবার বিপদের মধ্যেও সুখ—চণ্ডীমণ্ডপ পাকা হইয়াছে, খটখটে পাকা মেঝে; ঘর-দুয়ারগুলিও ভাল হইয়াছে। কিন্তু তবুও লোকে ভরসা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকিতে পারে নাই। ঘোষ কি বলিবেন—এই ভাবিয়া ইতস্তত করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীহরি নিজে সকলকে আহ্বান করিয়াছে; গায়ে চাদর দিয়া সকল পরিবারগুলির সুখ-সুবিধার তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছে। মিষ্টভাষায় সকলকে আহ্বান করিয়া, অভয় দিয়া বলিতেছে—ভয় কি, চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমার বাড়ী রয়েছে, সমস্ত আমি খুলে দিচ্ছি।

শ্রীহরি ঘোষের এই আহ্বানের মধ্যে একবিন্দু কৃত্রিমতা নাই, কপটতা নাই। গ্রামের এতগুলি লোক যখন আকস্মিক বিপর্যয়ে ধন-প্রাণ লইয়া বিপন্ন—তখন সে অকপট দয়াতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। শুধু চণ্ডীমণ্ডপই নয়; সে তাহার নিজের বাড়ী-ঘর-দুয়ারও খুলিয়া দিতে সংকল্প করিল। শ্রীহরির বাপের আমলেই ঘর-দুয়ার তৈয়ারি করিবার সময় বন্যার বিপদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াই ঘর তৈয়ারি করা হইয়াছিল। প্রচুর মাটি ফেলিয়া উঁচু ভিটাকে আরও উঁচু করিয়া তাহার উপরে আরও একবুক দাওয়া-উঁচু শ্রীহরির ঘর। ইদানীং শ্রীহরি আবার ঘরগুলির ভিতরের গায়ে পাকা দেয়াল গাঁথাইয়া মজবুত করিয়াছে; দাওয়া মেঝে, এমন কি উঠান পর্যন্ত সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইয়াছে। নূতন বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়া তো প্রায় একতলার সমান উঁচু। সম্প্রতি শ্রীহরি একটা প্রকাণ্ড গোয়াল-ঘর তৈয়ারি করাইয়াছে. তাহার উপরেও কোঠা করিয়া দোতলা করিয়াছে। সেখানেও বহু লোকের স্থান হইবে, সে ঘরখানার ভিতরও বাঁধানো। তাহার এত স্থান থাকিতে গ্রামের লোকগুলি বিপন্ন হইবে?

শ্রীহরির মা ইদানীং শ্রীহরির গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য দেখিয়া পূর্বের মত গালিগালাজ বা চিৎকার করিতে সাহস পায় না; এবং সে নিজেও যেন অনেকটা পাল্টাইয়া গিয়াছে, মান-মর্যাদা-বোধে সে-ও যেন অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তবুও এক্ষেত্রে শ্রীহরির সংকল্প শুনিয়া সে প্রতিবাদ করিয়াছিল—না বাবা হরি, তা হবে না—তোমাদের আমি ও করতে দোব না। তা হলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

শ্রীহরির তখন বাদ-প্রতিবাদ করিবার সময় ছিল না। এতগুলি লোকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তা ছাড়া গোপন মনে সে আরও ভাবিতেছিল—ইহাদের আহারের ব্যবস্থার কথা। যাহাদের আশ্রয় দিবে—তাহাদের আহার্যের ব্যবস্থা না-করাটা কি তাহার মত লোকের পক্ষে শোভন হইবে? মায়ের কথার উত্তরে সংক্ষেপে সে বলিল—ছিঃ মা!

—ছিঃ কেনে·বাবা, কিসের ছিঃ? তোমাকে ধ্বংস করতে যারা ধর্মঘট করেছে—তাদিগে বাঁচাতে তোমার কিসের দয়া, কিসের গরজ?

শ্রীহরি হাসিল, কোন উত্তর দিল না। শ্রীহরির মা ছেলের সেই হাসি দেখিয়াই চুপ

করিল—সন্তুষ্ট হইয়াই চুপ করিল, পুত্র-গৌরবে সে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিল। জমিদারের মা হইয়া তাহারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এতগুলি লোকের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক তাহারা, এ কি কম গৌরব! লোকে তাহাকে বলে রাজার মা। সে মনে মনে স্পষ্ট অনুভব করিল—যেন ভগবানের দয়া-আশীর্বাদ তাহার পুত্র-পৌত্র, তাহার পরিপূর্ণ সম্পদ-সংসারের উপর নামিয়া আসিয়া আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। শ্রীহরিও ঠিক তাই ভাবিতেছিল।

ময়ূরাক্ষী চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে; তাহাতে বন্যাও আসিবে। লোকেরা বিব্রত হইলে—তাহার পুত্র-পৌত্ররাও এমনিভাবেই সকলকে আশ্রয় দিবে। সকলে আসিয়া বলিবে —শ্রীহরি ঘোষ মশায় ভাগ্যে চণ্ডীমণ্ডপ করে গিয়েছিলেন! সেদিনও তাহার নাম হইবে।

তাই শ্রীহরি নিজে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সকলকে মিষ্টভাষায় আহ্বান জানাইল, অভয় দিল—ভয় কি চণ্ডীমণ্ডপ রয়েছে, আমার বাড়ী-ঘর রয়েছে, সমস্ত খুলে দিচ্ছি আমি।

চাষী গৃহস্থেরা সপরিবারে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। শ্রীহরির গুণগান করিতেছে। একজন বলিতেছিল—ভাগ্যিমান পুরুষ যে গাঁয়ে জন্মায় সে গাঁয়েরও মহাভাগ্যি। সেই ধুলোয়-ধুলোকীর্ন্নি হয়ে থাকত; আর এ হয়েছে দেখ দেখি! যেন রাজপুরী!

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—তোমরা তো আমার পর নও গো। সবই জাত-জ্ঞাত। আপনার জন। এ তো সব তোমাদেরই।

দুর্গা পথের জলের উপরেই দাঁড়াইয়া ছিল। এ পাড়া পার হইয়াই আবার মাঠ। জল ইহারই মধ্যে হাঁটু ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। মাঠে সাঁতারজল। এদিকে বেলা নামিয়া পড়িতেছে। জামাই-পণ্ডিতের খবর লইয়া এখনও কেহ ফিরিল না। জামাই-পণ্ডিত তবে কি ভাসিয়া গেল? চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। তাহার জামাই-পণ্ডিত, পাঁচখানা গ্রাম যাহার নাম লইয়া ধন্য-ধন্য করিয়াছিল, পরের জন্য যে নিজের সোনার সংসার ছারখার হইতে দিল, গরীব-দুঃখীর আপনার জন, অনাথের আশ্রয়, ন্যায্য ছাড়া অন্যায্য কাজ যে কখনও করে না, সেই মানুষটা ভাসিয়া গেল আর এই লোকগুলা একবার তাহার নামও করে না!

সে জল ভাঙিয়া অগ্রসর হইল। গ্রামের ও-মাথায় পথের উপরে সে দাঁড়াইয়া থাকিবে। প্রকাণ্ড বড় মাঠ। তবুও তো দেখা যাইবে কেহ ফিরিতেছে কিনা। জামাই-পণ্ডিত ভাসিয়া গেলে এই পূর্বদিকেই গিয়াছে। মানুষগুলা তো ফিরিবে! দূর হইতে ডাকিয়াও তো খানিকটা আগে খবর পাইবে। দুর্গা গ্রামের পূর্ব মাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। নির্জনে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল, বার বার মনে মনে গাল দিতে লাগিল কামার-বউকে। সর্বনাশী রাক্ষসী যদি এমন করিয়া পণ্ডিতের মুখে কালি মাখাইয়া মাথাটা হেঁট করিয়া দিয়া চলিয়া না যাইত, তবে জামাই-পণ্ডিত এমনভাবে তখন মাঠের দিকে যাইত না। সে তো জামাই-পণ্ডিতের ভাবগতিক জানে। সে যে তাহার প্রতি পদক্ষেপের অর্থ বুঝিতে পারে।

কে একটা লোক দ্রুতবেগে জল ঠেলিয়া গ্রামের ভিতর হইতে আসিতেছে। দুর্গা মুখ ফিরাইয়া দেখিল। কুসুমপুরের রহম শেখ আসিতেছে। রহমই প্রশ্ন করিল—কে, দুগ্‌গা নাকি ?

—হ্যাঁ।

—আরে, দেবু-বাপের খবর কিছু পালি ? শেখের কণ্ঠস্বরে গভীর উদ্বেগ। দেবুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। রহম আজ জমিদারের লোক। এখনও সে জমিদারের পক্ষে থাকিয়াই কাজকর্ম করিতেছে ; দৌলতের সঙ্গেও তাহার যথেষ্ট খাতির। দেবুর প্রসঙ্গ উঠিলে সে তাহার বিরুদ্ধ-সমালোচনাই করিয়া থাকে। কিন্তু দেবুর এই বিপদের সংবাদ পাইয়া কিছুতেই সে স্থির থাকিতে পারে নাই, ছুটিয়া আসিয়াছে। সে বাড়ীতে ছিল না ; থাকিলে হয়তো বাঁধ-ভাঙার খবর পাইবামাত্র দেবুদের সঙ্গেই আসিত। সেই গাছ-বেচা টাকা লইয়া সে সকালে উঠিয়াই গিয়াছিল জংশনের বাজারে। রেলের পুল পার হইবার সময়েই বান দেখিয়া সে খানিকটা ভয় পাইয়াছিল। বাজারে বসিয়াই সে বাঁধ-ভাঙার সংবাদ পায়। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহাদের গ্রামেও জল ঢুকিয়াছে। তাহার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা দৌলতের দলিজায় আশ্রয় লইয়াছে। গ্রামের মাতব্বরদের পরিবারবর্গ প্রায় সকলেই সেখানে। সাধারণ চাষীরা মেয়েছেলে লইয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে আশ্রয় লইয়াছে। মজুর খাটিয়া, চাকরি করিয়া যাহারা খায় তাহারা গিয়াছে গ্রামের পশ্চিম দিকে উঁচু ডাঙায়, এ গ্রামের প্রাচীনকালের মহাপুরুষ গুলমহাম্মদ সাঁহেবের কবরের ওখানে। কবরটির উপর প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের ছায়াপত্রতলে আশ্রয় লইয়াছে। রহম তাহাদের খবর করিতে গিয়াই দেবুর বিপদের সংবাদ পাইয়াছে। সংবাদটা পাইবামাত্র সে যেন কেমন হইয়া গেল।

মুহূর্তে তাহার মনে হইল—সে যেন কত অপরাধ করিয়াছে দেবুর কাছে। উত্তেজনার মুখে—লোকাপবাদের আকারে প্রচারিত দেবুর ঘুষ লওয়াটা বিশ্বাস করিলেও—রহমের মনের কোণে একটা সন্দেহ ছিল, দেবুকে সে যে ছোট হইতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাহাকে সে ভালবাসিয়াছে। ওই জানা এবং ভালবাসাই ছিল সেই সন্দেহের ভিত্তি। কিন্তু সে সন্দেহও এতদিন মাথা তুলিবার অবকাশ পায় নাই। দাঙ্গার মিটমাটের ফলে—জমিদার তরফ হইতে তাহাকে সম্মান দিল—সেই সম্মানটাই পাথরের মত এতদিন সে সন্দেহকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আজ এই সংবাদ অকস্মাৎ যেন পাথরটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল, মুহূর্তে সন্দেহটা প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। দেবু—যে এমন করিয়া জীবন দিতে পারে, সে কখনও এমন শয়তান নয়। দেবু-বাপ কখনও বাবুদের টাকা লয় নাই। তেমন প্রকৃতির লোক নয়। ওটা বাবুদের ধাপ্পাবাজি। সে যদি বাবুদের লোক হইত, তবে এই অত বড় বুদ্ধির ব্যাপারে এক দিনের জন্যও কি তাহাকে বাবুদের কাছারিতে দেখা যাইত না ? সে যদি তেমন স্বার্থপর লোকই হইবে—তবে কেন অসমসাহসিকতার সহিত বাঁধের ভাঙনের মুখে গিয়া দাঁড়াইল ? রহম সেইখান হইতেই ছুটিয়া আসিতেছে।

রহমের প্রশ্নে দুর্গার চোখ দিয়া দরদরধারে জল বহিয়া গেল। এতক্ষণে একটা লোক তাহার জামাই-পণ্ডিতের খবর করিল!

রহম অধিকতর ব্যগ্রতার সঙ্গে প্রশ্ন করিল—দুগ্‌গা?

দুর্গা কথা বলিতে পারিল না, সে ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—না, কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

রহম সঙ্গে সঙ্গে মাঠের জলে নামিয়া পড়িল। দুর্গা বলিল—দাঁড়ান শেখজী, আমিও যাব।

রহম বলিল—আয়। পানি-সাঁতার! এতটা সাঁতার দিতে পারবি তো?

দুর্গা কাপড় সাঁটিয়া অগ্রসর হইল।

রহম বলিল—দাঁড়া। হুই দেখ্‌, কতকগুলা লোক বেরিয়েছে মহাগ্রাম থেকে।

বানে-ডোবা নিচু মাঠকে বাঁয়ে রাখিয়া মহাগ্রামের পাশে-পাশে কতকগুলি লোক আসিতেছে। গ্রামের ধারে মাঠের অপেক্ষা জল অনেক কম। মাঝ-মাঠে সাঁতার-জল স্রোতের বেগে বহিয়া চলিয়াছে।

রহম সেইখান হইতেই হাঁক দিতে সুরু করিল। চাষীর হাঁক। হাঁক কিন্তু জোর হইল না। সারাটা দিন রোজার উপবাস করিয়া গলা শুকাইয়া গিয়াছে। নিজের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা বুঝিয়া রহম বলিল—দুগ্‌গা, তু সমেত হাঁক্ পাড়।

দুর্গাও প্রাণপণে রহমের সঙ্গে হাঁক দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরও বার বার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যদি তাহারা অর্থাৎ পাতু, সতীশ, জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষালই হয়! যদি তাহারা আসিয়া বলে—না, পাওয়া গেল না!

তাহারাই বটে। হাঁকের উত্তর আসিল; শুনিয়াই রহম বলিল—হাঁ, উয়ারাই বটে। ইরসাদের কথা মালুম হচ্ছে।

সে এবার নাম ধরিয়া ডাক দিল—ই-র-সা-দ!

উত্তর আসিল —হাঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোক কয়টি আসিয়া উপস্থিত হইল—ইরসাদ, সতীশ, পাতু, হরেন ও দেখুড়িয়ার একজন ভল্লা।

রহম প্রশ্ন করিল—ইরসাদ,—পণ্ডিত? দেবু-বাপকে পেয়েছো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইরসাদ বলিল—পাওয়া গিয়েছে। জলের তোড়ের মুখে পড়ে মাথায় কিছু ঘা লেগেছে। জ্ঞান নাই।

দুর্গা প্রশ্ন করিল—কোথায়? ইরসাদ মিয়ে—কোথা জামাই-পণ্ডিত?

—দেখুড়েতে। দেখুড়ের ধারে গিয়ে রাম ভল্লা টেনে তুলেছে।

—বাঁচবে তো?

—জগন ডাক্তার রয়েছে। দুজন ভল্লা গিয়েছে কঙ্কণা—যদি হাসপাতালের ডাক্তার আসে। ছিদেম ভল্লা এসেছে—জগন ডাক্তারের বাক্স নিয়ে যাবে।

দুর্গা বলিল—আমিও যাব।

চণ্ডীমণ্ডপ লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা কলরব করিতেছিল। আপন আপন জিনিসপত্র গুছাইয়া—রাত্রির মত জায়গা করিয়া লইবার জন্য ছোটখাটো কলহও বাধিয়া উঠিয়াছে। ছেলেগুলা চ্যা-ভ্যাঁ লাগাইয়া দিয়াছে। কাহারও অন্যের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর নাই। আগন্তুক দলটি চণ্ডীমণ্ডপের কাছে উপস্থিত হইতেই কিন্তু কয়েকজন ছুটিয়া আসিল। কয়েকজনের পিছনে পুরুষেরা প্রায় সকলেই আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঘোষাল, পণ্ডিতের খবর কি ? পণ্ডিত—আমাদের পণ্ডিত ?

—সতীশ—অ সতীশ ?

—পাতু ? বল্‌ কেনে রে ?

চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মেয়েরা উদ্‌গ্রীব হইয়া কাজকর্ম বন্ধ করিয়া স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হরেন উত্তেজিতভাবে বলিল—হোয়াট্‌ ইজ্‌ ভাট্‌ টু ইউ ? সে খবরে তোমাদের কি দরকার ? সেলফিশ পিপ্‌ল সব !

ইরসাদ বলিল—পণ্ডিতকে বহুকষ্টে পাওয়া গিয়েছে। তবে অবস্থা খুব খারাপ।

চণ্ডীমণ্ডপের মানুষগুলি যেন সব পাথর হইয়া গেল। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এক প্রৌঢ়া মা-কালীর মন্দিরের বারান্দায় প্রায় মাথা ঠুকিয়া ঐকান্তিক আর্তস্বরে বলিল—বাঁচিয়ে দাও মা, তুমি বাঁচিয়ে দাও। দেবুকে তুমি বাঁচিয়ে দাও। দেবু—আমাদের সোনার দেবু ! মা-কালী, তুমি মালিক, বাঁচাও তুমি।

স্তব্ধ মানুষগুলির মধ্য হইতে আত্ম-প্রার্থনার গুঞ্জন উঠিল—মা ! মা ! বাঁচাও ! মা কালী !

মেয়েরা বার বার চোখ মুছিতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। জগন ডাক্তারের ওষুধের বাক্স লইয়া ভল্লা জোয়ানটি চলিয়াছিল, পিছনে পিছনে দুর্গা। সে-ও অহরহ মনে মনে বলিতেছিল—বাঁচাও মা, বাঁচিয়ে দাও। মা-কালী, তুমিই মালিক। জামাই-পণ্ডিতকে বাঁচিয়ে দাও। এবার পূজোয় আমি ডাইনে-বাঁয়ে পাঠা দোব মা।

বার বার তাহার চোখে জল আসিতেছিল—মনকে সে প্রবোধ দিতেছিল—আশায় সে বুক বাঁধিতে চাহিতেছিল—জামাই-পণ্ডিত নিশ্চয় বাঁচিবে ! এতগুলি লোক, গোটা গ্রাম-সুদ্ধ লোক যাহার জন্য দেবতার পায়ে মাথা কুটিতেছে, তাহার কি অনিষ্ট হয় ? কিছুক্ষণ আগে যখন তাহারা ঘোষের তোষামোদ করিতেছিল—কই, তখন তো তাহাদের বুক চিরিয়া এমন দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হয় নাই, চোখ দিয়া জল আসে নাই ! সে শুধু দায়ে পড়িয়া বড়লোকের আশ্রয়ে মাথা গুঁজিয়া—লজ্জার মাথা খাইয়া মিথ্যা তোষামোদ করিয়াছে। সে তাহাদের প্রাণের কথা নয়। কখনও নয়। এইটাই তাহাদের প্রাণের কথা। দরদর করিয়া চোখ দিয়া জল কি শুধুই পড়ে ? মানুষের কদর্যপনার সঙ্গেই দুর্গার জীবনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

মানুষকে সে ভাল বলিয়া কখনও মনে করে নাই। আজ তাহার মনে হইল—মানুষ ভাল—মানুষ ভাল। বড় বিপদে, বড় অভাবে পড়িয়া তাহারা খারাপ হয়। তবুও তাহাদের বুকের ভিতর থাকে ভালত্ব। মানুষের সঙ্গে স্বার্থের জন্য ঝগড়া করিয়াও তাহার মন খারাপ হয়। পাপ করিয়া তাহার লজ্জা হয়।

মানুষ ভাল। জামাই-পণ্ডিতকে তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। জামাই-পণ্ডিত তাহার বাঁচিবে।

—কে যায় গো? কে যায়?—পিছন হইতে ভারী গলায় কে ডাকিল।

ভল্লা জোয়ানটি মুখ না ফিরাইয়া বলিল—আমরা।

—কে তোমরা?

এবার ছোকরা চটিয়া উঠিল। সে বলিল—তুমি কে?

শাসন-দৃপ্ত কণ্ঠে পিছন হইতে হাঁক আসিল—দাঁড়া ওইখানে।

—না।

—এ্যাই!

ছোকরা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু চলিতে বিরত হইল না। দুর্গা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পিছনের লোকটি হাঁকিয়া বলিল—এই শালা!

ছোকরা এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এগিয়ে এস বুনুই, দেখি তোমাকে একবার।

—কে তুই?

—তুই কে?

—আমি কালু শেখ, ঘোষ মহাশয়ের চাপরাসী। দাঁড়া ওইখানে।

—আমি জীবন ভল্লা! তোমার ঘোষ মশায়ের কোন ধার ধারি না আমি।

—তোমার সঙ্গে কে? মেয়ে নোক—? কে বটে?

—দুর্গা তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল—আমি দুগ্‌গা দাসী।

—দুগ্‌গা?

—হ্যাঁ।

কালু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা যাও।

কালু বাহির হইয়াছে পদ্মর সন্ধানে। পদ্ম শ্রীহরির বাড়ীতে নাই। বানের গোলমালের মধ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেহ লক্ষ্য করে নাই। সন্ধ্যার মুখে শ্রীহরি তথ্যটা আবিষ্কার করিয়া রাগে ক্ষোভে একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কালুকে পাঠাইয়াছে, ভূপালকে পাঠাইয়াছে পদ্মর সন্ধানে।

পদ্ম পলাইয়াছে। গতরাত্রে এক অসুস্থ মুহূর্তে তৃষ্ণার্ত পাগলে যেমন করিয়া পঙ্কপুকুরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি ভাবেই শ্রীহরির দরজার সম্মুখে আসিয়া তাহার বাড়ীতেই ঢুকিয়াছিল। আজ সকাল হইতে তাহার অনুশোচনার সীমা ছিল না। তাহার জীবনের কামনা শুদ্ধমাত্র রক্তমাংসের দেহের কামনাই নয়, পেটের ভাতের কামনাই নয়, তাহার মনের

পুষ্পিত কামনা—সে ফলের পরিণতির সফলতায় সার্থক হইতে চায়। অন্ন সে শুধু নিজের পেট পুরিয়া চায় না—অন্নপূর্ণা হইয়া পরিবেশন করিতে চায়—পুরুষের পাতে, সন্তানের পাতে; তাহার কামনা অনেক। শ্রীহরির ঘরে থাকার অর্থ উপলব্ধি করিয়া সকাল হইতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে এবং বন্যার বিপদে এই জনসমাগমের সুযোগে কখন তাহাদের মধ্য দিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণে বন্যা, পূর্বে বন্যা, পশ্চিমেও তাই, সে উত্তর দিকের মাঠ ধরিয়া অন্ধকারের আবরণে চলিয়াছে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে—যেখানে হোক্।

ভল্লাটির পিছনে দুর্গা চলিয়াছিল।

মাঠের বন্যা বাড়িয়া উঠিয়াছে—যেখানে বৈকালে এককোমর জল ছিল, সেখানে জল এখন বুক ছাড়াইয়াছে। শিবকালীপুরে চাষীপাড়াতেও এবার ঘরে জল ঢুকিতেছে। তাহারা মহাগ্রামের ভিতর দিয়া চলিল। মহাগ্রামের পথেও হাঁটুর উপর জল। বন্যার যে রকম বৃদ্ধি, তাহাতে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই চাষীদের ঘরেও বান ঢুকিবে। মহাগ্রাম এককালের সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম—অনেক পড়ো ভিটায় ভাঙা ঘরের মাটির স্তূপ জমিয়া আছে—সেকালের গৃহস্থের পোঁতা গাছগুলির ছায়াকে আশ্রয় করিয়া সেই মাটির স্তূপের উপর সব গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ও বাড়ীতে যত লোক ধরিয়াছে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন।

দেখুড়িয়ায় একমাত্র ভরসা তিনকড়ির বাড়ী; তিনকড়ির বাড়ীটা খুব উঁচু। সেখানেই অধিকাংশ লোক আশ্রয় লইয়াছে। অনেকে গ্রামান্তরে পলাইয়াছে। ভল্লাদের অনেকে এখন বাঁধের উপরে বসিয়া আছে। কাঠ ভাসিয়া গেলে ধরিবে। গরু ভাসিয়া গেলে ধরিবে। রাম তারিণী প্রভৃতি কয়েকজন রাত্রেও থাকিবে স্থির করিয়াছে। কত বড়লোকের ঘর ভাঙিবে; কাঠের সিন্দুক আসিতে পারে। অলঙ্কার-পরা বড়লোকের মেয়ের মৃতদেহও ভাসিয়া আসিতে পারে। বড়লোক বাবু ভাসিয়া আসিতে পারে—যাহার জামায় থাকিবে সোনার বোতাম, আঙুলে হীরার আংটি, পকেটে থাকিবে নোটের তাড়া—কোমরে গেঁজলে-ভরা মোহর। কেবল এক-একজন পালা করিয়া তিনকড়ির বাড়ীতে থাকিবে। পণ্ডিতের অসুখ—কখন্ কি দরকার লাগে কে জানে!

জগন ডাক্তার তিনকড়ির দাওয়ায় বসিয়া ছিল।

জীবন বাক্সটা নামাইয়া দিল।

দুর্গা ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল—ডাক্তারবাবু, জামাই-পণ্ডিত কেমন আছে?

ডাক্তার ওষুধের বাক্স খুলিয়া ইন্‌জেকশনের সরঞ্জাম বাহির করিতে করিতে বলিল—গোলমাল করিস্ নে, বস।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে দেবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে? কে?

দুইজনেই ছুটিয়া গেল ঘরের মধ্যে; দেবু চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে; তাহার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল তিনকড়ির মেয়ে স্বর্ণ। রাঙা চোখে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে

চাহিয়া—অকস্মাৎ সে দুই হাতে স্বর্ণের চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার মুখখানা আপনার চোখের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিতেছে—কে? কে?

স্বর্ণের চুলগুলি যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য তাহার। সে নীরবে দেবুর হাত দুইখানা ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

দেবু আবার প্রশ্ন করিল—বিলু? বিলু? কখন এলে তুমি? বিলু!

জগন দেবুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া স্বর্ণকে মুক্ত করিয়া দিল।

দুর্গা ডাকিল—জামাই-পণ্ডিত!

জগন মৃদুস্বরে বলিল—ডাকিস না। বিকারে বক্‌ছে।

আঠার

ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা বন্যার ভীষণ প্লাবনে অঞ্চলটা বিপর্যস্ত হইয়া গেল। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কালবন্যা—ঘোড়া বান আসে নাই। পঞ্চগ্রামের সুবিস্তীর্ণ মাঠখানায় শস্যের প্রায় চিহ্ন নাই। জলস্রোত কতক উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। বাকী যাহা ছিল, তাহা হাজিয়া পচিয়া গিয়াছে; একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। মাঠের জল পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে সবুজ। বাঁধের ধারে যেদিক দিয়া জলস্রোতের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল—সেখানকার জমিগুলির উপরের মাটিটুকু চাষীরা চষিয়া খুঁড়িয়া, সার ঢালিয়া, চন্দনের মত মোলায়েম এবং সন্তানবতী জননীর বুকের মত খাদ্যরস-সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল—তাহার আর কিছুই নাই; স্রোতের টানে খুলিয়া গলিয়া ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া গিয়াছে। জমিগুলার বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে কঠিন অনুর্বর এঁটেল মাটি; কতক কতক জমির উপর জমিয়া গিয়াছে রাশীকৃত বালি।

গ্রামের কোলে কোলে—যেখানে জলস্রোত ছিল না—সে জমিগুলি শেষে ডুবিয়াছিল এবং আগেই বন্যা হইতে মুক্ত হইয়াছে—সেখানে কিছু কিছু শস্য আছে। কিন্তু সে শস্যের অবস্থাও শোচনীয়; দুর্ভিক্ষ মহামারীর শেষে যে মানুষগুলি কোনমতে বাঁচিয়া থাকে—ঠিক তাদেরই মত অবস্থা। এখন আবার পল্লীগুলির ঘর ধ্বসিয়া ভাঙিয়া পড়িবার পালা পড়িয়াছে। কতক ঘর অবশ্য বন্যার সময়েই ভাঙিয়াছে; কিন্তু বন্যার পর ধ্বসিতেছে বেশী। বন্যায় ঘর এইভাবেই বেশী ভাঙে। জলে যখন ডুবিয়া থাকে তখন দেওয়ালের ভিত ভিজিয়া নরম হয়, তারপর জল কমিলে—রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলেই ফুলিয়া গিয়া ধ্বসিয়া পড়ে। প্রায় শতকরা পঞ্চাশখানা ঘর ভাঙিয়াছে। খড়বিচালি ভাসিয়া গিয়াছে, বন্যায় ডুবিয়া গোচর-ভূমির ঘাস পচিয়া গিয়াছে—গাই-বলদ-ছাগল-ভেড়াগুলার অনাহার সুরু হইয়াছে। তাহারা সুযোগ পাইবা মাত্র ছুটিয়া চলিয়াছে উত্তর দিকে। পূর্ব-পশ্চিমে বহমান ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী গ্রামগুলির উত্তর দিকে সব মাঠ উঁচু; চিরকাল অবহেলার মাঠ; ওই মাঠ জলে ডোবে নাই। এবার অতি-বৃষ্টিতেও মাঠের ফসল বেশ ভাল—গরু ছাগল-ভেড়া ওই মাঠেই ছুটিয়া যাইতে চায়। এবার ওই উত্তরের মাঠেই মানুষের ভরসা; কিন্তু ওদিকে জমির পরিমাণ অতি সামান্য।

শ্রীহরি ঘোষ আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। তাহার কর্মচারী দাসজীর সঙ্গে এই সব কথাই সে বলিতেছিল। দাস আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল—বৃদ্ধির ব্যাপারটা আপোসে মিটমাট করা ভারি অন্যায় হয়েছে—ভারি অন্যায়।

তাহার বক্তব্য—আপোসে মিটমাট না করিয়া মামলার সংকল্পে অবিচলিত থাকিলে আজ মামলাগুলি অনায়াসে একতরফা ডিক্রি—অর্থাৎ প্রজাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হইয়া ডিক্রি হইয়া যাইত। এই অবস্থায় আদালতের মারফতে আপোস করিলেও অনেক ভাল হইত। আদালতকে ছাড়িয়া আপোসে বৃদ্ধি—টাকায় দুই আনার বেশী হয় না, আদালত তাহা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু মামলায় অথবা মামলা করিয়া আদালতের মারফতে আপোস করিলে বৃদ্ধি অনেক বেশী হইতে পারে। এমন কি টাকায় আট আনা পর্যন্ত বৃদ্ধির নজির আছে।

শ্রীহরির কথাটা মনে হইয়াছে। কিন্তু কঙ্কণার বড়বাবু যে ব্যাপারটা মাটি করিয়া দিলেন! কি কুক্ষণেই রহমের সঙ্গে হাঙ্গামাটা বাধাইলেন!

দাস বলিল—ধর্মঘটের ঘট বানের জলে ভেসে যেত। পেটের জন্যেই তখন এসে গড়িয়ে পড়ত আপনাদের দরজায়। কলের মালিক তখন টাকা দাদন দিতে চেয়েছিল মাঠের ধান দেখে। কিন্তু এই বানের পরে যে একটি আধলাও কাউকে দিত না।

শ্রীহরি একটু হাসিল—পরিতৃপ্তির হাসি। সে কথা সে জানে। তাহার শান্-বাঁধানো উঁচু বাড়ীতে বন্যার জলে ক্ষতি করিতে পারে নাই। ধানের মরাইগুলি অক্ষত পরিপূর্ণ অবস্থায় তাহার আঙিনা আলো করিয়া রহিয়াছে। সে কল্পনা করিল—পাঁচখানা-সাতখানা গ্রামের লোক তাহার খামারে ওই ফটকের সম্মুখে ভিক্ষুকের মত করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। ধান চাই। তাহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ অনাহারে রহিয়াছে, মাঠে একটি বীজধানের চারা নাই।

ভাদ্র মাসের এখনও পনের দিন আছে, এখনও দিবারাত্রি পরিশ্রম করিলে অল্পস্বল্প জমি চাষ হইতে পারিবে। 'আছাড়ো' করিয়া বীজ পড়িলে কয়েক দিনের মধ্যেই বীজের চারা উঠিয়া পড়িবে। সেই বীজ লইয়া যে যতখানি পারে চাষ করিতে পারিলে তবুও কিছুটা পাওয়া যাইবে। অন্তত প্রতি চারিটিতে একটি করিয়াও ধানের শীষ হইবে। শ্রীহরির নিজের জমি অনেক—অমরকুণ্ডার মাঠের সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলি প্রায় সবই তাহার। সে-সব জমিতে যতখানি সম্ভব চাষ করিবার আয়োজন সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছে। যতটুকু হয়—সেটুকুই লাভ। "আষাঢ়ে রোপণ নামকে"—অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত জল খুব কমই হয় এবং রোয়ার কাজও খুব কম হয়—আষাঢ়ের চাষ নামেই আছে, কার্যত হয় না; হইলেও শস্য অপেক্ষা পাতাই হয় বেশী। "শাওনে রোপণ ধানকে"—শ্রাবণের চাষে শস্য হয় ভাল এবং সাধারণতঃ শ্রাবণেই উপযুক্ত বৃষ্টি এদেশে হয়। শ্রাবণের চাষই বাস্তব এবং ফলপ্রদ। "ভাদুরে রোপণ শীষকে"—অর্থাৎ শ্রাবণ পর্যন্ত বৃষ্টি না হইয়া ভাদ্রে বৃষ্টি নামিলে, সে বৃষ্টি অনাবৃষ্টির; ফসল হইবার তেমন কথাও নয়, এবং ভাদ্রে রোয়া ধানগাছগুলি ঝাড়ে-

গোছে বাড়িবার সময় পায় না। ফলে যে কয়েকটা চারা পোঁতা হয়, সেই চারাগুলিতেই একটি করিয়া শীষ হয়। আর "আশ্বিনে রোপণ কিস্‌কে"? অর্থাৎ আশ্বিনে চাষ কিসের জন্য?···এটা ভাদ্র মাস—এখনও ভাদ্রের পনেরটা দিন অবশিষ্ট; এখনও ধানের চারা রুইতে পারিলে, এক শীষ করিয়া ধান মিলিবে। চাষীদের বীজের ধান চাই, খাইবার ধান চাই।

শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইবে না। সে তাহাদের ধান দিবে। সমস্ত মরাই উজাড় করিয়া ধান দিবে। কল্পনানেত্রে সে দেখিল—লোকে অবনত মুখে ধান-ঋণের খতে সই করিয়া দিল। মুক্তকণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়া তাহারা আরও একখানি অদৃশ্য খত লিখিয়া দিল,—তাহার নিকট আনুগত্যের খত। অকস্মাৎ সে এই সমস্তের মধ্যে অমোঘ বিচারের বিধান দেখিতে পাইল। গভীরভাবে সে বলিয়া উঠিল—হরি-হরি-হরি। তুমিই সত্য।

ভগবানের প্রতিভূ রাজা, সকল দেবতার অংশে-রাজার জন্ম। ভগবানের পৃথিবী, ভগবানের প্রতিভূ রাজা পৃথিবী শাসন করেন। পৃথিবীর ভূমি তাঁহার, সকল সম্পদ তাঁহার। রাজার প্রতিভূ জমিদার। রাজাই জমিদারকে রাজার বিধান দিয়াছেন—তুমি কর আদায় করিবে, তাহাদের শাসন করিবে। তাঁহারই নিয়মে প্রজা ভূমির জন্য কর দেয়, রাজার মতই রাজার প্রতিভূকে মান্য করে। সে বিধানকে ইহারা অমান্য করিয়াছিল বলিয়াই এতবড় বন্যার শাস্তি তিনিই বিধান করিয়াছেন। এখন তাহার পরীক্ষা। প্রজার বিপর্যয়ে রাজার কর্তব্য তাহাদিগকে রক্ষা করা। রাজার প্রতিভূ হিসাবে সে কর্তব্য তাহার উপর আসিয়া বর্তিয়াছে। সে যদি সে-কর্তব্য পালন না করে, তবে তিনি তাহাকেও রেহাই দিবেন না। সে তাহাদিগকে ধান দিবে। তাহার কর্তব্যে সে অবহেলা করিবে না।

দুই হাত জোড় করিয়া সে ভগবানকে প্রণাম করিল। তিনি তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। দিতে বাকী রাখিয়াছেন কি? জমি, বাগান, পুকুর, বাড়ী;—শেষ পর্যন্ত তাহার কল্পনাতীত বস্তু জমিদারি—সেই জমিদারিও তিনি তাহাকে দিয়াছেন। গোয়াল-ভরা গরু, খামার-ভরা মরাই, লোহার সিন্দুক-ভরা টাকা, সোনা, নোট—তাহাকে দু হাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহার জীবনের সকল কামনাই তিনি পরিপূর্ণ করিয়াছেন; পাপকামনা পূর্ণ করিয়াও অত্যাশ্চর্যভাবে সেই পাপ-প্রভাব হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অনিরুদ্ধের সঙ্গে যখন তাহার প্রথম বিরোধ বাধে, তখন হইতেই তাহার কামনা ছিল—অনিরুদ্ধের জমি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দেশান্তরী করিবে এবং তাহার স্ত্রীকে সে দাসী করিয়া রাখিবে। অনিরুদ্ধের জমি সে পাইয়াছে—অনিরুদ্ধ দেশত্যাগী। অনিরুদ্ধের স্ত্রীও তাহার ঘরে স্বেচ্ছায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। যাক্‌ সে যে পলাইয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে, ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

এইবার দেবু ঘোষকে শায়েস্তা করিতে হইবে। আরও কয়েকজন আছে,—জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, তিনকড়ি পাল, সতীশ বাউড়ী, পাতু বায়েন, দুর্গা মুচীনী। তিনকড়ির ব্যবস্থা হইয়াছে। সতীশ, পাতু—ওগুলা পিঁপড়ে; তবে দুর্গাকে ভালমত সাজা দিতে হইবে। জগন, হরেনকে সে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। কোন মূল্যই নাই ও-দুটার। আর দেবুকে

শায়েস্তা করিবার আয়োজনও আগে হইতেই হইয়া আছে। কেবল বন্যার জন্যই হয় নাই ; পঞ্চগ্রামের সমাজের পঞ্চায়েত-মণ্ডলীকে এইবার একদিন আহ্বান করিতে হইবে। দেবু অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, আরও একটু সুস্থ হউক। দেখুড়িয়া হইতে বাড়ীতে আসুক। চণ্ডীমণ্ডপে তাহাকে ডাকিয়া, পঞ্চগ্রামের লোকের সামনে তাহার বিচার হইবে।

কালু শেখ আসিয়া সেলাম করিয়া একখানা চিঠি, গোটাদুয়েক প্যাকেট ও একখানা খবরের কাগজ আনিয়া নামাইয়া দিল। কঙ্কণার পোস্টাপিসে এখন শ্রীহরির লোক নিত্য যায় ডাক আনিতে। এটা সে কঙ্কণার বাবুদের দেখিয়া শিখিয়াছে। খবরের কাগজ দেখিয়া, সে চিঠি লিখিয়া ক্যাটালগ আনায় ; চিঠিপত্রের কারবার সামান্যই—উকিল-মোক্তারের নিকট হইতে মামলার খবর আসে। আর আসে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র। চিঠিখানায় একটা মামলার দিনের খবর ছিল, সেখানা দাসজীকে দিয়া শ্রীহরি খবরের কাগজটা খুলিয়া বসিল। কাগজটার মোটা-মোটা অক্ষরের মাথার খবরের দিকে চোখ বুলাইতে গিয়া হঠাৎ সে একটা খবর দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা—"ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রবল বন্যা।"··· রুদ্ধনিশ্বাসে সে সংবাদটা পড়িয়া গেল।···

দেবুও অবাক হইয়া গেল।

সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, তবে শরীর এখনও দুর্বল। কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারের চিকিৎসায়, জগন ডাক্তারের তদ্বিরে এবং স্বর্ণের শুশ্রূষায়—সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। গতকল্য সে অন্নপথ্য করিয়াছে। আজ সে বিছানার উপর ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল নিজের কথা। একেবারে গেলেই ভাল হইত। আর সে পারিতেছে না। রোগশয্যায় দুর্বল ক্লান্ত শরীরে শুইয়া তাহার মনে হইতেছিল—পৃথিবীর স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ সব ফুরাইয়া গিয়াছে। কেন ? কিসের জন্য তাহার বাঁচিয়া থাকা ? বাঁচার কথা মনে হইলেই তাহার মনে পড়িতেছে তাহার নিজের ঘর। নিস্তব্ধ, জনহীন ধুলায় আচ্ছন্ন ঘর !···তিনকড়ির ছেলে গৌর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে প্রবেশ করিল—পণ্ডিত-দাদা !

—গৌর ? দেবু বিস্মিত হইল—কি গৌর ? ইস্কুল থেকে ফিরে এলে ?

গৌর জংশনের ইস্কুলে পড়ে ; এখন ইস্কুলের ছুটির সময় নয়। গৌর একখানা খবরের কাগজ তাহার সামনে ধরিয়া বলিল—এই দেখুন !

—কি ? বলিয়াই সে সংবাদটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। "ময়ূরাক্ষী নদীতে ভীষণ বন্যা"। সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা কেহ লিখিয়াছে। বন্যার ভীষণতা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছে : "শিবকালীপুরের দেশপ্রাণ তরুণ কর্মী দেবনাথ ঘোষ বন্যার গতিরোধের জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নাই। উপরন্তু তিনি বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যান। বহু কষ্টে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।" ইহার পরেই স্থানীয় ক্ষতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে—"এখানকার অধিবাসীরা আজ সম্পূর্ণ রিক্ত ও গৃহহীন। শতকরা যাটখানি বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত খাদ্যশস্য বন্যার প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে, সাংসারিক সকল সম্বল নিশ্চিহ্ন ;

ভবিষ্যতের আশা কৃষিক্ষেত্রের খাদ্যসম্পদ বন্যায় পচিয়া গিয়াছে; অনেকের গরুবাছুরও ভাসিয়া গিয়াছে। এই শেষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের চিরসঙ্গী মহামারীরও আশঙ্কা করা যাইতেছে। তাহাদের জন্য বর্তমানে খাদ্য চাই, ভবিষ্যতে বাঁচিবার জন্য বীজধান চাই, মহামারী হইতে রক্ষার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা চাই; নতুবা দেশের এই অংশ শ্মশানে পরিণত হইবে। এই বিপন্ন নরনারীগণকে রক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর উপর ন্যস্ত; সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাইতেছি। এইস্থানে অধিবাসীগণের সাহায্য-কল্পে একটি স্থানীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের একনিষ্ঠ সেবক—উপরোক্ত শ্রীদেবনাথ ঘোষ সম্পাদক হিসাবে সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশবাসীর যথাসাধ্য সাহায্য—বিধাতার আশীর্বাদের মতই গৃহীত হইবে।"

দেবু অবাক হইয়া গেল। এ কি ব্যাপার! খবরের কাগজে এসব কে লিখিল? দেশপ্রাণ—দেশের একনিষ্ঠ সেবক! দেশময় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ বার্তা কে ঘোষণা করিয়া দিল? খবরের কাগজটা একপাশে সরাইয়া, সে খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল।

গৌর কাগজখানা লইয়া বহুজনকে পড়িয়া শুনাইল। যে শুনিল সে-ই অবাক হইল। দেশের গেজেট দেবু পণ্ডিতের নামে জয়জয়কার করিয়াছে—ইহাতে তাহারা খুশী হইল। শ্রীহরি দেবুকে পতিত করিবার আয়োজন করিতেছে, দায়ে পড়িয়া শ্রীহরির মতেই তাহাদিগকে মত দিতে হইবে; তবুও তাহারা খুশী হইল। বার বার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল—হ্যাঁ, তা বটে। ঠিক কথাই লিখেছে। এর মধ্যে মিথ্যা কিছু নাই। দশের দুঃখে দুঃখী, দশের সুখে সুখী—দেবু তো আমাদের সন্ন্যেসী!

তিনকড়ি আস্ফালন করিয়া নির্মম নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে গালাগালি দিল—থাম্ থাম্ দুমুখো সাপের দল, থাম্ তোরা। নেড়ী কুত্তার মতন যার কাছে যখন যাবে—তারই পা চাটবে আর ন্যাজ নাড়বে। দেবুর প্রশংসা করবার তোরা কে? যা ছিরে পালের কাঁছে যা, দল পাকিয়ে পতিত করগে দেবুকে। যা বেটারা, বল্ গিয়ে তোদের ছিরেকে—গেজেটে কি লিখেছে দেবুর নামে!

তিনকড়ির গালিগালাজ লোকে চুপ করিয়া শুনিল—মাথা পাতিয়া লইল। একজন শুধু বলিল—মোড়ল, পেট হয়েছে দুশমন—কি করব বল? তুমি যা বলছ তা ঠিক বটে।

—পেট আমার নাই? আমার ইস্তিরি-পুত্তু-কন্যে নাই?

এ কথার উত্তর তাহারা দিতে পারিল না। তিনকড়ি পেট-দুশমনকে ভয় করে না, তাহাকে সে জয় করিয়াছে—এ কথা তাহারা স্বীকার করে; এজন্য তাহাকে তাহারা প্রশংসা করে। আবার সময়বিশেষে—নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিতে তিনকড়ির এই যুদ্ধকে বাস্তববোধহীনতা বলিয়া নিন্দা করিয়া আত্মগ্লানি হইতে বাঁচিতে চায়। কতবার মনে করে—তাহারাও তিনকড়ির মত পেটের কাছে মাথা নিচু করিবে না।. অনেক চেষ্টাও করে; কিন্তু পেট-দুশমনের নাগপাশের এমনি বন্ধন যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার পেষণে এবং বিষনিশ্বাসে

জর্জরিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে হয়। তাই আর সাহস হয় না।

বাপ, পিতামহ, তাহাদেরও পূর্বপুরুষ ওই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে সন্তান-সন্ততিকে বার বার সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে—"পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়, মাথা ঠুকিয়ো না।" পেটের চেয়ে বড় কিছু নাই, অনাহারের যাতনার চেয়ে অধিকতর যাতনা কিছু নাই ; উদরের অন্নকে বিপন্ন করিয়ো না—তাহাদের শিরায় শিরায় প্রবহমাণ। শ্রীহরির ঘরেই যে তাহাদের পেটের অন্ন, কেমন করিয়া তাহারা শ্রীহরিকে অমান্য করিবে ? তবুও মধ্যে মধ্যে তাহারা লড়াই করিতে চায়। বুকের ভিতর কোথায় আছে আর একটা গোপন ইচ্ছা—অন্তরতম কামনা, সে মধ্যে মধ্যে ঠেলিয়া উঠিয়া বলে—না আর নয়, এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল !

এবার ধর্মঘটের সময়—সেই ইচ্ছা একবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যেটুকু সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত, পারিবার কথা—তাহার চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া কোথা দিয়া শেখেদের সঙ্গে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইল ; সদর হইতে আসিল সরকারী ফৌজ। পুরুষানুক্রমে সঞ্চয়-করা ভয়ে তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি দেখাইল দানার লোভ। আর তাহারা থাকিতে পারিল না। থাকিয়াই বা কি হইত ? কি করিত ? এই বন্যার পর যে শ্রীহরি ভিন্ন তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। কি করিবে তাহারা ? শ্রীহরির কথায় সাদাকে কালো—কালোকে সাদা না বলিয়া তাহাদের উপায় কি ? পেট-দুশমনের ভার কেহ নাও, পেট পুরিয়া খাইতে পাইবার ব্যবস্থা কর,—দেখ তাহারা কি না পারে !

তিনকড়ির গালিগালাজের আর শেষ হয় না।—ভীতু শেয়াল, লোভী গরু, বোকা ভেড়া পেটে ছোরা মার্ গিয়ে ! মরে যা তোরা ! মরে যা ! ঢোঁড়া সাপ—এক ফোঁটা বিষ নেই ! মরে যা তোরা, মরে যা !

দেঁখুড়িয়ার অধিবাসী তিনকড়ির এক জ্ঞাতি-ভাই হাসিয়া বলিল—মরে গেলে তো ভালই হয় ভাই তিনু। কিন্তু মরণ হোক বললেই তো হয় না—আর নিজেও মরতে পারি না ! তেজের কথা—বিষের কথা বলছিস ? তেজ, বিষ কি শুধুই থাকে রে ভাই ? বিষয় না থাকলে বিষও থাকে না, তেজও থাকে না !

তিনকড়ি মুখ খিঁচিয়া উঠিল—বিষয় ! আমার বিষয় কী আছে ? কত আছে ? বিষয়—টাকা—!

সে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনুদাদা বিষয়—টাকা। তেজ-বিষ আমারও একদিন ছিল। মনে আছে—তুমি আর আমি কঙ্কণার নিতাইবাবুকে ঠেঙিয়েছিলাম ? রাত্রে আসত—দেঁতো গোবিন্দের বোনের বাড়ী ? তাতে আমিই তোমাকে ডেকেছিলাম। আগে ছিলাম আমি। নিতাইবাবু মার খেয়ে ছ'মাস ভুগে শেষটা মরেই গেল---মনে আছে ? সে করেছিলাম গাঁয়ের ইজ্জতের লেগে। তখুন তেজ ছিল—বিষ ছিল। তখন আমাদের জমজমাট সংসার। বাবার প্রকাশ বিঘে জমির চাষ, তিনখানা হাল ; বাড়ীতে আমরা পাঁচ ভাই—পাঁচটা মুনিষ ;

তখন তেজ ছিল—বিষ ছিল। তারপর পাঁচ ভাইয়ে ভিন্ন হলাম ; জমি পেলাম দশ বিঘে, পাঁচটা ছেলেমেয়ে ; নিজেই বা কি খাই—ছেলেমেয়েদিগের মুখেই বা কি দিই ? শ্রীহরি ঘোষের দোরে হাত না পেতে করি কি বল ? আর তেজ-বিষ থাকে ?

আবার একটু হাসিয়া বলিল—তুমি বলবে—তোমারই বা কি ছিল ? ছিল কিনা—তুমিই বল ? আর জমিও তোমার আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। তোমার তেজ-বিষ মরে নাই, আছে। তাও তো তেজের দণ্ড অনেক দিলে গো। সবই তো গেল। রাগ করো না, সত্যি কথা বলছি। ঠিক আগেকার তেজ কি তোমারই আছে ?

তিনকড়ি এতক্ষণে শান্ত হইল। কথাটা নেহাত মিথ্যা বলে নাই। আগেকার তেজ কি তাহারই আছে ? আজকাল সে চিৎকার করিলে লোকে হাসে। আর ওই ছিল—ছিরে, আগে চিৎকার করিলে লোকে সকলেই তো তাহার উত্তর করিত—সামনা-সামনি দাঁড়াইত। কিন্তু আজ ছিরে শ্রীহরি হইয়াছে। তাহার তেজের সম্মুখে মানুষ—আগুনের সামনে কুটার মত কাঁপে ; কুটা কাঁচা হইলে শুকাইয়া যায়, শুকনা হইলে জ্বলিয়া উঠে।

লোকটি এবার বলিল—তিনু-দাদা, শুনলাম নাকি গেজেটে নিকেছে—দেবুর কাছে টাকা আসবে—সেই সব টাকা-কাপড় বিলি হবে ?

তিনকড়ি এতটা বুঝিয়া দেখে নাই ; সে এতক্ষণ আস্ফালন করিতেছিল—গেজেটে শ্রীহরিকে বাদ দিয়া কেবল দেবুর নাম প্রকাশিত হইয়াছে—এই গৌরবে। সে যে-কথাটা শ্রীহরিকে বার বার বলে—সেই কথাটা গেজেটেও বলিয়াছে—সেই জন্য। সে বলে—তুই বড়লোক আছিস আপনার ঘরে আছিস, তার জন্যে তোকে খাতির করব কেন ? খাতির করব তাকেই যে খাতিরের লোক। স্বর্ণের পাঠ্যপুস্তক হইতে কয়েকটা লাইন পর্যন্ত সে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে—

> "আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
> লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
> বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
> সংসারে সে বড় হয় বড় গুণ যার।"

ধনী শ্রীহরিকে বাদ দিয়া গেজেট গুণী দেবুর জয়-জয়কার ঘোষণা করিয়াছে—সেই আনন্দেই আস্ফালন করিতেছিল। হঠাৎ এই কথাটা শুনিয়া তাহারও মনে হইল, হ্যাঁ, গেজেট তো লিখিয়াছে ! যে যাহা সাহায্য করিবেন, বিধাতার আশীর্বাদের মতই তাহা লওয়া হইবে।

তিনকড়ি বলিল—আসবে না ? নিশ্চয় আসবে। নইলে গেজেটে লিখলে ক্যান ?··· তিনকড়ির সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে ওই কথাটা প্রচার করিবার জন্য তখনই ভল্লা পাড়ায় চলিয়া গেল। রামা, ও রামা !···তেরে ! গোবিন্দে ! ছিদমে ! কোথা রে সব ?

দেবু তখনও ভাবিতেছিল। এ কে করিল ? বিশু-ভাই নয় তো ? কিন্তু বিশু বিদেশে

থাকিয়া এসব জানিবে কেমন করিয়া? ঠাকুর-মহাশয় লিখিয়া জানাইলেন? হয়তো তাই। তাই সম্ভব। কিন্তু এ কী করিল বিশু-ভাই? এ বোঝা আর সহিতে পারিবে না! সে মুক্তি চায়। জীবন তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। ক্লান্তি, অরুচি, তিক্ততায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। আর দু-তিনটা দিন গেলেই সে তিনকড়ি-কাকার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে। তিনকড়ির ঋণ তাহার জীবনে শোধ হইবার কথা নয়। রাম ভল্লা তাহাকে বন্যার স্রোত হইতে টানিয়া তুলিয়াছে। কুসুমপুরের ও-মাথা হইতে তিনখানা গ্রাম পার হইয়া দেখুড়িয়ার ধার পর্যন্ত সে ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর হইতে তিনকড়ি তাহাকে নিজের ঘরে আনিয়া গোষ্ঠীসুদ্ধ মিলিয়া যে সেবাটা করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। তিনকড়ির স্ত্রী ও স্বর্ণ, নিজের মা-বোনের মত সেবা করিয়াছে; গৌরও সেবা করিয়াছে সহোদর ভাইয়ের মত। তিনকড়ি তাহাকে আপনার খুড়ার মত যত্ন করিয়াছে। কিন্তু এও তাহার সহ্য হইতেছে না, কোন রকমে আপনার পা-দুইটার উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইবার বল পাইলেই সে চলিয়া যাইবে। এই অকৃত্রিম স্নেহের সেবাযত্ন তাহাকে অস্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিয়াছে। এও তাহার ভাল লাগিতেছে না। খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে লোকের ভাঙা ঘর, বন্যার জলে হাজিয়া-যাওয়া শাক-পাতার ক্ষেত, পথের দুধারে পলি-লিপ্ত ঝোপঝাড়, গাছপালা, গ্রাম্য পথখানি যেখানে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে পড়িয়াছে সেইখান দিয়া পঞ্চগ্রামের মাঠের লম্বা একটা ফালি অংশ কাদায় জলে ভরা—শস্যহীন মাঠ। কিন্তু এসবের কোন প্রতিফলন তাহার চিন্তার মধ্যে চাঞ্চল্য তুলিতেছে না। সে আর পারিতেছে না। সে আর পারিবে না।

—দেবু-দা! গৌর আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে সেই কাগজখানা। দেবু তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—বল!

—এটা কেন লিখেছে দেবু-দা? এই যে—?

—কি?

—এই যে, এইখানটা। খবরের কাগজটা দেবুর বিছানার উপর রাখিয়া গৌর বলিল—এই যে!

দেবু হাসিয়া বলিল—কি কঠিন যে বুঝতে পারলে না? কই দেখি!

গৌর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আমি না। আমিও তো বললাম—ও আবার কঠিন কি? স্বন্ন বলছে!

—কোন্ জায়গাটা?

—এই যে "এই সমস্ত বিপন্ন নরনারীকে রক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর উপর ন্যস্ত। সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সকলকে আহ্বান জানাইতেছি।" তা স্বন্ন বলছে,—ওই যে স্বন্ন দাঁড়িয়ে আছে। আয় না স্বন্ন, আয় না এখানে!

দেবুও সস্নেহে আহ্বান করিল—এস স্বর্ণ, এস!

স্বর্ণ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দেবু বলিল—এর মানে তো কিছু কঠিন নয়!

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—দায়িত্ব লিখেছে কেন তাই শুধোলাম দাদাকে। এ তো লোকের কাছে ভিক্ষা চাওয়া! যার দয়া হবে দেবে—না হয় দেবে না। সে তো দায়িত্ব নয়!

কথাগুলি দেবুর মস্তিষ্কে গিয়া অদ্ভুতভাবে আঘাত করিল।...তাই তো!

স্বর্ণ বলিল—আর আমাদের এখানে বান হয়েছে, তাতে অন্য জায়গার লোকের দায়িত্ব হতে যাবে কেন?

দেবু অবাক হইয়া গেল। সে বুদ্ধিমতী মেয়েটির অর্থ-বোধের সূক্ষ্ম তারতম্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবুর সে দৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ কিন্তু একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল—আমি বুঝতে পারি নাই·· সে লজ্জিত হইয়াই চলিয়া গেল।...দেবু তখনও অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, এ কথাটা তো সে ভাবিয়া দেখে নাই! সত্যই তো—নাম-না-জানা এই গ্রাম কয়খানির দুঃখ-দুর্দশার জন্য দেশ-দেশান্তরের মানুষের দয়া হইতে পারে, কিন্তু দায়িত্ব তাহাদের কিসের? দায়িত্ব। ওই কথাটা গুরুত্বে ও ব্যাপ্তিতে তাহার অনুভূতির চেতনায় ক্রমশ বিপুল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই পঞ্চগ্রামও পরিধিতে বাড়িয়া বিরাট হইয়া উঠিল।

সে ডাকিল—স্বর্ণ!

গৌর বসিয়া তখনও ওই লাইন কয়টি পড়িতেছিল। তাহার মনেও কথাটা লাগিয়াছে। সে বলিল—স্বর্ণ চলে গিয়েছে তো!

—ও। আচ্ছা, ডাক তো তাকে একবার।

ডাকিতে হইল না, স্বর্ণ নিজেই আসিল। গরম দুধের বাটি ও জলের গেলাস হাতে করিয়া আসিয়া, বাটিটা নামাইয়া দিয়া বলিল—খান!

দেবু বলিল—তুমি ঠিক ধরেছ স্বর্ণ। তোমার ভুল হয় নাই। তোমার বুদ্ধি দেখে আমি খুশী হয়েছি।

স্বর্ণ লজ্জিত হইয়া এবার মুখ নামাইল!

দেবু বলিল—তুমি রবীন্দ্রনাথের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটি পড়েছ—

"দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,—
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা'?"

পড়েছ?

স্বর্ণ বলিল—না।

—গৌর, তুমি পড়নি?

—না।

—শোন তবে।

স্বর্ণ বাধা দিয়া বলিল—আগে আপনি দুধটা খেয়ে নিন। জুড়িয়ে যাবে।

দুধ খাইয়া, মুখে জল দিয়া দেবু গোটা কবিতাটা আবৃত্তি করিয়া গেল।

স্বর্ণ বলিল—আমাকে লিখে দেবেন কবিতাটি ?

দেবু বলিল—তোমাকে এই বই একখানা প্রাইজ দেব আমি।

স্বর্ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—পণ্ডিত মশায় আছেন ? কে বাহির হইতে ডাকিল।

গৌর মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল—ডাক-পিওন।

দেবু বলিল—এস। চিঠি আছে বুঝি ?

—চিঠি—মনি-অর্ডার।

—মনি-অর্ডার !

—পঞ্চাশ টাকা পাঠাচ্ছেন বিশ্বনাথবাবু।

বিশ্বনাথ চিঠিও লিখিয়াছে। তাহা হইলে এ সমস্ত বিশ্বনাথই করিয়াছে। লিখিয়াছে —দাদুর পত্রে সব জানিয়াছি ; পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম, আরও টাকা সংগ্রহ করিতেছি। তোমার কাছে অনেক মনি-অর্ডার যাইবে, আমরাও কয়েকজন শীঘ্র যাইব। কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।

টাকাটা লইয়া দেবু চিন্তিত হইয়া পড়িল। বিশ্বনাথ লিখিয়াছে—"কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।" পঞ্চাশ টাকায় সে কী কাজ করিবে ? গৌরকে প্রশ্ন করিল—কাকা কোথায় গেলেন দেখ তো গৌর !

"দশে মিলি করি কাজ—হারি জিতি নাহি লাজ।"

দেবু অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দশজনের পরামর্শ লইয়াই কাজ করিল। এই কাজে আজ সে একটি পুরানো মানুষের মধ্যে এক নূতন মানুষকে আবিষ্কার করিল। খুব বেশী না হইলেও, তবু সে খানিকটা আশ্চর্য হইল। তিনু-কাকার ছেলে গৌর। গৌর সুস্থ সবল ছেলে, কিন্তু শান্ত ও বোকা। বুদ্ধি সত্যই তাহার কম। সেই গৌরের মধ্যে এক অপূর্ব গুণ সে আবিষ্কার করিল। সে স্কুলে পড়ে, স্কুলের ছাত্রদের দেবু ভাল করিয়াই জানে। নিজেও সে উৎসাহী ছাত্র ছিল, এবং পাঠশালার পণ্ডিতি করিয়া, গৌরের অপেক্ষা কমবয়সী হইলেও—অনেক ছেলে লইয়া কারবার করিয়াছে। এক ধারার ছেলে আছে যাহারা পড়ায় ভাল, কাজ-কর্মেও উৎসাহী ; আর এক ধারার ছেলে আছে যাহারা পড়ায় ভাল নয় অথচ দুর্দান্ত, কাজ-কর্মে প্রচণ্ড উৎসাহ। এ দুয়ের মাঝামাঝি ছেলেও আছে যাহাদের একটা আছে আর একটা নাই। আবার দুইটাতেই পিছনে পড়িয়া থাকে, কচ্ছপের মত যাহাদের জীবনের গতি এমন ছেলেও আছে। গৌর ওই শেষের ধরনের ছেলে বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল। কিন্তু আজ সে নিজের অদ্ভুত পরিচয় দিল। এ পরিচয় অবশ্য তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ; সে

তিনকড়ির ছেলে। দশে মিলিয়া কাজ করার আয়োজনটায় সে একা যেন দশজনের শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

তিনকড়ি বলিয়াছিল আমাদের তাঁবের লোক যারা, তা'দিগেই দু-চার টাকা ক'রে দিয়ে কাজ আরম্ভ কর।

দেবু বলিল—দেখুন, পাঁচজনাকে ডেকে যা হয় করা যাক। নইলে শেষে কে কি বলবে!

তিনকড়ি বলিল—বলবে কচু। বলবে আবার কে কি? কোন্ বেটার ধার ধারি আমরা? কারো বাবার টাকা? আর ডাকবেই বা কাকে?

দেবু হাসিল; তিনু-কাকার কথাবার্তা সে ভাল করিয়াই জানে। হাসিয়া বলিল—আমি বলছি জগন ডাক্তার, হরেন, ইরসাদ, রহম এই জনকয়েককে।

—রহম? না রহমকে ডাকতে পাবে না। যে লোক দল ভেঙে জমিদারের সঙ্গে গিয়ে জুটেছে তাকে ডাকতে হবে না।

—না তিনু-কাকা, আপনি ভেবে দেখুন। মানুষের ভুলচুক হয়। আর তা ছাড়া মানুষকে টেনে আপনার করে নিলেই মানুষ আপনার হয়, আবার ঠেলে ফেলে দিলেই পর হয়ে যায়।

তিনকড়ি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কথাটা তাহার মনঃপুত হইল না।

দেবু বলিল—কাকে তা হলে পাঠাই বলুন দেখি? রামকে একবার পাওয়া যাবে না?

গৌর বসিয়া ছিল, সে উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমি যাব দেবু-দা।

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ। রাম তো জাতে ভল্লা। রামকে ডাকতে গেলে কেউ যদি কিছু মনে করে?

তিনকড়ি গর্জিয়া উঠিল—মনে করবে? কে কি মনে করবে? কোন্ শালাকে খাবার নেমন্তন্ন করছি যে মনে করবে? তাহার মনের চাপা দেওয়া অসন্তোষটা একটা ছুতা পাইয়া ফাটিয়া পড়িল।

গৌর অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দেবু বলিল—না—না। গৌর ঠিকই বলেছে তিনু-কাকা।

—ঠিক বলেছে—যাক, মরুক।...বলিয়াই সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। বাপের অমতে ছেলেকে যাইতে বলিতে দ্বিধা হইল তাহার।

গৌর বলিল—দেবু-দা! আমি যাই?

—যাবে? কিন্তু তিনু-কাকা—

—বাবা তো যেতে বললে।

—না, যেতে বললেন কই? রাগ করে উঠে গেলেন তো।

স্বর্ণ ঘরে ঢুকিল, সে হাসিয়া বলিল—না, বাবা ওই ভাবেই কথা বলেন। মরগে যা, খালে যা—এসব বাবার কথার কথা।

গৌর হাসিয়া বলিল—বলে না কেবল স্বর্ণকে।...

গৌর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—সকলকেই খবর দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরীকেও খবর দিয়া আসিয়াছে। দেবু খুশি হইয়া বলিল—বেশ করেছ। বৃদ্ধ চৌধুরী পাকা লোক, অথচ তাহার কথাটাই দেবুর মনে হয় নাই। গৌর বলিল—মহাগ্রামের ঠাকুরমশায়কেও খবর দিয়ে এসেছি দেবু-দা।

দেবু সবিস্ময়ে বলিল—সে কি! তাঁকে কি আসতে বলতে আছে? এ তুমি করলে কি? কি বললে তুমি তাঁকে?

গৌর বলিল—তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। ওঁদের বাড়ীতে বললাম—আমাদের বাড়ীতে মিটিং হবে আজ। বানের মিটিং। তাই বলতে এসেছি।

স্বর্ণ হাসিয়া সারা হইয়া গেল—বানের আবার মিটিং হল?

অপরাহ্নে সকলেই আসিয়া হাজির হইল। জগন, হরেন, ইরসাদ, রহম এবং তাহাদের সঙ্গে আরও অনেকে। সতীশ ও পাতু আসিয়াছে, দুর্গাও আসিয়াছে। সে নিত্যই আসে। তাহারই হাতে দেবুর বাড়ীর চাবি। সে-ই ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে, দেখেশুনে। বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরীও আসিয়াছে। বৃদ্ধ হাঁটিয়া আসিতে পারে নাই, গরুর গাড়ি জুড়িয়া আসিয়াছে; মুশকিল হইয়াছে—তিনকড়ি নাই। সে যে সেই বাহির হইয়াছে, এখনও ফেরে নাই।

বৃদ্ধ বলিল—বাবা-দেবু, খোঁজ তো দু'বেলাই নিই। নিজে আসতে পারি নাই।...কথার মাঝখানে হাসিয়া বলিল—অন্য দিকে টানছে কিনা; এদিকে তাই পা বাড়াতে পারি না। তা তোমার তলব পেয়ে এ-দিক্‌কার টানটা বাড়ল, হাঁটতে পারলাম না—গরুর গাড়ি করেই এলাম।

দেবু বলিল—আমার শরীর দেখছেন, নইলে—

—হ্যাঁ, সে আমি জানি বাবা। তবে কাজটা একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

—এই যে কাজ সামান্যই। তিনকড়ি-কাকার জন্যে—। তা হোক আমরা বরং আরম্ভ করি ততক্ষণ।

সমস্ত জানাইয়া—কাগজ ও মনি-অর্ডারের কুপন দেখাইয়া টাকাটা সকলের সামনে রাখিয়া দেবু বলিল—বলুন, এখন কি করব?

জগন বলিল—গরীবদের খেতে দাও। যাদের কিছু নাই তাদের দাও।

হরেন বলিল—আই সাপোর্ট ইট।

দেবু বলিল—চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী বলিল—কথা তো ডাক্তার ভালই বলেছেন। তবে আমি বলছিলাম—চাষের এখন পনের-বিশ দিন সময় আছে। টাকাটায় বীজধান কিনে দিতে পারলে—

রহম ও ইরসাদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—এ খুব ভাল যুক্তি।

জগন বলিল—গরীবগুলো শুকিয়ে মরবে তো?

দেবু বলিল—পঞ্চাশ টাকাতে তাদের ক'দিন বাঁচাবে?

—এর পরেও টাকা আসবে।

—সেই টাকা থেকে দেবে তখন।

গৌর দেবুর কানের কাছে আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—দেবুদা, আমরা সব ছেলেরা মিলে—যে সব গাঁয়ে বান হয় নাই—সেই সব গাঁ থেকে যদি ভিক্ষে করে আনি!

গৌরের বুদ্ধিতে দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠিক এই সময়েই প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বাহির হইতে ডাক আসিল—পণ্ডিত রয়েছেন?

ন্যায়রত্ন মহাশয়। সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন ভিতরে আসিয়া, একটু কুণ্ঠার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমার আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল।

দেবু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমাকে মার্জনা করতে হবে। আমি আপনাকে খবর দিতে বলিনি। তিনকড়ি-কাকার ছেলে গৌর নিজে একটু বুদ্ধি খরচ করতে গিয়ে এই কাণ্ড করে বসেছে।

—তিনকড়ির ছেলেকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমরা দশের সেবায় পুণ্যার্জনের যজ্ঞ আরম্ভ করেছ, সে যজ্ঞভাগ দিতে আমাকে আহ্বান জানিয়ে এসে সে ভালই করেছে।

গৌর ঢিপ করিয়া তাঁহার পায়ে প্রণত হইল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—কই, তিনকড়ির কন্যাটি কই? বড় ভাল মেয়ে। আমার একটু জল চাই। পা ধুতে হবে।

স্বর্ণ তাড়াতাড়ি জলের বালতি ও ঘটি হাতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমি ধুয়ে দিচ্ছি চরণ।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—আমি কিছু সাহায্য এনেছি পণ্ডিত। চাদরের খুঁট খুলিয়া তিনি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া তিনি বলিলেন—প্রথমে বীজ-ধান দেওয়াই উচিত। বীজের জন্য ধানও আমি কিছু সাহায্য করব পণ্ডিত।

সকলে উঠিলে দুর্গা বলিল—কবে বাড়ী যাবে জামাই-পণ্ডিত? আমি আর পারছি না। তোমার বাড়ীর চাবি তুমি নাও।

দেবু বলিল—কাল কিংবা পরশুই যাব দুর্গা। দু'দিন রাখ চাবিটা।

দুর্গা কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিল। বলিল—বিলু-দিদির ঘর, বিলু-দিদি নাই, খোকন নাই—যেতে আমার মন হয় না। তার ওপর তুমি নাই। বাড়ী যেন হাঁ হাঁ করে গিলতে আসছে।

এতক্ষণে তিনকড়ি ফিরিল; পিঠে ঝুলাইয়া আনিয়াছে প্রকাণ্ড এক কাতলা মাছ। প্রায় আধমণ ওজন হবে। আঠারো সেরের কম তো কোনমতেই নয়। দড়াম করিয়া মাছটা ফেলিয়া বলিল—বাপরে, মাছটার পেছু পেছু প্রায় এক কোশ হেঁটেছি। যেয়ো না

হে, যেয়ো না, দাঁড়াও ; মাছটা কাটি, খানকতক করে সব নিয়ে যাবে। ডাক্তার, ইরসাদ, রহম ! দাঁড়াও ভাই ; দাঁড়াও একটুকুন !

উনিশ

পনের দিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দুইটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। শ্রীহরি ঘোষ পঞ্চায়েত ডাকিয়া দেবুকে পতিত করিল। অন্যদিকে বন্যা-সাহায্য-সমিতি বেশ একটি চেহারা লইয়া গড়িয়া উঠিল। সাহায্য-সমিতির জন্যই অঞ্চলটায় বেশী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের নাতি বিশ্বনাথবাবু নাকি গেজেটে বানের খবর ছাপাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহর হইতে চাঁদা তুলিতেছেন ; শুধু শহর নয়, অনেক পল্লীগ্রাম হইতেও লোক টাকা পাঠাইতেছে। প্রায় নিত্যই দেবু পণ্ডিতের নামে কত নাম-না-জানা গ্রাম হইতে পাঁচ টাকা দশ টাকার মনি-অর্ডার আসিতেছে। পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই প্রায় পাঁচশো টাকা দেবুর হাতে আসিয়াছে। যাহাদের ঘর ভাঙিয়াছে, তাহাদের ঘরের জন্য সাহায্য দেওয়া হইবে। বীজধান ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মাঠে 'আছাড়ো'র বীজচারা হইতে যে যেমন পারিয়াছে—সে তেমন জমি আবাদ করিতেছে।

ভাদ্রের সংক্রান্তি চলিয়া গেল ; আজ আশ্বিনের পয়লা। "আশ্বিনের রোপণ কিস্‌কে ?" অর্থাৎ কিসের জন্য। তবু লোকে এখনও রোয়ার কাজ চালাইতেছে। মাসের প্রথম পাঁচটা দিন গতমাসের সামিল বলিয়াই ধরা হয়। তাহার উপর এবার ভাদ্র মাসের একটা দিন কমিয়া গিয়াছে—উনত্রিশ দিনে মাস ছিল। তবে বিপদ হইয়াছে—লোকের ঘরে খাবার নাই, তাহার উপর আরম্ভ হইয়াছে কম্প দিয়া জ্বর—ম্যালেরিয়া। ভাগ্য তবু ভাল বলিতে হইবে যে কলেরা হয় নাই। ঘরে ঘরে শিউলি পাতার রস খাওয়ার এক নূতন কাজ বাড়িয়াছে। ভাদ্রের শেষে শিউলি গাছগুলা নূতন পাতায় ভরিয়া উঠে, ফুল দেখা দেয় ; এবার গাছের পাতা নিঃশেষ হইয়া গেল—এ বৎসর গাছগুলার ফুল হইবে না। জ্বর আরম্ভ না হইলে আরও কিছু বেশী জমি আবাদ করা যাইত। কাল ম্যালেরিয়া ! ম্যালেরিয়া প্রতি বৎসরেই এই সময়টায় কিছু কিছু হয়, এবার এই বানের পর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে ভীষণভাবে ! ওষুধ বিনা পয়সায় পাওয়া যায় কঙ্কণার ডাক্তারখানায় আর জংশন শহরের হাসপাতালে ; কিন্তু চাষ কামাই করিয়া এতটা পথ রোগী লইয়া যাওয়া সহজ কথা নয়। জগন ডাক্তার বিনা পয়সায় দেখে, কিন্তু ওষুধের দাম নেয়। না-লইলেই বা তাহার চলে কি করিয়া ? তবে দেবু পণ্ডিত কাল বলিয়াছে—কলিকাতা হইতে কুইনাইন এবং অন্যান্য ওষুধ আসিতেছে। জেলাতেও নাকি দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে—একজন ডাক্তার এবং ওষুধের জন্য।

লোকের বিস্ময়ের আর অবধি নাই। বুড়ো হরিশ সেদিন ভবেশকে বলিল—যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে।

ভবেশ বলিল—তা বটে হরিশ-খুড়ো। দেখলাম অনেক। বান তো আগেও হয়েছে গো।...

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। বর্ষা এখানে প্রবল ঋতু। জল-প্লাবন অল্পবিস্তর প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। পাহাড়িয়া নদী ময়ুরাক্ষীর বুকেও বিশ-ত্রিশ বৎসর অন্তর প্রবল বর্ষায় এইভাবেই সর্বনাশা রাক্ষসী বন্যার ঢল নামে; গ্রাম ভাসিয়া যায়, শস্যক্ষেত্র ডুবিয়া যায়—এ তাহারা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছে। তখনকার আমলে এমন বন্যার পর দেশে একটা দুঃসময় আসিত। সে দুঃসময়ে স্থানীয় ধনী এবং জমিদারেরা সাহায্য করিতেন। ধনীরা, অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা গরীবদের খাইতে দিত; মহাজনেরা বিনা-সুদে বা অল্প-সুদে ধান-ঋণ দিত চাষীদের। জমিদার সে সময় আশ্বিন-কিস্তির খাজনা আদায় বন্ধ রাখিত, সে-বৎসরের খাজনা বাকি পড়িলে সুদ লইত না। দয়ালু জমিদার আংশিকভাবে খাজনা মাফ দিত, আবার দুই-একজন গোটা বৎসরটাই খাজনা রেয়াত করিত। চাষীদের অবস্থা তখন অবশ্য এখনকার চেয়ে অনেক ভাল ছিল, এমন করিয়া সম্পত্তিগুলা টুকরা টুকরা হইয়া গৃহস্থেরা গরীব হইয়া যায় নাই। তাহারা কয়টা মাস কষ্ট করিত, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে সামলাইয়া উঠিত।

গরীব-দুঃখী অর্থাৎ বাউড়ী-ডোম-মুচীদের দুর্দশা তখনও যেমন, এখনও তেমনই। এই ধরনের বিপর্যয়ের পর—তাহাদের মধ্যেই মড়ক হয় বেশী। ভিক্ষা ছাড়া গতি থাকে না, দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। আবার দেশের অবস্থা ফিরিলে পিতৃপুরুষের ভিটার মমতায় অনেকেই ফেরে। এমন দুর্দশায় সম্পন্ন গৃহস্থেরা গভর্নমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করিয়া তাকাবা ঋণ লইত, পুকুর কাটাইত, জমি কাটাইত, গরীবরা তাহাতে খাটিয়া খাইত।

হরিশ বলিল—ওদের কাল তো এখন ভাল হে। নদীর পুল পার হলেই ওপারে জংশন। বিশটা কলে ধোঁয়া উঠছে। গেলেই খাটুনি—সঙ্গে সঙ্গে পয়সা। তা তো বেটারা যাবে না!

ভবেশ বলিল—যায় নাই তাই রক্ষে খুড়ো। গেলে আর মুনিষ-বাগাল মিলত না।

হরিশ বলিল—তা বটে। তবে এবারে আর থাকবে না বাবা। এবার যাবে সব। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

ভবেশ বলিল—দেবু তো লেগেছে খুব। ইস্কুলের ছোঁড়ারা সব গাঁয়ে-গাঁয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে। চাল, কাপড়, পয়সা।

গৌর দেবুকে যে কথাটা কানে কানে বলিয়াছিল, সে কথাটা কাজে পরিণত হইয়াছে। এক-একজন বয়স্ক লোকের নিয়ন্ত্রণে ছেলের দল যে-সব গ্রামে বন্যা হয় নাই সেই সব গ্রাম ঘুরিয়া, গান গাহিয়া, চাল কাপড় ভিক্ষা করিয়া আনিতেছে। পনের-কুড়ি মণ চাউল ইহার মধ্যে জমা হইয়াছে। কোন এক ভদ্রলোকের গ্রামে—মেয়েরা নাকি গয়না খুলিয়া দিয়াছে। খুব দামী গয়না নয়; আংটি, দুল, নাকছাবি ইত্যাদি। এ-সবই এই অঞ্চলের লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিতেছে। লোকের বাড়ীতে গরীবেরা নিজে যখন ভিক্ষা চাহিতে যায়,

তখন লোকে দেয় না, কটু কথা বলে। কত কাতরভাবে কাকুতি করিয়া তাহাদের ভিক্ষা চাহিতে হয়। অথচ এই ভিক্ষার মধ্যে—ওই ভিক্ষার দীনতা নাই। আবার দেবুর বাড়ীতে সাহায্য যাহারা লইতেছে, তাহাদের গায়েও ভিক্ষার দীনতার আঁচ লাগিতেছে না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অপূর্ব আত্মতৃপ্তির ভাব যেন লুকানো আছে। আগে নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলি দারিদ্র্যের জন্য ভিক্ষা করিতে গিয়া একটা মর্মান্তিক অপরাধ-বোধের গ্লানি অনুভব করিত ; সেই অপরাধ-বোধটা যেন ঘুচিয়া গিয়াছে।

ভবেশ বলিল—বেজায় বাড় কিন্তু বেড়ে গেল ছোটলোকের দল। ওই সাহায্য-সমিতির চাল পেয়ে বেটাদের বুদ্ধি হয়েছে দেখেছ? পরশু আমাদের মান্দের (বড় রাখাল) ছোঁড়া এক বেলা এল না। তা গেলাম পাড়াতে। ভাবলাম অসুখ-বিসুখ হয়েছে, গিয়ে শুনলাম তিনকড়ির বেটা গৌরের সঙ্গে জংশনে গিয়েছে—কি কাজ আছে। আমার রাগ হয়ে গেল। রাগ হয় কিনা তুমিই বল? বললাম—তা হলে কাজকর্ম করে আর কাজ নাই—আমি জবাব দিলাম। ছোঁড়ার মা বললে কি জান? বললে—তা মশায় কি করব বল? পণ্ডিত মাশায়রা খেতে দিচ্ছে লোককে এই বিপদে। তাদের একটা কাজ না করে দিলে কি চলে? যদি জবাবই দাও তো দিয়ো।

হরিশ হাসিয়া বলিল—ও হয়, চিরকালই ওই হয়ে আসছে। বুঝলে—আমরা তখন ছোট, এই তের-চৌদ্দ বছর বয়সে। তখন রামদাস গোসাঁই এসেছিল। নাম শুনেছ তো?

ভবেশ প্রণাম করিয়া বলিল—ওরে বাপ্‌রে! আমি দেখেছি যে!

হরিশ বলিল—দেখেছ?

—হ্যাঁ, ইয়া জটা। দেখি নাই! তখন অবিশ্যি আর এখানে থাকেন না। মধ্যে মধ্যে আসতেন।

—তাই বল। আমি যখনকার কথা বলছি, গোসাঁই বাবা তখন এখানেই থাকতেন। কঙ্কণার উদিকের মাথার ময়ূরাক্ষীর ধারে তাঁর আস্তানা। গোসাঁই লাগিয়ে দিলেন মচ্ছবের ধুম। লোকে নিজেরা মাথায় করে দু-মণ দশ-মণ চাল দিয়ে আসত। গরীব-দুঃখী যে যত পারত খেতে পেত, কেবল মুখে বলতে হতো "বলো ভাই রাম নাম, সীতারাম"। গরীব-দুঃখীর মা বাপ ছিলেন গোসাঁই। তখন এমনই বাড় হয়েছিল ছোটলোকের—জমিদার, গেরস্ত একটা কথা বললেই বেটারা গিয়ে দশখানা করে লাগাত গোসাঁইয়ের কাছে। গোসাঁইও সেই নিয়ে জমিদার-গেরস্তদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। শেষকালে লাগল কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে। তা গোসাঁই লড়েছিলেন অনেক দিন। শেষকালে একদিন এক খেমটাওয়ালী এসে হাজির হল। বাবুদের চক্রান্ত, বুঝলে? গোসাঁইকে ধরে বললে—শহরে গিয়ে তুমি আমার ঘরে ছিলে, টাকা বাকী আছে, টাকা দাও। নইলে···।—এই নিয়ে সে এক মহা কেলেঙ্কারি। গোসাঁই রেগে-মেগে চলে গেলেন, বলে গেলেন—কল্কি-মহারাজ না এলে দুষ্টের দমন হবে না।···ব্যস্, তারপর আবার যে-কে সেই—সেই পায়ের তলায়। এও দেখো তাই হবে।

* *

সেকালে রামদাস গোসাঁইয়ের কাছে ওই রূপ-পসারিণী আসিতেই লোকে গোসাঁইকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। পর পর তিন-চারি দিন তৈয়ারী ভাত তরকারী নষ্ট হইয়া গেল, কেহ আসিল না। যাহাদের হইয়া গোসাঁই জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন—তাহারাও আসে নাই, রামদাস গোসাঁই রোষে ক্ষোভে এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। একালে কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। দেবুর সঙ্গে কামার-বউ এবং দুর্গাকে জড়াইয়া অপবাদটা লইয়া আলোচনা লোকে যথেষ্ট করিয়াছে, পঞ্চায়েত দেবুকে পতিত করিয়াছে; তবু লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

দেবুর প্রতি ন্যায়রত্নের বিশ্বাস অগাধ। কিন্তু জনসাধারণকে তিনি যে বিশ্বাস করেন না; এই বিষয়টা লইয়া তিনিও ভাবিয়াছেন। তাঁহার এক-সময় মনে হয়—সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে, সমাজ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মবিশ্বাসও লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেইজন্য নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত শ্রীহরি ঘোষের নেতৃত্বে থাকিয়া দেবুকে পতিত করিবার সংকল্প করিলেও সেটা ঠিক কাজে পরিণত হইল না। ইহারই মধ্যে একদিন শিবকালীপুরের চণ্ডীমণ্ডপে—বর্তমানে শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়ীতে—ঘোষের আহ্বানে নবশাক সম্প্রদায়ের পঞ্চায়েত সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় অবস্থাপন্ন সংগৃহস্থ যাহারা, তাহাদের অনেকেই আসিয়াছিল। গরীবেরাও একেবারে না-আসা হয় নাই। দেবুকে ডাকা হইয়াছিল—কিন্তু সে আসে নাই। বলিয়া দিয়াছিল—কামার-বউ শ্রীহরি ঘোষের বাড়ীতে আছে; পূর্বে সে তাহাকে সাহায্য করিত নিরাশ্রয় বন্ধুপত্নী হিসাবে, কিন্তু এখন তাহার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। দুর্গা তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। দুর্গার মামার বাড়ী তাহার শ্বশুরের গ্রামে, সেই হিসাবে দুর্গা তাহার স্ত্রীকে দিদি বলিত, তাহাকে জামাই-পণ্ডিত বলে। সে দুর্গাকে স্নেহ করে। দুর্গা তাহার বাড়ীতে কাজকর্ম করে এবং বরাবরই করিবে; সেও তাহাকে চিরদিন স্নেহ এবং সাহায্য করিবে; কোন দিন তাড়াইয়া দিবে না। এই তাহার উত্তর। এই শুনিয়া পঞ্চায়েত যাহা খুশি হয় করিবেন।

পঞ্চায়েত তাহাকে পতিত করিয়াছে।

পতিত করিলেও জনসাধারণ দেবুর সংস্রব ত্যাগ করে নাই। লোকে আসে যায়, দেবুর ওখানে বসে, পান-তামাক খায়। বিশেষ করিয়া সাহায্য-সমিতি লইয়া দেবুর সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। আবার সাধারণ অবস্থার লোকেদের মধ্যে কতকগুলি লোক তো পঞ্চায়েতের ঘোষণাকে প্রকাশ্যেই 'মানি না' বলিয়া দিয়াছে। তিনকড়ি তাহাদের নেতা।

ন্যায়রত্ন যেদিন দেবুকে উপদেশ দিয়াছিলেন—সেদিন কল্পনা করিয়াছিলেন অন্যরূপ। কল্পনা করিয়াছিলেন—সমাজের সঙ্গে কঠিন বিরোধিতার মধ্যে পণ্ডিতের ধর্মজীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ধ্যান ধারণা পূজার্চনার মধ্য দিয়া দেবুর এক নূতন রূপ তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। দেবু ঘোষ সাহায্য-সমিতি লইয়া কর্মের পথে চলিয়াছে। কর্মের পথেও ধর্ম-জীবনে যাওয়া যায়। কিন্তু দেবুর সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়া

বড় আঘাত পাইয়াছেন—দেবু নাকি দুর্গা মুচীনীর হাতে জল খাইতেও প্রস্তুত। দুর্গাকে সে অনুরোধও করিয়াছিল; কিন্তু দুর্গা রাজী হয় না।

কর্মকেই তিনি সামাজিক জীবনের সঞ্জীবনী-শক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সে কর্ম ধর্ম-বিবর্জিত কর্ম নয়। ধর্ম-বিবর্জিত কর্ম সঞ্জীবনী-সুধা নয়—উত্তেজক সুধা, অন্ন নয়—পচনশীল তণ্ডুলের মাদক রস।

ন্যায়রত্ন দেবুর জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। পণ্ডিতকে তিনি ভালবাসেন। পণ্ডিত মাদক রসের উত্তেজনায় উগ্র উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। এটা তিনি আগে কল্পনা করেন নাই। সমাজে এমনি ভাবেই জোয়ার-ভাঁটা খেলিতেছে। এমনি ভাবেই মানুষগুলি এক-একবার জোয়ারের উচ্ছ্বাস লইয়া উঠিতেছে, আবার সে উচ্ছ্বাস ভাঙিয়া পড়িয়া ভাঁটার টানের মত শান্ত স্তিমিত হইয়া যাইতেছে।

এ তো ক্ষুদ্র পঞ্চগ্রাম। সমগ্র দেশ ব্যাপ্ত করিয়া এমনি ভাবে উচ্ছ্বাস আসে যায়। তাঁহার জীবনেই তিনি দেখিয়াছেন ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন। অবশ্য ব্রাহ্মধর্মের সাধারণ মানুষের জীবন একবিন্দুও আকৃষ্ট হয় নাই। তারপর আসিল স্বদেশী আন্দোলন; সে আন্দোলনেও দুইটি উচ্ছ্বাস দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলনই—ধর্মসংস্রবহীন প্রথম আন্দোলন। এই আন্দোলন একটা কাজ করিয়াছে। না-থাক ধর্মের সংস্রব, কিন্তু একটা নৈতিক প্রভাব আনিয়া দিয়া গিয়াছে।

তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি যাহা দেখিয়াছেন— সে দৃশ্য তাঁহার মনে পড়িল। প্রথম সমাজপতির আসনে বসিয়া নিজে তিনি মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। নামে তিনি সমাজপতি হইলেও তখন হইতেই সত্যকার সমাজপতি ছিল জমিদার। জমিদারদের তখন প্রবল প্রতাপ। তাহারা তাঁহাকে মুখে সম্মান করিত, শ্রদ্ধা করিত; কিন্তু অন্তরে করিত উপেক্ষা। সাধারণ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার ক্ষেত্রে তাঁহাকে তাহারা আহ্বান করিত। কিন্তু নিজেদের ব্যভিচারের অন্ত ছিল না। মদ্যপান ছিল তন্ত্রশাস্ত্র-অনুমোদিত; জমিদারের বৈঠকে বসিত 'কারণ চক্র'। পথে পথে তরুণ ধনীনন্দনেরা মত্ত পদবিক্ষেপে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া ফিরিত। রাত্রে অসহায় মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের দরজায় কামোন্মত্ত করাঘাত ধ্বনিত হইত। সাধারণ মানুষ ছিল বোবা জানোয়ারের মত। তাহাদের ঘরের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। এই স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সেইটাকে অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গিয়াছে; মানুষের একটা নীতি-বোধ জাগিয়াছে।

ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। এই আন্দোলনের ঢেউ তাঁহার শশীর বুকে লাগিয়াছিল। শশীর মধ্যে দুর্নীতি কিছু ছিল না। আন্দোলন তাহার ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিল। শশী উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ফল ন্যায়রত্নের জীবনে ভীষণতম আকারে দেখা দিয়াছে। আবার সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছে বিশ্বনাথের বুকে। বিশ্বনাথ তাঁহার মুখের উপরেই বলিয়াছে—সে জাতি মানে না, ধর্ম মানে না, সমাজ ভাঙিতে চায়। সে তাঁহার বংশের উত্তরাধিকার পর্যন্ত অস্বীকার করিতে চায়। জয়ার মত স্ত্রী—তাহার

প্রতিও তাহার মমতা নাই। এবারকার জোয়ার সর্বনাশা জোয়ার···আবার একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন ন্যায়রত্ন।

পঞ্চগ্রামের বুকেও সেই জোয়ার-ভাঁটা চলিয়াছে। নানা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মানুষগুলি এক এক সময় হৈ-চৈ করিয়া কলরব করিয়া উঠে, আবার এলাইয়া পড়ে—দল ভাঙিয়া যায়। আগে প্রতি হৈ-চৈ-এর ভিতরেই থাকিত সমাজ-ধর্ম। তাঁহার প্রথম জীবনে হৈ-চৈ হইয়াছিল—তাঁহারই নেতৃত্বে কঙ্কণার চণ্ডীতলায় বাবুদের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে। পাঁচখানা গ্রামের মেয়েরা সেখানে যায়, বাবুদের ছেলেরা সেকালে চণ্ডীতলায় মদ খাইয়া বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিত। সাধারণ লোককে লইয়া তিনিই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তারপর রামদাস গোস্বামীর সময়ে হৈ-চৈ-এর ভিতরেও ছিল—"বলো ভাই রাম নামে"র ধুয়া। তারপর সামাজিক ব্যাপার লইয়া অনেক হৈ-চৈ হইয়া গেল। এই দেবুকে উপলক্ষ করিয়াই হৈ-চৈ হইল তিনবার। সেট্‌ল্‌মেণ্ট লইয়া প্রথম। তারপর ধর্মঘট। তারপর এই বন্যার সাহায্য-সমিতি। প্রথমে তিনি দেবুর সম্বন্ধে আশা পোষণ করিয়াছিলেন। ধর্মঘটের সময়েও সে প্রভাব তাহার উপরে ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এই পঞ্চায়েত উপলক্ষ করিয়া সেটা যেন উপিয়া গেল।

কালধর্ম, যুগধর্ম! শশীর শোচনীয় পরিণাম তাঁকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া এ সম্বন্ধে চেতনা দিয়া গিয়াছে। তাই তিনি আর নিজেকে বিচলিত হইতে দেন না। প্রাণপণে নিজেকে সংহত করিয়া কালের লীলাপ্রকাশ শুধু দ্রষ্টার মত দেখিয়া যাইতে বদ্ধপরিকর। যাহার যে পরিণতি হয় হউক, কাল যেরূপে আত্মপ্রকাশ করে করুক, তিনি দেখিবেন—শুধু নিশ্চেষ্টভাবে দেখিবেন।

নতুবা সেদিন বিশ্বনাথ যখন তাঁহার মুখের উপর বলিল—আপনার ঠাকুর এবং সম্পত্তির ব্যবস্থা আপনি করুন দাদু!—সেইদিন তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিতেন, কঠোর শাস্তি। পিতামহ হিসাবে তিনি দাবি করিতেন তাহার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুর মূল্য - যাহা তিনি দিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র শশিশেখরকে, শশী দিয়া গিয়াছে তাহাকে।

ন্যায়রত্নের খড়মের শব্দ কঠোর হইয়া উঠিল। আপনার উত্তেজনা তিনি বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

বিশ্বনাথ কালকে পর্যন্ত স্বীকার করে না। সে বলে—কালের সঙ্গে আমাদের লড়াই। এ কালকে শেষ করে আগামী কালকে নিয়ে আসারই সাধনা আমাদের।

মূর্খ! তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তা হলে কালের সঙ্গে যুদ্ধ বলছ কেন? কাল অনন্ত। তার এক খণ্ডাংশের সঙ্গে যুদ্ধ। আজকের কালকে চাও না, আগামী কালকে চাও! এ শাক্ত-বৈষ্ণবের লড়াই। কালীরূপ দেখতে চাও না, কৃষ্ণরূপের পিপাসী! কিংবা ব্রজদুলালের পরিবর্তে দ্বারকানাথকে চাও!

বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—কোন নাথকেই আমি চাই না দাদু! তর্কের মধ্যে উপমার খাতিরে কাউকে চাই—একথা বললে আপনার লাভ কি হবে? নাথ আর সহ্য হচ্ছে না

মানুষের, নাথের দল এই সুদীর্ঘকাল মানুষ যতবার উঠতে চেয়েছে—তাকে নাথত্বের চাপে নিষ্পেষিত করেছে। তাই আগামী কালের রূপ আমাদের অ-নাথের রূপ। নাথের উচ্ছেদেই হবে আজকের কালের অবসান।

কথাটা সত্য। পঞ্চগ্রামেও যতবার মানুষগুলি হৈ-চৈ করিয়া উঠিয়াছে, ততবার জমিদার ধনী সমাজ-নেতারা তাহা দর দমন করিয়াছে। এ দেখিয়াও কি তোমার চেতন হয় না বিশ্বনাথ যে, মানুষের জীবনোচ্ছ্বাস এমন ভাবে আদিকাল হইতে ঐ অ-নাথত্বের কালকে আনিতে চায়—কিন্তু সে কাল আজও আসে নাই! কতকাল আজ অতীত হইয়া গেল—কত আগামী কাল আসিল, কিন্তু যে আগামী কালের কল্পনা তোমাদের—সে কাল আসিল না। কেন আসিল না জান? কালের সেই রূপে আসিবার কাল এখনও আসে নাই।

বিশ্বনাথ এইখানে যাহা বলে—তিনি তাহা কিছুতেই মানিতে পারেন না। তাহার সঙ্গে বিরোধ এইখানেই। গভীর বেদনায় নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের মন আবার টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিল। আবার তিনি ডাকিলেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

পোস্টাপিসের পিওন আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।—চিঠি!

চিঠিখানি হাতে লইয়া ন্যায়রত্ন নাটমন্দির হইতে নামিয়া মুক্ত আলোকে ধরিলেন। বিশ্বনাথের চিঠি। ন্যায়রত্নের আজও চশমা লাগে না। তবে বৎসরখানেক হইতে আলোর একটু বেশী দরকার হয় এবং চোখ দুটি একটু সঙ্কুচিত করিয়া পড়িতে হয়। পোস্টকার্ডের চিঠি। ন্যায়রত্ন পড়িয়া একটু আশ্চর্য হইয়া গেলেন—কল্যাণীয়াসু!—কাহাকে লিখিয়াছে বিশু-ভাই? চিঠিখানা উল্টাইয়া ঠিকানা দেখিয়া দেখিলেন—জয়ার চিঠি। ন্যায়রত্ন অবাক হইয়া গেলেন। জয়াকে বিশ্বনাথ পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে! মাত্র কয়েক লাইন।...আমি ভাল আছি। আশা করি তোমরাও ভাল আছ। কয়েক দিনের মধ্যেই একবার ওখানে যাইব। ঠিক বাড়ী যাইব না। বন্যার সাহায্য-সমিতির কাজে যাইব, সঙ্গে আরও কয়েকজন যাইবেন। দাদুকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিয়ো। তোমরা আশীর্বাদ জানিয়ো।

ইতি—বিশ্বনাথ।

ন্যায়রত্ন চিন্তিত ভাবেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পোস্টকার্ডের চিঠিখানা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। সেদিন যখন বিশ্বনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল—জয়ার সঙ্গেও তাহার মতের মিল হইবে না, সেদিন তিনি এত বিচলিত হন নাই। মতের মিল তো নাই। জয়া তাঁহার হাতে-গড়া মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় বংশের গৃহিণী। সমাজ ভাঙিয়াছে, —ধর্ম বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে—সারা পৃথিবীর লোভ, অনাচার, অত্যাচার—এ দেশের মানুষ জর্জরিত হইয়া ভয়াবহ পরধর্ম বা ধর্মহীন বৈদেশিক জীবননীতি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে,—কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে আজও তাঁহার ধর্ম বাঁচিয়া আছে। জয়া অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার পৌত্র ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে—এই চিন্তায় যখন তিনি অধীর হন, তখন জয়ার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা পান। বিশ্বনাথ যখন তাঁহার সঙ্গে তর্ক করে—কূটযুক্তিতে তাঁহাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে,

তখন তিনি গভীর তিতিক্ষায় নিজেকে সংযত করিয়া মহাকালের লীলার কথা ভাবিয়া নীরব হইয়া থাকেন—সেই নীরবতার মধ্যে মনে পড়ে জয়াকে। জয়ার জন্য দারুণ দুশ্চিন্তা হয়। আবার যখন বিশ্বনাথ নানা অজুহাতে পনের দিন কুড়ি দিন অন্তর বাড়ী আসে, তখন ওই দুশ্চিন্তাই তাঁহার ভরসা হইয়া উঠে। বিশ্বনাথ গোবিন্দজীর ঝুলন মানে না; কিন্তু সেই ঝুলনের অজুহাতে জয়ার সঙ্গে ঝুলন খেলা খেলিতে আসে। তাই জয়ার সঙ্গে মতে মিলিবে না বলিলেও ন্যায়রত্নের গোপন অন্তরে ভরসা ছিল। বহ্নির সঙ্গে পতঙ্গের মিল আছে কি না কে জানে—প্রাণশক্তির সঙ্গে দাহিকা শক্তির সম্বন্ধটাই বিরোধী সম্বন্ধ—তবু পতঙ্গ আসে পুড়িয়া ছাই হইতে। জয়ার রূপের দিকে চাহিয়া তিনি আশ্বস্ত হন। কিন্তু আজ তিনি চিন্তিত হইলেন। বিশ্বনাথ জয়াকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে!

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্যায়রত্ন ডাকিলেন—হলা রাজ্ঞী শউন্তলে!

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ীর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—ভাঁড়ার-ঘরে তালা ঝুলিতেছে, অন্য ঘরগুলির দরজাও বন্ধ, শিকল-বন্ধ। ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইলেন। জয়া তো এ সময়ে কোথাও যায় না!

তিনি আবার ডাকিলেন— অজয়—অজু বাপি!

অজয় সাড়া দিল না—সাড়া দিল বাড়ীর রাখালটা।—যাই আজ্ঞেন, ঠাকুর মশাই ... ওদিকের চালা হইতে ছোঁড়াটা ঘুমন্ত অজয়কে কোলে করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। —খোকন ঘুমলছে ঠাকুর মশাই!

—অজয়ের মা কোথায় গেল?

—আজ্ঞেন, বউ-ঠাকুরণ যেয়েছেন আমাদের পাড়া।

—তোদের পাড়ায়? ন্যায়রত্ন বিস্মিত হইয়া গেলেন। জয়া বাউড়ী-পাড়ায় গিয়াছে। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ছোঁড়াটা বলিল —আজ্ঞেন, নোটন বাউড়ীর ছেলেটা হাত-পা খিঁচছে—নোটনের বউ আইছিল—ঠাকুরের চরণামেত্তর লেগে। তাই গেলেন সেথা বউ-ঠাকুরণ।

—হাত-পা খিঁচছে? কি হয়েছে?

—তা জেনে না। বা-বাওড় লেগেছে হয়তো।

বা-বাওড় অর্থে ভৌতিক স্পর্শ। দুঃখের মধ্যেও ন্যায়রত্ন একটু হাসিলেন। এ বিশ্বাস ইহাদের কিছুতেই গেল না।

ঠিক এই সময়েই জয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ফিরিয়াছে। ন্যায়রত্ন চকিত হইয়া উঠিলেন—তুমি এই অবেলায় স্নান করলে?

জয়া ক্লান্ত উদাস স্বরে উত্তর দিল—ছেলেটি মারা গেল দাদু!

—মারা গেল?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছিল?

—জ্বর। কিন্তু এ রকম জ্বর তো দেখি নি দাদু!

ন্যায়রত্ন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আগে তুমি কাপড় ছাড় ভাই। তারপর শুনব।

জয়া তবু গেল না; বলিল—কাল বিকেলবেলা থেকে সামান্য জ্বর হয়েছিল। সকালে উঠেও ছেলেটা খেলা করেছে। বললে—জলখাবার-বেলা থেকে জ্বরটা চেপে এল। তারপরই ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। ঘণ্টাখানেক আগে তড়কার মত হয়। তাতেই শেষ হয়ে গেল। শুনলাম দেখুড়েতেও নাকি পরশু একটি, কাল একটি ছেলে এমনিভাবেই মারা গিয়েছে। এদের পাড়াতে আরও তিন-চারটি ছেলের এমনি জ্বর হয়েছে। এ কি জ্বর দাদু?

কুড়ি

ম্যালেরিয়া এবার আসিয়াছে যেন মড়কের চেহারা লইয়া। চারিদিকে ঘরে ঘরে লোক জ্বরে পড়িয়াছে। কে কাহার মুখে জল দেয়—এমনি অবস্থা। বয়স্ক মানুষের বিপদ কম—তাহারা ভুগিয়া কঙ্কালসার চেহারা লইয়া সারিয়া উঠিতেছে—পাঁচ দিন, সাত দিন, চৌদ্দ দিন পর্যন্ত জ্বরের ভোগ। মড়কটা ছেলেদের মধ্যে। পাঁচ-সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের জ্বর হইলে—মা-বাপের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিন দিন কি পাঁচ দিনের মধ্যেই একটা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। হঠাৎ জ্বরটা ময়ূরাক্ষীর ওই ঘোড়াবানের মতই হু-হু করিয়া বাড়িয়া উঠে—ছেলেটা ক্রমাগত মাথা ঘুরায়—তারপর হয় তড়কার মত। ব্যস্, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সব শেষ হইয়া যায়। দশটার মধ্যে বাঁচে দুইটা কি তিনটা, সাত-আটটাই মরে।

পরশু রাত্রে পাতু মুচীর ছেলেটা মরিয়াছে। পাতুর স্ত্রীর অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান-সন্ততি হয় নাই—দুই বৎসর আগে ওই সন্তানটিকে সে কোলে পাইয়াছিল। পাড়া-প্রতিবাসীরা বলে—ওটি এ-গ্রামের বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের সন্তান। শুধু পাড়াপ্রতিবাসীরাই নয়—পাতুর মা, দুর্গা, ইহারাও বলে। ঘোষালের সঙ্গে স্ত্রীর গোপন প্রণয়ের কথা পাতুও জানে। আগে যখন পাতুর চাকরান জমি ছিল—ঢাকের বাজনা বাজাইয়া সে দু-পয়সা রোজগার করিত, তখন পাতু ছিল বেশ মাতব্বর মানুষ, তখন ইজ্জৎ-সম্ভ্রমের দিকে কঠিন দৃষ্টি ছিল। দুর্গার মন্দ স্বভাবের জন্য তখন সে গভীর লজ্জা-বোধ করিত—দুর্গাকে সে কত তিরস্কার করিয়াছে; কখনো কখনো প্রহারও করিয়াছে। তখন তাহার স্ত্রীও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাতুর প্রতি ছিল তাহার গভীর ভয়, আসক্তিও ছিল; দিবারাত্রি হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী বিড়ালীর মত বউটা ঘরের কাজ করিয়া ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সে সময় তাহার শাশুড়ী—পাতুর মা পুত্রবধূর যৌবন ভাঙাইয়া গোপনে রোজগার করিবার প্রত্যাশায় বউটিকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কিন্তু তখন বউটি কিছুতেই রাজী হয় নাই। তাহার পর পাতুর জীবনে শ্রীহরি ঘোষের আক্রোশে আসিল একটা বিপর্যয়। জমি গেল, পাতু বাজনার ব্যবসা ত্যাগ করিল, শেষে দিন-মজুরী অবলম্বন করিল। এই অবস্থার মধ্যে কেমন করিয়া

যে পাতু বদলাইয়া গেল—সে পাতুও জানে না।

এখন ঘরে চাল না থাকিলে দুর্গার কাছে চাল লইয়া, পয়সা লইয়া—দুর্গাকে সে শাসন করা ছাড়িল। তারপর একদিন তাহার মা বলিল—দুগ্‌গা কঙ্কণায় যায় এতে (রাতে) তু যদি সাঁতে যাস পাতু—তবে বক্‌শিশ্‌টা বাবুদের কাছে তুই-ই তো পাস। আর মেয়েটা যায়, কোনদিন আত (রাত) বিরেতে—যদি বেপদই ঘটে তবে কি হবে? মায়ের প্যাটের বুন তো বটে।

দুর্গাকে সঙ্গে করিয়া বাবুদের অভিনয়ের আসরে পৌছাইয়া দিতে গিয়া—পাতুর ওটাও বেশ অভ্যাস হইয়া গেল। এই অবসরে একদিন প্রকাশ পাইল, তাহার স্ত্রীও ওই ব্যবসায়ে রত হইয়াছে। ঘোষাল ঠাকুরকে সন্ধ্যার পর পাড়ার প্রান্তে নির্জন স্থানে ঘুরিতে দেখা যায় এবং পাড়া হইতে পাতুর বউকেও সেইদিকে যাইতে দেখা যায়। একদিন পাতুর মা ব্যাপারটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হঠাৎ একটা কলরব তুলিয়া ফেলিল। দুর্গা বলিল—চুপ কর মা, চুপ কর, ঘরের বউ, ছিঃ!

পাতু মাকেও চুপ করিতে বলিল না—বউটাকেও তিরস্কার করিল না—নিজেই নীরবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। বউটা ভয়ে সেদিন বাপের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছিল; কয়েক দিন পরে পাতুই নিজে গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। কিছুদিন পর পাতুর স্ত্রী এই সন্তানটি প্রসব করিল।

পাড়ার লোকে বলাবলি করিল—ছেলেটা ঘোষাল ঠাকুরের মত হইছে বটে। রংটা এতটুকু কালো দেখাইছে।…

পাতুও ছেলেটার দুষ্টবুদ্ধি দেখিয়া কতদিন বলিয়াছে—বামুনে বুদ্ধির ভেজাল আছে কিনা, বেটার ফিচ্‌লেমী দেখ ক্যানে!—বলিয়া সে সস্নেহে হাসিত।

ছেলেটাকে ভালবাসিত সে। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে ছেলেটা শেষ হইয়া গেল। দুর্গাও ছেলেটাকে বড় স্নেহ করিত; সে ডাক্তার দেখাইয়াছিল। জগনকে যতবার ডাকিয়াছে—নগদ টাকা দিয়াছে, নিয়মিত ঔষধ খাওয়াইয়াছে, তবু ছেলেটা বাঁচিল না।

আশ্চর্যের কথা—পাতুর স্ত্রী ততটা কাতর হইল না, যতটা কাতর হইল পাতু। পাতু তাহার মোটা গলায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া পাড়াটাকে পর্যন্ত অধীর করিয়া তুলিল।

বিপদের রাত্রে সতীশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল—সান্ত্বনা দিল। বাউড়ী ও মুচী পাড়ার মধ্যে সতীশ মোড়ল মানুষ, ঘরে তাহার হাল আছে—দুই মুঠা খাইবার সংস্থান আছে। সে-ই মনসার ভাসানের দলের মাতব্বর, ঘেঁটুর দলের মূল গায়েন—রকমারি গান বাঁধে; এজন্য হরিজনপল্লীর লোক তাহাকে মান্যও করে। সে-ই ছেলেটার সংকারের ব্যবস্থা করিল। পরদিন সকালে সে পাতুকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল, তারপর দেবু পণ্ডিতের আসরে লইয়া গেল।

দেবুর আসর এখন সর্বদাই জমজমাট হইয়া আছে। নিজ গ্রামের এবং আশপাশ গ্রামের বারো-তেরো হইতে আঠার-উনিশ বছরের ছেলের দল সর্বদা আসিতেছে যাইতেছে, কলরব

করিতেছে। তিনকড়ির ছেলে গৌর তাহাদের সর্দার। পাতুও কয়েকদিন এখানকার কাজে খাটিতেছে। ছেলেদের সঙ্গে সে বস্তা ঘাড়ে করিয়া ফিরিত। গ্রাম-গ্রামান্তরে মুষ্টিভিক্ষার চাল সংগ্রহ করিয়া বহিয়া আনিত। এই বিপদের দিনে সাহায্য-সমিতি হইতে পাতুর পরিবারের জন্য চালের বরাদ্দও হইয়া গেল। কথাটা তুলিল সতীশ।

দেবু কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিল। সতীশ কথাটা তুলিতেই সে সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল— হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, পাতুর ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি। নিশ্চয়।

সাহায্য-সমিতি হইতে পাতুর খোরাকের চালের ব্যবস্থা দেবু করিয়া দিয়াছে। চালটা লইয়া আসে দুর্গা। সকালে উঠিয়াই জামাই-পণ্ডিতের বাড়ী যায়। বাহির হইতে ঘরকন্নার যতখানি মার্জনা এবং কাজকর্ম করা সম্ভব দেবুর বাড়ীতে সে সেইগুলি করে; সাহায্য-সমিতির চাল মাপে। সকালে গিয়া দুপুরে খাওয়ার সময় ফেরে, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আবার যায়—ফেরে সন্ধ্যার পর। সে এখন সদাই ব্যস্ত। বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ পর্যন্ত নাই।

সকালে উঠিয়াই সে দেবুর বাড়ী গিয়াছে। পাতুর মা দাওয়ায় বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া নাতির জন্য কাঁদিতেছে,—পাতুর মায়ের অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধেই। সে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে,—দুর্গার পাপে তাহার এই সর্বনাশ ঘটিয়া গেল। ওই পাপিনী বউটা—ব্রাহ্মণের দেহে পাপ সঞ্চার করিয়া সে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছে, সেই পাপে এত বড় আঘাত তাহার বুকে বাজিল। গোঁয়ার-গোবিন্দ পাষণ্ড পাতু দেবস্থলে বাজনা বাজানো ছাড়িয়াছে, সেই দেব-রোষে তাহার নাতিটি মরিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা পাপে ভরিয়া উঠিয়াছে—তাই ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভাঙিয়া আসিল কালবন্যা—তাই দেশ জুড়িয়া মড়কের মত আসিয়াছে এই সর্বনাশা জ্বর;—গ্রামের পাপে সেই জ্বরে তাহার বংশধর গেল—তাহার স্বামী-কুল, পুত্র-কুল আজ নির্বংশ হইতে বসিল।

পাড়ায় এখানে-ওখানে আরও কয়েকটা ঘরে কান্না উঠিতেছে। পাতু বাড়ীর পিছনে একা বসিয়া কাঁদিতেছিল। আজ সতীশ আসে নাই, অন্য কেহও ডাকে নাই, সে-ও কোথাও যায় নাই।

পাতুর মা হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া আসিল। পাতুর মুখের সামনে বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—আর সব্বনাশ করিস না বাবা, আর কাঁদিস না। পরের ছেলের লেগে আর আদিখ্যেতা করিস না। উঠ্! উঠে খানকয়েক তালপাতা কেটে আন্—এনে দেওয়ালের ভাঙনে বেড়া দে। কাজকম্মো কর্।

বন্যায় পাতুর ঘরের একখানা দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাতু এখন বাস করিতেছে দুর্গার কোঠাঘরখানার নিচের তলার ঘরে। ওই ঘরখানা এতদিন নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করিত পাতুর মা।

পাতু কোন কথা বলিল না।

পাতুর মা বলিল—ওগে (রোগে)-শোকে আমার বুকের পাঁজরাগুলা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। এতে (রাতে) শোব—আর তোরা তুজনায় ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদবি—আমার ঘুম হয় না বাপু। তোরা আপনার ঘর করে লে। কত লোকের ঘর পড়েছে—সবাই যার যেমন তার তেমন মেরামত করলে—তোর আর হল না !

পাতুর মা মিথ্যা বলে নাই, ময়ূরাক্ষীর বানের ফলে এ-পাড়ায় একখানা ঘরও গোটা থাকে নাই, কাহারও বেশী—কাহারও কম ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও আধখানা—কাহারও একখানা —কাহারও বা তুইখানা দেওয়াল পড়িয়াছে, তুই-চারজনের গোটা ঘরই পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশ-পঁচিশ দিনের মধ্যেই সকলে যে যেমন আপনার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কেহ বা তালপাতার বেড়া দিয়াছে। যাহাদের গোটা ঘর পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা চাল তৈয়ার করিয়া তালপাতার চাটাই ঘিরিয়া মাথা গুঁজিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ঘোষ মহাশয়—শ্রীহরি ঘোষ অকাতরে লোককে সাহায্য করিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে—তালপাতা যাহার যত প্রয়োজন কাটিয়া লইতে পারে। তুইটা ও একটা হিসাবে বাঁশও সে অনেককে দিয়াছে। কিন্তু পাতু শ্রীহরি ঘোষের কাছে যায় নাই। গেলেও ঘোষ তাহাকে দিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ; কারণ সতীশ বাউড়ীকেও ঘোষ কোন সাহায্য করে নাই। বলিয়াছে—তুমি তো বাবা গরীব নও !

সতীশ অবাক হইয়া গেল। সে বড়লোক হইল কেমন করিয়া ?

শ্রীহরি বলিয়াছিল—তুমি আগে ছিলে পাড়ার মাতব্বর, এখন হয়েছ গাঁয়ের মাতব্বর। শুধু এ গাঁয়ের কেন—পঞ্চগ্রামের তুমি একজন মাতব্বর। সাহায্য-সমিতি তোমার হাতে। লোককে তুমি সাহায্য করছ, তোমাকে সাহায্য কি আমি করতে পারি ?

সতীশ ব্যাপারটা বুঝিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল।

ব্যাপারটা শুনিয়া পাতু কিন্তু হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল—সতীশ ভাই, উ বেটার আমি মুঁখ পর্যন্ত দেখি না। বেটার মুখ দেখলে পাপ হয়। মরে গেলেও আমি কখনও যাব না উয়ার দোরে।

পাতু যায় নাই, এদিকে তুর্গার ঘরে শুকনো মেঝেয় রান্নাবান্নার জায়গা পাইয়া, নিজের ঘর মেরামতের জন্য এতদিন সে কোন চেষ্টাও করে নাই। রাত্রিতে শুইবার স্থান তাহাদের নির্দিষ্ট হইয়া আছে, দেবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই তুর্গা পাতুর জন্য ওই চাকরিটা স্থির করিয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ছেলেটা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেবুর বাড়ী শুইত। ছেলেটার মৃত্যুর পর কয়দিন তাহারা তুর্গার নিচের ঘরেই শুইতেছে। সুতরাং নিজের ঘর-মেরামতের বাস্তব প্রয়োজনের কোন তাগিদই আপাতত তাহার ছিল না। তাহার মনের যে তাগিদ—সে তাগিদও পাতুর ফুরাইয়া গিয়াছে বহুদিন। রান্নাবান্নার স্থান ও শুইবার আশ্রয় ছাড়া মানুষের যে কারণে ঘরের প্রয়োজন হয় তা পাতুর নাই। কি রাখিবে সে ঘরে ? রাখিবার মত বস্তুই যে তাহার কিছু নাই। চাকরান জমি লইয়া ঘোষের সঙ্গে মামলায় তাহার সমস্ত পিতল-কাঁসা গিয়াছে। সে বাদ্যকর—আগে তাহার ঢাক ছিল তুইখানা,

ঢোলও একখানা ছিল ; তাহাও গিয়াছে বাদ্যকরের লাভহীন বৃত্তি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বে চামড়াও একটা সম্পদ ছিল—সেও আর নাই। জমিদার টাকা লইয়া ভাগাড় বন্দোবস্ত করিবার ফলে চামড়ার কারবারও গিয়াছে। কারবার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকাপয়সা আনা বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঘরে সে রাখিবেই বা কি—আর ঘরখানাকে সাজাইবেই বা কি দিয়া ? পৈতৃক শাল-দোশালা বিক্রয় করিবার পর পুরনো সিন্দুক-তোরঙ্গের মতই ঘরখানা সেই হইতে যেন অকারণে তাহার জীবনের সবখানি জায়গা জুড়িয়া পড়িয়াছিল। বানে ঘরখানার এক দিকের দেওয়াল ভাঙিয়াছে,—যেন শূন্য তোরঙ্গের একটা দিক উই-পোকায় খাইয়া শেষ করিয়াছে। পাতু সেটাকে আর নাড়িতে বা ঝাড়িতে চায় না—বাকী কয়টা দিকও কোন রকমে উইয়ে শেষ করিয়া দিলে সে বোধ হয় বাঁচিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ভাবিয়াছে—ঘরখানা পড়িয়া গেলে,— ওই বাস্তুভিটার উপর একদফা লাউ-কুমড়া-ডাঁটাশাক লাগাইবে—তাহাতে প্রচুর ফসল পাওয়া যাইবে ; কিছু খাইবে, কিছু বিক্রয় করিবে।...

মায়ের কথা শুনিয়া পাতুর শোকাতুর মন—দুঃখে-রাগে যেন বিষাইয়া উঠিল। কাটা ঘা যেমন তেল লাগিয়া বিষাইয়া উঠে, তেমনি যন্ত্রণাদায়ক ভাবে বিষাইয়া উঠিল। মাকে সে কোন কথা বলিল না, সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যাইবেই বা কোথায় ? এক সতীশের বাড়ী। কিন্তু সতীশ আজ আসে নাই বলিয়া অভিমান করিয়া সে সেখানে গেল না ; আর এক দেবু পণ্ডিতের মজলিস ! কিন্তু সেও পাতুর ভাল লাগিল না। দেশের কথা ছাড়া সেখানে অন্য কথা নাই। আজ সে একান্তভাবে তাহার নিজের কথা বলিতে, অপরের কাছে শুনিতে চায় তাহার দুঃখটা কত বড় মর্মান্তিক সেই কথা, তাহারা পাতুর দুঃখে কতখানি দুঃখ পাইয়াছে সেই তত্ত্ব সে জানিতে চায়। দশজনের কথা—বিশখানা গাঁয়ের কথা শুনিতে তাহার এখন ভাল লাগে না।

পাতু মাঠের পথ ধরিল।

মাঠেই বা কি আছে ? গোটা মাঠখানাকে বানে ছারখার করিয়া দিয়া গিয়াছে। এখানে বালি ধু-ধু করিতেছে—ওখানে খানায় জল জমিয়া আছে ; যে জমিগুলার ওসব ক্ষতি হয় নাই; সেই সব জমিগুলা শুকাইয়া ফাটিয়া যেন হাড় পাঁজরা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। চারিপাশ অসমান উঁচু-নিচু, কতক জমিতে অবশ্য আবার ধান পোঁতা হইয়াছে। বন্যানীত পলির উর্বরতায় সদ্যপোঁতা ধানের চারাগুলি আশ্চর্য রকমের জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। আরও অনেক জমি চাষ হইতে পারিত, কিন্তু লোকের বীজ নাই। বীজও হয়তো মিলিত—পণ্ডিত বীজের যোগাড় করিয়াছিল, ঘোষও দিতে প্রস্তুত ছিল ; কিন্তু ম্যালেরিয়া আসিয়া চাষীর হাড়গুলা যেন ভাঙিয়া দিল।

হঠাৎ কাহার উচ্চ কণ্ঠের গান তাহার কানে আসিল। স্বরটা পরিচিত। সতীশের গলা বলিয়া মনে হইতেছে। হ্যাঁ, সতীশই বটে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপর দিয়া আসিতেছে। কোথায় গিয়াছিল সতীশ ? পরক্ষণেই সে হাসিল। সতীশের অবস্থা মোটামুটি ভাল—জমি হাল আছে, কত কাজ তাহার ! কোন কাজে গিয়াছিল, কাজ উদ্ধার করিয়া মনের আনন্দে

গান ধরিয়া ফিরিতেছে। তাহার তো পাতুর অবস্থা নয়। জমিও যায় নাই—সর্বস্বান্তও হয় নাই—ছেলেও মরে নাই। সে গান করিবে বৈকি। পাতু একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না।

"গরুর সেবা কর রে মন গরু পরম ধন"

ওঃ, সতীশ গোধন-মাহাত্ম্য গান করিতেছে—

"দরিদ্রের লক্ষ্মী মাগো শিবের বাহন।
তুমি মাগো হলে রুষ্ট, জগতেরো অশেষ কষ্ট,
তুষ্ট হও মা ভগবতী বাঁচাও জীবন।
গরু পরম ধন—মন রে—গোমাতা গোধন।"

পাতুকে দেখিয়া সতীশ গান বন্ধ করিল—গভীর বেদনার্ত স্বরে বলিল—রহম শ্যাখের জোড়া-বলদ—আহা, জোড়াকে জোড়াই মরে গেল রে!

পাতু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল—ভোর রেতে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু করতে পারলাম না। শ্যাখ বুক চাপড়িয়ে কাঁদছে। আঃ, কি বাহারের বলদ জোড়া!—বলিতে বলিতে সতীশের চোখেও জল আসিল। সে চোখ মুছিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এতক্ষণে পাতু প্রশ্ন করিল—কি হয়েছিল?

ঘাড় নাড়িয়া সতীশ শঙ্কিতভাবে বলিল—বুঝতে পারলাম না। তবে মহামারণ কাণ্ড বটে। জ্বরে যেমন ছেলের বনেদ মেরে দিছে—এ রোগে গরুও বোধ হয় তেমনি ঝেড়ে-পুছে দিয়ে যাবে। কাণ্ড খুব খারাপ!

সতীশ বাউড়ী এ অঞ্চলের মধ্যে বিচক্ষণ গো-চিকিৎসকও বটে। রহমের গরুর ব্যারাম হইতে সে তাহাকেই ডাকিয়াছিল।

রহম সত্যই বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছিল।

চাষী রহমের অনেক শখের গরু। তাহার অবস্থার অতিরিক্ত দাম দিয়া গরু-জোড়াটাকে সে প্রায় শৈশব অবস্থায় কিনিয়াছিল। সযত্নে লালন-পালন করিয়া, তাহাদিগকে 'আবড়' অর্থাৎ হাল-বহন অনভ্যস্ত হইতে—'দোঁয়াইয়া' অর্থাৎ অভ্যস্ত করিয়াছিল। শক্ত-সমর্থ সুগঠিত গরু-জোড়াটি—এ অঞ্চলের চাষীদের ঈর্ষার বস্তু ছিল। রহম গরু দুইটার নাম দিয়াছিল একটার নাম 'পেল্লাদ', অপরটার নাম 'আকাই'। প্রহ্লাদ এবং আকাই এ অঞ্চলের একালের বিখ্যাত শক্তিশালী জোয়ান ছিল। গরু দুইটির গৌরবে রহমের অহঙ্কার ছিল কত! ভাল সড়কের উপর দিয়া সে যখন গাড়ী লইয়া যাইত, তখন লোকজন দেখিলেই গরু দুইটার তলপেটে পায়ের বুড়া আঙুলের ঠোকর এবং পিঠে হাতের আঙুলের টিপ দিয়া নাকে একটা ঘড়াত শব্দ তুলিয়া গরু দুইটাকে ছুটাইয়া দিত। বলিত—শেরকে বাচ্ছা রে বেটা—আরবী ঘোড়া!

কখনও পথিকদের হুঁশিয়ার করিয়া হাঁকিত—এ-ই সরে যাও ভাই, এই সরে যাও!

বর্ষার সময় কাদায় কাহারও গাড়ী পড়িলে—শীতে কাহারও ধানবোঝাই গাড়ী খানা-খন্দে পড়িলে, রহম তাহার প্রহ্লাদ ও আকাইকে লইয়া গিয়া হাজির হইত। তাহাদের গরু খুলিয়া দিয়া সে জুড়িয়া দিত প্রহ্লাদ ও আকাইকে। প্রহ্লাদ-আকাই অবলীলাক্রমে গাড়ী টানিয়া তুলিয়া ফেলিত। পরমগৌরবে নিঃশব্দে বড় বড় দাঁতগুলি আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িত। এ অঞ্চলে শ্রীহরি ঘোষ ছাড়া এমন ভাল হেলে বলদ আর কাহারও ছিল না। শ্রীহরি নিজের বলদ-জোড়াটার দাম দিয়াছে—সাড়ে তিনশো টাকা।

রহম বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছে।

কাঁদিবে না? গরু যে রহমের কাছে উপযুক্ত ছেলের চেয়েও বেশী। বড় আদরের—বড় যত্নের ধন; তাহার কর্ম-জীবনের দুইখানা হাত। কাঁধে করিয়া সার বয়, বুক দিয়া ঠেলিয়া মাটি চষে, বুড়া বাপ-মাকে উপযুক্ত ছেলে যেমন ভাবে কোলে-কাঁধে করিয়া পাথর-চাপড়ির পীরতলা ঘুরাইয়া আনে, তেমনি ভাবে সপরিবার রহমকে গ্রাম-গ্রামান্তরে গাড়ীতে বহিয়া লইয়া যাইত, ক্ষেতের ফসল বোঝাই করিয়া ঘরে আনিয়া তুলিয়া দিত, যোগ্য শক্তিশালী বেটার মত। এই সর্বনাশা বানে জমির ফসল পচিয়া গেল, তবু রহম প্রহ্লাদ ও আকাইয়ের সাহায্যে অর্ধেকের উপর জমিতে হাল দিয়া বীজ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে। বাকী জমিটায় আশ্বিনের শেষেই বরখন্দের চাষ করিবে ঠিক করিয়াছে। এখন সে চাষ তাহার কি করিয়া হইবে? যে জমিটার ধান পোঁতা হইয়াছে—তাহার ফসলই বা কেমন করিয়া ঘরে আনিবে?

একবার ইদুজ্জোহার সময় সে ইরসাদের কাছে একটা গল্প শুনিয়াছিল। তাহাদের এক মহাধার্মিক মুসলমান চাষী কোরবানি করিবার জন্য দুনিয়ার মধ্যে তাহার প্রিয়তম বস্তু কি ভাবিয়া দেখিয়া—তাহার চাষের সব চেয়ে ভাল বলদটিকে কোরবানি করিয়াছিল। গল্পটি শুনিয়া তাহার বুক টন্-টন্ করিয়া উঠিতেছিল। বার বার মনে পড়িয়াছিল তাহার প্রহ্লাদ ও আকাইকে। দুই-তিন দিন সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই।

রহম গোঁয়ার লোক, বুদ্ধি তাহার তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু হৃদয়াবেগ তাহার অত্যন্ত প্রবল; একেবারে ছেলেমানুষের মত সে কাঁদিতেছিল। অন্যান্য মুসলমান চাষীরাও আসিয়াছিল। তাহারাও সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছিল, আহা হা—এমন চমৎকার জানোয়ার দুইটা মরিয়া গেল! তাহারাও যে অন্য গ্রামের চাষীদের কাছে তাহাদের গ্রামের গরু বলিয়া অহঙ্কার করিত।

হিন্দুদের দুর্গাপূজার পর দশমীর দিন—গরু লইয়া একটা প্রতিযোগিতা হয়। ঘোড়-দৌড়ের মত গরুর দৌড়। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে আপন আপন গরু লইয়া গিয়া একটা জায়গা হইতে ছাড়িয়া দেয়, পিছনে প্রচণ্ড শব্দে ঢাক বাজে—চকিত হইয়া গরুগুলি ছুটিতে আরম্ভ করে। একটা নিদিষ্ট সীমানা যে গরু সর্বাগ্রে পার হয়, সেই গরুই এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়, শ্রীহরির নূতন গরু-জোড়াটা সেবার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। পরবৎসর তিনকড়ি আসিয়া রহমের প্রহ্লাদ ও আকাইকে লইয়া গিয়াছিল। বলিয়াছিল—দে ভাই,

আমাকে ধার দে। বেটা ছিরের দেমাকটা আমি একবার ভেঙে দিই!

রহম আপত্তি করে নাই। সে মুসলমান, কিন্তু তাহার গরু দুইটা তো গরুই; হিন্দুও নয়—মুসলমানও নয়। তা ছাড়া শ্রীহরির দেমাক ভাঙিয়া তাহার আনন্দ তিনকড়ির চেয়ে কম হইবে না। সেবার রহমের প্রহ্লাদ সকলকে হারাইয়া দিয়াছিল। প্রহ্লাদের পর শ্রীহরির জোড়াটা পৌঁছিয়াছিল। তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই রহমের আকাই।

ইরসাদ আসিয়া হাতে ধরিয়া রহমকে বলিল—উঠ! চাচা উঠ! কি করবে বল? মানুষের তো হাত নাই। নাও, এইবার আবার দেখে-শুনে কিনবে একজোড়া ভাল বলদ-বাছুর। আবার হবে। এ জোড়ার চেয়ে জিন্দা হবে—তুমি দেখিয়ো!

রহম বলিল—না, না, বাপ। তা হবে না। আমার পেল্লাদ-আকাইয়ের মতনটি আর হবে না রে বাপ। যেটি যায় তেমনটি আর হয় না। ইরসাদ বাপ, আর আমার হবে না। আর বাপ ইরসাদ—! জলভরা উগ্র চোখ দুটি তুলিয়া রহম বলিল—ই হাড়ে আর আমার সে হবে না বাপ, আমার আর কি আছে, কিসে হবে?

ইরসাদ বলিল—আমি তুমার টাকার যোগাড় করে দিব চাচা। তুমাকে আমি বাত দিচ্ছি। উঠ, তুমি উঠ।

ঠিক এই সময়েই আসিয়া হাজির হইল তিনকড়ি। প্রহ্লাদ ও আকাইয়ের মৃত্যুর খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে। রহম তাহাকে দেখিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—তিনু-ভাই! দেখ ভাই দেখ, আমার কি সর্বনাশ হইছে দেখ।

তিনকড়ি নীরবে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল মরা বলদ দুইটাকে। নীরবেই প্রহ্লাদের দেহটার পাশে আসিয়া বসিল—কয়েকবার দেহটার উপর হাত বুলাইল; তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—ওঃ, দুটো ঐরাবত রে! আঃ, ইন্দ্রপাত হয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

চোখ মুছিয়া সে বলিল—মহাগেরামেও ক'টা গরুর ব্যামো হয়েছে শুনলাম।

চাষীরা সকলে চকিত হইয়া উঠিল—মহাগেরাম?

—হ্যাঁ। তিনকড়ি চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ছেলে-মড়কের মত গো-মড়কও লাগল দেখছি। সতীশ বাউড়ী আমাকে বললে—কি ব্যামো বুঝতেই পারে নাই!

ইরসাদ এবং অন্য চাষীরা মহাচিন্তিত হইয়া উঠিল।

তিনকড়ি বলিল—দেবু তার করেছে জেলাতে গরুর ডাক্তারের জন্যে! হ্যাঁ—হ্যাঁ, ইরসাদ চাচা, তোমাকে দেবু যেতে বলেছে বিশেষ করে। কাল রেতে কলকাতা থেকে বিশুবাবু আরও সব কে কে এসেছে। বার বার করে তোমাকে যেতে বলে দিয়েছে।

হঠাৎ খানিকটা বিচিত্র হাসি হাসিয়া আবার বলিল—মহাগেরামে দেখলাম, রমেন চাটুয্যে আর দৌলতের লোক ঘুরছে মুচীপাড়ায়। গিয়েছে বুঝলাম—পেল্লাদ-আকাইয়ের খাল (চামড়া) ছাড়াবার লেগে তাগিদ দিতে। একেই বলে—কারু সর্বনাশ, আর কারু পোষমাস!

রহম একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল।—আমি ভাগাড়ে দিব না। গেড়ে দিব—আমি মাটিতে গেড়ে দিব। তারপর হঠাৎ ইরসাদের হাত ধরিয়া বলিল—ইরসাদ, ই তা হলি উদেরই কাম!

—কি? ইরসাদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—মুচীদিকে দিয়ে উরাই বিষ দিছে।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না ভাই, বিষ-কাঁড় নয়, এ ব্যামোই বটে। মড়ক—গো-মড়ক। তবে ওরা ভাগাড় জমা নিয়েছে—লাভ তো ওদের হবেই।

ইরসাদ বলিল—তা হলে আমি এখন একবার যাই চাচা। ঘরে ভাত চাপিয়ে এসেছি, পুড়ে যাবে হয়তো। উ-বেলা একবার দেবু-ভাইয়ের কাছে থেকে ঘুরে আসতে হবে। বিশুবাবু এসেছে বললে তিনু-কাকা। দেখে আসি একবার কি বলে।···

ছমির শেখ নিতান্ত দরিদ্র; দিনমজুরি করিয়া খায়; দেহ তার দুর্বল; রোগপ্রবণ বলিয়া মজুরিও বড় মেলে না। ছমিরের দুঃসহ দুরবস্থা আজন্মের—ওটা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে ভিক্ষাও সে করে। বন্যার পর সাহায্য-সমিতি হওয়াতে বেচারা ইরসাদের অত্যন্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। ইরসাদের পিছনে খানিকটা আসিয়া সে ডাকিল—মিয়া-ভাই! ইরসাদ ফিরিয়া দেখিল ছমির।

—কি ছমির-ভাই?

—দেবু পণ্ডিতের কাছে যাবা? আমার লাগি আর কবিলাটার লাগি—দুখানা কাপড় যদি বুলে দাও—পুরানো হলিও চলবে মিয়া-ভাই।

ইরসাদ বলিল—আচ্ছা।

ইরসাদ বিশুকে বহুবার দেখিয়াছে। কিন্তু তেমন আলাপ কখনও হয় নাই। কঙ্কণার ইস্কুলে বিশু যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়িত সেই সময় ইরসাদ তাহার মামার বাড়ীর মাইনর ইস্কুলের পড়া শেষ করিয়া আসিয়া ভর্তি হইয়াছিল। বয়সে তফাত ছিল না, ইরসাদই বয়সে বৎসর খানেকের বড়, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ও ফোর্থ ক্লাসের পার্থক্যটা ইস্কুল-জীবনে এত বেশী যে কোনদিন ভাল করিয়া আলাপ জমাইবার সুযোগ হয় নাই। তারপর মক্তবের মৌলবীত্ব গ্রহণ করিয়া, নিজের ধর্ম লইয়া সে বেশ একটু মাতিয়া উঠিয়াছিল; ফলে ইরসাদ ইদানীং বিশুর উপর বিরূপ হইয়া উঠে। কারণ বিশু হিন্দুদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঘরের সন্তান। কিন্তু সম্প্রতি দেবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরে সে বিরূপতা তাহার মুছিয়া যাইতেছে। দেবুর কাছে বিশ্বনাথের গল্প শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। বিশুবাবুর এতটুকু গোঁড়ামি নাই। মুসলমান খৃষ্টান, এমন কি হিন্দুদের অস্পৃশ্য জাতি কাহাকেও ছুঁইয়া সে স্নান করে না।

দেবু বলিয়াছিল- তোমাকে দেখবামাত্র দুহাতে জড়িয়ে ধরবে, তুমি দেখো ইরসাদ-ভাই!

বিশুর চিঠিগুলা পড়িয়া তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে। বন্যার পরে অকস্মাৎ সাহায্য-সমিতির খবর দিয়া যেদিন সে টাকা পাঠাইল, সেদিন সে বিস্মিত হইয়া গেল। বিশ্বনাথের

সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও মনে হইল—এ এক নূতন ধরনের মানুষ। এমন ধরনের মানুষ কঙ্কণার বাবুদের ছেলেদের মধ্যে নাই, তাহার পরিচিত মিয়া-মোকাদিমদের ঘরেও সে দেখে নাই, তাহাদের নিজেদের মধ্যে তো থাকিবার কথাই নয়। মনে হইল বিশ্বনাথের সঙ্গে তাহাদের অমিল হইবার কিছু নাই। দেবুকে লেখা চিঠির মধ্যে—বিশ্বনাথের কথাবার্তার মধ্যেও চমৎকার দোস্তির সুর আছে—যাহা মুহূর্তে অন্তর স্পর্শ করে। লোকটিকে দেখিবার জন্য সে আগ্রহভরেই চলিয়াছিল। ভাবিতেছিল—বিশ্বনাথ তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে, সে তখন কি বলিবে?—বিশুবাবু? না ভাই-সাহেব? না বিশু-ভাই? দেবু বলে বিশু-ভাই। কিন্তু প্রথমেই কি তাহার বিশু-ভাই বলা ঠিক হইবে?

দেবুর বাড়ীর খানিকটা আগেই জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানা। ডাক্তার একখানা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরভাবে বিড়ি টানিতেছিল। ইরসাদ একটু বিস্মিত হইল। ডাক্তারও সাহায্য-সমিতির একজন পাণ্ডা। বিশেষ করিয়া এই সর্বনাশা ম্যালেরিয়ার সময়ে—সাহায্য-সমিতির নামে যেভাবে চিকিৎসা করিতেছে—তাহাতে তাহার সাহায্য একটা মোটা অঙ্কের টাকার চেয়ে কম নয়। আজ বিশু আসিয়াছে, অথচ সে এখানে বসিয়া রহিয়াছে। ইরসাদ বলিল—সেলাম গো ডাক্তার!

ডাক্তার বলিল—সেলাম।

হাসিয়া ইরসাদ বলিল—কি রকম, বসে রয়েছেন যে?

—কি করব? নাচব?

ইরসাদ একটু আহত হইল। ব্যথিত বিস্ময়ে সে জগনের মুখের দিকে চাহিল। জগন বলিল—কোথায় যাবে? দেবুর ওখানে বুঝি?

ইরসাদ নীরসকণ্ঠে বলিল—হ্যাঁ। বিশ্বনাথ এসেছে শুনলাম। তাই যাব একবার মহাগেরামে।

—মহাগেরামে সে আসে নাই। জংশনের ডাক-বাংলায় আছে। দেবুও সেইখানে।

—জংশনে?

—হ্যাঁ—বলিয়া ডাক্তার আপন মনে বিড়ি টানিতে আরম্ভ করিল। আর কথা বলিল না।

আরও খানিকটা আগে—হরেন ঘোষালের বাড়ী। ঘোষাল উত্তেজিত ভাবে বাড়ীর সামনে ঘুরিতেছিল, আপন মনেই সংস্কৃত আওড়াইতেছিল—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহ।

ইরসাদ আরও খানিকটা আশ্চর্য হইয়া গেল। ঘোষালও যায় নাই। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—ঘোষাল, কাণ্ডটা কি?

ঘোষাল লাফ দিয়া নিজের দাওয়ায় উঠিয়া বলিল—যাও, যাও, বিশুবাবু খানা সাজিয়ে রেখেছে—খেয়ে এস গিয়ে—যাও! বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

আরও খানিকটা আগে—গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ, শ্রীহরি ঘোষের ঠাকুরবাড়ী। সেই ঠাকুর-

বাড়ীর নাটমন্দিরে বেশ একটি জনতা জমিয়া গিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীরভাবে পদচারণা করিতেছে। প্রাচীন বয়সীরা উদাসভাবে বসিয়া আছে। কথা বলিতেছে শুধু ঘোষের কর্মচারী দাসজী—কঙ্কণার বড়বাবু তো অজগরের মত ফুঁসছে—বুঝলেন কিনা? বলছে—আমি ছাড়ব না। মহামহোপাধ্যায়ই হোক— আর পীরই হোক, এর বিহিত আমি করবই।

ইরসাদের আর সন্দেহ রহিল না। কোন একটা গোলমাল হইয়াছে নিশ্চয়ই। সে ভাবিতেছিল—কোথায় যাইবে? ডাক্তার বলিল—বিশ্বনাথ জংশনে ডাকবাংলোয় আছে। দেবু সেখানে আছে। জংশনে যাওয়াই বোধ হয় ভাল, কিন্তু তাহার আগে সঠিক সংবাদ কাহার কাছে পাওয়া যায়?

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল—দেবুর দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে দুর্গা। ইরসাদ দ্রুতপদে আসিয়া দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা, দেবু-ভাই কোথায় বল দেখি?

দুর্গা ম্লানমুখে বলিল—মহাগেরামে—ঠাকুর মশায়ের বাড়ী গিয়েছে।

—মহাগেরামে? তবে যে ডাক্তার বললে—জংশনে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গা বলিল—সেখান থেকে মহাগেরামে গিয়াছে—ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে।

—কি ব্যাপার বল দেখি? সবাই দেখি হৈ-চৈ করছে!

দুর্গার চোখে জল আসিয়া গেল। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুর্গা বলিল—সে এক সর্বনেশে কাণ্ড শেখ মশায়! ঠাকুর মশায়ের নাতি নাকি পৈতে ফেলে দিয়েছে কাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছে। ঠাকুর মশায় নাকি নিজের চোখে সব দেখেছেন। ঠাকুর মশায় নাকি থরথর করে কেঁপে মৌরাক্ষীর বালির ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। এ চাকলায় সবাই এই নিয়ে কলকল করছে। জামাই-পণ্ডিত ঠাকুর মশায়কে ধরে তুলে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়েছে।

একুশ

জীবনে এইটাই বোধ হয় ন্যায়রত্নের পক্ষে প্রচণ্ডতম আঘাত।

প্রৌঢ়ত্বের প্রথম অধ্যায়ে—পুত্রের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার ফলে তিনি এক প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। পুত্র শশিশেখর আত্মহত্যা করিয়াছিল। চলন্ত ট্রেনের সামনে সে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে মিলিয়াছিল শুধু একতাল মাংসপিণ্ড। ন্যায়রত্ন স্থির অকম্পিত ভাবে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য—পুত্রের সেই দেহাবশেষ মাংসপিণ্ড দেখিয়াছিলেন; সযত্নে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা একত্রিত করিয়া তাহার সৎকার করিয়াছিলেন। পৌত্র বিশ্বনাথ তখন শিশু। পুত্রবধূকে দিয়া তিনি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বাহিরে তাঁহার একবিন্দু চাঞ্চল্য কেহ দেখে নাই। আজ কিন্তু ন্যায়রত্ন থরথর করিয়া কাঁপিয়া ময়ূরাক্ষীগর্ভের উত্তপ্ত বালির উপর বসিয়া পড়িলেন। বিশ্বনাথের অনেক বিদ্রোহ সহ্য

করিয়াছেন। সে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবনাদর্শের এবং পুণ্যময় কুলধর্মের বিপরীত মত পোষণ করে এবং সে-সবকে সে অস্বীকার করে—তাহা তিনি পূর্ব হইতেই জানেন। বহুবার পৌত্রের সঙ্গে তাঁহার তর্ক হইয়াছে। তর্কের মধ্যে পৌত্রের মৌখিক বিদ্রোহকে তিনি সহ্য করিয়াছেন। মনে মনে নিজেকে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার আসনে বসাইয়া, বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছুকে মহাকালের দুর্জ্ঞেয় লীলা ভাবিয়া সমস্ত কিছু হইতে লীলা-দর্শনের আনন্দ-আস্বাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পৌত্রের মৌখিক মতবাদকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়া তর্কের বিদ্রোহকে কর্মে পরিণত হইতে দেখিয়া, মুহূর্তে তাঁহাব মনোজগতে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আজ ধর্মদ্রোহী আচারভ্রষ্ট পৌত্রকে দেখিয়া, তীব্রতম করুণ ও রৌদ্র রসে বিচলিত অভিভূত হইয়া, আপনার অজ্ঞাতসারে কখন দর্শকের নির্লিপ্ততার আসনচ্যুত হইয়া ন্যায়রত্ন অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে নামিয়া পড়িয়া নিজেই সেই মহাকালের লীলায় ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন।

কয়েক দিন হইতে তিনি বিশ্বনাথকে প্রত্যাশা করিতেছিলেন। জয়াকে সে একটা পোস্ট-কার্ড চিঠিতে লিখিয়াছিল—সে এবং আরও কয়েকজন ওদিকে যাইবে। ন্যায়রত্ন লিখিয়াছিলেন—তোমরা কতজন আসিবে লিখিবে। কাহারও কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা তাহাও জানাইবে।...সে পত্রের উত্তর বিশ্বনাথ তাঁহাকে দেয় নাই। গতকাল সন্ধ্যার সময় দেবু তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছিল যে রাত্রি দেড়টার গাড়ীতে বিশু-ভাই কলিকাতার কয়েকজন কর্মী বন্ধুকে লইয়া জংশনে নামিবে। কিন্তু সে লিখিয়াছে, তাহারা 'জংশনের ডাকবাংলোতেই থাকিবার ব্যবস্থা করিবে'।

ন্যায়রত্ন মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রিতে বাড়ীতে আসিলে কি অসুবিধা হইত? বাড়ীতে আজিও রাত্রে দুইজন অতিথির মত খাদ্য রাখিবার নিয়ম আছে। অতিথি না আসিলে, সকালে সে খাদ্য দরিদ্রকে ডাকিয়া দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকালে দরিদ্ররা আসিয়া এ-বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকে। বাসি হইলেও উপাদেয় উপকরণময় খাদ্য উচ্ছিষ্ট নয়; এই খাদ্যটির জন্য এ গ্রামের দরিদ্ররা সকলেই লোলুপ হইয়া থাকে। জয়া এখন পালা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই গৃহে বিশ্বনাথ রাত্রিতে অতিথি লইয়া আসিতে দ্বিধা করিল। বন্ধুরা হয়তো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বিশ্বনাথ হয়তো ভাবিয়াছে তাহাদের যথোপযুক্ত মর্যাদা এ গৃহের প্রাচীন-ধর্মী গৃহস্বামী দিতে পারিবেন না।

জয়া কিন্তু ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সহজ সরল করিয়া দিয়াছিল। বিশ্বনাথের প্রতি তাহার কোন সন্দেহ জন্মিবার কারণ আজও ঘটে নাই। পিতামহের সঙ্গে বিশ্বনাথ তর্ক করে, সে তর্কের বিশেষ কিছু সে বুঝিত না, তর্কের সময় সে শঙ্কিত হইত, আবার তর্কের অবসানে পিতামহ এবং পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবহার দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। কখনও স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বিশ্বনাথ হাসিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিত। বলিত—ওসব হল পণ্ডিতি কচ্‌কচি আমাদের! শাস্ত্রে বলেছে—অজা-যুদ্ধ আর ঋষি-শ্রাদ্ধ আড়ম্বরে ও গুরুত্বে এক রকমের ব্যাপার। প্রথমটা খুব হৈ-হৈ তর্কাতর্কি—দেখেছ তো বিচার-সভা—

এই মারে তো এই মারে কাণ্ড ! তারপর সভা শেষ হল—বিদেয় নিয়ে সব হাসতে হাসতে যে যার বাড়ী চলে গেল। আমাদেরও তাই আর কি ! সভা শেষ হল এইবার বিদেয় কর দিকি। তুমিই তো গৃহস্বামিনী ! বলিয়া সে সাদরে স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইত। জয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ঘরের মেয়ে ; আক্ষরিক লেখাপড়া তেমন না করিলেও অজা-যুদ্ধ, ঋষি-শ্রাদ্ধ উপমা সমন্বিত বিশ্বনাথের যুক্তি রস-সমেত উপভোগ করিত, এবং তর্কের মূল তত্ত্বের কিছু গন্ধও যেন পাইত।

জয়া কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে—তুমি কি করতে চাও বল দেখি ?

—মানে ?

—মানে দাদুর সঙ্গে তর্ক করছ, বলছ—ঈশ্বর নাই—জাত মানি না ! ছি, ওই আবার বলে নাকি—এত বড় লোকের নাতি হয়ে !

—বলে না বুঝি ?

—না। বলতে নাই।

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বনাথ হাসিত। অল্প বয়সে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন ন্যায়রত্ন। বিশ্বনাথের মা—ন্যায়রত্নের পুত্রবধূ—বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। ন্যায়রত্নের স্ত্রী—বিশ্বনাথের পিতামহী মারা যাইতেই জয়া ঘরের গৃহিণী-পদ গ্রহণ করিয়াছে। তখন তাহার বয়স ছিল সবে ষোলো। বিশ্বনাথ সেবারেই ম্যাট্রিক পাস করিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। তখন সে-ও ছিল পিতামহের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। হোস্টেলে থাকিত ; সন্ধ্যাআহ্নিক করিত নিয়মিত। তখন তাহার নিকট কেহ নাস্তিকতার কথা বলিলে—সে শিশু-কেউটের মত ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। এমনও হইয়াছে যে, তর্কে হারিয়া সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। তাহার পর কিন্তু ধীরে ধীরে বিরাট মহানগরীর রূপ-রসের মধ্যে এবং দেশদেশান্তরের রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে সে এক অভিনব উপলব্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহার এ পরিবর্তন সম্পূর্ণ হইল, তখন জয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল—সে-ও জীবনে একটা পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহার কিশোর মন উত্তপ্ত তরল ধাতুর মত ন্যায়রত্নের ঘরের গৃহিণীর ছাঁচে পড়িয়া সেই রূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে ; শুধু তাই নয় —তাহার কৈশোরের উত্তাপও শীতল হইয়া আসিয়াছে। ছাঁচের মূর্তির উপাদান কঠিন হইয়া গিয়াছে, আর সে ছাঁচ হইতে গলাইয়া অন্য ছাঁচে ঢালিবার উপায় নাই। ভাঙিয়া গড়িতে গেলে এখন ছাঁচটা ভাঙিতে হইবে। ন্যায়রত্নের সঙ্গে জয়া জড়াইয়া গিয়াছে অবিচ্ছেদ্য ভাবে। জয়াকে ভাঙিয়া গড়িতে গেলে তাহার দাদুকে আগে ভাঙিতে হইবে। তাই বিশ্বনাথ—স্ত্রীর সঙ্গে ছলনা করিয়া দিনগুলি কাটাইয়া আসিয়াছে।

স্বামীর হাসি দেখিয়া জয়া তাহাকে তিরস্কার করিত। তাহাতেও বিশ্বনাথ হাসিত। এ হাসিতে জয়া পাইত আশ্বাস। এ হাসিকে স্বামীর আনুগত্য ভাবিয়া, সে পাকা গৃহিণীর মত আপন মনেই বকিয়া যাইত।—

আজ জয়া দাদুকে বলিল—আপনি বড় উতলা মানুষ দাদু! রাত্রে নেমে জংশনে ডাক-

বাংলোয় থাকবে শুনে অবধি আপনি পায়চারি করছেন। থাকবে তো হয়েছে কি?

ন্যায়রত্ন ম্লান-হাসি হাসিয়া নীরবে জয়ার দিকে চাহিলেন। সে হাসির অর্থ পরিষ্কারভাবে না বুঝিলেও আঁচটা জয়া বুঝিল। সে-ও হাসিয়া বলিল—আপনি আমাকে যত বোকা ভাবেন দাদু, তত বোকা আমি নই। তারা সব জংশনে নামবে রাত্রে দেড়টা-দুটোয়। তারপর জংশন থেকে—রেলের পুল দিয়ে নদী পার হয়ে—কঙ্কণা, কুসুমপুর, শিবকালীপুর—তিনখানা গ্রাম পেরিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে রাতটা ডাকবাংলোয় থাকবে, ঘুমিয়ে-টুমিয়ে সকালবেলা দিব্যি খেয়া-ঘাটে নদী পার হয়ে সোজা চলে আসবে বাড়ী।

ন্যায়রত্নকেও কথার যুক্তিটা মানিতে হইল। জয়া অযৌক্তিক কিছু বলে নাই। তা ছাড়া ন্যায়রত্নের আজ জয়ার বলটাই সকলের চেয়ে বড় বল। তাঁহার সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করিয়া বিশ্বনাথ যখন ন্যায়রত্ন-বংশের কুলধর্মপরায়ণা জয়ার আঁচল ধরিয়া হাসিমুখে বেড়াইত—তখন তিনি মনে মনে হাসিতেন। মহাযোগী মহেশ্বর উন্মত্তের মত ছুটিয়াছিলেন মোহিনীর পশ্চাতে। বৈরাগী-শ্রেষ্ঠ তপস্বী শিব উমার তপস্যায় ফিরিয়াছিলেন কৈলাস-ভবনে। তাঁহার জয়া যে একাধারে দুই,—রূপে সে মোহিনী, বিশ্বনাথের সেবায় তপস্যায় সে উমা। জয়াই তাঁহার ভরসা। জয়ার কথায় আবার তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সেখানে একবিন্দু উদ্বেগের চিহ্ন নাই। ন্যায়রত্ন এবার আশ্বাস পাইলেন। জয়ার যুক্তিটাকে বিচার করিয়া মানিয়া লইলেন—জয়া ঠিকই বলিয়াছে।

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া আবার তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। জয়ার যুক্তি সহজ সরল—কোথাও এতটুকু অবিশ্বাসের অবকাশ নাই; কিন্তু বিশ্বনাথ সংবাদটা তাঁহাকে না দিয়া দেবুকে দিল কেন? বিশ্বনাথ আজকাল জয়াকে পোস্টকার্ডে চিঠি লেখে কেন? তাহাদের দুইজনের সম্বন্ধের রঙ কি তাহার ওই চিঠির ভাষার মত ফিকে হইয়া আসিয়াছে? লৌকিক মূল্য ছাড়া অন্য মূল্যের দাবি হারাইয়াছে?—মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বাহিরে আসিলেন।

—কে? দাদু? জয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন। লক্ষ্য করিলেন—জয়ার ঘরের জানালার কপাটের ফাঁকে প্রদীপ্ত আলোর ছটা জাগিয়া রহিয়াছে। ন্যায়রত্ন বলিলেন—হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তুমি এখনও জেগে?

জয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। হাসিয়া বলিল—আপনার বুঝি ঘুম আসছে না? এখনও সেই সব উদ্ভট ভাবনা ভাবছেন?

ন্যায়রত্ন আপনাকে সংযত করিয়া হাসিয়া বলিলেন—আসন্ন মিলনের পূর্বক্ষণে সকলেই অনিদ্রা-রোগে ভোগে, রাজ্ঞি! শকুন্তলা যেদিন স্বামিগৃহে যাত্রা করেছিলেন, তার পূর্বরাত্রে তিনিও ঘুমোন নি!

জয়া হাসিয়া বলিল—আমি গোবিন্দজীর জন্যে চাদর তৈরি করছিলাম।

—গোবিন্দজীর জন্যে চাদর তৈরি করছিলে? আমার গোবিন্দজীকেও তুমি এবার কেড়ে নেবে দেখছি! তোমার চারু মুখ আর সুচারু সেবায়—তোমার প্রেমে না পড়ে যান

আমার গোবিন্দজী!

জয়া নীরবে শুধু হাসিল।

—চল, দেখি—কি চাদর তৈরি করছ?

চমৎকার একফালি গরদ। গরদের ফালিটির চারিপাশে সোনালী পাড় বসাইয়া চাদর তৈয়ারি হইতেছে। ন্যায়রত্ন বলিলেন—বাঃ, চমৎকার সুন্দর হয়েছে ভাই।

হাসিয়া জয়া বলিল—আপনার নাতি এনেছিল রুমাল তৈরি করবার জন্যে। আমি বললাম, রুমাল নয়—এতে গোবিন্দজীর চাদর হবে। জরি এনে দিয়ো। আর খানিকটা নীলরঙের খুব পাতলা ফিন্‌ফিনে বেনারসী সিল্কের টুকরো। রাধারাণীর ওড়না করে দেব। গোবিন্দজীর চাদর হল—এইবার রাধারাণীর ওড়না করব।

ন্যায়রত্নের সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ভাগ্যে যাই থাক—জয়ার কখনও অকল্যাণ হইতে পারে না, কখনও না।

ভোরবেলায় উঠিয়াই কিন্তু ন্যায়রত্ন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রত্যাশা করিয়াছিলেন —বিশ্বনাথের ডাকেই তাঁহার ঘুম ভাঙিবে। সে আসিয়া এখান হইতে তাহার বন্ধুদের জন্যে গাড়ী পাঠাইবে। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন—টোল-বাড়ীর সীমানার শেষপ্রান্তে। ওখান হইতে গ্রাম্য পথটা অনেকখানি দূর অবধি দেখা যায়।

কাহার বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিতেছে। ন্যায়রত্ন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। অকাল মৃত্যুতে দেশ ছাইয়া গেল! আহা, আবার কে সন্তানহারা হইল বোধ হয়!

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ন্যায়রত্ন ফিরিয়া চাদরখানি টানিয়া লইয়া পথে নামিলেন। আসিয়া দাঁড়াইলেন গ্রামের প্রান্তে। পূর্বদিগন্তে জবাকুসুম-সঙ্কাশ সবিতার উদয় হইয়াছে। চারিদিক সোনার বর্ণ আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। দিগ্‌দিগন্ত স্পষ্ট পরিষ্কার। পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ শস্যহীন মাঠখানার এখানে ওখানে জমিয়া-থাকা-জলের বুকে আলোকচ্ছটায় প্রতিবিম্ব ফুটিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের উপরে শরবন বাতাসে কাঁপিতেছে। ওই শিবকালীপুর। এদিকে দক্ষিণে বাঁধের প্রান্ত হইতে আল-পথ। কেহ কোথাও নাই। বহুদূরে—সম্ভবত শিবকালীপুরের পশ্চিম প্রান্তে সবুজ খানিকটা মাঠের মধ্যে কালো কালো কয়েকটা কাঠির মত কি নড়িতেছে! চাষের ক্ষেতে চাষীরা বোধ হয় কাজ করিতেছে। ন্যায়রত্ন ধীরে ধীরে আল-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। উদ্বেগের মধ্যে তিনি মনে মনে বার বার পৌত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। মানুষের এই দারুণ দুঃসময়—মুখের অন্ন বন্যায় ভাসিয়া গেল, মানুষ আজ গৃহহীন, ঘরে ঘরে ব্যাধি, আকাশে-বাতাসে শোকের রোল,—এই দারুণ দুঃসময়ে বিশ্বনাথ যাহা করিয়াছে—করিতেছে, সে বোধ করি মহাযজ্ঞের সমান পুণ্যকর্ম। পূর্বকালে ঋষিরা এমন বিপদে যজ্ঞ করিয়া দেবতার আশীর্বাদ আনিতেন মানুষের কল্যাণের জন্য। বিশ্বনাথও সেই কল্যাণ আনিবার সাধনা করিতেছে। মনে মনে তিনি বার বার পৌত্রকে আশীর্বাদ করিলেন—ধর্মে তোমার মতি হোক—ধর্মকে তুমি জান, তুমি দীর্ঘায়ু হও—বংশ আমাদের উজ্জ্বল হোক্।

মাথার উপর শন্-শন্ শব্দ শুনিয়া ন্যায়রত্ন ঈষৎ চকিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মন শিহরিয়া উঠিল। গোবিন্দ! গোবিন্দ! মাথার উপর পাক দিয়া উড়িতেছে এক ঝাঁক শকুন। আকাশ হইতে নামিতেছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ওপাশে বালুচরের উপর শ্মশান, সেইখানে। ন্যায়রত্ন আবার শিহরিয়া উঠিলেন—মানুষ আর শব-সৎকার করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। শ্মশানে গোটা দেহটা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে।

বাঁধের ওপারে বালুচরের উপর নামিয়া দেখিলেন—শ্মশান নয়—ভাগাড়ে নামিতেছে শকুনের দল। তিনটা গরুর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। একটি তরুণ-বয়সী দুগ্ধবতী গাভী। পঞ্চগ্রামের গরীব গৃহস্থেরা সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। সবাই হয়তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। থাকিবে শুধু দালান-কোঠার অধিবাসীরা।···

—ঠাকুর মশায় এত বিয়ান বেলায় কুথা যাবেন?

অন্যমনস্ক ন্যায়রত্ন মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখেন—খেয়ানৌকার পাটনী শশী ভল্লা হালির উপর মাথা ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতেছে।

—কল্যাণ হোক। একবার ওপারে যাব।

শশী নৌকাখানাকে টানিয়া একেবারে কিনারায় ভিড়াইল।

ময়ূরাক্ষীর নিকটেই ডাকবাংলো।

ন্যায়রত্ন তীরে উঠিয়া মনে মনে বিশ্বনাথকে আশীর্বাদ করিলেন।

তাহার বন্ধুদের কল্পনা করিলেন। মনে তাঁহার জাগিয়া উঠিল শিবকালীপুরের তরুণ নজরবন্দীটির ছবি। প্রত্যাশা করিলেন—হয়তো সেই যতীনবাবুটিকেও দেখিতে পাইবেন।

ডাকবাংলোর ফটকে ঢুকিয়া তিনি শুনিলেন—উচ্ছ্বসিত হাসির কলরোল। হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত হাসি। এ হাসি যাহারা হাসিতে না পারে—তাহারা কি এই দেশব্যাপী শোকার্ত ধ্বনি মুছিতে পারে! হ্যাঁ—উপযুক্ত শক্তিশালী প্রাণের হাসি বটে!

ন্যায়রত্ন ডাকবাংলোর বারান্দায় উঠিলেন। সম্মুখের দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা দিয়া সব দেখা যাইতেছে। একখানা টেবিলের চারিধারে পাঁচ-ছয়জন তরুণ বসিয়া আছে, মাঝখানে একখানা চীনামাটির রেকাবির উপর বিস্কুট-জাতীয় খাবার। একটি তরুণী চায়ের পাত্র হাতে দাঁড়াইয়া আছে; ভঙ্গি দেখিয়া বুঝা যায়—সে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কেহ একজন তাহার হাত ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে। যে ধরিয়াছিল—সে পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিলেও—ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন। ও কে? বিশ্বনাথ? হ্যাঁ, বিশ্বনাথই তো!

মেয়েটি বলিল—ছাড়ুন। দেখুন, বাইরে কে একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইল বিশ্বনাথ।

—দাদু, এখানে আপনি! বিশ্বনাথ উঠিয়া পড়িল—তাহার এক হাতে আধখাওয়া ন্যায়রত্নের অপরিচিত খাদ্যখণ্ড। পরমুহূর্তেই সে বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিল—আমার দাদু! ···মেয়েটি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

তাহারা সকলেই সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে দেবুও কোন্‌খানে

ছিল। সে দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ঠাকুর মশায়, বিশু-ভাই চা খেয়েই আসছে। চলুন, আমরা ততক্ষণ রওনা হই।

ন্যায়রত্ন দেবুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া, তাহাকে অতিক্রম করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, বিশ্বনাথের বন্ধুদের দিকে। পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের অঙ্গে বিজাতীয় পোশাক। বিশ্বনাথের বন্ধুরা সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিল।

বিশ্বনাথ বলিল—আমার বন্ধু এঁরা। আমরা সব একসঙ্গে কাজ করে থাকি, দাদু।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমার বন্ধু ছাড়া ওঁদের একটা করে বিশেষ পরিচয় আছে আসল, ভাই! সেই পরিচয়টা দাও। কাকে কি বলে ডাকব ?

বিশ্বনাথ পরিচয় দিল—ইনি প্রিয়ব্রত সেন, ইনি অমর বসু, ইনি পিটার পরিমল রায়—

—পিটার পরিমল!

—হ্যাঁ, উনি ক্রিশ্চান।

ন্যায়রত্ন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শুধু একবার চকিতের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিলেন পৌত্রের দিকে।

—আর ইনি—আবদুল হামিদ।

ন্যায়রত্নের দৃষ্টি ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—আর ইনি জীবন বীরবংশী।

বীরবংশী অর্থাৎ ডোম। ন্যায়রত্ন এবার চাহিলেন টেবিলের দিকে ; একখানি মাত্র চীনামাটির প্লেটে খাবার সাজানো রহিয়াছে—এবং সে খাবার খরচও হইয়াছে। চায়ের কাপগুলি সবই টেবিলের উপর নামানো। সেই মুহূর্তেই সেই মেয়েটি ও-ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে ধোয়া জামা ও গেঞ্জি।

—আর ইনিও আমাদের সহকর্মী দাদু—অরুণা সেন, প্রিয়ব্রতের বোন।

মেয়েটি হাসিয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিল, বলিল—আপনি বিশ্বনাথবাবুর দাদু!

ন্যায়রত্ন শুধু বলিলেন—থাক্, হয়েছে।···অস্ফুট মৃদু কণ্ঠস্বর যেন জড়াইয়া যাইতেছিল।

মেয়েটি জামা ও গেঞ্জি বিশ্বনাথকে দিয়া বলিল—নিন, জামা-গেঞ্জি পাল্টে ফেলুন দিকি! সকলের হয়ে গেছে। চলুন, বেরুতে হবে।

হামিদ একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল, বলিল—আপনি বসুন।

ন্যায়রত্নের সংযম যেন ফুরাইয়া যাইতেছে। সুখ, দুঃখ, এমন কি দৈহিক কষ্ট সহ্য করিয়া, তাহার মধ্য হইতে যেন রসোপলব্ধি-শক্তি তাঁহার বোধ হয় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। স্নায়ুশিরার মধ্যে দিয়া একটা কম্পনের আবেগ বহিতে সুরু করিয়াছে ; মস্তিষ্ক-মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে সে আবেগে। তবু হামিদের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাসি হাসিয়া তিনি বসিলেন।

বিশ্বনাথ জামা ও গেঞ্জি খুলিয়া ফেলিয়া, পরিষ্কার জামা-গেঞ্জি পরিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের অনাবৃত দেহের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিশ্বনাথের দেহ যেন

বালবিধবার নিরাভরণ হাত দুখানির মত দীপ্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার গৌর দেহ-বর্ণ পর্যন্ত অনুজ্জ্বল; শুধু অনুজ্জ্বল নয়, একটা দৃষ্টিকটু রূঢ়তায় লাবণ্যহীন। ওঃ, তাই তো! উপবীত? বিশ্বনাথের গৌরবর্ণ দেহখানিকে তির্যক বেষ্টনে বেড়িয়া শুচি-শুভ্র উপবীতের যে মহিমা—যে শোভা ঝলমল করিত, সেই শোভার অভাবে এমন মনে হইতেছে। ন্যায়রত্নের দেহের কম্পন এবার স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি আপনার হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত! দেবু পণ্ডিত রয়েছ?

দেবু আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে?

—আমার শরীরটা যেন অসুস্থ হয়েছে মনে হচ্ছে। আমায় তুমি বাড়ী পৌছে দিতে পার?

সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অরুণা মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল—বিছানা করে দেব, শোবেন একটু?

—না।

বিশ্বনাথ অগ্রসর হইয়া আসিল, ডাকিল—দাদু!

নিষ্ঠুর যন্ত্রণা-কাতর স্থানে স্পর্শোদ্যত মানুষকে যে চকিত ভঙ্গিতে—যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক্ রোগী হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করে, তেমনি চকিতভাবে ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের দিকে হাত তুলিবেন।

অরুণা ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল?

অন্য সকলেও গভীর উদ্বেগের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কপালে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে কয়েকটি গভীর কুঞ্চন-রেখা জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বনাথ তাঁহার বেদনাতুর পাণ্ডুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। ন্যায়রত্নের অবস্থাটা সে উপলব্ধি করিতেছে।

কয়েক মিনিটের পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন চোখ খুলিলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের কল্যাণ হোক্ ভাই। আমি তা হলে উঠলাম।

—সে কি! এই অসুস্থ শরীরে এখন কোথায় যাবেন? বিশ্বনাথের বন্ধু পিটার পরিমল ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

—নাঃ, আমি এইবার সুস্থ হয়েছি।

বিশ্বনাথ বলিল—আমি আপনার সঙ্গে যাই?

—না। বলিয়াই ন্যায়রত্ন দেবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি আমায় একটু সাহায্য কর পণ্ডিত। আমায় একটু এগিয়ে দাও।

দেবু সসম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া বলিল—হাত ধরব?

—না, না। ন্যায়রত্ন জোর করিয়া একটু হাসিলেন—শুধু একটু সঙ্গে চল। ন্যায়রত্ন বাহির হইয়া গেলেন; ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ, স্তম্ভিত হইয়া গেল। কেহই কোন

কথা বলিতে পারিল না। ন্যায়রত্ন প্রাণপণ চেষ্টায় যে কথা গোপন রাখিয়া গেলেন মনে করিলেন, সে কথা তাঁহার শেষের কয়েকটি কথায়, হাসিতে, পদক্ষেপের ভঙ্গিতে বলা হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ নীরবে বাহির হইয়া আসিল। ডাকবাংলোর সামনের বাগানের শেষপ্রান্তে ন্যায়রত্ন দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিশ্বনাথ কাছে আসিবামাত্র বলিলেন—হ্যাঁ, জয়াকে—জয়াকে কি পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে?

বিশ্বনাথ হাসিল, বলিল—সে আসবে না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—না, না। তাকে আসতে আমি বাধ্য করব।

—বাধ্য করলে অবশ্য সে আসবে। কিন্তু তাকে শুধু দুঃখ পেতেই পাঠাবেন।

—জয়াকেও তুমি দুঃখ দেবে?

—আমি দেব না, সে নিজেই পাবে, সাধ করে টেনে বুকে আঘাত নেবে; যেমন আপনি নিলেন। কষ্টের কারণ আপনার আছে আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই কষ্ট স্বাভাবিকভাবে আপনাকে এতখানি কাতর করে নি। কষ্টটাকে নিয়ে আপনি আবার বুকের ওপর পাথরের আঘাতের মতন আঘাত করেছেন। জয়াও ঠিক এমনি আঘাত পাবে। কারণ, সে এতকাল আপনার পৌত্রবধূ হবারই চেষ্টা করেছে—জেনে রেখেছে, সেইটাই তার একমাত্র পরিচয়। আজকে সত্যকার আমার সঙ্গে নূতন করে পরিচয় করা তার পক্ষে অসম্ভব। আপনিও হয়তো চেষ্টা করলে পারেন, সে পারবে না।—

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন, কুলধর্ম বংশপরিচয় পর্যন্ত তুমি পরিত্যাগ করেছ—উপবীত ত্যাগ করেছ তুমি! তোমার মুখে এ কথা অপ্রকাশিত নয়। অপরাধ আমারই। তুমি আমার কাছে আত্মগোপন কর নি, তোমার স্বরূপের আভাস তুমি আমাকে আগেই দিয়েছিলে। তবু আমি জয়াকে—আমার পৌত্রবধূর কর্তব্যের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম, তোমার আধ্যাত্মিক বিপ্লব লক্ষ্য করতে তাকে অবসর পর্যন্ত দিই নি। কিন্তু—

—বলুন!

—না। আর কিছু নাই আমার; আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। অপরাধ—এমন কি, পাপও যদি হয় আমার হোক। জয়া আমার পৌত্রবধূই থাক্। তোমাকে অনুরোধ—আমার মৃত্যুর পর যেন আমার মুখাগ্নি করো না। সে অধিকার রইল জয়ার।

বিশ্বনাথ হাসিল। বলিল—বঞ্চনাকেও হাসিমুখে সইতে পারলে, সে বঞ্চনা তখন হয় মুক্তি। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন—আমি যেন এ হাসিমুখে সইতে পারি। সে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিল।

ন্যায়রত্ন পিছাইয়া গেলেন, বলিলেন—থাক্, আশীর্বাদ করি, এ বঞ্চনাও তুমি হাসিমুখে সহ্য কর। বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিয়া পথে অগ্রসর হইলেন। দেবু নতমস্তকে নীরবে তাঁহার অনুগমন করিল।

বিশ্বনাথ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল।…

ন্যায়রত্ন খেয়া-ঘাটের কাছে আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পিছন ফিরিয়া হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিয়া আর্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—পণ্ডিত! পণ্ডিত!

আজ্ঞে! বলিয়া দেবু ছুটিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ন্যায়রত্ন আশ্বিনের রৌদ্রতপ্ত নদীর বালির উপর বসিয়া পড়িলেন।...

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচখানা গ্রামে কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। অভাবে রোগে-শোকে জর্জরিত মানুষেরাও সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সচ্ছল অবস্থার প্রতিষ্ঠাপন্ন কয়েকজন—এ অনাচারের প্রতিকারে হইয়া উঠিল বদ্ধপরিকর।

ইরসাদের সঙ্গে দেবুর পথেই দেখা হইয়া গেল।

দেবু গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় মাথা হেঁট করিয়া পথ চলিতেছে। ইরসাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হইল; দেবু মুখ তুলিয়া ইরসাদের দিকে চাহিয়া ভাল করিয়া একবার চোখের পলক ফেলিয়া যেন নিজেকে সচেতন করিয়া লইল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল—ইরসাদ-ভাই!

—হ্যাঁ। শুনলাম, তুমি মহাগ্রামে গিয়েছ। দুর্গা বললে।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু বলিল—হ্যাঁ। এই ফিরছি সেখান থেকে।

—তোমাদের ঠাকুর মশায় শুনলাম নাকি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, নদীর ঘাটে! কেমন রইছেন তিনি?

একটু হাসিয়া দেবু বলিল—কেমন আছেন, তিনিই জানেন। বাইরে থেকে ভাল বুঝতে পারলাম না। নদীর ঘাটে কেঁপে বসে পড়লেন। আমি হাত ধরে তুলতে গেলাম। একটু-খানি বসে থেকে নিজেই উঠলেন। ময়ূরাক্ষীর জলে মুখ-হাত ধুয়ে হেসে বললেন—মাথাটা ঘুরে উঠেছিল, এইবার সামলে নিয়েছি পণ্ডিত। বাড়ী এসে—আমাকে জল খাওয়ালেন, স্নান করলেন, পূজো করলেন। আমি বসেই ছিলাম; দেখে বললেন—এইখানেই খেয়ে যাবে পণ্ডিত। আমি জোড়হাত করে বললাম—না না, বাড়ী যাই। কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না। খেয়ে উঠলাম। আমাকে বললেন—আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। বললেন—আমার জমি-জেরাত বিষয়-আশয় যা কিছু আছে—তোমাকে ভার নিতে হবে। ভাগে—ঠিকে, যা বন্দোবস্ত করতে হয়, তুমি করবে। ফসল উঠলে আমাকে খাবার মত চাল পাঠিয়ে দেবে কাশীতে, আর উদ্বৃত্ত ধান-বিক্রি করে টাকা।

ইরসাদ বলিল—ন্যায়রত্ন মশায় তবে কাশী যাবেন ঠিক করলেন?

—হ্যাঁ, ঠাকুর নিয়ে, বিশু-ভাইয়ের স্ত্রীকে ছেলেকে নিয়ে কাশী যাবেন। হয় কাল—নয় পরশু।

—বিশুবাবু আসে নাই? একবার এসে বললে না কিছু?

—না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দেবু আবার বলিল—সেই কথাই ভাবছিলাম, ইরসাদ-ভাই!

—কি কথা বল দেখি?

—বিশু-ভাইয়ের সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখব না। টাকাকড়ির হিসেবপত্র আজই আমি তাকে বুঝিয়ে দোব।

ইরসাদ চুপ করিয়া রহিল।

দেবু বলিল—তোমাদের জাত-ভাই একজন এসেছেন—আবদুল হামিদ। তিনিও দেখলাম—ওই বিশু-ভাইয়ের মতন। নামেই মুসলমান, জাত-ধর্ম কিছু মানেন না।

বাইশ

কয়েক দিন পর।

মানুষ বন্যায় বিপর্যস্ত, রোগে জীর্ণ ও শোকে কাতর, অনাহার এবং অচিকিৎসার মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। গো-মড়কে তাহাদের সম্পদের একটা বিশিষ্ট অংশ শেষ হইয়া যাইতেছে। তাহাদের জীবনের সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে করাল মূর্তিতে। তবু সে কথা ভুলিয়া তাহারা এ সংঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল।…ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র ধর্ম মানে না, জাতি মানে না, ঈশ্বর মানে না—সে উপবীত ত্যাগ করিয়াছে! ন্যায়রত্ন পৌত্রবধূ এবং প্রপৌত্রকে লইয়া দুঃখে লজ্জায় দেশত্যাগ করিয়াছেন। সে দুঃখ—সে লজ্জার অংশ যেন তাহাদের। শুধু তাই নয়, ইহাকে তাহারা মনে করিল—পঞ্চগ্রামের পক্ষে মহা অমঙ্গলের সূচনা। তাহারা ঘরে ঘরে হায় হায় করিয়া সারা হইল, আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। অনেকে চোখের জলও ফেলিল। বলিল—একপো ধর্ম হয়তো এইবার শেষ, চারপো কলি পরিপূর্ণ। সমস্ত কিছু সর্বনাশের কারণ যেন এই অনাচারের মধ্যে নিহিত আছে।

এই আক্ষেপ—এই আশঙ্কায় তাহারা মৃত্যু কামনা করিল কিনা, তাহারাও জানে না; তবু তাহারা কিছু একটার প্রেরণায় সাহায্য-সমিতির প্রতি বিমুখ হইল—যাহার ফলে মৃত্যু হয়তো অনিবার্য। এই নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অভাব এবং রোগের নির্যাতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ মৃত্যু-বিভীষিকা সম্মুখে দেখিয়াও আহার এবং ঔষধ-প্রত্যাখ্যান অনিবার্য মৃত্যু নয়তো কি?

ন্যায়রত্ন চলিয়া যাওয়ার পরদিন সকালবেলায় বিশ্বনাথ আসিয়াছিল। সেদিন দেবু তাহাকে হিসাবপত্র বুঝিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ বলিয়াছিল—তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ, দেবু-ভাই! আমাদের সঙ্গে সংস্রব রাখতে না চাও রেখো না, কিন্তু এখানকার সাহায্যের নাম করে দশজনের কাছে টাকা তুলে যে সাহায্য-সমিতি হয়েছে, তার অপরাধটা কি হল?

দেবু হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে মাফ কর, বিশু-ভাই।

আজ আবার বিশ্বনাথ আসিয়াছে। কয়দিন ধরিয়া সে নিজেই সাহায্য-সমিতি চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

আজও দেবু তাহাকে বলিল—আমাকে মাফ কর, বিশু-ভাই। তারপর হাসিয়া বলিল—

দেখলে তো নিজেই এ-ক'দিন চেষ্টা করে, একজনও কেউ চাল নিতে এল না!

সত্যই কেহ আসে নাই। গ্রামে গ্রামে জানানো হইয়াছে—সাহায্য-সমিতিতে শুধু চাল নয়, ওষুধও পাওয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তারও আসিয়াছে। কিন্তু তবুও কেহ ওষুধ লইতে আসে নাই।

বিশ্বনাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।···

এ কয়দিন ধরিয়া বিশ্বনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মানুষগুলি অদ্ভুত। কাছিম যেমনভাবে খোলার মধ্যে তাহার মুখ-সমেত গ্রীবাখানি গুটাইয়া বসিলে তাহাকে আর কোন-মতেই টানিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি ভাবেই ইহারা আপনাদিগকে গুটাইয়া লইয়াছে। ইহাকে জড়ত্ব বলিয়া বিশ্বনাথ উপহাস করিতে পারে নাই—ইহার মধ্যে সহনশক্তির যে এক অদ্ভুত পরিচয় রহিয়াছে—তাহাকে সে সসম্মানে শ্রদ্ধা করিয়াছে। এই সহনশক্তি যাহারা আয়ত্ত করিয়াছে—রক্তের ধারায় বংশানুক্রমে যাহাদের মধ্যে এই শক্তি প্রবহমাণ – তাহারা যদি জাগে, তবে সে এক বিরাট শক্তির দুর্জয় জাগরণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ডাকে—যাহার ডাকে সে জাগিবে, কূর্মাবতারের মত সমস্ত ধরিত্রীর ভারবহনের জন্য সে জাগিয়া উঠিবে ; তেমন ডাক সে দিতে পারিল না। তাই বোধ হয়, তাহার ডাকে তাহারা সাড়া দিল না।

সে ওই বীরবংশী—অর্থাৎ শিক্ষিত ডোম বন্ধুটিকে লইয়া গ্রামে গ্রামে হরিজন-পল্লীতে মিটিং করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। মিটিং করিতে পারিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু মিটিং হয় নাই। মিটিং করিতে দেয় নাই ভূমির স্বামী—ভূস্বামী-বর্গ ; যাহারা বিশ্বনাথের অনাচারের জন্য ন্যায়রত্নকে সামাজিক শাস্তি দিবার সংকল্প করিয়াছিল—তাহারাই ; কঙ্কণার বাবুরা, শ্রীহরি ঘোষ। হাটতলা জমিদারের, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের, ধর্মরাজতলার বকুলগাছের তলদেশের মাটিও জমিদারের, সেখানে যত পতিত ভূমি, এমন কি ময়ূরাক্ষীর বালুময়-গর্ভও তাহাদের। বিশ্বনাথ এই দেশেরই মানুষ—বাল্যকাল হইতে এই দেশের ধুলা-কাদা মাখিয়া মানুষ হইয়াছে, সে-ও ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল—এত পথে ধুলা সে মাখিয়াছে, পঞ্চগ্রামের মানুষ বাঁচিয়া আছে—পথ চলিতেছে—পরের মাটিতে। নিজেদের বলিতে তাহাদের ঘরের অঙ্গনটুকু ছাড়া আর কিছুই নাই। ব্যবহারের অধিকার বলিয়া একটা অধিকারের কথা বরাবর শুনিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে অধিকারও জমিদার নাকচ করিয়া দিল আদালতের সীলমোহর-যুক্ত পরোয়ানার সাহায্যে। আদালতে দরখাস্ত করিয়া জমিদারেরা পরোয়ানা বাহির করিয়া আনিল—এই এই স্থানে মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রবেশ করিতে নিষেধ করা যাইতেছে। অন্যথা করিলে অনধিকার-প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত হইবে।

এ আদেশ অমান্য করিবার কল্পনাও বিশ্বনাথের দল করিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবিয়া সে কল্পনা ত্যাগ করিয়াছে। দলের অন্য সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ দেবুর কাছে আসিয়াছে—সাহায্য-সমিতির ভার দিতে।···

দেবু বলিল—বিশু-ভাই, তুমি আমাকে রেহাই দাও। তুমি ঠাকুর মশায়ের পৌত্র—তুমি যাই কর, তোমার বংশের পুণ্যফল তোমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু আমি ফেটে মরে যাব।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—ওটা তোমার ভুল বিশ্বাস, দেবু-ভাই। কিন্তু সে যাক্ গে। এখন আমিই সাহায্য-সমিতির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য সকলে তো চলেই গেছেন, আমিও আজই চলে যাব। আমার সঙ্গে সংস্রব না থাকলে তো কারও আপত্তি হবে না!

দেবু কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—দেবু!

ম্লান হাসি হাসিয়া দেবু বলিল—বিশু-ভাই!

বিশ্বনাথ বলিল—এতে আর তুমি অমত করো না।

—লোকে হয়তো তবু আর সাহায্য-সমিতিতে আসবে না, বিশু-ভাই!

—আসবে। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—না আসে তোমাকে বুঝিয়ে আনতে হবে। তুমি পারবে। টাকাপয়সা তো জাত মেনে হাত ঘোরে না, ভাই। চণ্ডালের ঘরের টাকা বামুনের হাতে এলেই শুদ্ধ হয়ে যায়।

কাঁটার খোঁচার মত একটু তীক্ষ্ণ আঘাত দেবু অনুভব করিল; সে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত বিশু-ভাইয়ের মুখখানি! কোনখানে একবিন্দু এমন কিছু নাই—যাহা দেখিয়া অপ্রীতি জন্মে, রাগ করা যায়। বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া সে বলিল—কেন তুমি এমন কাজ করলে, বিশু-ভাই?

বিশ্বনাথ কথার উত্তর দিল না, অভ্যাসমত নীরবে হাসিল।

দেবু বলিল—কঙ্কণার বাবুরা ব্রাহ্মণ হলেও সায়েবদের সঙ্গে এক-টেবিলে বসে খানা খায়—অখাদ্য খায়, মদ খায়, অজাত-কুজাতের মেয়েদের নিয়ে ব্যভিচার করে—তাদের আমরা ঘেন্না করি। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, পথের ভিখিরীরা পর্যন্ত ঘেন্না করে। ভয়ে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ঘেন্না করে। ওরা বামুনও নয়, ধর্মও ওদের নাই। কিন্তু রোগে, শোকে, দুঃখে, বিশু-ভাই, মরণে পর্যন্ত আমাদের ভরসা ছিলে—তোমরা। ঠাকুর মহাশয়ের পায়ের ধুলো নিলে মনে হত সব পাপ আমাদের ধুয়ে গেল, সব দুঃখু আমাদের মুছে গেল। মনে মনে যখন ভাবতাম, একদিন ভগবান আসবেন, পৃথিবীর পাপীকে বিনাশ করে আবার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠা করবেন—তখন মনে পড়ত ঠাকুর মশায়ের মুখ। আজ আমরা কি করে বাঁচব বলতে পার? কার ভরসায় আমরা বুক বাঁধব?

বিশ্বনাথ বলিল—নিজের ভরসায় বুক বাঁধ, দেবু-ভাই। যেসব কথা তুমি বললে, সেসব নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। সে তোমার ভাল লাগবে না। শুধু একটা কথা বলে যাই। যে-কালে দাদুর মত ব্রাহ্মণেরা রাজার অন্যায়ের বিচার করতে পারত, চোখ রাঙালে বড় লোকে ভয়ে মাটিতে বসে যেত—সে-কাল চলে গেছে। এ-কালে অভাব হলে—হয় নিজেরাই দল বেঁধে অভাব ঘুচোবার চেষ্টা কর, নয় যারা আজ দেশরক্ষার ভার নিয়ে বসে আছে—

তাদের কাছে দাবি জানাও। রোগ হলে ওষুধের জন্যে—চিকিৎসার জন্যে তাদেরই চেপে ধর। অকালমৃত্যুতে তাদেরই চোখ রাঙিয়ে গিয়ে বল—কেন তোমাদের বন্দোবস্তের মধ্যে এমন অকাল-মৃত্যু ? গভীর দুঃখে শোকে অভিভূত যখন হবে—তখন ভগবানকে যদি ডাকতে ইচ্ছে হয়—নিজেরা ডেকো। ঠাকুর মশায়দের কাজ আজ ফুরিয়ে গিয়েছে ; তাই সেই বংশের ছেলে হয়েও আমি অন্যরকম হয়ে গিয়েছি। দাদু আমার—মন্ত্র-বিসর্জনের পর মাটির প্রতিমার মত বসে ছিলেন, তাই তিনি চলে গেলেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বিশু-ভাই, তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ, তুমি আমাদের ঠাকুর মশায়ের বংশধর—তুমি আমাদের বাঁচাবে—এইটাই আমাদের সব চেয়ে বড় ভরসা ছিল। কিন্তু—

হাসিয়া বিশ্বনাথ বলিল—বলেছি তো, অন্যে তোমাদের আশীর্বাদের জোরে বাঁচাবে, এ ভরসা ভুল ভরসা, দেবু-ভাই ! সে ভুল যদি আমা থেকে তোমাদের ভেঙে গিয়েই থাকে, তবে সে ভালই হয়েছে। আমি ভালই করেছি। আচ্ছা, আমি এখন চলি দেবু !

—কিন্তু বিশু-ভাই—

—যেদিন সত্যি ডাকবে, সেইদিন আবার আসব, দেবু-ভাই। হয়তো বা নিজেই আসব।

বিশ্বনাথ দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া, খানিকটা আগে পথের বাঁকে মোড় ফিরিয়া মিলাইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ বিশ্বনাথ দাঁড়াইয়া গেল। কেহ যেন তাহার পথরোধ করিল। তাহার চোখে পড়িল—অদূরবর্তী মহাগ্রাম। ওই যে তাহাদের বাড়ীর কোঠাঘরের মাথা দেখা যাইতেছে। ওই যে ঘনশ্যাম কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছটি। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখিয়া সে আবার মাথা নিচু করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কোন্ আকর্ষণে সে যে দাদু-জয়া-অজয়কে ছাড়িয়া, ঘর-দুয়ার ফেলিয়া, এমনভাবে জীবনের পথে চলিয়াছে—সে কথা ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া যায়। অদ্ভুত অপরিমেয় উত্তেজনা এই পথ চলায়।

—ছোট্-ঠাকুর মশায় !

—কে ? চকিত হইয়া বিশ্বনাথ চারিপাশে চাহিয়া দেখিল।

পথের বাঁ দিকে মাঠের মধ্যে একটা পুকুরের পাড়ের আমবাগানের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে।

বিশ্বনাথ আবার প্রশ্ন করিল—কে ? বহুকালের প্রাচীন গাছগুলি বাগানটার নিচের দিকটা ঘন ছায়ায় প্রায় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর একটা নিচু গাছের ডালের আড়ালে মেয়েটির মুখের আধখানা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে, চেনা যাইতেছে না।

বাগানের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা।

বিশ্বনাথ বলিল—দুর্গা !

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানে ?

—এসেছিলাম মাঠের পানে। দেখলাম আপনি যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।

—একবারে দেশ-ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন আপুনি ?

বিশ্বনাথ দুর্গার মুখের দিকে চাহিল। দুর্গার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—দরকার হলেই আসব আবার।

দুর্গা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাসিল। বলিল—একটা পেনাম করে নিই আপনাকে। আপনি তো এখানকার বিপদ-আপদ্ ছাড়া আসবেন না। তার আগে যদি মরেই যাই আমি! সে আজ অনেকদিন পর খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সে প্রণাম করিল খানিকটা সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব রাখিয়া। বিশ্বনাথ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ জানাইয়া বলিল—আমি জাত-টাত মানি না রে! আমার পায়ে হাত দিতে তোর এত ভয় কেন ?

দুর্গা এবার বিশ্বনাথের পায়ে হাত দিল। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া হাসিয়া বলিল—জাত ক্যানে মানেন না ঠাকুর মশায় ? এখানে এক নজরবন্দী বাবু ছিলেন—তিনিও মানতেন না। বলতেন—আমার খাবার জলটা না-হয় তুমিই এনে দিয়ো দুগ্গা!

বিশ্বনাথও হাসিল, বলিল—আমার তেষ্টা এখন পায় নি দুর্গা। না-হলে তোকেই বলতাম —আমি এইখানে দাঁড়াই—তুই এক গেলাস জল এনে দে আমায়!

দুর্গা আবার খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে না হয় আমাকে নিয়ে চলেন আপনার সঙ্গে। আপনার ঝিয়ের কাজ করব। ঘরদোর পরিষ্কার করব, আপনার সেবা করব।

বিশ্বনাথ বলিল—আমার যে ঘরদোর নেই। এখানকার ঘরই পড়ে থাকল। তার চেয়ে এখানেই থাক্ তুই। আবার যখন আসব—তোর কাছে জল চেয়ে খেয়ে যাব।

বিশ্বনাথ চলিয়া গেল; দুর্গা একটু বিষণ্ণ হাসি মুখে মাখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবু চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

বিশ্বনাথ চলিয়া যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই যে বসিয়াছিল—এখনও সেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ঠাকুর মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ চলিয়া গেল। তাহার মনে হইতেছে—সে একা। এ বিশ্ব-সংসারে সে একা! তাহার বিলু, তাহার খোকা যেদিন গিয়াছিল—সেদিন যখন তাহার বিশ্বসংসার শূন্য মনে হইয়াছিল, সেদিন গভীর রাত্রে আসিয়াছিলেন ঠাকুর মহাশয়। যতীনবাবু রাজবন্দী ছিল, অনেক দিন আগেই চলিয়া গিয়াছে। তাহার অভাবেও সে বেদনা অনুভব করিয়াছিল; কিন্তু তখন নিজেকে অসহায় বলে মনে হয় নাই। বিশ্বনাথ

কয়েক দিন পরই আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সে সত্যই একা। আজ সে একান্তভাবে সহায়হীন—আপনার জন কেহ পাশে দাঁড়াইতে নাই, বিপদে ভরসা দিতে কেহ নাই, সান্ত্বনার কথা বলে, এমন কেহ নাই। অথচ এ কি বোঝা তাহার ঘাড়ে আজ চাপিয়াছে! এ বোঝা যে নামিতে চায় না! চোখে তাহার জল আসিল। চারিদিক নির্জন,—দেবু চোখের জল সংবরণ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহার গাল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

এ বোঝা যেন নামিবার নয়। শুধু তাই নয়—বোঝা যেন দিন দিন বাড়িতেছে! বোঝা আজ পাহাড়ের মত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। একখানা গ্রাম হইতে পাঁচখানা গ্রামের দুঃখের বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। খাজনা-বৃদ্ধির ধর্মঘট হইতে—শেখপাড়া কুসুমপুরের সঙ্গে বিরোধ, তারপর এই সর্বনাশা বন্যা, বন্যার পর কাল ম্যালেরিয়া—গো-মড়ক। পঞ্চগ্রামের অভাব-অনটন-রোগ-শোক আজ পাহাড়ের সমান হইয়া উঠিয়াছে। সে একা কি করিবে? কি করিতে পারে?

—জামাই-পণ্ডিত! তুমি কাঁদছ?

দেবু মুখ ফিরাইয়া দেখিল—দুর্গা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—ছোট-ঠাকুর মাশায় চলে গেলেন—তাতেই কাঁদছ! দুর্গা আঁচলের খুঁটে আপনার চোখ মুছিল। তারপর আবার বলিল—তা তুমি যদি যেতে না বলতে—তবে তো তিনি যেতেন না।

চাদরের খুঁটে চোখ-মুখ মুছিয়া দেবু বলিল—আমি তাকে যেতে বলেছি?

দুর্গা বলিল—আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম—তোমরা যখন কথা বলছিলে, সব শুনেছি আমি। লোকে আজ চাল নিতে আসে নাই। কাল আসত। কাল না আসত, পরশু আসত। জামাই, পেটের লেগে মানুষ কি না করে বল!...ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—জান তো, আমার দাদা ঘোষালের টাকা দিব্যি হাত পেতে নেয়।

দেবু নীরবে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা আবার বলিল ছোট্-ঠাকুর মাশায় পৈতা ফেলে দিয়েছে, জাত মানে না, ধম্ম মানে না বলছ, কিন্তু দ্বারিক চৌধুরী মাশায়ের খবর শুনেছ?

—কি? চৌধুরী মশায়ের কি হল? দেবু চমকিয়া উঠিল। দ্বারিক চৌধুরী কিছুদিন হইতে অসুখে পড়িয়া আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদায়ের দিন পর্যন্ত সে আসিতে পারে নাই। বৃদ্ধের অবশ্য বয়স হইয়াছে। তবুও তাহার মৃত্যু-সংবাদ দেবুর পক্ষে একটা বড় আঘাত হইবে। বৃদ্ধ মানুষ বড় ভাল। দেবুকে অত্যন্ত স্নেহ করে।

দুর্গা বলিল—চৌধুরী মাশায় ঠাকুর বিক্রি করছে।

—ঠাকুর বিক্রি করছে!

—হ্যাঁ। ঠাকুরের সেবা আর চালাতে পারছে না। তার ওপরে বানে আর কিছু রাখে নাই। চৌধুরী মাশায়কে পাল.বলেছে—ঠাকুর আমাকে দাও, আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা

দোব। পাল নিজের বাড়ীতে সেই ঠাকুর পিতিষ্ঠে করবে।

—শ্রীহরি ?

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া একটু হাসিল।

দেবু আবার বলিল—চৌধুরী ঠাকুর বিক্রি করছেন ?

—হ্যাঁ, বিক্রি করছেন। কথাটা এখন চাপা আছে। এখন হাজার হোক্ মানী লোক বটে তো চৌধুরী মাশায়। পালের হাতে ধরে বলেছে—এ কথা যেন কেউ না জানে পাল—অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন বলো, অন্য কোন ঠাঁই থেকে এনেছ। পাল কাউকে বলে নাই।

—বলতে যদি বারণই করেছে—শ্রীহরিও যদি বলে নাই কাউকে, তবে তুই জানলি কি করে ? দেবু কথাটা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তর্কের কূটযুক্তিতে সে দুর্গার কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল। কথার শেষে সেই কথাই সে বলিল—ও তুই কার কাছে বাজে কথা শুনেছিস !

হাসিয়া দুর্গা বলিল—কি আর তোমাকে বলব জামাই-পণ্ডিত, বল !

—কেন ?

—আমি বাজে কথা শুনি না। দুর্গা হাসিল।—আমার খবর পাকা খবর। মনে নাই ?

—কি ?

—নজরবন্দীর বাড়ীতে রেতে জমাদার এসেছিল—তোমাদের মিটিংয়ের খবর পেয়ে, সে খবর আমি আগে পেয়েছিলাম।

দেবুর মনে পড়িল। সেদিন দুর্গা খবরটা সময়মত না দিলে সত্যই অনিষ্ট হইত। অন্ততঃ ডেটিন্যু যতীনবাবুর জেল হইয়া যাইত।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—বিলু-দিদির বুন হয়েও আমি তোমার মন পেলাম না, আর লোকে সাধ্যি-সাধনা করে আমার মন পেল না।

দেবুর মুখে-চোখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল ; দুর্গার রসিকতা—বিশেষ করিয়া আজ মনের এই অবস্থায়—তাহার একেবারেই ভাল লাগিল না ; সে বলিল—থাম্ দুর্গা। ঠাট্টা-তামাশার কথাও নয় এটা, সময়ও নয়। বল তুই কার কাছে শুনলি ?

কয়েক মুহূর্তের জন্য দুর্গা মুখ ফিরাইয়া লইল। তার পরই সে আবার তাহার স্বাভাবিক হাসিমুখে বলিল—নিজের লজ্জার কথা আর কি করে বলি বল ? চৌধুরী মাশায়ের বড় বেটা আমাকে বলেছে। সে কিছুদিন থেকে আমার বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরছে। আমি পরশু ঠাট্টা করেই বলেছিলাম—চৌধুরী-মাশায়, মালা-বদল করতে আমি সোনার হার নোব। বললে—তাই দোব আমি। বাবা ছিরু পালকে ঠাকুর বেচেছে—পাঁচশো টাকা দেবে। তোকে আমি হারই গড়িয়ে দোব।

দেবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা উঠিয়া পড়িল। বলিল—আমি এসে রান্না করব দুর্গা।

* * *

—কোথায়—? প্রশ্নটা করিতে গিয়া দুর্গা চুপ করিয়া গেল। কোথায় যাইতেছে জামাই-পণ্ডিত—সে বিষয়ে অস্পষ্টতার তো অবকাশ নাই। বারণ করিলেও সে শুনিবে না।

—আসছি। বেশী দেরি করব না।

দেবু হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

শিবপুর ও কালীপুরের মধ্যে ব্যবধান একটি দীঘি।

প্রকাণ্ড বড় দীঘি। এক সময়ে ওই চৌধুরীরাই কাটাইয়াছিল। দীঘিটা মজিয়া গিয়াছে। দীঘিটার পাড়েই চৌধুরীদের বাড়ী। এক সময়ে চৌধুরীদের বাঁধানো ঘাট ছিল, ঐ ঘাটে চৌধুরীদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার স্নানযাত্রা পর্ব অনুষ্ঠিত হইত। ঘাটটির নামই 'জনার্দনের ঘাট'। ঘাটটি এখন ভাঙিয়া গিয়াছে, দীঘিটা মজিয়া আসিয়াছে, পানায় সারা বৎসর ভরিয়া থাকে, তবুও ওইখানেই স্নান-যাত্রা পর্বের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান ঠিক বলা চলে কি না, দেবু জানে না। দেবুর বাল্যকালে চৌধুরীদের ভাঙা হাটে ফাটল-ধরা বাঁধা-ঘাটে স্নানযাত্রার যে অনুষ্ঠান সে দেখিয়াছে, তাহার তুলনায় এখন যাহা হয়—তাহাকে বলিতে হয় অনুষ্ঠানের অভিনয়, কোনমতে নিয়মরক্ষা।

মজা দীঘিটাতে যে জল থাকিত, তাহাতেও কার্তিক মাসের অনাবৃষ্টিতে অনেক উপকার করিত। অনেকটা জমিতে সেচ পাইত। এবার আবার ময়ূরাক্ষীর বন্যায় দীঘিটার একটা মোহনা ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই এই আশ্বিন মাসেই দীঘিটা জলহীন হইয়া পড়িয়া আছে। দীঘির ভাঙা ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দীঘিটার পরই চৌধুরীদের আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা খিড়কি। খিড়কির ছোট পুকুরটার ওপরেই ছিল চৌধুরীদের সেকালের পাকাবাড়ী। এখনও ছোট পাতলা ইটের স্তূপ পড়িয়া আছে। পাকা বাড়ী-ঘরের আর এখন কিছুই অবশিষ্ট নাই, বহু কষ্টে কেবল চৌধুরী রথের ঘরের ফাট-ধরা পাকা দেওয়াল কয়খানি খাড়া রাখিয়াছিল; ছাদ গেলে খড়ের চাল করিয়াছিল; এবার বন্যায় সেখানাও পড়িয়া গিয়াছে। কাঠের রথখানাও ভাঙিয়াছে। সর্বাঙ্গে কাদামাখা রথখানা কাত হইয়া পড়িয়া আছে একটা গাছের গুঁড়ির উপর।

ভগ্নস্তূপ পার হইয়া দেবু চৌধুরীর বর্তমান মাটির বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের ঘরখানার সামনের বারান্দাটার চাল পচিয়া খসিয়া গিয়াছে। বারান্দার উপরে পাতা তক্ত-পোশটা জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া, ফুলিয়া-ফাঁপিয়া-ফাটিয়া পড়িয়া আছে—জরাজীর্ণ শোথরোগগ্রস্ত বৃদ্ধের মত।

বাড়ীর ভিতর-মহলে বাহিরের পাঁচিল ভাঙিয়া গিয়াছে—সেখানে তালপাতার বেড়া দেওয়া হইয়াছে। বেড়ার ফাঁক দিয়াই দেখা যাইতেছে, একদিকে একখানা ঘর ভাঙিয়া একটা মাটির স্তূপ হইয়া রহিয়াছে; চালের কাঠগুলা এখনও ভাঙিয়া পড়িয়া আছে অতিকায় জানোয়ারের কঙ্কালের মত।

অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ দেবুর কণ্ঠনালী দিয়া আওয়াজ বাহির হইল না, তাহার পা উঠিল না; নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। চৌধুরীর বাড়ীর এ দুরবস্থা সে কল্পনা করিতে পারে না। চৌধুরীর বাড়ী অনেক দিন ভাঙিয়াছে; পাকা ইমারত ইটের পাঁজায় পরিণত হইয়াছে, জমিদারী গিয়াছে, পুকুর গিয়াছে, যে পুকুর আছে, তাও মজিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবুও চৌধুরীর মাটির কোঠা—মাটির বাড়ীখানার শ্রী ও পারিপাট্য ছিল। চৌধুরীর জমিও কিছু আছে; বন্যার পরে যখন সাহায্য-সমিতির পত্তন হয়, তখনও চৌধুরী নগদ একটি টাকা দিয়াছে। দেবু অনেকদিনই এদিকে আসে নাই; সুতরাং অবস্থার এমন বিপর্যয় দেখিয়া সে প্রায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার উপর চৌধুরীর অসুখ। সে ক্ষুব্ধচিত্তে কঠোর কথা বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল। দেবু একবার ভাবিল—ফিরিয়া যাই! চৌধুরী লজ্জা পাইবে, মর্মান্তিক বেদনা পাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ডাকিল—চৌধুরী মশায়? হরেকেষ্ট?

কেউ উত্তর দিল না, কিন্তু বাড়ীর ভিতর সাড়া জাগিয়াছে বুঝা গেল। মেয়েরা ফিস্ ফিস্ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিতেছে। চৌধুরী-বাড়ী আজ সাধারণ চাষী গৃহস্থের বাড়ী ছাড়া কিছু নয়—তবুও পর্দার আভিজাত্য এখনও পুরা বজায় আছে।

দেবু আবার ডাকিল—হরেকেষ্ট বাড়ী আছ?

হরেকেষ্ট চৌধুরীর বড় ছেলে। সে এবার বাহির হইয়া আসিল; সেই মুহূর্তেই চৌধুরীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের রেশ ভাসিয়া আসিল—আঃ! কে ডাকছেন দেখ না হে!

দেবু বলিল—চৌধুরী মশায়কে দেখতে এসেছি।

হরেকেষ্ট নির্বোধ, গাঁজাখোর; সে তাহার বড় বড় দাঁতগুলি বাহির করিয়া আপ্যায়িতের হাসি হাসিয়া বলিল—দেখবেন আর কি? বাবার আমার শেষ অবস্থা, কবরেজ বলেছে—বড় জোর পাঁচ-সাত দিন।

দেবু বলিল—চল, একবার দেখব।

হরেকেষ্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিল—এস! এস! সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের দিকে উদ্দেশ করিয়া হাঁকিল—সরে যাও সব একবার। পণ্ডিত যাচ্ছে। দেবু পণ্ডিত।

কুড়ি-পঁচিশ দিন পূর্বে চৌধুরী অসুস্থ অবস্থাতেও গাড়ী করিয়া সাহায্য-সমিতির আসরে গিয়াছিল; এই কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যেই চৌধুরী যেন আর এক মানুষে পরিণত হইয়াছে—মানুষ বলিয়া আর চেনাই যায় না। চামড়ায় ঢাকা হাড়ের মালা একখানি পড়িয়া আছে যেন বিছানার উপর। চোখ কোটরগত, নাকটা খাঁড়ার মত প্রকট, হনু দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়া চৌধুরীর মূর্তিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

চৌধুরী এই অবস্থাতেও হাসিয়া বলিল—এস, বস।·· শীর্ণ হাতখানি দিয়া চৌধুরী অনতি-দূরে পাতা একখানি মাদুর দেখাইয়া দিল। ইহারই মধ্যে চৌধুরী এই ব্যবস্থাটুকু করাইয়া রাখিয়াছে।

দেবু বসিল তাহার বিছানায়। বলিল—এমন কঠিন অসুখ করেছে আপনার? কই, কিছুই তো শুনি নি চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী ম্লান হাসি হাসিল। বলিল—ফকিরে যায়-আসে, লোকের নজরে পড়বার কথা নয় পণ্ডিত। রাজা-উজীর যায়—লোক-লস্কর হাঁক-ডাক, লোকে পথে দাঁড়িয়ে দেখে। বুড়োর যাওয়াও ফকিরের যাওয়া।

দেবু চুপ করিয়া রহিল; তাহার অনুশোচনা হইল—লজ্জা হইল যে, সে এতদিনের মধ্যে কোন খোঁজখবর করে নাই!

চৌধুরী বলিল—বাবা, তুমি ওই মাদুরটায় বস। আমার গায়ে বিছানায় বড় গন্ধ হয়েছে।

চৌধুরীর শীর্ণ হাতখানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া দেবু বলিল—না, বেশ আছি।

চৌধুরী বলিল—তোমাকে আশীর্বাদ করি—তোমার মঙ্গল হোক; তোমার থেকে দেশের উপকার হোক—মঙ্গল হোক।

দেবু প্রশ্ন করিল—কে চিকিৎসা করছে?

—চিকিৎসা? চৌধুরী হাসিল।—চিকিৎসা করাই নি। নিজেই বুঝতে পারছি—নাড়ী তো একটু-আধটু দেখতে জানি, আর খুব বেশী দিন নয়। একদিন মেয়েরা জিদ্ করে কবরেজ ডেকেছিল। ওষুধও দিয়ে গিয়েছে, তবে ওষুধ আমি খাই না। আর দিন নাই। কি হবে মিছামিছি পয়সা খরচ করে? একটু জল দাও তো বাবা। ওই যে। হ্যাঁ।

সযত্নে জল খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দেবু বলিল—না, না। ওষুধ না খাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

—পয়সা নাই পণ্ডিত।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

চৌধুরী বলিল—অনেক দিন থেকেই ভেতর শূন্য হয়েছিল। এবার বন্যাতে সব শেষ করে দিলে। ধান যে কটা ছিল ভেসে গিয়েছে; কদিন আগে দুটো বলদের একটা মরেছে, একটা বেঁচেছে; কিন্তু সেও মরারই সামিল। বড় ছেলেটাকে তো জান—গাঁজাখোর—নষ্টচরিত্র। ছোটগুলো খেতে পায় না। কি করব!

দেবু বলিল—কাল ডাক্তার নিয়ে আসব।

—না।

—না নয়। ডাক্তারকে না চান, কবরেজ নিয়ে আসব আমি।

—না। চৌধুরী এবার বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, পণ্ডিত না। বাঁচতে আমি আর চাই না। একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল—ঠাকুর মশায় কাশী গেলেন—বিছানায় শুয়েই বৃত্তান্ত শুনলাম। ডুলি করে একবার শেষ দর্শন করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু লজ্জাতে তাও পারলাম না। পণ্ডিত, আমি কি করেছি জান?

দেবু চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিল।

চৌধুরীর মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল—আমি আমাদের লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরকে

বিক্রি করেছি। শ্রীহরি ঘোষ কিনলেন।

ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ হইয়া গেল। কথাটি বলিয়া চৌধুরী বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দেবুও কোন কথা বলিতে পারিল না।

বহুক্ষণ পরে চৌধুরী বলিল—লক্ষ্মী না থাকলে নারায়ণও থাকেন না, পণ্ডিত। ঠাকুরও দেখলাম—সম্পদের ঠাকুর। গরীবের ঘরে উনি থাকেন না। আমি স্বপ্ন দেখলাম পণ্ডিত। ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে তাই বললেন।

সবিস্ময়ে দেবু প্রশ্নের আকারে কথাটার শুধু পুনরুক্তি করিল—স্বপ্নে বললেন?

—হ্যাঁ। বহুক্ষণ ধরিয়া বার বার থামিয়া—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চৌধুরী বলিয়া গেল—একদিন ঘরে কিছুই ছিল না। আতপ চালও একমুঠো ছিল না যে নৈবেদ্য হয়। ভোগ তো দূরের কথা। নিরুপায় হয়ে বড় ছেলেটাকে পাঠালাম—মহাগ্রামে ঠাকুর মশায়ের কাছে। ওটা গাঁজা খায়—মধ্যে মধ্যে ঘোষের দরবারে আজকাল যায় তামাক খেতে, হয়তো ঘোষের ওখানে নেশাও পায়। ও ঠাকুর মশায়ের বাড়ী না গিয়ে ঘোষের বাড়ী গিয়েছিল। ঘোষ আতপ চাল দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—তোমার বাবাকে বলো—ঠাকুরটি আমাকে দেন। আমার ইচ্ছে ঠাকুর প্রতিষ্ঠে করি। না-হয় পাঁচশো টাকা দক্ষিণে আমি দোব।··· হতভাগা আমাকে এসে সেই কথা বললে। বলব কি দেবু, মনে মনে বার বার ঠাকুরকে অন্তর ফাটিয়ে বললাম,—ঠাকুর, তুমি আমাকে সম্পদ্ দাও, তোমার সেবা করি সাধ মিটিয়ে; এ অপমান থেকে আমাকে বাঁচাও। নইলে বল আমি কি করব? রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—শ্রীহরির ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠে হচ্ছে। আমি টাকা নিচ্ছি শ্রীহরির কাছে। প্রথম দিন মনে হল—চিন্তার জন্যে এমন স্বপ্ন দেখেছি; বলব কি পণ্ডিত, দ্বিতীয় দিন দেখলাম—আমাদের পুরুত মশায় বলছেন—আপনি শ্রীহরির ঘরেই ঠাকুরকে দিয়ে আসুন। ঠাকুর রেখে আপনি কি করবেন?···পরের দিন আবার দেখলাম—আমি নিজে শ্রীহরির হাতে ঠাকুরকে তুলে দিচ্ছি। বুঝলাম; ভেবেও দেখলাম—আমার মৃত্যুর পর ছেলেরা হয়তো নিত্যপূজাই তুলে দেবে। চৌধুরী হাসিয়া বলিল, আর রাখবেই বা কি করে? নিজেদেরই যে অন্ন জুটবে না! যে জমিটুকু আছে, তাও বন্ধক ছিল ফেলারাম চৌধুরীর কাছে। একশো টাকা—সুদে আসলে আড়াই শো হয়েছে। শ্রীহরিকে ডেকে পাঁচশো টাকা নিলাম পণ্ডিত। জমিটা ছাড়িয়ে নিলাম। কি করব, বল!

দেবু স্তম্ভিত, নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আচ্ছা, আজ আমি উঠি।

—উঠবে?

—হ্যাঁ। আজ যাই, আবার আসব।

—এস।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলিয়া চৌধুরী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া নিথর হইয়া সে-ও চোখ বুজিল।

দেবু আসিয়াছিল চৌধুরীর উপর ক্ষোভ লইয়া। অর্থের জন্য দেবতা—বংশের ঠাকুরকে বিক্রয় করিয়াছে শুনিয়া তাহার যে ক্ষোভ হইয়াছিল, সে ক্ষোভ সে দুঃখ ন্যায়রত্নের দেশত্যাগের জন্য ক্ষোভ-দুঃখের চেয়ে বড় কম নয়। তাহার প্রিয়তম বন্ধু, জীবনের একমাত্র ভরসার স্থল বিশু-ভাইকে সে যেমন ত্যাগ করিয়াছে, তেমনি ভাবে চৌধুরীকে পরিত্যাগের বার্তাই সে শুনাইতে আসিয়াছিল। দূর হইতে মনে মনে সংকল্প করিয়া তাহার ক্ষোভ মেটে নাই, তাই সে আসিয়াছিল—চৌধুরীকে সে কথা রূঢ়ভাবে শুনাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু সে ফিরিল নির্বাক বেদনার ভার লইয়া। চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তাহার আর নাই। মনে মনে বার বার সে দোষ দিল—অভিযুক্ত করিল দেবতাকে। এক্ষেত্রে চৌধুরী আর কি করিতে পারিত? স্বপ্নগুলি যদি তাহার মনের ভ্রমও হয়—তবুও সব দিক বিচার করিয়া দেখিয়া মনে হইল, চৌধুরী ঠিকই করিয়াছে। তাহার কর্তব্য সে করিয়াছে। চিরদিন সংসারের শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছে—ভোগ দিয়াছে; আজ নিঃস্ব অবস্থায় সেই দেবতার সেবাভোগ দিতে পারিবে না বলিয়া সে যদি সম্পদশালীর হাতেই দেবতাকে দিয়া থাকে—তবে সে অন্যায় করে নাই, তাহার কর্তব্যই করিয়াছে; কিন্তু দেবতা তাহার কি করিল? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—ঠাকুর মহাশয়ের গল্প। দুঃখ তাঁহার পরীক্ষা।

না—না। সে আপন মনেই বলিল—না। এই বিশ্ব-জোড়া দুঃখ তাঁহার পরীক্ষা বলিয়া আজ আর কিছুতেই সে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক দিয়া গোটা দেশটাকে ছন্নছাড়া করিয়া পরীক্ষা!

পথ দিয়া আসিতে আসিতে শুনিল—পাশেই শিবপুরের বাউড়ীপাড়ায় কয়েকটি নারী-কণ্ঠের বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার স্বর উঠিতেছে।

বাঁ দিকে আউশের মাঠ খাঁ-খাঁ করিতেছে। ধান নাই। সামনে আসিতেছে কার্তিক মাস, রবিফসল চাষের সময়, লোকের শক্তি-সামর্থ্য নাই, গরু নাই, সে চাষও হয়তো অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহারও আগে পূজা—দুর্গাপূজা। পূজাও বোধ হয় এবার হইবে না। ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীর পূজা করিবে—তাঁহারই টোলের এক ছাত্র। তিনি তাহাকেই ভার দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুর মশায় না থাকিলে—সে কি পূজা হইবে? মহাগ্রামের দত্তদের পূজা গতবারেও তাহারা ভিক্ষা করিয়া করিয়াছিল। এবার আর হইবেই না। লোকের ঘরে নূতন কাপড়-চোপড়, ছেলেদের জামা-পোশাক—হইবে না।

সব শেষ হইয়া গেল। সব শেষ।

ঠাকুর মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন, চৌধুরী মৃত্যু-শয্যায়; মাতব্বর বলিতে পঞ্চগ্রামে আর কেহ রহিল না। ছেলেবেলায় প্রাচীন কালের লোকেদের কাছে শুনিয়াছিল—'তে-মুণ্ডে'র পরামর্শ লইতে হয়; 'তেমুণ্ড' অর্থাৎ তিনটা মুণ্ড যাহার, তাহার কাছে। প্রথমে তাহার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। তার পরই শুনিয়াছিল—'তেমুণ্ড' হইল অতি প্রাচীন বৃদ্ধ।

উপু হইয়া বসিয়া থাকে, তুই পাশে থাকে হাঁটু তুইটা ; মাঝখানে টাক-পড়া চক্‌চকে মাথাটি —দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় তিনমুণ্ডবিশিষ্ট মানুষ। তে-মুণ্ড দূরে থাক্‌, আজ পরামর্শ দিবার কোন প্রবীণ লোকই রহিল না।

অন্নহীন দেশ, শক্তিহীন রোগজর্জর মানুষ, উপদেষ্টা-অভিভাবকহীন সমাজ। দেবতারা পর্যন্ত নির্দয় হইয়া সেবা-ভোগের জন্য ধনীদের ঘরে চলিয়াছেন। এদেশের আর কি রক্ষা আছে!

কোন আশা নাই, সব শেষ।

গভীর হতাশায় তুঃখে দেবু একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। ভিক্ষা করিলেও এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোককে বাঁচানো কি তাহার সাধ্য! পরক্ষণেই মনে হইল—একজন পারিত, বিশু-ভাই হয়তো পারিত। সে-ই তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।···

তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

কিসের ঢোল পড়িতেছে? ও কিসের ঢোল? ঢোল পড়ে সাধারণত জমি-নিলামের ঘোষণায়—আজকাল অবশ্য ইউনিয়ন বোর্ডের হাকিমদের হুকুমজারি ঢোল সহযোগে হইয়া থাকে। ট্যাক্সের জন্য অস্থাবর ক্রোক, ট্যাক্স আদায়ের শেষ তারিখ, ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রভৃতির ঘোষণা—হরেক রকমের হুকুম। এ ঢোল কিসের?···দেবু দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

চিরপরিচিত ভূপাল একজন মুচীকে লইয়া ঢোল সহরত করিয়া চলিয়াছে।

—কিসের ঢোল, ভূপাল?

—আজ্ঞে, ট্যাক্স।

—ট্যাক্স? এই সময় ট্যাক্স?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর খাজনাও বটে।

দেবুর সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল। এই তুঃসময়—তবু ট্যাক্স চাই, খাজনা চাই! কিন্তু সে কথা ভূপালকে বলিয়া লাভ নাই। সে দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে ভূপালদের পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

তুঃখে নয়—এবার ক্ষোভে ক্রোধে তাহার ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

কোন উপায়ই কি নাই? বাঁচিবার কি কোন উপায়ই নাই?

চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীহরির সেরেস্তা পড়িয়াছে। গোমস্তা দাসজী বসিয়া আছে। কালু শেখ কাঠের ধুনি হইতে একটা বিড়ি ধরাইতেছে। ভবেশ ও হরিশ বসিয়া আছে, তাহাদের হাতে হুঁকা। মহাজন ফেলারাম ও শ্রীহরি বকুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে—কোন গোপন কথা, কাহারও সর্বনাশের পরামর্শ চলিতেছে বোধ হয়।

গতিবেগ আরও দ্রুততর করিল দেবু।

বাড়ীর দাওয়ার উপর গৌর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ওই একটি ছেলে। বড় ভাল

ছেলে। একেবারে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। একটা লোক তাহার তক্তাপোশের উপর শুইয়া ঘুমাইতেছে। লোকটার পরনে হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে সস্তাদরের কামিজ ও কোট্; পায়ে ছেঁড়া মোজা, জুতাজোড়াটা নূতন হইলেও দেখিলে বুঝা যায় কমদামী। হ্যাটও আছে, হ্যাটটা মুখের উপর চাপা দিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতেছে, মুখ দেখা যায় না। পাশে টিনের একটা স্যুট্‌কেস।

দেবু গৌরকে প্রশ্ন করিল—কে, গৌর?

গৌর বলিল—তা তো জানি না। আমি এখুনি এলাম; দেখলাম, এমনি ভাবেই শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

দেবু সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে আবার লোকটার দিকে চাহিল।

গৌর ডাকিল—দেবু-দা!

—কি?

—ভিক্ষের বাক্সগুলো নিয়ে এসেছি। চাবি খুলে পয়সাগুলো নেন্। আরও পাঁচ-ছটা বাক্স দিতে হবে। আমাদের আরও পাঁচ-ছজন ছেলে কাজ করবে।

দেবু মনে অদ্ভুত একটা সান্ত্বনা অনুভব করিল। তালাবন্ধ ছোট ছোট টিনের বাক্স লইয়া গৌরের দল জংশন-স্টেশনে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করে। সেই বাক্সগুলি পূর্ণ করিয়া সে পয়সা লইয়া আসিয়াছে। সংবাদ আনিয়াছে—তাহার দলে আরও ছেলে বাড়িয়াছে; আরও ভিক্ষার বাক্স চাই। পাত্রে ভিক্ষা ধরিতেছে না। আরও পাত্র চাই।

সে সস্নেহে গৌরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল।

গৌর বলিল—আজ একবার আমাদের বাড়ী যাবেন? সন্ধ্যের সময়?

—কেন? দরকার আছে কিছু? কাকা ডেকেছেন নাকি?

—না, স্বর্ন এবার পরীক্ষা দেবে কিনা। তাই দরখাস্ত লিখে দেবেন। আর স্বর্ন তার পড়ার কতকগুলা জায়গা জেনে নেবে।

—আচ্ছা, যাব। গভীর স্নেহের সঙ্গে দেবু সম্মতি জানাইল। গৌর আর স্বর্ণ—ছেলেটি আর মেয়েটির কথা ভাবিয়া পরম সান্ত্বনা অনুভব করিল দেবু। আর ইহারা বড় হইলে এ অঞ্চলের অবস্থা আর এক রকম হইয়া যাইবে।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল দুর্গা, সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—যাক্, ফিরতে পারলে! খাবে-দাবে কখন্?

তাহার শাসনে দেবু না হাসিয়া পারিল না; বলিল—এই যে! চল।

দুর্গা একটু হাসিয়া বলিল—লাও, আবার কুটুম এসেছে!

—কুটুম?

—ওই যে! দুর্গা ঘুমন্ত লোকটিকে দেখাইয়া দিল।

দেবুর কথাটা নূতন করিয়া মনে হইল। সবিস্ময়ে সে বলিল—তাই বটে! ও কে রে?

—কর্মকার।

—কর্মকার ?

—অনিরুদ্ধ গো! চাকরি করে সায়েব সেজে ফিরে এসেছে। মরণ আর কি!

—অনিরুদ্ধ গো? অনি-ভাই?

—হ্যাঁ।

কথাবার্তার সাড়াতেই, বিশেষ করিয়া বার বার অনিরুদ্ধ শব্দটার উচ্চারণে অনিরুদ্ধ জাগিয়া উঠিল। প্রথমে মুখের টুপিটা সরাইয়া দেবুর দিকে চাহিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—দেবু-ভাই! রাম-রাম।

তেইশ

দেবু অনিরুদ্ধকে বলিল—এতদিন কোথায় ছিলে অনি-ভাই?

উত্তরে অনিরুদ্ধ দেবুকে বলিল—কেয়া, পদ্ম ঘর ছোড়কে চলা গেয়া দেবু-ভাই?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথা হেঁট করিল। কোন কথা সে বলিতে পারিল না, পদ্মকে সে রক্ষা করিতে পারে নাই। গৃহত্যাগিনী কন্যার পিতা, পত্নীর স্বামী, ভগ্নীর ভাই সেই গৃহত্যাগের প্রসঙ্গ উঠিলে যেভাবে মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকে, তেমনি ভাবেই সে চুপ করিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ হাসিল; বলিল—সরম কাহে? তুমারা কেয়া কসুর ভাই?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ঘাড় নাড়িয়া—যেন মনে মনে অনেক বিবেচনা করিয়া বলিল—উস্‌কা ভি কুছ কসুর নেহি! কুছ্ না! যানে দেও।

শেষে আপনার বুকে হাত দিয়া নিজেকে দেখাইয়া বলিল—কসুর হামারা; হ্যাঁ, হামারা কসুর।

দেবু এতক্ষণে বলিল—একখানা চিঠিও যদি দিতে অনি-ভাই!

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—আর কোন কথা বলিল না।

দুর্গা দেবুকে তাগিদ দিল—জামাই, বেলা দুপুর যে গড়িয়ে গেল। রান্না কর!…তারপর অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল—মিতেও তো এইখানে খাবে! না কি হে?

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, এইখানে খাবে বৈকি। তুই কথাবার্তা বলতে শিখলি না দুগ্‌গা!

দুর্গা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল—ও যে আমার মিতে! ওকে আবার কুটুম্বিতে কিসের? কি হে মিতে, বল না?

অনিরুদ্ধ অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল—সচ্ বোলা হ্যায় মিতেনী!

তাহার এই হাসিতে দেবু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। বলিল—তুমি মুখহাত ধোও অনি-ভাই। তেল-গামছা নাও, চান কর। আমি রান্না করে ফেলি।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া সে রান্নার উদ্যোগ আরম্ভ করিল।…অনিরুদ্ধ! হতভাগ্য

অনিরুদ্ধ! দীর্ঘকাল পরে ফিরিল—কিন্তু পদ্ম আজ নাই। থাকিলে কি সুখের কথাই না হইত! আজ অনিরুদ্ধের হাতে তাহাকে সে সমর্পণ করিত মেয়ের বাপের মত—বোনের বড় ভাইয়ের মত। হতভাগিনী পদ্ম! সংসারের চোরাবালিতে কোথায় যে তলাইয়া গেল কে জানে? তাহার কঙ্কালের একখানা টুকরাও আর মিলিবে না তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য।

অনিরুদ্ধ বাহিরে বক্-বক্ করিতেছে। অনর্গল অশুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলিয়া চলিয়াছে। বাংলা যেন জানেই না। যেন আর-এক দেশের মানুষ হইয়া গিয়াছে সে।

খাইতে বসিয়া অনিরুদ্ধ তাহার নিজের কথা বলিল—এতক্ষণে সে বাংলায় কথা বলিল। ...জেলখানাতেই মনে মনে বড় আক্ষেপ হয়েছিল দেবু-ভাই। নিজের ওপর ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবতাম, গাঁয়ে মুখ দেখাব কি করে? আর গাঁয়ে গিয়ে খাবই বা কি? কিছুদিন থাকতে থাকতে আলাপ হল একজন হিন্দুস্থানী মিস্ত্রীর সঙ্গে। লোকটার জেল হয়েছিল মারামারি করে। কারখানার আর একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে মারামারি করেছিল—একজন মেয়েলোকের জন্যে। সে-ই আমাকে বললে। আমার খালাসের একদিন আগে তার খালাসের দিন। কলকাতায় তার জেল হয়েছিল—খালাস হবে সে সেইখানে। ক'দিন আগেই এ জেল থেকে চলে গেল। আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলে গেল—তুমি চলে এসো আমার কাছে। আমি তোমার কাজ ঠিক করে দোব। জেল থেকে খালাস পেয়ে বের হলাম। ভাবলাম বাড়ী যাব না, জংশন থেকে খবর দিয়ে পদ্মকে আনিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব। তা—। অনিরুদ্ধ হাসিল; কপালে হাত দিয়া বলিল, হামারা নসীব দেবু-ভাই! আমাদের সেই বলে না—"গোপাল যাচ্ছ কোথা? ভূপাল! কপাল? কপাল সঙ্গে!" আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল জংশনের কলের একটা মেয়ের সঙ্গে। দুগ্‌গা জানে, সাবি—সাবিত্রী মেয়েটার নাম। মেয়েটা দেখতে-শুনতে খাসা; আমার সঙ্গে—। অনিরুদ্ধ আবার হাসিল। অনিরুদ্ধের সঙ্গে মেয়েটির আগে হতেই জানাশুনা; জানাশুনার চেয়েও গাঢ়তর পরিচয় ছিল। মেয়েটি ছিল কলের বৃদ্ধ খাজাঞ্চীর অনুগৃহীতা। বৃদ্ধের কাছে টাকা-পয়সা সে যথেষ্ট আদায় করিত, কিন্তু তাহার প্রতি অনুরক্তি বা প্রীতি এতটুকু ছিল না। সে সময়টায় বুড়ার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মেয়েটি সদর শহরে আসিয়া দেহ-ব্যবসায়ের আসরে নামিয়াছিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না আমাকে। নিয়ে গেল তার বাসায়। মদ-টদ খাওয়ালে। আর সেই দিনই এলো সেই বুড়ো খাজাঞ্চী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। মেয়েটা জ্বলে গেল। রাত্রেই আমাকে বললে—চল, আমরা পালাই। দেবু-ভাই, মাতন কাকে বলে তুমি জান না। মাতনে মেতে তাই চলে গেলাম। গিয়ে উঠলাম কলকাতায় মিস্ত্রীর ঠিকানায়। তারপর—।

তারপর অনিরুদ্ধ বলিয়া গেল এতদিনের দীর্ঘ কাহিনী...কলে কাজ ঠিক করিয়া দিল মিস্ত্রী। কামারশালায় মজুরের কাজ। কামারের ছেলে—তাহার উপর বুকে দারিদ্র্যের

জ্বালা, কাজ শিখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। মজুর হইতে কামারের কাজ, কামারের কাজ হইতে ফিটার-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়া সে আজ পুরাদস্তুর একজন ফিটার। বারো আনা হইতে দেড় টাকা—দেড় টাকা হইতে দুই টাকা—দুই হইতে আড়াই—আজ তাহার দৈনিক মজুরি তিন টাকা। তাহার উপর ওভারটাইম। ওভারটাইম ছাড়াও মধ্যে তাহার বাহিরে দুই চারিটা ঠিকার কাজ থাকে।

অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাই, পেট ভরে খেয়েছি—পরেছি—আবার মদ খেয়েছি, ফুর্তি করেছি—করেও আমি ছ'শো পঁচাত্তর টাকা সঙ্গে এনেছি। ভেবেছিলাম—ঘর-দোর মেরামত করব—জমি কিনব। পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তা···অনিরুদ্ধ দুটি হাত-ই উল্টাইয়া দিয়া বলিল—ফুড়ুৎ ধা হয়ে গেল! অনিরুদ্ধ চুপ করিল। দেবুও কোন উত্তর দিল না। এ সবের কি উত্তর সে দিবে?

দুর্গা অদূরে বসিয়া সব শুনিতেছিল। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তারপর, সাবি কেমন আছে?

—ছিল ভালই। তবে—। হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—কদিন হল সাবি কোথা পালিয়েছে!

—পালিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তাতেই বুঝি পরিবারকে মনে পড়ল?

অনিরুদ্ধ দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কাজে-কাজেই, তাই হল বৈকি। দোষ আমার, সে তো আমি স্বীকার করছি। তবে—

দুর্গা বলিল—তবে কি?

—তবে যদি ছিরের ঘরে না যেত, তবে আমার কোন দুঃখুই হত না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তাও যে সে ছিরের ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে—এতেও আমি সুখী।

দেবু বলিল—তাহার একমাত্র অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করিল—তুমি যদি একখানা চিঠিও দিতে, অনি-ভাই?

অনিরুদ্ধ বলিল—বলেছি তো, মাতন কাকে বলে তুমি জান না দেবু-ভাই! আমি মেতে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া—মনে মনে কি ছিল জান? মনে মনে ছিল যে, রোজকার করে হাজার টাকা না নিয়ে আমি ফিরব না। ফিরে তোমাদিগকে সব তাক্ লাগিয়ে দোব।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তা এখন এসে তোমারই তাক লেগে গেল!

—না। অনিরুদ্ধ অস্বীকার করিয়া বলিল—না। এরকম একটা মনে মনে ভেবেই এসেছিলাম। খাবার নাই, পরবার নাই—স্বামী দেশ-ছাড়া, ছেলেপুলে নাই, জোয়ান বয়েস পদ্মর; এ আমি হাজারবার ভেবেছি দুগ্‌গা। তবে সব চেয়ে বেশী দুঃখ—।

—কি?

—না। সে আর বলব না।

—ক্যানে? তোমার আবার লজ্জা হচ্ছে নাকি?

—লজ্জা! দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু-ভাইয়ের ছেলে-পরিবার ছিল না, ওই তাকে খেতে-পরতে দিলে। হারামজাদী এসে ওর পায়ে গড়িয়ে পড়ল না কেন? আজ আমি দেবু-ভাইয়ের কাছে চেয়ে নিয়ে যেতাম। সে যদি না যেতে চাইত, কি দেবু-ভাই যদি দুঃখু পেতো, আমি হাসি-মুখে চলে যেতাম।

দেবু বলিয়া উঠিল—আঃ—আঃ, অনি-ভাই!

সে খাবার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

সমস্ত বাকী দ্বিপ্রহরটাই দেবুর মনে পড়িল—সেদিনকার রাতের কথা। বাহিরের তক্তা-পোশের উপর বসিয়া সে স্থিরদৃষ্টিতে সেই শিউলি গাছটার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার একাগ্র চিন্তায় বাধা দিয়া দুর্গা তাহাকে ডাকিল—জামাই!

—এঁ্যা! আমাকে বলছিস?

দুর্গা হাসিল; বলিল—বেশ যা হোক্। জামাই আর কাকে বলব?

—কি বলছিস?

—উ বেলায় গৌর এসেছিল। আমাকে বলে গিয়েছে, দেবু-দাদাকে একবার মনে করে যেতে বলো আমাদের বাড়ী। কি দরখাস্ত না কি লিখতে হবে। বার বার করে বলে গিয়েছে। তোমাকে বলে নাই?

দেবুর মনে পড়িয়া গেল। স্বর্ণ মাইনর পরীক্ষা দিবে। তাহার দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইবে। স্বর্ণকে একটু পড়াশুনা দেখাইয়া দিতে হইবে। স্বর্ণকেও যদি জীবনের পথ ধরাইয়া দিতে পারে, তবে সে-ও তাহার পক্ষে একটা মহাধর্ম হইবে। বড় চমৎকার মেয়ে। গৌরেরই বোন তো। দেবু আশ্চর্য হইয়া যায়—কোথা হইতে কেমন করিয়া তাহারা এমনটি হইল!

তিনকড়ির বাড়ীতে বেশ একটা জটলা বসিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি উপুড় হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। ভল্লাবাগ্দীদের রামচরণ, তারিণী, বৃন্দাবন, গোবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন বসিয়া তামাক খাইতেছে। সকলেই চুপ করিয়া আছে। ইহাদের নিস্তব্ধতার একটা বিশেষ অর্থ আছে। আস্ফালন, উচ্চহাসি—ইহাদের স্বাভাবিক প্রকাশ। তিনকড়ির চারিত্রিক গঠনও অনেকটা ইহাদেরই মত। তিনকড়িকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের মজলিশ বসিলে, অন্তত সিকি মাইল দূর হইতে সমবেত অট্টহাসির শব্দ শোনা যায়। অথবা শোনা যায় বচসার উচ্চকণ্ঠের আস্ফালন। অথবা শোনা যায় ঈষৎ জড়িত কণ্ঠের সমবেত গান।

নিস্তব্ধ আসর দেখিয়া দেবু শঙ্কিত হইল। কি ব্যাপার তিনু-কাকা?

তিনকড়ি এতক্ষণে মুখ তুলিয়া দেবুকে লক্ষ্য করিল; বলিল—এস বাবা!

দেবু বলিল—এমন করে চুপ্-চাপ্ কেন আজ?

রামভল্লা বলিল—মোড়ল-দাদার ভাল গাইটি আজ মরে গেল প্রণ্ডিত মাশায়।

তিনকড়ি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুধু তাই নয় বাবা। হারামজাদা

ছিদমে ঘোষপাড়াতে কাল রেতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পঞ্চাশবার আমি বলেছিলাম—ওরে হারামজাদা ছিদমে, তোর বয়েস এখন কাঁচা, হাজার হলেও ছেলেমানুষ, যাস নি। তা শুনলে না।

—ঘোষপাড়ায় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে? কই, ঘোষপাড়ায় ডাকাতি হয়েছে বলে কিছু শুনি নাই তো?

—এ ঘোষপাড়া নয়। মৌলিক-ঘোষপাড়া—মুরশিদাবাদের পাঁচহাটির ধারে। কেউ কেউ পাঁচহাটি-ঘোষপাড়াও বলে।

দেবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। পাঁচহাটি সে নিজেই গিয়াছে। সপ্তাহে পাঁচদিন হাট বসে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত হাট। তরিতরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া চাল-দাল, মশলাপত্র, এমন কি গরু-মহিষ পর্যন্ত কেনা-বেচা হয়। মৌলিক-ঘোষপাড়াও সে একবার দেখিয়াছে, বনিয়াদী মৌলিক উপাধিধারী কায়স্থ জমিদারের বাস। প্রকাণ্ড বাড়ী। কায়দা-করণ কত! কিন্তু পাঁচহাটি যে এখান হইতে অন্তত বারো ক্রোশ পথ—চব্বিশ মাইল! এখান হইতে সেখানে ডাকাতি করিতে গিয়াছে! ছিদাম ভল্লা! উনিশ-কুড়ি বছরের লিকলিকে সেই লম্বা ছোঁড়াটা!

সবিস্ময়ে দেবু বলিল—সে যে এখান থেকে বারো-চোদ্দ ক্রোশ পথ!

অত্যন্ত সহজভাবে রাম বলিল—হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি।

—এতদূর ডাকাতি করতে গিয়েছে? ছিদমে? সেই ছোঁড়াটা? কাল বিকেল বেলাতেও যে আমি তাকে দেখেছি! আমার সঙ্গে পথে দেখা হল।

—হ্যাঁ। সন্ধ্যের সময় বেরিয়েছে।

তিনকড়ি বলিল—হারামজাদা ধরা পড়ল,—এরপর গোটা গাঁ নিয়ে টানাটানি করবে। আমাকেও বাদ দেবে না, বাবা-দেবু। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দেবু চমকাইয়া উঠিল। তিনকড়ির মত লোকের মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকার অর্থ এতক্ষণে তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে সংযত হইয়া বলিল—করে, তার উপায় নাই। সে অবশ্যই সহ্য করতে হবে। কিন্তু তাতেই বা ভয় কি! আদালত তো আছে। মিথ্যাকে সত্যি বলে চালাতে গেলে সে চলে না।

তিনকড়ি একটু হাসিল।

রাম হাসিয়া বলিল—পণ্ডিত বাজে কথা বলে নাই তিনু-দাদা। তুমি ভেবো না কিছু। পুলিস হুজ্জোৎ করবে—মেজেস্টারও হয়তো দায়রায় ঠেলবে। কিন্তু দায়রাতে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি দেখো।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার যেন শিহরিয়া উঠিল; নিকটেই কোথায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল কাহার মর্মান্তিক দুঃখে বুকফাটা কান্না! সকলেই চমকিয়া উঠিল।

তিনকড়ি বলিল—কে রে রাম? কে কাঁদছে?

রামের চাঞ্চল্য ইহারই মধ্যে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে; সে বলিল—রতনের বেটাটা গেল

বোধ হয়।

তারিণী বলিল—হ্যাঁ, তাই লাগছে।

হঠাৎ তিনকড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ আক্রোশে বলিয়া উঠিল—মানুষে মানুষ খুন করলে ফাঁসি হয়, কিন্তু রোগকে ধরে ফাঁসি দিক্ দেখি! আয় রাম, দেখি। যা হবার সে তো হবেই—তার লেগে ভেবে কি করব?

সে হন-হন করিয়া সকলের আগেই চলিয়া গেল। দেবু একটু বিস্মিত হইল। তিনু-কাকার এমন বিচলিত অবস্থা সে কখনো দেখে নাই। সকলে চলিয়া গেলে সে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতেছিল রতনের বাড়ী যাইবে কিনা? গেলে যে কাজের জন্য সে আসিয়াছে—সে কাজ আজ আর হইবে না। এদিকে স্বর্ণের পরীক্ষার জন্য অনুমতির আবেদন পাঠাইবার দিনও আর বেশী নাই। রতনের বাড়ী গিয়াই বা কি হইবে? কি করিবে সে? শুধু পুত্র-শোকাতুর মা-বাপের বুকফাটা আর্তনাদ শোনা, তাহাদের মর্মান্তিক আক্ষেপ চোখে দেখা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। নাঃ, আর সে দুঃখ দেখিতে পারিবে না। দুঃখ দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সে এখানে আসিবার পথে আনন্দ-আস্বাদনের প্রত্যাশা লইয়াই আসিয়াছিল। পরে সে অনেক কল্পনা করিয়াছে। বুদ্ধি-দীপ্তিমতী স্বর্ণকে সে কঠিন প্রশ্ন করিবে, স্বর্ণ প্রথম শূন্যদৃষ্টিতে ভাবিতে থাকিবে। হঠাৎ তাহার চোখ দুটি চেতনার চাঞ্চল্যে দীপশিখার মত জ্বলিয়া উঠিবে, মুখে স্মিত হাসি ফুটিবে, ব্যগ্র হইয়া বলিয়া দিবে সে প্রশ্নের উত্তর। আরও কঠিনতর প্রশ্ন করিবে সে—স্বর্ণ সে প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া পাইবে না। তখন তাহার স্তিমিত চোখের প্রদীপে জানার আলোক-শিখা সে জ্বালাইয়া দিবে। বলিবে—শোন, উত্তর শোন। সে উত্তর বলিয়া যাইবে, স্বর্ণের চোখে দীপ্তি ফুটিবে; আর বুদ্ধিমতী মেয়েটির মুখে ফুটিয়া উঠিবে পরিতৃপ্ত কৌতূহলের তৃপ্তি ও শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়। গৌরও হয়তো শুব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিবে। গৌরের বুদ্ধি ধারালো নয়, কিন্তু অফুরন্ত তাহার প্রাণশক্তি। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রাণশক্তির স্ফুরণের স্পর্শ সে পাইবে। সাহায্য-সমিতির জন্য হয়তো ইহারই মধ্যে সে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া বসিয়া আছে। পড়াশুনার অবসরের মধ্যে মৃদু কণ্ঠে বলিবে—দেবু-দা, একটা কথা বলছিলাম কি—।

কল্পনার মধ্যে সে যেন মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছিল। দুঃখ হইতে মুক্তি, হতাশা হইতে মুক্তি—দুর্যোগময়ী অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রির অবসানক্ষণে পূর্বাকাশের ললাট-রেখার প্রান্তে এ যেন শুকতারার উদয়-আশ্বাস! দুঃখ আর সে সহ্য করিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার ঘর! ঘরের কথা মনে করিলে তাহার হাসি পায়। বিলু-খোকনের সঙ্গেই তাহার ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। যেটা আছে, সেইটাতে এবং গাছতলাতে কোন প্রভেদ নাই। পৃথিবীর পথের ধারে গাছতলার অভাব নাই, এটা ছাড়িয়া আর একটার আশ্রয়ে যাইতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু এই কাজগুলা যেন তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। নেশাখোর যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াও নেশা ছাড়িতে পারে না—নেশার সময় আসিলেই যেমন নেশা করিয়া বসে, সেও তেমনি মনে

করে—এই কাজটা শেষ করিয়া আর সে এ সবের মধ্যে থাকিবে না ; এই শেষ। কিন্তু কাজটা শেষ হইতে না হইতে আবার একটা নূতন কাজের মধ্যে আসিয়া মাথা গলাইয়া বসে।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে ভাগ্যবানের চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে—বর্ষার দিগন্তের বিদ্যুৎ ; আলোর আভাস আসে, গর্জনের শব্দ আসিয়া পৌঁছায় না—ভাগ্যবান অন্ধকারের মধ্যেও নিশ্চিন্ত পথ দেখিয়া চলে। কিন্তু ভাগ্যহীনের হাতের আলো নিভিয়া যায় ; তাহার ভাগ্যফলের দিগন্তের বিদ্যুতাভার পরিবর্তে আসে ঝড়ো হাওয়া। দেবু যে আনন্দের প্রদীপখানি মনে মনে জ্বালিয়াছিল—সে আলো তিনকড়িদের দুশ্চিন্তার দীর্ঘনিশ্বাস এবং সন্তান-বিয়োগে রতন বাগ্দীর বুকফাটা আর্তনাদের ঝড়ো হাওয়ায় নিমেষে নিভিয়া গেল।

দাওয়ায় উঠিয়া সে দেখিল—সামনের ঘরে যেখানে গৌর ও স্বর্ণ বসিয়া পড়ে, সেখানে কেহই নাই। শুধু একখানা মাদুর পাতা রহিয়াছে, পিলসুজে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। সে ডাকিল—গৌর !

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সে ডাকিল—গৌর রয়েছ ? গৌর ?

এবার ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল স্বর্ণ।

দেবু বলিল—স্বর্ণ !

স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না।

দেবু বলিল—গৌর কই ? তোমার পরীক্ষার দরখাস্ত লেখবার কথা বলে এসেছিল সে, তোমার কি কি পড়া দেখিয়ে নেবার আছে বলেছিল !

স্বর্ণ এবারও কোন কথা বলিল না। প্রদীপটা স্বর্ণের পিছনে জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখ অবয়বে ঘনায়িত ছায়া পড়িয়াছে ; তবুও দেবুর মনে হইল—স্বর্ণের চোখ দিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। সে সবিস্ময়ে একটু আগাইয়া গেল, বলিল—স্বর্ণ !

চাপা কান্নার মধ্যে মৃদুস্বরে স্বর্ণ এবার বলিল—কি হবে দেবু-দা ?

—কিসের স্বর্ণ ? কি হয়েছে ?

—বাবা—

—কি স্বর্ণ ? বাবার কি ? বলিতে বলিতেই তাহার মনে পড়িল তিনকড়ির কথা। তিনকড়ি তাহাকে বলিতেছিল—"ঘোষগাঁয়ে ডাকাতি করতে গিয়ে ছিদাম ধরা পড়েছে। হারামজাদা ধরা পড়ল, এর পর গোটা গাঁ নিয়ে টানাটানি করবে। আমাকেও বাদ দেবে না বাবা।" দেবু বুঝিল, আলোচনাটা বাড়ীর ভিতর পর্যন্ত পৌঁছিয়া মেয়েদের মনেও একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে।

অভয়ের সহিত সান্ত্বনা দিয়া সে বলিল—ছিদামের কথা বলছ তো ? তা তার জন্যে ভয় কি ? মিছিমিছি তিনু-কাকাকে জড়ালেই তো জড়ানো যাবে না ! ভগবান আছেন।

এখনও দিনরাত্রি হচ্ছে। সত্য-মিথ্যা কখনও ঢাকা থাকবে না। এ চাকলার লোক সাক্ষী দেবে—তিনু-কাকা সেরকম লোক নয়। এর আগেও তো পুলিস দু-দুবার বি-এল কেস করেছিল—কিন্তু কিছুই তো করতে পারে নি। চাকলার লোকের সাক্ষ্য জজ সাহেব কখনও অমান্য করতে পারেন না।

স্বর্ণের কান্না বাড়িয়া গেল, বলিল—কিন্তু এবার যে বাবা সত্যি সত্যি ওদের দলে মিশেছে!

—য়্যাঁ, বল কি ?···দেবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

স্বর্ণ বলিল—কেউ আমরা জানতাম না, দেবু-দা। আজ সন্ধ্যের সময় রাম-কাকারা এসে চুপি চুপি বাবাকে বললে—সর্বনাশ হয়েছে মোড়ল দাদা, ছিদমে ধরা পড়েছে। আমরা মনে করলাম, তাড়া খেয়ে ছোঁড়া কোন দিকে ছটকে পড়েছে, কিন্তু না—হারামজাদা ধরাই পড়েছে।···বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে বললে—রামা, তোরাই আমাকে মজালি! তোরাই আমাকে এবার এ পাপ করালি!

দেবু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে, সে নির্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণ মৃদুস্বরে বলিল—কাল বিকেলবেলা বাবা বললে—আমি কাজে যাচ্ছি—ফিরব কাল সকালে ; তার আগে যদি ফিরি তো অনেক শেষরাত্তির হবে। পুলিসে যদি ডাকে তো বলে দিস—অসুখ করেছে, ঘুমিয়ে আছে। পুলিসে ডাকে নাই, কিন্তু বাবা ফিরল শেষরাত্রে। হাঁপাচ্ছিল। মদ খেয়েছিল। তা বাবা তো মদ খায়। আমরা কিছু বুঝতে পারি নি। আজ সন্ধ্যেবেলায় রাম-কাকারা যখন এল—

স্বর্ণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শেষ—সব শেষ! চৌধুরী ঠাকুর বিক্রয় করিয়াছে, তিনু-কাকা শেষ ডাকাতের দলে ভিড়িয়াছে!

কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া স্বর্ণ বলিল—এরা সব যখন ডাকাতির কথা বলছিল, দাদা তখন ঘরে বসে ছিল—বাবা জানতো না। আমি ঘরে এলাম—দাদা ইশারা করে আমাকে চুপ করে থাকতে বললে। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম।

আবার একটা আবেগের উচ্ছ্বাস স্বর্ণের কণ্ঠে প্রবল হইয়া উঠিল ; বলিল—দাদা বাড়ী থেকে চলে গিয়েছে দেবু-দা।

দেবু চমকিয়া উঠিল। বলিল—চলে গিয়েছে! কেন ?

—হ্যাঁ। রাগে, দুঃখে, অভিমানে। যাবার সময় বললে—স্বর্ণ, বাবা খোঁজ করে তো বলিস, আমি বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি। এ বাড়ীতে আমি আর থাকব না।

চব্বিশ

তিনকড়ি নিজেই একদিন অকপটে দেবুর কাছে সব খুলিয়া বলিল। ঘর খানাতল্লাশ করিয়া কিছু মিলিল না। কিন্তু ছিদাম জীবনে প্রথম ডাকাতি করিতে গিয়া, ধরা পড়িয়া পুলিসের

কাছে আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, সে কবুল করিয়াছে। তাহার উপর মৌলিক ঘোষপাড়ার যে গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ীর দুজনে তিনকড়ি, রাম এবং তারিণীকে দেখিবামাত্র চিনিয়া ফেলিল। পুলিসের প্রশ্নের সম্মুখে স্বর্ণও যাহা শুনিয়াছিল বলিয়া ফেলিল। তিনকড়ি পাথরের মূর্তির মতো নিস্পলক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর বিচারকালে—তিনকড়ি তখন হাজতে—দেবু একজন উকিল লইয়া তিনকড়ির সঙ্গে যেদিন দেখা করিল, সেইদিন তিনকড়ি অকপটে দেবুর কাছে সব খুলিয়া বলিল।

সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও দেবুকে তিনকড়ির মামলার তদ্বির করিতে হইল। নিজের মনের সঙ্গে এই লইয়া যুদ্ধ করিয়া সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তিনু-কাকা ডাকাতের দলে মিশিয়া ডাকাতি করিয়াছে—পাপ সে করিয়াছে—তাহার পক্ষে থাকিয়া মকদ্দমার তদ্বির করা কোনমতেই উচিত নয়। কিন্তু অন্যদিকে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে কোনমতেই নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিতে পারিতেছে না। শুধু মমতার কথাই নয়, আজ যদি তিনকড়ির মেয়াদ হইয়া যায়, তবে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মাকে লইয়া তাহাকে আবার বিপদে পড়িতে হইবে। ত্রিসংসারের মধ্যে তাহাদের অভিভাবক কেহ নাই। গৌর সেইদিন সন্ধ্যায় যে কোথায় পালাইয়াছে—তাহার আর কোন উদ্দেশ নাই। জীবনে এমন জটিল অবস্থার মধ্যে সে কখনও পড়ে নাই।

প্রতিদিন রাত্রে একাকী বসিয়া শত চিন্তার মধ্যে তাহার মনে হয়—ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়। এখান হইতে চলিয়া গেলেই তাহার মুক্তি সে জানে; কিন্তু তাহাও সে পারিতেছে না। সে ইতিমধ্যে স্বর্ণদের সংস্রব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিল; তিনদিন সে স্বর্ণদের বাড়ী গেল না। চতুর্থ দিনে মা এবং একজন ভল্লার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া স্বর্ণ ম্লানমুখে তাহার বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—দেবু-দা!

দেবু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, মনে মনে অপরাধের গ্লানি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল; সে বাহিরে আসিয়া বলিল—স্বর্ণ! খুড়ীমা! আসুন—আসুন। ওরে দুর্গা, ওরে কোথা গেলি সব! এই যে এই মাদুরখানায় বসুন। বাহিরের তক্তাপোশের মাদুরখানা তাড়াতাড়ি টানিয়া আনিয়াই সে মেঝেতে পাতিয়া দিল।

স্বর্ণের মা পূর্বে দেবুর সঙ্গে কথা বলিত না। এখন কথা বলে ঘোমটার ভিতর হইতে। সে বলিল—থাক্ বাবা, থাক্।

স্বর্ণ দেবুর পাতা মাদুরখানা তুলিয়া ফেলিল।

দেবু বলিল—ও কি, তুলে ফেলছ কেন?

স্বর্ণ একটু হাসিয়া বলিল—উল্টো করে পেতেছেন। উল্টো মাদুরে বসতে নেই।… বলিয়া সে মাদুরখানা সোজা করিয়া পাতিতে লাগিল।

—ও। অপ্রতিভ হইয়া দেবু বলিল—আপনারা কষ্ট করে এলেন কেন বলুন তো! আমি তিন দিন যেতে পারি নি বটে। শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। আজই যেতাম।

* * *

স্বর্ণ বলিল—একটা কথা, দেবু-দা !

—কি, বল ?

—দাদার জন্যে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না ? কাল একটা পুরনো কাগজে দেখছিলাম একজনরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—'ফিরে এসো' বলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথাটা দেবুর মনেই হয় নাই। সে বলিল—হ্যাঁ, তা ঠিক বলেছ। তাই দিয়ে দেখি। আজই লিখে বরং ডাকে পাঠিয়ে দোব।

স্বর্ণ আপনার আঁচলের খুঁট খুলিয়া দুইটি টাকা দাওয়ার উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—কত লাগবে, তা তো জানি না ! দু'টাকায় হবে কি ?

—টাকা তোমার কাছে রাখ। আমি সে ব্যবস্থা করব'খন।

ঘোমটার ভিতর হইতে স্বর্ণের মা বলিল—টাকা দুটি তুমি রাখ বাবা। তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ। মাঝে মাঝে টাকাও খরচ করছে জানি। এ দুটি আমি গৌরের নাম করে নিয়ে এসেছি।

দেবু টাকা দুটি তুলিয়া লইল। স্বর্ণের মায়ের কথা মিথ্যা নয়। তবে সে-কথা দেবু নিজে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করে নাই। কেবল স্বর্ণের পরীক্ষার ফিয়ের কথাটাই তাহারা জানে। পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প আজও স্বর্ণ অটুট রাখিয়াছে, মেয়েটির অদ্ভুত জেদ। সে তাহাকে বলিয়াছিল—দেবু-দা, বাবার তো এই অবস্থা, দাদা চলে গিয়েছে, যেটুকু জমি আছে তাও থাকবে না। এর পর আমাদের কি অবস্থা হবে ? শেষে লোকের বাড়ী ঝি-গিরি করে খেতে হবে।

দেবু চুপ করিয়াই ছিল। এ কথার উত্তরই বা কি দিবে সে ?

স্বর্ণ আবার বলিয়াছিল—সেদিন জংশনে গিয়েছিলাম, বালিকা-বিদ্যালয়ের দিদিমণির সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে বললেন—মাইনার পাস কর তুমি, তোমাকে আমাদের ইস্কুলে নেব। ছোট মেয়েদের পড়াবে তুমি। দশ টাকায় ভর্তি হতে হবে। তারপর বাড়িয়ে দেবেন।

দেবু নিজেও অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে। এ ছাড়া স্বর্ণের জন্য কোন পথ সে দেখিতে পায় নাই। আগেকার কালে অবশ্য এ পথের কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। বিধবার চিরা-চরিত পথ—বাপ-মা অথবা ভাইয়ের সংসারে থাকা। কেহ না থাকিলে, অন্যের বাড়ীতে চাকরি করা। যাহারা শূদ্র, বামুন-বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ অথবা অবস্থাপন্ন স্বজাতীয়ের বাড়ীতে পাচিকার কাজই ছিল দ্বিতীয় উপায়। আর এক উপায়—শেষ উপায়—সে উপায়ের কথা ভাবিতেও দেবু শিহরিয়া উঠে। মনে পড়ে শ্রীহরিকে, মনে পড়ে পদ্মকে। সে মনে মনে বার বার স্বর্ণকে ধন্যবাদ দিয়াছে, সে যে এরূপ সাধু-সংকল্প করিতে পারিয়াছে, এজন্যও তাহাকে অনেক প্রশংসা করিয়াছে। ভাবিয়া আশ্চর্যও হইয়াছে,—মেয়েটি আবেষ্টনীর প্রভাব কাটাইয়া এমন সংকল্পের প্রেরণা কেমন করিয়া পাইল ?

প্রাচীন লোকে বলে—কাল-মাহাত্ম্য। কলিকাল।

চণ্ডীমণ্ডপে, লোকের বাড়ীতে, স্নানের ঘাটে এই কথা লইয়া ইহারই মধ্যে অনেক সবিদ্রূপ আলোচনা চলিতেছে।

দেবুকেও অনেকে বলিয়াছে—পণ্ডিত, এ কাজ ভাল হচ্ছে না। এর ফল পরে বুঝবে।··· অনেক কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছে ইহার ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে।

—মেয়েতে বিবি সেজে জংশনে চাকরি করতে যাবে কি হে? তখন তো সে যা মন চাইবে—তাই করবে!

দেবু যে এ কথা মানে না এমন নয়। জংশনের বালিকা-বিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষয়িত্রী এখান হইতে ভীষণ দুর্নাম লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সদরের হাসপাতালের একজন লেডি ডাক্তারকে লইয়া একজন হোমরা-চোমরা মোক্তার বাবুর কলঙ্কের কথা জেলায় জানিতে কাহারও বাকি নাই। কিন্তু পরের ঘরে ঝিয়ের কাজ করিলেও তো সে অপযশ, সে পাপের সম্ভাবনা হইতে পরিত্রাণ নাই। জংশনের কলেও তো কত মেয়েছেলে কাজ করিতে যায়। সেখানেও কি তাহারা নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে? কিন্তু এসব যেন লোকের সহিয়া গিয়াছে। দেবুর মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ ছাড়াও স্বর্ণের উপর তাহার বিশ্বাস আছে, শিক্ষার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আছে। স্বর্ণ লেখাপড়া শিখিলে তাহার জীবন উজ্জ্বলতর হইবে বলিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা।

তিনকড়িকেও সে স্বর্ণের সংকল্পের কথা বলিল—তিনকড়িও বলিল—ওর আর কথা নাই বাবা। তুমি তাই করে দাও। স্বর্নের জন্যে নিশ্চিন্ত হলে আর আমার কোন ভাবনাই রইল না। কালাপানি কি ফাঁসি হলেও আমি হাসতে হাসতে যেতে পারব।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। স্বর্ণের কথাপ্রসঙ্গে তিনকড়ি নিজের অপরাধের কথাটা তুলিতেই সে মনে অশান্তি অনুভব করিল।

তিনকড়ি মনের আবেগে অকপটে সব খুলিয়া বলিল।

বলিল—দেবু, এ আমার কপালের ফের বই কি! চিরকালটা রামাদের এই পাপের জন্যে গাল দিয়েছি, মেরেছি, দু মাস তিন মাস ওদের মুখ পর্যন্ত দেখি নি। বাবা, জীবনের মধ্যে পরের পুকুরের দুটো-একটা মাছ ছাড়া—পরের একটা কুটোগাছা কখনও নিই নি। সেই আমার কপালের দুর্মতি দেখ! আমার অদেষ্ট আমাকে যেন ঘাড়ে ধরে এ পথে নিয়ে এলো। বানে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেল। দেবু, তোমাদিকে লুকিয়ে প্রথম প্রথম থালা-কাঁসা বেচলাম, তারপর—অন্ধকার হল চারিদিক। ভাবলাম, তোমাদের সাহায্য সমিতিতে যাই। কিন্তু লজ্জা হল। বীজ-ধান নিয়ে এলাম প্রথম, তাও অর্ধেকের উপর খেয়েই ফেললাম। তখন রামা একদিন এল। বললে—মোড়ল দাদা, আমাদিগকে তুমি কিছু বলতে পাবে না। আমরা তোমার ওই সমিতির ভিক্ষে নিয়ে বেঁচে থাকতে লারব। বাগ্দী—লাঠিয়াল, আমরা ডাকাত, চিরকাল জোর করে খেয়েছি—আজ ভিক্ষে নিতে পারব না। ও মাগা চালের ভাত গলা দিয়ে নামছে না। আমাদের যা হয় হবে। তুমি আমাদের পানে চোখ বুজে থেকো। আমরা আমাদের উপায় করে নোব।···আমি বলেছিলাম—আমি ভিক্ষা নিতে পারলে

তোরা পারবি না কেন ? রামা বলেছিল—তোমাকেও ও ভাত খেতে দোব না। ভিখ্ মাঙ্‌তে দোব না তোমায়। তুমি মোড়ল—তুমি তোমার বাপ-পিতেমো চিরকাল মাথা উঁচু করে রয়েছ—পাঁচজনাকে খাইয়েছ, ভিক্ষে লিতে সরম লাগে না তোমার ? বরং যার বেশি আছে, তার কেড়ে লিই এস···তবু আমি বলেছিলাম, এ পাপ ! এ পাপ করতে নাই !···রামা বললে—আমরা কালীমায়ের আজ্ঞা নিয়ে যাই মোড়ল, পাপ হলে, মা আজ্ঞে দিবে কেন ? বেশ, তুমি মায়ের মাথায় ফুল চড়াও, ফুল যদি পড়ে—তবে বুঝবে মায়ের আজ্ঞে তাই। আর না পড়ে—তুমি যাবে না।···তা শ্মশানে কালীপূজো হল সেদিন রাত্রে। ফুল চড়ালাম মাথায় ; ফুল পড়ল।···

তিনকড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তারপর হাসিয়া বলিল—আমার কপালে এই ছিল বাবা। আমিই বা কি করব ! তুমি উকিল দিলে—বেশ করলে। আর এসব নিয়ে নিজেকে জড়িও না। এরপর পুলিস তোমাকে নিয়ে হাঙ্গামা করবে। তুমি বরং স্বর্ণমায়ের একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিয়ো। তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত। বল, আমাকে কথা দাও, স্বর্ণের ব্যবস্থা করবে তুমি ?

দেবুকে সমর্থন করিয়াছে কেবল জগন ডাক্তার। ডাক্তার দোষেগুণে সত্যই বেশ লোক। যেটা তাহার ভাল লাগে, সেটা সে অকপটে সমর্থন করে। যেটা মন্দ মনে হয়—সেটার গতিরোধ করিতে পারুক আর নাই পারুক—আকাশ ফাটাইয়া চিৎকার করিয়া বলে—না না। এ অন্যায়—এ হতে পারে না।

আর সমর্থন করিয়াছে অনিরুদ্ধ।

মাস দেড়েকে হইয়া গেল—অনিরুদ্ধ এখনও রহিয়াছে। চাকরির কথা বলিলে সে বলে—আমার চাকরির ভাবনা ! হাতুড়ি পিটব আর পয়সা কামাব। পয়সা সব ফুরিয়ে যাক—আবার চলে যাব। কেয়া পরোয়া ? মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো—শালা বোঝার মধ্যে শুধু একটা স্যুটকেস। হাতে ঝুলিয়ে নোব আর চলব মজেসে !

সে এখন আড্ডা গাড়িয়াছে দুর্গার ঘরে। দুর্গার ঘরে ঠিক নয়—থাকে সে পাতুর ঘরে। ওইখানে তার অড্ডা। দেবু বুঝিতে পারে—অনিরুদ্ধ দুর্গাকে চায়। কিন্তু দুর্গা অদ্ভুত রকমে পাল্টাইয়া গিয়াছে ; ও-ধার দিয়াও ঘেঁষে না ; দেবুর ঘরে কাজ-কর্ম করে, দুইটা খায়, রাত্রে গিয়া ঘরে খিল আঁটিয়া শোয়। প্রথম প্রথম শ্রীহরির রটনায় দেবুকে জড়াইয়া যে অপবাদটা উঠিয়াছিল—সেটা ওই দুর্গার আচরণের জন্যই আপনি মরিয়া গিয়াছে সকালের আকাশে অকালের মেঘের মত। তাহার উপর বন্যার পরে দেবু যখন সাহায্য-সমিতি গঠন করিয়া বসিল, দেশ-বিদেশ হইতে দেবুর নামে টাকা আসিল, দেবুকে কেন্দ্র করিয়া পাঁচখানা গ্রামের বালক-সম্প্রদায় আসিয়া জুটিল—চাষীর ছেলে গৌর হইতে আরম্ভ করিয়া জংশনের স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া দেবুর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিল এবং দেবুও যখন সকলকে সাহায্য দিল—ভিক্ষা দেওয়ার ভঙ্গিতে নয়—আত্মীয়কুটুম্বের দুঃসময়ে তত্ত্বতল্লাশের মত করিয়া সাহায্য দিল, তখন লোকে তাহাকে পরম সমাদরের সঙ্গে মনে মনে গ্রহণ করিল, তাহার প্রতি

অবিচারের ত্রুটিও স্বীকার করিল। সমাজের বিধানে দেবু পতিত হইয়াই আছে। পাঁচখানা গ্রামের মণ্ডলদের লইয়া শ্রীহরি যে ঘোষণা করিয়াছে—তাহার প্রকাশ্য প্রতিবাদও কেহ করে নাই। কিন্তু সাধারণ জীবনে চলা-ফেরায়—মেলা-মেশায় দেবুর সঙ্গে প্রায় সকলেরই ঘনিষ্ঠতা বজায় আছে এবং সে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সবই লক্ষ্য করে। দু-চারজনকে সে প্রশ্ন করিয়াছিল—দেবুর ওখানে যে এত যাওয়া-আসা কর—জান দেবু পতিত হয়ে আছে ?

শ্রীহরি একদিন প্রশ্ন করিয়াছিল রামনারায়ণকে। সে তাহার তাঁবের লোক। অন্তত শ্রীহরি তাই মনে করে। রামনারায়ণ ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালিত প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। রামনারায়ণ শ্রীহরিকে খাতিরও করে ; এক্ষেত্রে সে বেশ বিনয়ের সঙ্গেই উত্তর দিয়াছিল—তা যাই আসি—ভাই বন্ধুলোক, তার ওপর ধরুন সাহায্য সমিতি থেকে এ দুর্দিনে সাহায্যও নিতে হয়েছে। দশখানা গাঁয়ের লোকজন আসে। যাই, বসি, কথাবার্তা শুনি। পতিত করেছেন পঞ্চায়েত—দশখানা গাঁয়ের লোক যদি সেটা না মানে, তবে একা আমাকে বলে লাভ কি বলুন !

শ্রীহরি রাগ করিয়াছিল। দশখানা গাঁয়ের লোকের উপরেই রাগ করিয়াছিল ; কিন্তু সে রাগটা প্রথমেই পড়িয়াছিল—রামনারায়ণের উপর। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর সে, কৌশল করিয়া অপর সভ্যদের প্রভাবান্বিত করিয়া রামনারায়ণের উপর এক নোটিশ দিয়াছিল। তোমার অনুপযুক্ততার জন্য তোমাকে এক মাসের নোটিশ দেওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেবু সে নোটিশের উত্তরে ডিস্ট্রিক্ট্ ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স্-এর নিকট একখানা ও সার্কেল অফিসারের মারফৎ এস্-ডি ওর কাছে বহু লোকের সইযুক্ত একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া রামনারায়ণের উপযুক্ততা প্রমাণ করিয়া সে নোটিশ নাকচ করিয়া দিয়াছে।

• তারা নাপিতকেও শ্রীহরি শাসন করিয়াছিল—তুই দেবুকে ক্ষৌরি করিস কেন বল্ তো ?

ধূর্ত তারার আইনজ্ঞান টন্‌টনে ; সে বলিয়াছিল—আজ্ঞে, আগের মতন ধান নিয়ে কামানো আজকাল উঠে গিয়েছে। ধরুন যারা পতিত নয়—তাদের অনেকে—নিজে ক্ষুর কিনে কামায়, রেল জংশনে গিয়ে হিন্দুস্থানী নাপিতের কাছে কামিয়ে আসে ; আমি পয়সা নিয়ে কত বাইরের লোককেও কামাই। পণ্ডিত পয়সা দেন—আমি কামিয়ে দিই। আমার তো পেট চলা চাই। আপনি মস্ত লোক—যারা ক্ষুর কিনেছে, কি যারা অন্য নাপিতের কাছে কামায়, তাদের বারণ করুন দেখি ; তখন একশোবার—ঘাড় হেঁট করে আমি হুকুম মানব ; পণ্ডিতকে কামাবো না আমি।

শ্রীহরি ব্যাপারটা লইয়া আর কোন উচ্চবাচ্য করে নাই ; কিন্তু সাক্ষাতে সে সমস্তই লক্ষ্য করিতেছে। তিনকড়ির মামলায় সে যথাসাধ্য পুলিস কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতেছে। তিনকড়ি ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ায় সে মহাখুশী হইয়াছে,—সে কথা সে গোপনও করে না।

ঘটনাটা যখন সত্য, তখন পুলিসকে সাহায্য করায় দেবু শ্রীহরিকে দোষ দেয় নাই

কিন্তু আক্রোশবশে শ্রীহরি তাহার ঝুনা গোমস্তা দাসজীর সাহায্যে মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে। দাসজী নিজে নাকি পুলিসকে বলিয়াছে যে সে স্বচক্ষে তিনকড়ি ও রামভল্লাদের লাঠি হাতে ঘটনার রাত্রে—তিনটার সময় বাঁধের উপর দিয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছে। সে নিজে সেদিন জংশনে রাত্রি দেড়টার ট্রেনে নামিয়া ফিরিবার পথে রাস্তা ভুল করিয়া দেখুড়িয়ার কাছে গিয়া পড়িয়াছিল।

এই কথা মনে করিয়া দেবুর মন শ্রীহরির উপর বিষাইয়া উঠে। ঘৃণাও হয় যে—তিনকড়ির বিপদে শ্রীহরি হাসে, সে খুশী হইয়াছে। সে আরও জানে—অদূর ভবিষ্যতে তিনকড়ির জেল হইবার পর, শ্রীহরি আবার একবার পড়িবে স্বর্ণকে লইয়া। তাহার আভাসও সে পাইয়াছে। সে বলিয়াছে—জুতো পায়ে দিয়ে জংশনের ইস্কুলে মাস্টারি করবে বিধবা মেয়ে!···আচ্ছা, দেখি কেমন ক'রে করে! আমি তো মরি নাই এখনো!···

সন্ধ্যাবেলায় আপনার দাওয়ায় বসিয়া দেবু এই সব কথাই ভাবিতেছিল। আজ তাহার মজলিশে কেহ আসে নাই। দূরে ঢাক বাজিতেছে। আজ রাত্রে জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার বিসর্জন-উৎসব। কঙ্কণার বাবুদের বাড়ীতে তিনখানি জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে। সে এক পূজার প্রতিযোগিতা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কে কত আগে খাওয়াইতে পারে এবং কাহার বাড়ীতে কতগুলি মাছ-তরকারি, এই লইয়া প্রতিবারই পূজার পরও কয়েক দিন ধরিয়া আলোচনা চলে। বিসর্জন উপলক্ষে বাজী পোড়ানো লইয়া আর এক দফা প্রতিযোগিতা হয়।···সকলেই প্রায় বাজী পোড়ানো দেখিতে ছুটিয়াছে। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল পর্যন্ত গিয়াছে পাতুদের দলবলসহ। দুর্গাও গিয়াছে। শ্রীহরিও গিয়াছে সন্ধ্যার আগেই। শ্রীহরির বাহারের টাপর-চাপানো গাড়ীখানা দেবুর দাওয়ার সুমুখ দিয়াই গিয়াছে। গলায় ঘণ্টার মালা পরানো তেজী বলদ দুইটা হেলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর পাশে লালপাগড়ি বাঁধিয়া কালু শেখ এবং চৌকিদারী নীল উর্দি ও পাগড়ি আঁটিয়া ভূপাল বাগ্দীও গিয়াছে। সে জমিদার শ্রেণীর মানুষ এখন; তাহার বিশেষ নিমন্ত্রণ আছে।

গ্রামের মধ্যে আছে যাহারা, তাহারা বৃদ্ধ অক্ষম, অথবা রুগ্ন কিংবা সদ্যশোকাতুর। শোকাতুর এ অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি মানুষ। বন্যার পর করাল ম্যালেরিয়া অঞ্চলটার প্রতি ঘরেই একটা-না-একটা শেল হানিয়া গিয়াছে। তাদের অধিকাংশ লোক—ওই সদ্য-শোকার্তরা ছাড়া সকলেই গিয়াছে। ভাসান দেখিতে, আলো-বাজনা-বাজী পোড়ানোর আনন্দে মাতিতে এই পথে দেবুর চোখের উপর দিয়া সব গিয়াছে। তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন বুকে হাঁটিয়া মরীচিকার দিকে ছুটিয়া যায় জলের জন্য—তেমনি ভাবেই মানুষগুলি ছুটিয়া গেল—ক্ষণিকের মিথ্যা আনন্দের জন্য। কিছুক্ষণ আগে একা একটি লোক গেল—মাথায় কাপড় ঢাকিয়া, দেবু তাহাকেও চিনিয়াছে। সে ও-পাড়ার হরিহর—পরশু তাহার একটা ছেলে মারা গিয়াছে। দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। উহাদের কথায় মনে পড়িল নিজের কথা—বিলুকে, খোকাকে। সেই বা বিলুকে খোকাকে কতক্ষণ মনে করে!··;তাহার

মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল।···কতক্ষণ ? দিনান্তে একবার স্মরণও করে না। হিসাব করিয়া দেখিলে মাসান্তে একদিন একবার হইবে কিনা সন্দেহ। কেবল কাজ কাজ—পরের কাজের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ভূতের ব্যাগার খাটিয়া চলিয়াছে সে। এ বোঝা কবে নামিবে কে জানে !—

তবে এইবার হয়তো নামিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

সাহায্য সমিতির টাকা ও চাউল ফুরাইয়া আসিয়াছে। অন্য দিকেও সাহায্য সমিতির প্রয়োজনও কমিয়া আসিল। আশ্বিন চলিয়া গিয়াছে—কার্তিকও শেষ হইয়া আসিল। এখানে-ওখানে দুই-চারিটা আউস—ইতিমধ্যেই চাষীর ঘরে আসিয়াছে। 'ভাষা' ধানও কাটিয়াছে। অগ্রহায়ণের প্রথমেই 'নবীনা' ধান উঠিবে, তাহার পর ধান কাটিবে 'আমন'। পঞ্চগ্রামের মাঠই এ অঞ্চলের মধ্যে প্রধান মাঠ—সেই মাঠে অবশ্য এবার কিছুই নাই। কিন্তু প্রতি গ্রামেরই অন্যদিকেও কিছু কিছু জমি আছে। সেই সব মাঠ হইতে ধান কিছু কিছু আসিবে। সদ্য অভাবটা ঘুচিবে। দু-মাসের মধ্যে ম্যালেরিয়া অনেকখানি সহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার তেজ কমিয়াছে—আর সে মড়কের ভয়াবহতা নাই। ছেলে অনেক গিয়াছে, বয়স্ক মরিয়াছেও কম নয়। গরু-মহিষ প্রায় অর্ধেক উজাড় হইয়াছে। সেই অর্ধেক গরু-মহিষ লইয়াই লোকে আবার চাষের কাজে নামিয়াছে। রামের একটা শ্যামের একটা লইয়া—রাম-শ্যাম দুজনে 'গাঁতো' করিয়া কিছু কিছু রবি ফসল চাষের উদ্যোগ করিতেছে।

দেবু দেখে আর ভাবে—আশ্চর্য মানুষ ! আশ্চর্য সহিষ্ণুতা ! অশ্চর্য তাহার বাঁচিবার—ঘরকন্না করিবার সাধ-আকাঙ্ক্ষা ! এই মহা বিপর্যয়—বন্যারাক্ষসীর করকরে জিভের লেহন-চিহ্ন সর্বাঙ্গে অঙ্কিত ; এই অভাব, এই রোগ, ওই মড়কের মধ্যে ঘরের ভাঙন, জমির বালি, ক্ষেতের গর্ত—সমস্তই মানুষ এক লহমায় মুছিয়া ফেলিল। কালই সে পঞ্চগ্রামের মাঠ দেখিয়া আসিয়াছে। দেখুড়িয়ায় গিয়াছিল—স্বর্ণদের তল্লাশ করিতে। পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া আলপথের দুই ধারের জমিগুলিতে কিছু কিছু চাষ হইয়াছে। এখন ছোলা, মশুর, গম, যব, সরিষার বীজ সংগ্রহ করার দায়টাই সাহায্য সমিতির শেষ দায়। এই কাজটা করিয়া ফেলিতে পারিলেই—সাহায্য সমিতি সে বন্ধ করিয়া দিবে।

সাহায্য সমিতির দায়ের বোঝা এইবার ঘাড় হইতে নামিবে।

আর এক বোঝা—তিনকড়ির সংসারের বোঝা। এই নূতন দায়টি লইয়াই তাহার চিন্তার অন্ত নাই। তিনকড়ির মামলার শেষ হইতে আর দেরি নাই। শোনা যাইতেছে—শীঘ্রই—বোধ হয় এক মাসের মধ্যে দায়রায় উঠিবে। দায়রার বিচারে তিনকড়ির সাজা অনিবার্য। তারপর স্বর্ণ ও তিনকড়ির স্ত্রীকে লইয়া সমস্যা বাধিবে। এ দায় সত্যকার দায়, মহাদায়। শ্রীহরির শাসন-বাক্য সে শুনিয়াছে। কাহারও শাসন-বাক্যকে সে আর ভয় করে না। শাসন-বাক্য শুনিলেই তাহার মনে আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠে। তারা নাপিতের কাছে

কথাটা শুনিয়া সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল—তিনকড়ির জেল হইলে সে স্বর্ণ এবং তাহার মাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখিবে। স্বর্ণ যে রকম পরিশ্রম করিতেছে এবং যে রকম তাহার ধারালো বুদ্ধি, তাহাতে সে এম-ই পরীক্ষায় পাস করিবেই। জংশনের ইস্কুলে সে নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহার চাকরি করিয়া দিবে, এবং স্বর্ণ যাহাতে ম্যাট্রিক পাস করিতে পারে, তাহাও সে করিবে। শ্রীহরি বলিয়াছে—জুতা পায়ে দিয়া বিধবা মেয়ে চাকরি করিলে সে সহ্য করিবে না। তবুও স্বর্ণকে সে রীতিমত আজকালকার শিক্ষিত মেয়ের মত সাজপোশাক পরাইবে। সাদা থান কাপড়ের পরিবর্তে সে তাহাকে রঙিন শাড়ি কাপড় পরিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। বিধবা! কিসের বিধবা স্বর্ণ? পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ—সাত বৎসর বয়সে বিধবা! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সব বিধবার বিবাহের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। আইন পর্যন্ত পাস হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা তাহার মনে পড়িল—

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে!...হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ কর, বলিতে পার না।"...স্বর্ণের একটা ভালো বিবাহ দিয়া তাহাদের লইয়াই সে আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিবে।

এসব তাহার উত্তেজিত মনের কথা। স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় স্বর্ণদের চিন্তাই এখন তাহার বড় চিন্তা হইয়াছে। অভিভাবকহীন স্ত্রীলোক দুটিকে লইয়া কি ব্যবস্থা সে যে করিবে—স্থির করিতে পারিতেছে না। গৌর থাকিলে সে নিশ্চিন্ত হইত। লজ্জায়-দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গেল—তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া ভাবিয়া উঠিল। উপায় সে পাইয়াছে।

দূরে দুম্-দাম্ ফট্-ফাট শব্দ উঠিতেছে। বোম-বাজি ফাটিতেছে। কদম গাছের ফুল ফাটিতেছে। ওই যে আকাশের বুকে লাল-নীল রঙের ফুলঝুরি ঝরিতেছে, হাউই বাজি পুড়িতেছে!...

উপায় সে পাইয়াছে। সাহায্য সমিতির দায় হইতে মুক্তি পাইলেই সে তাহার নিজের জমি-বাড়ী স্বর্ণ এবং স্বর্ণের মাকে ভোগ করিতে দিয়া একদিন রাত্রে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। স্বর্ণ এবং তাহার মায়ের বরং জংশনে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের কাছাকাছি কোথাও থাকিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবে। স্বর্ণ ইস্কুলে চাকরি করিবে, তাহার জমিগুলি সতীশ বাউড়ীর হাতে চাষের ভার দিবে; সে ধান তুলিয়া স্বর্ণদের দিয়া আসিবে। তারপর—গৌর কি কোন দিনই ফিরিবে না? ফিরিলে সে-ই এই সব ভার লইবে।

এই পথ ছাড়া মুক্তির উপায় নাই। হ্যাঁ, তাই সে করিবে। সংসার হইতে—বন্ধন হইতে মুক্তিই সে চায়। প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আর সে পারিবে না। আর সে পরের বোঝা বহিয়া ভূতের ব্যাগার খাটিতে পারিতেছে না। তাহার বিলু—তাহার খোকাকে মনে করিবার অবসর হয় না, রাজ্যের লোকের সঙ্গে বিরোধ মনান্তর করিয়া দিন কাটানো,

কলঙ্ক-অপবাদ অঙ্গের ভূষণ করিয়া লওয়া—এ সব আর তাহার সহ্য হইতেছে না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অতল শান্তির মধ্যে—নিরুদ্বেগ আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইতে চায় সে। সে তাহার বৈচিত্র্যময় ব্যথাতুর অতীতকে পিছনে ফেলিয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। প্রাণ ভরিয়া সে খোকনকে বিলুকে স্মরণ করিবে—ভগবানকে ডাকিবে—তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবে। যাইবার আগে সে অন্তত একটা কাজ করিবে—খোকন এবং বিলুর চিতাটি সে পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দিবে। আর শ্মশানঘাটে একখানি ছোট টিনের চালাঘর করিয়া দিবে। জলে, ঝড়ে, শিলাবৃষ্টিতে, বৈশাখের রৌদ্রে শ্মশান-বন্ধুদের বড় কষ্ট হয়। একখানি মার্বেল ট্যাবলেটে লিখিয়া দিবে "বিলু ও খোকনের স্মৃতিচিহ্ন"।

খোকন ও বিলু! আজ এই নির্জন অবসরে তাহারা যেন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে মনের মধ্যে। খোকন ও বিলু! সামনেই ওই শিউলি গাছটার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে —মনে হইতেছে বিলুই যেন দাঁড়াইয়া আছে, পদ্মের মত আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহার খোকন ও বিলু!

দেবু চমকিয়া উঠিল। মাত্র একটুখানি সে অন্যমনস্ক হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিল, শিউলিতলার পাশ হইতে কে বাহির হইয়া অসিতেছে। ধব্ধবে কাপড়-পড়া নারীমূর্তি। বিলু—বিলু! হ্যাঁ...ওই যে তাহার কোলে খোকন! খোকনকে কোলে করিয়া সে দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। দেবুর সর্বশরীরে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। শিরায় শিরায়—যেন রক্তধারায় আগুন ছুটিতেছে। সে তক্তাপোশে বসিয়া ছিল—লাফ দিয়া উঠিয়া গিয়া অন্ধ আবেগে দুই হাতে বিলুকে বুকে টানিয়া চাপিয়া ধরিল, মুখ-কপাল চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল। বাঁচিয়া উঠিয়াছে—বিলু তাহার বাঁচিয়া উঠিয়াছে!

—এ কি জামাই, ছাড় ছাড়! ক্ষেপে গেলে নাকি?

দেবু চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে প্রশ্ন করিল—কে? কে?

—আমি দুগ্‌গা। তুমি বুঝি—

—য়্যাঁ, দুর্গা!...দেবু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া যেন পাথর হইয়া গেল।

দুর্গা বলিল—ঘোষেদের ছেলেটা ভিড়ের ভেতর সঙ্গ হারিয়ে কাঁদছিল, নিয়ে এলাম কোলে করে। মরণ আমার—দিয়ে আসি বাড়ীতে।

দেবু উত্তর দিল না। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত সে অসাড়ভাবে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। দুর্গা চলিয়া গেল।

দুর্গা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—দেবু তক্তাপোশের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে।

সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখে তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে মৃদু স্বরে ডাকিল—জামাই-পণ্ডিত!

দেবু উঠিয়া বসিল—কে, দুর্গা?

—হ্যাঁ।

—আমাকে মাফ করিস দুর্গা, কিছু মনে করিস না।

—কেন গো, কিসের কি মনে করব আবার !···দুর্গা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

—আমার মনে হল দুর্গা, শিউলিতলা থেকে বিলু যেন খোকনকে কোলে করে বেরিয়ে আসছে। আমি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, থাকতে পারলাম না।

দুর্গা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—কোন উত্তর দিল না। নীরবেই ঘরের শিকল খুলিয়া ঘরের ভিতর হইতে লণ্ঠনটা আনিয়া তক্তাপোশের উপর রাখিয়া বলিল—আঁধারে কত কি মনে হয়। আলোটা নিয়ে বসলেই— !···কথা বলিতে বলিতেই সে আলোর শিখাটা বাড়াইয়া দিতেছিল ; উজ্জ্বলতর আলোর মধ্যে দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া সে অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর সবিস্ময়ে বলিল--এর জন্যে তুমি কাঁদছ জামাই-পণ্ডিত !

দেবুর দুই চোখের কোল হইতে জলের রেখা আলোর ছটায় চক্‌-চক্‌ করিতেছে। দেবু ঈষৎ একটু ম্লান হাসিয়া হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

দুর্গা বলিল—জামাই-পণ্ডিত ! তুমি আমাকে ছুঁয়েছ বলে কাঁদছ ?

দেবু বলিল—চোখ থেকে জল অনেকক্ষণ থেকেই পড়ছে দুর্গা ; আজ মনে পড়ে গেল—খোকন আর বিলুকে। হঠাৎ তুই এলি ছেলে কোলে করে—আমার কেমন ভুল হয়ে গেল।···দেবুর চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দুর্গা বলিল—তোমার মত লোক জামাই-পণ্ডিত—তোমাকে কি কাঁদতে হয় ?

হাসিয়া দেবু বলিল—কাঁদতেই তো হয় দুর্গা। তাদের কি ভুলে যেতে পারি ?

দুর্গা বলিল—তা বলছি না জামাই। বলছি তোমার মত লোক যদি কাঁদবে, তবে গরীব-দুঃখীর চোখের জল মোছাবে কে বল ?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওদিকে ময়ূরাক্ষীর তীরের বাজনা থামিয়া গিয়াছে। দূরে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, সাড়া আগাইয়া আসিতেছে।

দুর্গা বলিল—উনোনে আগুন দিই, জামাই। অনেক রাত হল, ওঠ।

—নাঃ, আজ আর কিছু খাব না।

—ছিঃ ! তোমার মুখে ও কথা সাজে না। ওঠ, ওঠ। না উঠলে তোমার পায়ে মাথা ঠুকব আমি।

দেবু হাসিয়া বলিল—বেশ। চল্‌।

হঠাৎ নিকটেই কোথাও ঢোল বাজিয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া দেবু বলিল—ও আবার কি ?

দুর্গা হাসিয়া বলিল—কর্মকার, আবার কে !

—অনিরুদ্ধ ?

—হ্যাঁ। ভাসান দেখতে গিয়ে—যা হল্লোড় করলে ! আজ আবার পাকী মদ এনেছিল।

পাড়ার লোককে খাইয়েছে। এই রেতে আবার মঙ্গলচণ্ডীর গান হবে। তাই আরম্ভ হল বোধ হয়।

দেবু হাসিল। অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া ওই পাড়াটাকে বেশ জমাইয়া রাখিয়াছে। জমাইয়া রাখিয়াছেই নয়—অনেককে অনেক রকম সাহায্যও করিয়াছে।

দুর্গা বলিল—দাদা যে কর্মকারের সঙ্গে কাজ করতে কলকাতা চললো, শুনেছ?

—এমনি শুনেছি। অনিই একদিন বলছিল।

—আরও সব ক'জনা কম্মকারকে ধরেছে। তা কম্মকার বলেছে—সবাইকে নিয়ে কোথা যাব আমি? পাতু আমার পুরনো ভাবের লোক্‌, ওকে নিয়ে যাব। তোরা সব জংশনের কলে গিয়ে কাজ কর্।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আজই সব সন্ধ্যেবেলায়—ভাসান দেখতে যাবার আগে, খুব কল্‌কল্‌ করছিল সব। সতীশ দাদা বলছিল—কলে খাটতে যাবি কি? আর আর সবাই বলছিল—আলবৎ যাব, খুব যাব। কম্মকার ঠিক বলেছে। সে-সব লাফানি কি! মদের মুখে তো!

দেবু চুপ করিয়া রহিল। দুর্গার কথাটার মধ্যে দেবুর মন চিন্তার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছে। কলে খাটিতে যাইবে! ওপারে জংশনে কল অনেক দিন হইয়াছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত এ গ্রামের দীনদরিদ্র ও অবনত জাতির কেহই খাটিতে যায় নাই। সাঁওতাল এবং হিন্দুস্থানী মুচীরাই কলে মজুর খাটিয়া থাকে। কলের মজুরদের অবস্থাও সে জানে। পয়সা পায় বটে, মজুরিও বাঁধা বটে, কিন্তু কলে যে সব কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহাতে গৃহস্থের গৃহধর্ম থাকে না। গৃহও না—ধর্মও না। এতদিন ধরিয়া কলের লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক লোভ দেখাইয়াছে, কিন্তু তবুও গৃহস্থের একজনও ও-পথে হাঁটে নাই। কালবন্যায় গৃহস্থের ঘর ভাঙিয়াছে। অনিরুদ্ধ আসিয়া ধর্মভয়ও ফুৎকারে উড়াইয়া দিল নাকি!

দুর্গা বলিল—নাও, আবার কি ভাবতে বসলে? রান্না চাপাও!

দেবু রান্নার হাঁড়িটা আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। দুর্গা বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও।

—কি?

—কাপড় ছাড়।

—কেন?

সলজ্জ ভাবেই দুর্গা হাসিয়া বলিল—আমাকে ছুঁলে যে!

—তা হোক।

উনানের উপর দেবু হাঁড়ি চড়াইয়া দিল।

বাউড়ী-পাড়ায় কলরব উঠিতেছে। উন্মত্তের মতই বোধ হয় সবাই মাতিয়া উঠিয়াছে। অনিরুদ্ধ একটা ঝড় তুলিয়াছে যেন। ঢোল বাজিতেছে, গান হইতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রি। গান স্পষ্ট শোনা যাইতেছে।

মঙ্গলচণ্ডীর পালা-গানই বটে। বারমেসে গাহিতেছে।—

"আষাঢ়ে পূরয়ে মহী নব মেঘ জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।
সাহসে পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে। কিছু খুদকুঁড়া মিলে উদর না পুরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥"

দেবু আপন-মনেই হাসিল। সাপে খাইলে মরিয়া গরীবের হাড় জুড়ায়।···ভারি চমৎকার বর্ণনা কিন্তু!

তাহার আগাগোড়া—ফুল্লরার বারোমাস্যার বর্ণনা মনে পড়িয়া গেল।

"বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ-বাণী।
ভাঙা কুঁড়ে-ঘর তালপাতের ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার খুঁটি তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁটের বসন॥"

দুর্গা বলিয়া উঠিল—উনোনের আগুন যে নিভে গেল গো! কাঠ দাও!

দেবু উনানের দিকে চাহিয়া বলিল—দে বাপু, তুই একখানা কাঠ দে।

দুর্গা একখানা কাঠ ফেলিয়া দিয়া বলিল—না, তুমি দাও।

ওদিকে গান হইতেছে—

"দুঃখ কর অবধান, দুঃখ অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আসে বান॥
ভাদ্রমাসেতে বড় দুরন্ত বাদল। নদ-নদী একাকার আট দিকে জল॥"

দেবুর মন কবির প্রশংসায় যেন শতমুখ হইয়া উঠিল; 'আট দিকে জল'··কেবল উর্ধ্ব এবং অধঃ ছাড়া আর সব দিকে জল।

দুর্গা বলিল—আমাদের এবারকার মতন বান হলে মাগী আর বাঁচত না।

দেবুর মনে আবার একটা চকিত রেখার মত চিন্তার অনুভূতি খেলিয়া গেল; যে ছেলেটা ফুল্লরার গান গাহিতেছে, তাহার কণ্ঠস্বর ঠিক মেয়েদের মত, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত জোরালো। মনে হইতেছে, ফুল্লরাই যেন ওই পাড়ায় বসিয়া বারমেসে গান গাহিতেছে। ওপাড়ার যে-কোন ঘরই তো ফুল্লরার ঘর; কোন প্রভেদ নাই। তালপাতার ছাউনি, দেওয়ালও ভাঙা, খুঁটি শুধু ভেরেণ্ডার নয়—বাঁশের। দু-একজনের বটের ডালের খুঁটিও আছে।

গান চলিতেছে। ভাদ্রের পর আশ্বিন। দেশে দুর্গাপূজা। সকলের পরনে নূতন কাপড়। "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।" আশ্বিনের পর কার্তিক। হিম পড়িতেছে। ফুল্লরার গায়ে কাপড় নাই।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—তা আমাদের চেয়ে ভাল ছিল ফুল্লরা। মালোয়ারী ছিল না।

দেবু হাসিল।

মাসের পর মাস দুঃখ-ভোগের বর্ণনা চলিয়াছে। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—।

"দুঃখ কর অবধান—দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ-মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মরকন্দ॥"

গান শেষ হইয়া আসিয়াছে। দেবু ওই গানেই প্রায় তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

"দারুণ দৈবরোষে, দারুণ দৈবরোষে।
একত্র শয়নে স্বামী যেন যোল কোশে॥"

গান শেষ হইল। দেবুর খেয়াল হইল—ভাত নামানো দরকার। সে বলিল—দুর্গা, ভাত হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। নামিয়ে ফেলি, কি বল্?

কেহ উত্তর দিল না।

দেবু সবিস্ময়ে ডাকিল—দুর্গা!

কেহ উত্তর দিল না। দুর্গা চলিয়া গিয়াছে? কখন গেল? এই তো ছিল!

—দুর্গা?

দুর্গা সত্যই কখন চলিয়া গিয়াছে।

পঁচিশ

কার্তিকের শেষ। শীত পড়িবার সময় হইয়াছে। কিন্তু এবার শীত ইহারই মধ্যে বেশ কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে। সকালবেলায় কাঁপুনি ধরে। শেষরাত্রে সাধারণ কাপড়ে বা সূতী চাদরে শীত ভাঙে না। কার্তিক মাসে লোক লেপ গায়ে দেয় না। কারণ কার্তিক মাসে লেপ গায়ে দিলে মরিয়া পরজন্মে নাকি কুকুর হইতে হয়। তবুও লোকে লেপ-কাঁথা পাড়িয়াছে। বন্যার প্লাবনে দেশের মাটি এমন ভাবে ভিজিয়াছিল যে, সে জল এখনও শুকায় নাই। ছায়ানিবিড় আম-কাঁঠালের বাগানগুলির মাটি—জানালাহীন ঘরের মেঝে এখন স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করিতেছে। বাউড়ী-পাড়ার লোকে মেঝের উপর গাছের ডাল পুঁতিয়া বাখারি দিয়া মাচা বাঁধিয়াছে। সতীশ গায়ে দেয় একখানা পাত্‌লা ও জরাজীর্ণ বিলাতী কম্বল, সে এখনও লেপ গায়ে দেয় নাই।

পাতু বলে—কুকুর হতে দুঃখ নাই সতীশ-দাদা। তবে যেন বড় বড় রোঁয়াওলা বিলিতি কুকুর হই। দিব্যি শেকলে বেঁধে বড়লোকে পুষবে। দুধ-ভাত-মাংস খেতে দেবে।

অনিরুদ্ধ বলিয়াছে—আরে শালা—রোঁয়াতে উকুন হবে, রোঁয়া উঠে গেলে মর্‌বি। ভাগিয়ে দেবে তখন।

—তখন ক্ষেপে গিয়ে যাকে পাব তাকে কামড়াব।

—ডাণ্ডার বাড়ি যাকতক দিয়ে, না হয় গুলি করে মেরে ফেল্‌বে।

—ব্যাস, তখন তো কুকুর-জন্ম থেকে খালাস পাব !···পাতু আবার হাসিয়া বলে—আর যদি দিশি কুকুর হই, তবে তুমি পুষো আমাকে সতীশ-দাদা।

অনিরুদ্ধ আসিবার পর হইতে পাতুর কথাবার্তার ধারাটা এমনি হইয়াছে। খোঁচা দিয়া ছাড়া কথা বলিতে পারে না। পাতুর কথায় সতীশ একটু-আধটু আহত হয়।···

গতকাল রাত্রে ব্যাপারটা বেশ জট পাকাইয়া উঠিয়াছে। গোটা পাড়ার মেয়েপুরুষে মদ খাইয়াছে এবং হল্লা করিয়াছে। শেষে কলে খাটিবার মতলব প্রায় পাকা করিয়া ফেলিয়াছে। সতীশ ভোরবেলায় উঠিয়া বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া হাল জুড়িবার আয়োজন করিল। তাহাদের পাড়ায় সবসুদ্ধ পাঁচখানি হাল ছিল ; পূর্বে অবশ্য আরও বেশি ছিল। ওই পাতুরই ছিল একখানা। এখন এই গো-মড়কের পর পাঁচখানা হালের দশটা বলদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে চারিটা। তাহারই শুধু দুইটা আছে—বাকী দুইজনের একটা একটা। তাহারাও দুই-জনে মিলিয়া রবি-ফসলের চাষ করিবে ঠিক করিয়াছে। সতীশ তাহাদের একজনের বাড়ীতে গিয়া তাগিদ দিল—আয়, সুয্যি উঠে গেল।

অটল বলিল—এই হয়েছে ! লাও, তামাক একটুকুন্ ভালো করে খেয়ে লাও। আমি কালাচাঁদকে ডাকি, গরুটা লিয়ে আসি।

সতীশ তামাক খাইতে বসিল।

অটল ফিরিয়া আসিল একা। বলিল—সতীশ-দাদা, তুমি যাও, আমার আজ হ'ল না।

—হল না ?

অটল বলিল—যাবে না শালা কালাচেঁদে।

—যাবে না !

—যাবেও না, গরুও দেবে না। বল্লে—চাষবাস আমি করব না। আমার গরু আমি বেচে দোব। পার তো কিনে লাও। শালার আবার রস কত ! বলে—পয়সা ফেল মোয়া খাও, আমি কি তোমার পর !

—হ্যাঁ। ভূতে পেয়েছে শালাকে।

ভূতই বটে ! নহিলে পিতৃপুরুষের কাজকর্ম, কুলধর্ম মানুষ ছাড়িবে কেন ? আঃ, এমন সুখের এমন পবিত্র কাজ কি আর আছে ? জমি-চাষ, গো-সেবা পবিত্র কাজ ; কাজগুলি করিয়া যাও—মুনিবেরও ঘরের ধান, মাইনে, কাপড়, এই হইতেই তোমার চলিয়া যাইবে। বর্ষাবাদলে কোথাও মজুরি করিয়া মরিতে হইবে না। অবশ্য আগের মত সুখ আর নাই। আগে অসুখ হইলে মুনিবেরা বৈদ্য সুদ্ধ দেখাইত। তা ছাড়া মুনিবের ঘর হইতে কাঠ-কুটা-খড় এগুলা তো মেলেই। পালে-পার্বণে, মুনিব-বাড়ীর কাজ-কর্মে উপরি বক্শিশ আছে। সে সুখ ছাড়িয়া কলে খাটিবার জন্য সব নাচিয়া উঠিয়াছে। কর্মকার কতকগুলা টাকা আনিয়া মদ খাওয়াইয়া লোকের মাথা খারাপ করিয়া দিল। কর্মকারের দোষ কি ? সে কোন দিন বলে নাই। ধুয়াটা তুলিয়াছে পাতু। পাতুই অনিরুদ্ধকে বলিয়াছে—আমাকে তুমি নিয়ে চল কম্মকার-ভাই। তোমার সঙ্গে আমি যাব।

অনিরুদ্ধ পাতুকে লইয়া যাইতে রাজী হইয়াছিল। সে তাহার অনেক দিনের ভাবের লোক। এককালে পাতুর যখন হাল ছিল—তখন পাতুই তাহার জমি চাষ করিত। তা ছাড়া সে দুর্গার ভাই।

অনিরুদ্ধ পাতুকে লইয়া যাইতে রাজী হইয়াছে শুনিয়া সবাই আসিয়া নাচিতে লাগিল—আমাকে নিয়ে চলেন কম্মকার মশায়। আমিও যাব। আমিও, আমিও, আমিও।

কর্মকারের আমোদ লাগিয়াছে। সে বলিয়াছে—সবাইকে নিয়ে কোথা যাব বল্? তোরা এখানকার কলে গিয়ে খাট্। কর্মকারের কি? না ঘর, না পরিবার, না জমি, না কিছু; গাঁয়ে-মায়ে সমান কথা—সেই গ্রামকেই সে ত্যাগ করিয়াছে। কলে খাটিবার পরামর্শ সে দিয়া বসিল।

কলে খাটা! ভাবিতেও সতীশের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। হউক তারা গরীব, ছোট লোক, তবু তো তাহারা গৃহস্থ লোক। গৃহস্থ লোকে কি কলে খাটে!

সতীশ অটলকে বলিল—না দিক্। আয়, তু আমার সঙ্গে আয়। তিনটে গরু নিয়ে আমরা দুজনাতেই যতটা পারি করব—চল্।

অটল চুপ করিয়া বসিয়া ছিল; সেও পাতুর মত কিছু ভাবিতেছিল। সে উত্তর দিল না, নড়িলও না।

সতীশ ডাকিল—কি বলছিস, যাবি?

অটল মাথা চুলকাইয়া এবার বলিল—তা পরে ভাগাটা কি রকম করবে বল?

—ভাগা?

—হ্যাঁ।

—যা পাঁচজনায় বলবে, তাই হবে।

—না ভাই। সে তুমি আগাম ঠিক কর লাও।

—বেশ। চল্—যাবার পথে পণ্ডিত মাশায়ের কাছ হয়ে যাব। পণ্ডিত মাশায় যা বলবেন তাই হবে। পণ্ডিতের কথা মানবি তো?

পণ্ডিতের বাড়ীর সম্মুখে বেশ একটি জনতা জমিয়া গিয়াছে। স্বয়ং শ্রীহরি ঘোষ মহাশয় দাঁড়াইয়া আছে। সে-ই কথা বলিতেছে, খুব ভারী গলায় বেশ দাপের সঙ্গেই বলিতেছে—কাজটা তুমি ভাল করছ না দেবু!

আগে ঘোষ পণ্ডিতকে বলিত—দেবু-খুড়ো। আজ শুধু দেবু বলিতেছে। ঘোষ যে ভয়ানক চটিয়াছে—ইহাতে সতীশ এবং অটলের সন্দেহ রহিল না।

পণ্ডিত হাসিয়াই বলিল—সকালবেলায় উঠেই তুমি কি আমাকে শাসাতে এসেছ শ্রীহরি?

শ্রীহরি এমন উত্তরের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর বলিল—তুমি গ্রামের কত বড় অনিষ্ট করছ—তুমি বুঝতে পারছ না।

পণ্ডিত বলিল—আমি গ্রামের অনিষ্ট করছি ?

—করছ না ? গ্রামের ছোটলোকগুলো সব চললো কলে খাটতে ! তুমি তাদের উস্কে দিচ্ছ।

পণ্ডিত বলিল—না। আমি দিই নি।

—তুমি না দিয়েছ, তুমি অনিরুদ্ধকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ। সে-ই এসব করেছে।

—সে গ্রামের লোক, আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সে দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে, আমার ঘরে আছে। যতদিন ইচ্ছে সে থাকবে। সে কি করছে-না-করছে—তার জন্যে আমি দায়ী নই।

শ্রীহরি বলিল—জানি, সে ছোটলোকের সঙ্গে মদ খায়, ভাত খায় ! সেই লোককে তুমি ঘরে ঠাঁই দিয়েছ।

দেবু বলিল—অতিথের জাতবিচার করি না আমি। তার এঁটোও আমি খাই না। আর তা ছাড়া—।···দেবু এবার হাসিয়া বলিল—আমিও তো পতিত, শ্রীহরি !

শ্রীহরি আর কথা বলিতে পারিল না। সে আর দাঁড়াইলও না, নিজের বাড়ীর দিকে ফিরিল।

শ্রীহরির পশ্চাদ্‌বর্তীগণের মধ্য হইতে হরিশ আগাইয়া আসিয়া বলিল—শোন বাবা দেবু, শোন।

দেবু বলিল—বলুন।

—চল, তোমার দাওয়াতেই বসি। না, চল বাড়ীর ভেতর চল।

দেবু সমাদর করিয়াই বলিল—আসুন। সে তো আমার ভাগ্য।

বাড়ীর ভিতরে আসিয়া হরিশ বলিল—ও পতিত-এতিতের কথা ছাড়ান্ দাও। ওসব কথার কথা। কই, কেউ কোনদিন বলেছে যে দেবু পণ্ডিতের বাড়ী যাব না, সে পতিত ? না তোমার বাড়ী আসে নি। ওসব আমরা ঠিক করে দোব।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

হরিশ বলিল—শ্রীহরি বলছিল, দেবুকে বলো হরিশ ঠাকুর-দাদা, ও রাজী হয় তো আমার শালার একটি কন্যে আছে, ডাগর মেয়ে—তার সঙ্গে সম্বন্ধ করি। পতিত ! বাজে, বাজে ওসব।

দেবু বলিল—থাক্, হরিশ খুড়ো—বিয়ের কথা থাক্। এখন আর কি বলছেন বলুন ?

হরিশ বলিল—এ কাজ থেকে তুমি 'নিবিত্ত' হও বাবা। এ কাজ করো না। গাঁয়ে মুনিষ মিলবে না, মান্দের মিলবে না, মহা কষ্ট হবে লোকের। নিজেদের গোবরের ঝুড়ি মাথায় করে ক্ষেতে নিয়ে যেতে হবে। ওদের তুমি বারণ কর।

—বেশ তো, আপনারাই ডেকে বলুন !

—না রে বাবা। তোমাকে ওরা দেবতার মত মান্যি করে।

দেবু বলিল—শুনুন হরিশ-খুড়ো, আমি ওদের কিছু বলি নাই। বলেছে অনিরুদ্ধ। আগে

আগে উড়ো-ভাসা শুনেছিলাম, ঠিক-ঠাক শুনেছি কাল রাত্রে। আমি সমস্ত রাত্রি ভেবে দেখেছি। কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব করে দেখলাম—গাঁয়ের যত গেরস্ত-বাড়ী, তার পাঁচ গুণ লোক ওদের পাড়ায়। ইদানীং গাঁয়ের গেরস্তদের অবস্থা এত খারাপ হয়েছে যে লোক রাখবার মত গেরস্ত হাতের আঙুলে গুনতে পারা যায়। অন্য গাঁয়ের গেরস্ত-বাড়ীতে কাজ করে এখন বেশির ভাগ লোক। বানের পর তাদের অনেকেও মুনিষ-মান্দের ছাড়িয়ে দিয়েছে। এখন এসব লোকে খাবে কি? খেতে দেবে কে বলুন দেখি?

হরিশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেবু চুপ করিয়া রহিল তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায়। উত্তর না পাইয়া সে বলিল—তামাক খাবেন? আনব সেজে?

হরিশ ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল—না। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা, তা হলে আমি উঠলাম।

বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া বলিল—গাঁয়ের যে অনিষ্ট তুমি করলে দেবু, সে অনিষ্ট কেউ কখনও করে নি। সর্বনাশ করে দিলে তুমি।

দেবু বলিল—আমি ওদের একবারের জন্যেও কলে খাটবার কথা বলি নি, হরিশ খুড়ো। অবিশ্যি আপনি বিশ্বাস না করেন, সে আলাদা কথা।

—কিন্তু বারণও তো করলে না!

কথা বলিতে বলিতে তাহারা রাস্তার উপর দাঁড়াইল; ঠিক সেই মুহূর্তেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে শ্রীহরির উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠের কথা শোনা গেল—বলে দেবে, যারা কলে খাটতে যাবে—তারা আমার চাকরান্ জমিতে বাস করতে পাবে না। কলে খাটতে হ'লে গাঁ ছেড়ে উঠে যেতে হবে।

তর্ তর্ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল কালু শেখ। লাঠি হাতে পাগড়ী মাথায় কালু শেখ তাহাদের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেল।

শ্রীহরির হুকুমজারি শুনিয়া দেবুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ওটা নিতান্ত বাজে হুকুম। সে জানে, লোকে ও কথা শুনিবে না। সেট্‌ল্‌মেণ্ট কিন্তু একটা কাজ করিয়া গিয়াছে। পর্‌চার ওই কাগজখানা দিয়া নিতান্ত দুর্বল ভীরু লোককেও জানাইয়া দিয়া গিয়াছে যে, এই জমিটুকুর উপর তোমার এই স্বত্ব আছে, অধিকার আছে। আগে গৃহস্থ লোকেরা আপন আপন জমির উপর বাউড়ী ডোম মুচিদের ডাকিয়া বসবাস করিবার জায়গা দিত। তাহারা গৃহস্থের এ অনুগ্রহকে অসীম-অপার করুণা বলিয়া মনে করিত। সেই গৃহস্থটির সুখ-দুঃখে তাহারা একটা করিয়া অংশ গ্রহণ করিত—পবিত্র অবশ্য-কর্তব্যের মত। পৃথিবীতে তাহাদের জমি থাকিতে পারে বলিয়া ধারণাই পুরুষানুক্রমে এই সব মানুষের ছিল না। তাই যে বাস করিতে একটুকরা জমি দিত—সে-ই ছিল তাহাদের সত্যকার রাজা। পারিবারিক পারস্পরিক কলহবিবাদে এই রাজার কাছেই তাহারা আসিত। তাহার বিচার মানিয়া লইত, দণ্ড লইত মাথা পাতিয়া। বেগার খাটিত—উপঢৌকন দিত। আবার যেদিন রাজা বলিত—আমার জমি হইতে চলিয়া যাও, সেদিন আসিয়া তাহারা পায়ে ধরিয়া কাঁদিত, করুণা-ভিক্ষা করিত।

* *

ভিক্ষা না পাইলে তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া আবার কোন রাজার আশ্রয় খুঁজিত। শিবকালীপুরে ইহাদের বাস—জমিদারের খাস-পতিত ভূমির উপর। শ্রীহরি জমিদারের স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া—আজ সেই পুরাতন কালের হুকুম জারি করিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কালের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে! তাহারা পূর্বকালের মত নিরীহ ভীরু নাই, আর সঙ্গে সঙ্গে সেট্‌ল্‌মেণ্ট আসিয়া সকলের হাতে পরচা দিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে, এ জমিতে তোমাদের একটা লিখিত অধিকার আছে, যেটা মুখের হুকুমে যাইবে না। কথায় কথায় তাহারা এখন পরচা বাহির করে। শ্রীহরির এ হুকুমে কেহ ভয় পাইবে না—এ কথা দেবু জানে।...

গতরাত্রে সমস্ত রাত্রিটাই দেবুর ঘুম হয় নাই। তাহার শরীর অবসন্ন, চোখ জ্বালা করিতেছে। দুর্গাকে ছেলে কোলে করিয়া অকস্মাৎ শিউলিতলা হইতে বাহির হইতে দেখিয়া যে মারাত্মক ভ্রম করিয়া বসিয়াছিল, তাহার অনুশোচনায় এবং ইহাদের এই কলে খাটিতে যাওয়ার কথা শুনিয়া কি যে তাহার হইয়া গেল, সারারাত্রি আর কিছুতেই ঘুম আসিল না।

দুইটা চিন্তা একসঙ্গে তাহার মাথায় আসিয়া এমনভাবে জট পাকাইয়া গেল যে শেষটা দুইটাকে পৃথক বলিয়া চিনিবার উপায় পর্যন্ত ছিল না। সে মাথায় হাত দিয়া স্থিরভাবে ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিন্তা করিয়াছে। বিলু-খোকা! উঃ, সে আজ কি ভুলই না করিয়াছে! ছেলেটাকে কোলে করিয়া দুর্গা শিউলিতলার পাশ দিয়া আসিতেই তাহার মনে হইল—বিলু খোকাকে কোলে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এখনও পর্যন্ত সে সেই ছবিকে কিছুতেই ভ্রম বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। উঃ, বিলু-খোকাহীন এই ঘর —এই ঘরে সে কি করিয়া আছে? কোন্ প্রাণে আছে? বুক তাহার হু-হু করিয়া উঠিয়াছিল। পরের কাজ, দশের কাজ, ভূতের ব্যাগার! স্বর্ণ, স্বর্ণের মায়ের ভাবনা, তাহাদের সংসারের কাজ-কর্মের বন্দোবস্ত, স্বর্ণের পরীক্ষার পড়ায় সাহায্য, তিনকড়ির অপ্রশংসনীয় ফৌজদারী মামলার তদ্বির, সাহায্য-সমিতি—এই সব লইয়াই তাহার আজ দিন কাটিতেছে। সে এসব হইতে মুক্তি চায়। এ ভার সে বহিতে পারিতেছে না।

তিনকড়িদের বোঝা নামিতে আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে অনি-ভাই আসিয়া বাউড়ী-পাড়া, মুচী-পাড়া, ডোম-পাড়ার লোকগুলিকে কলের কাজে ঢুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছে। যাক উহারা কলেই যাক। তাহার সাহায্য সমিতির কাজের তিন ভাগ তো উহাদের লইয়াই। সমস্ত জীবনটাই তো সে উহাদের লইয়াই ভুগিতেছে। তাহার মনে পড়িল—উহাদের ময়ূরাক্ষীর বাঁধের তালগাছের পাতা কাটার জন্য শ্রীহরির সঙ্গে বিরোধ বাধিয়াছিল।* শ্রীহরি উহাদের গরুগুলি খোঁয়াড়ে দিলে, সে উহাদের উপকার করিবার জন্যই তাহার খোকার হাতের বালা বন্ধক দিয়াছিল—ষষ্ঠীর দিন। মনে পড়িল—রাত্রে

* গণদেবতা উপন্যাস দ্রষ্টব্য

ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজে বালা তুইগাছি ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সেই দিন তিনি তাহাকে ধার্মিক ব্রাহ্মণের গল্পের প্রথম অংশ বলিয়াছিলেন। তারপর উহাদের পাড়াতেই আরম্ভ হইল কলেরা। সে উহাদের সেবা করিতে গিয়াই ঘরে বহন করিয়া আনিল মহামারী রাক্ষসীর বিষদন্তের টুকরা; যে টুকরা বিদ্ধ হইল খোকনের বুকে—খোকন হইতে গিয়া বিঁধিল তাহার বিলুর বুকে। উঃ, সেই সমস্ত সহ্য করিয়াও সে আজও ওই উহাদের বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে।

ন্যায়রত্নের গল্প মনে পড়িল—মেছুনীর ডালার শালগ্রাম শিলার গল্প। সে উহাদের গলায় বাঁধিয়া আজও ফিরিতেছে। কিন্তু হইল কি? তাহারই বা কি হইল? ওই হতভাগাদেরই বা কি করিতে পারিয়াছে সে? বন্যার পরে অবশ্য সাহায্য সমিতি হইতে উহাদের অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু উপকার লইয়া কতকাল উহারা বাঁচিয়া থাকিবে? অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, সংসারে কোন সংস্থান নাই, অন্য কেহ উপকার করিতেছে—সেই উপকারে বাচিয়া থাকা কি সত্যকারের বাঁচা? আর পরের উপকারে বা কতদিন চলে? নাঃ, তার চেয়ে কলে-খাটা অনেক ভাল। অনি-ভাই তাহাদের বাচার উপায় বাহির করিয়াছে। চৌধুরীর লক্ষ্মী জনার্দন শিলা বিক্রয় করিবার পর হইতে আর তাহার মেছুনীর ডালার শালগ্রামকে গলায় বাঁধিয়া ফেরার আদর্শে বিশ্বাস নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথায় তাহার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু মেছুনীর ডালার শালগ্রাম হইতে এইবার ঠাকুর হাত-পা লইয়া মূর্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসুন—এই সে চায়। তাহাতে তাহার হয়তো মুক্তি হইবে। কিন্তু তাহার মুক্তির পর শালগ্রাম শিলার সেবা করিবে কে? তার্কিক হয়তো বলিবে—দেবু, তুমি ছাড়া সংসারে কোটি কোটি সেবক আছে। সত্য কথা। কিন্তু এ পরীক্ষা পুরানো হইয়া গিয়াছে। আর ওই বাউড়ী-ডোমেরাই যদি মেছুনীর ডালার শালগ্রাম হয়—তবে সেবকের চেয়ে দেবতার সংখ্যাই বাড়িয়া গিয়াছে। নাঃ, উহারা যদি নিজে হইতে বাঁচিবার পথ না পায়, তবে কাহারও সাধ্য নাই উহাদের বাচাইয়া রাখে। তাহার চেয়ে অনিরুদ্ধের পথই শ্রেয়। এ পথে অন্তত তাহারা পেটে খাইয়া, গায়ে পরিয়া—এখনকার চেয়ে ভালভাবে থাকিবে। একটা বিষয়ে পূর্বে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল। কলে খাটিতে গেলে মেয়েদের ধর্ম থাকিবে না, পুরুষেরাও মাতাল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। কিন্তু কাল সে ভাবিয়া দেখিয়াছে—ও আশঙ্কাটা অমূলক না হইলেও, যতখানি গুরুত্ব সে তাহার উপর আরোপ করিয়াছে ততখানি নয়। গাঁয়ে থাকিয়াও তো উহাদের ধর্ম খুব বজায় আছে! মনে পড়িয়াছে শ্রীহরির কথা, কঙ্কণার বাবুদের কথা, হরেন ঘোষালের কথা; ভবেশ-দাদা, হরিশ-খুড়ার যৌবনকালের গল্পও সে শুনিয়াছে। এই সেদিন-শোনা দ্বারকা চৌধুরীর ছেলে হরেকৃষ্ণের কথা মনে পড়িল। অনি-ভাই আগে যখন মাতামাতি করিয়াছিল—তখন সে গ্রামেরই মানুষ ছিল। ইহাদের মেয়েগুলি কঙ্কণার বাবুদের ইমারতে রোজ খাটিতে যায়, সেখানেও নানা কথা শোনা যায়। কালই চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে যে, মানুষের এ পাপ যায় যে পুণ্যে সেই পুণ্যে যত দিন সব মানুষ পুণ্যবান্ না হইবে তত দিন

সর্ব অবস্থায় এ পাপ থাকিবে। এ পাপ প্রবৃত্তি গ্রামে থাকিলে থাকিবেও, গ্রামের বাহিরে গেলেও থাকিবে। চেহারার একটু বদল হইবে মাত্র।

যাক, অনি-ভাইয়ের কথায় যদি উহারা কলে খাটিতে যায় তো যাক! সে বারণ করিবে না। উহাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারে ইহার অপেক্ষা বর্তমানে ভাল পথ আর নেই।

কলের মজুরও সে দেখিয়াছে। অনেকের সঙ্গে আলাপও আছে। তাহারা বেশ মানুষ। তবে একটু উচ্ছৃঙ্খল। ওই অনিরুদ্ধ সব চেয়ে ভাল নমুনা। তা হোক। উহারা যদি উপায় বেশী করে—কিছু বেশী পয়সার মদ গিলুক। কিন্তু অনিরুদ্ধের শরীরখানি কি সুন্দর হইয়াছে! কত সাহস তাহার! উহারা এমনই হোক। সে বারণ করিবে না। ঘাড়ের বোঝা নামাতে চাহিতেছে—সে বাধা দিবে না। সে মুক্তি চায়, তাহার মুক্তি আসুক।

সে আজ বাধা দিলেও তাহারা শুনিবে না। এ কথা কাল রাত্রেই তাহারা তাহাকে বলিয়া দিয়াছে। গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল—হঠাৎ গান থামিয়া গিয়া একটা প্রচণ্ড কলরব উঠিল। আপন দাওয়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিল দেবু—কলরবের প্রচণ্ডতায় সে চমকিয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। মদ বেশী খাইলে হতভাগারা মারামারি করিবেই। সকলেই বীর হইয়া উঠে। রক্তারক্তি হইয়া যায়। মনের যত চাপা আক্রোশ অন্ধকার রাত্রের সাপের মত গর্ত হইতে বাহির হইয়া ফুঁসিয়া উঠে। অনেকে আবার মারামারি করিবার জন্যই মদ খায়।

দেবু গিয়া দেখিল—সে প্রায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! মদের নেশায় কাহারও স্থির হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই, লোকগুলা টলিতেছে, সেই অবস্থাতেও পরস্পরের প্রতি কিল-ঘুষি হানাহানি করিতেছে। শত্রু-মিত্র বুঝিবার উপায় নাই। একটা জায়গায় ব্যাপারটা সঙ্গীন মনে হইল। দেবু ছুটিয়া গিয়া দেখিল—সত্যই ব্যাপারটা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। পাতু নির্মম আক্রোশে একটা লোকের—ভদ্রলোকের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। পাতু বেশ শক্তিশালী জোয়ান—তাহার হাতের পেষণে লোকটার জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেবু চিৎকার করিয়া বলিল—পাতু, ছাড় ছাড়!

পাতু গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাও। না ছাড়ব না।

দেবু আর দ্বিধা করিল না, প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসাইয়া দিল পাতুর কাঁধের উপর; পাতুর হাত খুলিয়া গেল। ছাড়া পাইয়া লোকটা বন্ বন্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল; কিন্তু পাতু আবার ছুটিয়া আসিয়াই দেবুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। দেবু ধাক্কা দিয়া কঠিন স্বরে বলিল—পাতু!

এবার পাতু থমকিয়া গেল, মত্ত-চোখের দৃষ্টি স্তিমিত করিয়া দেবুকে চিনিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—কে?

—আমি পণ্ডিত।

—কে, পণ্ডিত মশায়?…পাতু সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল—পেনাম। আচ্ছা, তুমি বিচার কর পণ্ডিত! বামুনের ছেলে হয়ে ও-বেটা মুচীপাড়ায় যখন-তখন ক্যানে

আসে ?…

ওদিকে গোলমালটা তখন থামিয়া আসিয়াছে। সকলে চাপা গলায় বলিতেছে—এ্যাই চুপ। পণ্ডিত !…কেবল একটা নিতান্ত দুর্বল লোক তখন আপন মনেই দুই হাতে শূন্যে ঘুষি খেলিয়া চলিয়াছে। পাতু বলিতেছে—নেহি মাংতা হ্যায়। তুমি শালার বাত নেহি শুনে গা। যাও !

দেবু বলিল—কি হল কি ? তোরা এসব আরম্ভ করেছিস কি ?

পাতু বলিল—আমাদের দোষ নাই। ওই সতীশ—সতীশ বাউড়ী। শালা আমার দাদা না কচু !

—কি হল ? সতীশ কি করলে ?

—বললে যাস না তোরা, যাস না।

—কি বিপদ ? যাস না কি ?

পাতু হাত দুটি জোড় করিয়া বলিল—তুমি যেন বারণ ক'র না পণ্ডিত। তোমাকে জোড়-হাত করছি।

—কি ? কি বারণ করব ?

—আমরা সব ঠিক করেছি কলে খাটব। কম্মকার সব ঠিক করে দেবে, আমি অবিশ্যি কম্মকারের সঙ্গে কলকাতা যাব। এরা সব এখানকার কলে খাটবে। তুমি যেন বারণ ক'র না।

দেবু হাসিল।

পাতু বলিল—আমরা কিন্তুক তা শুনতে লারব।

দেবু বলিল—সতীশ তার কি করলে ?

—শালা বলছে যাস না—যেতে পাবি না, গেরস্ত-ধম্ম থাকবে না। গেরস্ত-ধম্ম না কচু ! পেটে ভাত নাই—বলে ধরমের উপোস করেছি ! শালা, ভিখ মেগে খেতে হচ্ছে—গেরস্ত-ধম্ম !

একজন বলিল—উ শালার জমি আছে—হাল আছে, আমাদিগে দিক হাল-গরু-জমি, তবে বুঝি। তা না—শালা নিজে পেট ভরে খাবে, আর আমরা ভিখ মাগব আর ঘরে বসে গেরস্ত-ধম্ম করব !

পাতু বলিল—আর ওই শালা ঘোষাল !…হঠাৎ জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—না না। বেরাম্ভন। ঘোষাল মাশায়। বল তো পণ্ডিত—আমার ঘরে আসে ঘোষাল—সবাই জানে। বেশ—আসিস, পয়সা দিস, ধান দিস, বেশ কথা। তা বলে তো, আমার একটা ইজ্জৎ আছে। গোপনে আয়, গোপনে যা। তা না, আমাদের মারামারি লেগেছে আর ঘোষাল আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এল—তামাম লোকের ছামুতে। এসে মাতব্বরি করতে লেগে গেল। তাতেই ধরেছিলাম টুঁটি টিপে।…তারপর আপন মনেই বলিল—দাঁড়া দাঁড়া, যাব চলে কম্মকারের সঙ্গে—তোর পিরীতের মুখে ছাই দোব আমি। দাঁড়া।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কম্মকার কোথায় ?

—ওই, ওই শুয়ে রয়েছে।

অনিরুদ্ধ মদের নেশায় বকুলগাছ-তলাটাতেই পড়িয়াছিল; ঘুমে ও নেশায় সে প্রায় চেতনাহীন। এত গোলমালেও ঘুম ভাঙে নাই।

দেবু সকলকে বাড়ী যাইতে বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তাহারা তাহাকে বলিয়াও দিয়াছে—পণ্ডিত, তুমি বারণ করিও না। অনিরুদ্ধের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা ওই পথ বাছিয়া লইতে চাহিতেছে। আর তাহারা ভিক্ষা মাগিয়া গৃহস্থ-ধর্ম পালনের অভিনয় করিতে চায় না। উপার্জনের পথ থাকিতে—পেট ভরিয়া খাইবার উপায় থাকিতে তাহারা ক্রীতদাসত্ব অথবা ভিক্ষা করিয়া আধপেটা খাইয়া থাকিতে চায় না। সে বারণ করিবে কেন? কোন্ মুখেই বা বারণ করিবে? তা ছাড়া তাহাদের বোঝা তাহার ঘাড় হইতে নামিতে চাহিতেছে, সে ধরিয়া রাখিবে কেন? মুক্তির আগমন-পথে সে বাধা দিবে না। মুক্তি আসুক। খোকন-বিলু-শূন্য জীবন—বাড়ী-ঘর তাহার কাছে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে। সে তাহাদেরই সন্ধানে বাহির হইবে। পরলোকের আত্মাও তো ইহলোকের রূপ ধরিয়া আসিয়া প্রিয়জনকে দেখা দেয়! এমন গল্প তো কত শোনা যায়!

সকালে উঠিয়াই শ্রীহরি তাহাকে দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শাসন করিতে আসিয়াছিল। বেচারা জমিদারত্ব জাহির করিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারে নাই।

দেবু স্থির করিল—সে নিজে কলে গিয়া মালিকদের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিবে—ইহাদের কাজের ব্যবস্থা করিয়া আসিবে—শর্ত ঠিক করিয়া দিবে। শ্রীহরি যদি উহাদের বসতবাড়ী হইতে জোর করিয়া উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করে, তবে ওই বাউড়ী-ডোমদের লইয়া সে খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাইবে।

পাতু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। গতরাত্রির সে পাতু আর নাই। নিরীহ শান্ত মানুষটি।

দেবু হাসিয়া বলিল—এস পাতু!

মাথা চুলকাইয়া পাতু বলিল—এলাম।

—কি সংবাদ বল?

—কাল রেতে—

হাসিয়া দেবু বলিল—মনে আছে?

—সব নাই। আপুনি যেয়েছিলেন—লয়!

—তোমার কি মনে হচ্ছে?

—যেয়েছিলেন বলেই লাগছে।

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

মাথা চুলকাইয়া পাতু বলিল—কি সব বলেছিলাম!

—অন্যায় কিছু বল নাই। তবে ঘোষালকে হয়তো মেরে ফেলতে আমি না গেলে।

পাতু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অন্যায় হয়ে গিয়েছে বটে। তা ঘোষালেরও অন্যায় হয়েছে; মজলিসের ছামুতে আমার ঘর থেকে বেরুনো ঠিক হয় নাই মাশায়।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। এ কথার উত্তর সে কি দিবে?

পাতু বলিল—পণ্ডিত মাশায়?

—বল।

—কি বলছেন, বলেন?

—ও-কথার আমি কি উত্তর দেব পাতু?

পাতু জিভ কাটিয়া বলিল—রাম-রাম-রাম! উ কথা লয়!

—তবে?

পাতু আশ্চর্য হইয়া গেল, বলিল—আপুনি শোনেন নাই? কলে খাটতে যাওয়ার কথা?

—শুনেছি।···দেবু উঠিয়া বসিল, বলিল—শুনেছি। যাও—তাই যাও। তা নইলে আর উপায়ও নাই ভেবে দেখেছি। আমি বারণ করব না।

পাতু খুশি হইয়া দেবুর পায়ের ধুলা লইল। বলিল—পণ্ডিত মাশায়, কল তো উ-পারে অনেক কালই হয়েছে—এতদিন যাই নাই। দুঃখ-কষ্টে পড়েও যাই নাই। কিন্তু এ দুঃখ-কষ্ট আর সইতে লারছি!

দেবু জিজ্ঞাসা করিল—অনি-ভাই কোথা?

—সে জংশনে গিয়েছে। কলের বাবুদের সঙ্গে পাকা কথাবার্তা বলতে।

—বেশ। তাই যাও তোমরা। তাই যাও।

পাতু চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর দেবুও উঠিল। জগন ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া ডাকিল—ডাক্তার!

ডাক্তারের দাওয়ায় এখনও অনেক রোগীর ভিড়। ম্যালেরিয়ার নূতন আক্রমণ অবশ্য কমিয়াছে; মৃত্যু-সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু পুরানো রোগীও যে অনেক। জনকয়েক দাওয়ায় বসিয়াই কাঁপিতেছে। একজন গান ধরিয়া দিয়াছে; আপন মনেই গাহিয়া চলিয়াছে—"আমার কি হল বকুল ফুল!"

ডাক্তার ঘরের মধ্যে ওষুধ তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত ছিল। দেবুর গলার স্বর শুনিয়া সাড়া দিলে—কে? দেবু-ভাই? এস, এই ঘরের মধ্যে।

প্রকাণ্ড একটা কলাই-করা গামলায় ডাক্তার ওষুধ তৈয়ারি করিতেছিল; হাসিয়া বলিল—পাইকারি ওষুধ তৈরি করছি। কুইনিন, ফেরিপারক্লোর, ম্যাগসাল্‌ফ্‌ আর সিন্‌কোনা। একটু লাইকার আর্সেনিক দিলে ভাল হত, তা পাচ্ছি কোথায় বল? এই অমৃত—এক-এক শিশি গামলায় ডোবাব আর দেব। তারপর, কি খবর বল?

দেবু বলিল—সাহায্য-সমিতির ভার তোমাকেই নিতে হবে। একবার সময় করে হিসেব-টিসেবগুলো বুঝে নাও। তাই বলতে এলাম তোমায়।

—সে কি!

—হ্যাঁ ডাক্তার। টাকাকড়িও বিশেষ নাই, কাজও কমে এসেছে। তার ওপর বাউড়ী মুচীরা কলে খাটতে চললো। আমি এইবার রেহাই চাই ভাই। একবার তীর্থে যাব আমি।

—তীর্থে যাবে?···ডাক্তারের হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। দেবুর মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল এক অদ্ভুত বিচিত্র দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টির সম্মুখে দেবু একটু অস্বস্তি বোধ করিল। ডাক্তারের চিবুক অকস্মাৎ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল—রূঢ় অপ্রিয়ভাষী জগন ডাক্তার সে কম্পন সংযত করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

দেবু হাসিল,—গভীর প্রীতির সঙ্গে সে যেন আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া হাসিয়া বলিল —হ্যাঁ ভাই ডাক্তার। আমার ঘাড়ের বোঝা তোমরা নামিয়ে দাও।

ডাক্তার এবার আত্মসংবরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দেবু বলিল—তিনকড়ি-খুড়োর হাঙ্গামাটা মিটলেই আমি খালাস।

ছাব্বিশ

শীঘ্রই দেবুর ঘাড়ের বোঝা নামিল।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনকড়িদের দায়রায় বিচার শেষ হইয়া গেল। নিষ্কৃতির কোন পথই ছিল না তিনকড়ির। এক ছিদামের স্বীকৃতি—তাহার উপর স্বর্ণের সাক্ষ্য আরম্ভ হইতেই তিনকড়ি নিজেই অপরাধ স্বীকার করিয়া বসিল। স্বর্ণকে অনেক করিয়া উকিল শিখাইয়াছিলেন—একটি কথা 'না'। 'জানি না' 'মনে নাই' এবং 'না'—এই তিনটি তার উত্তর। প্রথম এজাহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—কি বলিয়াছে তার মনে নাই। রাম এবং তিনকড়ির মধ্যে কোন কথাবার্তা হইয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে না। এমন কথা শোনে নাই।···কিন্তু আদালতে দাঁড়াইয়া হলপ গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ যেন কেমন হইয়া গেল। সরকারী উকিলটি প্রবীণ, মামলা পরিচালনা করিয়া তাঁহার মাথায় টাকও পড়িয়াছে এবং অবশিষ্ট চুলে পাকও ধরিয়াছে; লোকচরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। কখন ধমক দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে হয়, কখন মিষ্ট কথায় কাজ হাসিল করিতে হয়—এসব তিনি ভাল রকমই জানেন। হলপ গ্রহণ করিবার পরই স্বর্ণের বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তিনি প্রথমেই গম্ভীরভাবে বলিলেন—ভগবানের নামে ধর্মের নামে তুমি হলপ করেছ, বাছা। সত্য গোপন করে যদি মিথ্যা বল, তবে ভগবান তোমার উপর বিরূপ হবেন; ধর্মে তুমি পতিত হবে। তোমার বাপেরও তাতে অমঙ্গল হবে। তারপর তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন—এই কথা তুমি বলেছ এস্-ডি-ওর আদালতে?

স্বর্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে উকিলের দিকে চাহিয়া রহিল।

উকিল একটা ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল? উত্তর দাও?

স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে তিনকড়ি কাঠগড়া হইতে বলিয়া উঠিল—আমি কবুল খাচ্ছি হুজুর। আমার কন্যাকে রেহাই দিন। আমি কবুল খাচ্ছি।

সে আপনার অপরাধ স্বীকার করিল। হ্যাঁ, আমি ডাকাতি করেছি। মৌলিক-ঘোষ পাড়ায় দোকানীর বাড়ীতে যে ডাকাত পড়েছিল তাতে আমি ছিলাম। বাড়ীতে আমি ঢুকি নাই, ঘাঁটি আগলেছি।

আপনার দোষই স্বীকার করিল—কিন্তু অন্য কাহারও নাম সে করিল না। বলিল—চিনি কেবল ছিদেমকে! ছিদেমই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল—তারই চেনা দল। আমার বাড়ীতে সে অনেক কাল কাজ করেছে। বন্যের পর ভিক্ষে করেই একরকম খাচ্ছিলাম। সাহায্য সমিতি থেকে চাল-ধান ভিক্ষে নিচ্ছি দেখে সে আমাকে বলেছিল—গেলে মোটা টাকা পাব। আমি লোভ সামলাতে পারি নি, গিয়েছিলাম। আর যাঁরা দলে ছিল—তারা কোথাকার লোক, কি নাম—আমি কিছুই জানি না। রামভল্লার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল—রাম আমাকে বলে-ছিল—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এই করলে! এই পর্যন্ত।

সকলের নাম করিয়া রাজসাক্ষী হইলে তিনকড়ি হয়তো খালাস পাইত। কিন্তু তাহা সে করিল না। তবু বিচারক তাহার নিজের দোষ স্বীকার করার জন্য আসামীদের তুলনায় তাহাকে কম সাজা দিলেন। চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল তিনকড়ির। রাম, তারিণী প্রভৃতির হইল কঠোরতর সাজা, পূর্বের অপরাধ, দণ্ড প্রভৃতির নজির দেখিয়া বিচারক তাহাদের উপর ছয় হইতে সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন।...

দেবু আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিল। যাক, একটা অপ্রীতিকর অস্বস্তিকর দায় হইতে অব্যাহতি পাইল। দুঃখের মধ্যেও তাহার সান্ত্বনা যে, তিনকড়ি-খুড়া যেমন পাপ করিয়াছিল, তেমনি সে নিজেই যাচিয়া দণ্ড গ্রহণ করিয়াছে।

রায়ের দিন সে একাই আসিয়াছিল। স্বর্ণ বা তিনকড়ির স্ত্রী আসে নাই। দণ্ড নিশ্চিত এ কথা সকলেই জানে, কেবল দণ্ডের পরিমাণটা জানার প্রয়োজন ছিল—সেইটাই তাহাদিগকে গিয়া জানাইতে হইবে।

ফিরিবার পথে একবার সে ডিস্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টার অব স্কুলসের আপিসে গেল—স্বর্ণের পরীক্ষার খবরটা জানিবার জন্য। খবর বাহির হইবার সময় এখনও হয় নাই; তবু যদি কোন সংবাদ কাহারও কাছে পাওয়া যায় সেইজন্যই গেল।

স্বর্ণ এম-ই পরীক্ষা দিয়াছে এবং ভালই দিয়াছে। প্রশ্নপত্রের উত্তরগুলি সে যাহা লিখিয়াছে, সে তাহাতে পাস হইবেই। অঙ্কের পরীক্ষায় সমস্ত অঙ্কগুলি স্বর্ণের নির্ভুল হইয়াছে।

দেবুর প্রত্যাশা স্বর্ণ বৃত্তি পাইবে। এম-ই পরীক্ষায় বৃত্তি মাসিক চারি টাকা এবং পাইবে পূর্ণ চারি বৎসর। বৃত্তি পাইলে স্বর্ণ জংশনের বালিকা বিদ্যালয়ে একটি কাজ পাইবে। শিক্ষয়িত্রীরা আশ্বাস দিয়াছেন, স্কুলের সেক্রেটারীও কথা দিয়াছেন। তাঁহাদের গরজও আছে স্কুলটাকে তাঁহারা ম্যাট্রিক স্কুল করিতে চান। চাকরি দিয়াও স্বর্ণকে তাঁহারা ক্লাশ

সেভেনে ভর্তি করিয়া লইবেন। এ হইলে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হইতে পারিবে। যে মন্ত্র সে দিতে পারে নাই, স্বর্ণ সেই মন্ত্র খুঁজিয়া পাইবে জ্ঞানের মধ্যে—বিদ্যার মধ্যে। শুধু মন্ত্রই নয়—সসম্মানে জীবিকা-উপার্জনের অধিকাব পাইয়া স্বর্ণ তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। কল্পনায় সে স্বর্ণের শুভ্র-শুচি-স্মিত রূপও যেন দেখিতে পায়। বড ভাল লাগে দেবুব। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা পরিয়া, মুখে শিক্ষা এবং সপ্রতিভতার দীপ্তি মাখিয়া, স্বর্ণ যেন তাহার চোখের সম্মুখে দাঁডায় স্মিত হাসিমুখে।

স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টারের আপিসে আসিয়া সে অপ্রত্যাশিতরূপে সংবাদটা পাইয়া গেল। জেলা শহরের বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এবং সেক্রেটারী বারান্দায় দাঁডাইয়া কথা বলিতেছিলেন। সে অদূরে দাঁডাইয়া খুঁজিতেছিল কোন পবিচিত কেবানীকে। যখন সে গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতি কবিত, তখন কয়েকজনের সঙ্গে তাহার আলাপ ছিল। হঠাৎ তাহার কানে আসিল শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন—আপনিই চিঠি লিখুন। আপনার চিঠির অনেক বেশী দাম হবে, স্কুলের সেক্রেটারী, নামকরা উকিল আপনি, আপনাব কথায় ভরসা হবে তাদের। পাডাগাঁয়ের মেয়ে তো, বৃত্তি পেলেও সহজে ঘর ছেডে শহবে পডতে আসবে না। আপনি যদি লেখেন, কোন ভাবনা নেই, হোস্টেলে ফ্রি, স্কুল ফ্রি, এ ছাডা আমরা হাত-খরচাও কিছু দেব—আপনি নিজে অভিভাবকের মত দেখবেন, তবেই হয়তো আসতে পারে।

—বেশ, তাই লিখে দেব আমি।

—হ্যাঁ, মেয়েটি অদ্ভুত নম্বর পেয়েছে। খুব ইণ্টেলিজেণ্ট মেয়ে।

—স্বর্ণময়ী দাসী। দেখুড়িয়া, পোস্ট কঙ্কণা—এই ঠিকানা তো?

—হ্যাঁ, মেয়েটির বাপের নাম বুঝি তিনকড়ি মণ্ডল। শুনলাম লোকটা একটা ডাকাতি-কেসে ধরা পডেছে! কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন তো? বাপ ডাকাত, আর মেয়ে, বৃত্তি পাচ্ছে!

দেবু আনন্দে প্রায় অধীর হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইয়া পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—তাঁহারা কি চান? কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেক্রেটারী বাবু বলিল—আচ্ছা, আমি শিবকালীপুরের জমিদারকে চিঠি লিখছি,—শ্রীহরি ঘোষকে। তাকে আমি চিনি।

দেবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে তাহার দেখা হইল এক পরিচিত কেরানীর সঙ্গে। তাহাকে নমস্কার করিয়া সে বলিল—ওই মহিলাটি আর ওই ভদ্রলোকটি কে বলুন তো?

—কে? ও, মহিলাটি এখানকার গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস আর উনি সেক্রেটারী রায়সাহেব সুরেন্দ্র বোস—উকিল। কেন বলুন তো?

—না। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। বৃত্তির কথা বলছিলেন ওঁরা।

—হ্যাঁ, আজ বৃত্তির খবর জেনে গেলেন। ওঁরা বৃত্তি পাওয়া মেয়ে যাতে ওঁদের ইস্কুলে

আসে সেই চেষ্টা করবেন। তাই আগে এসে প্রাইভেটে সব জেনে গেলেন। আমরা পাব সব দু-চার দিনের মধ্যেই। আপনি তো পণ্ডিতি ছেড়ে খুব মাতব্বরি করছেন। একটা ডাকাতি মামলার তদ্বির করলেন শুনলাম। কি রকম পেলেন?

দেবুর মনে হইল—কে যেন তাহার পিঠে অতর্কিতে চাবুক দিয়া আঘাত করিল। পা হইতে মাথা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া সে বলিল—তা বেশ, পাচ্ছিলুম বেশ, এখন হজম করতে কষ্ট হচ্ছে।

—আমাদের কিছু খাওয়ান-টাওয়ান? লোকটি দাঁত মেলিয়া হাসিতে লাগিল।

দেবু বলিল—আপনিও হজম করতে পারবেন না। বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না। স্টেশনের পথ ধরিল। শহর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া খানিকটা মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরটা পার হইয়া রেলওয়ে স্টেশন। জনবিরল মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আঃ! এইবার তাহার ছুটি। এদিকে সাহায্য সমিতির কাজ ফুরাইয়াছে, সমিতির হিসাব-নিকাশ ডাক্তারকে বুঝাইয়া দিয়াছে, সামান্য কিছু টাকা আছে, সে টাকা এখন মজুদ থাকিবে স্থির হইয়াছে। ডাক্তারকেই সে-টাকা সে দিয়া দিয়াছে। এদিকে তিনকড়ির মামলা চুকিয়া গেল, স্বর্ণ বৃত্তি পাইয়াছে। সে জংশনের ইস্কুলে চাকরিও করিবে—পড়াশুনাও চলিবে। শহরের স্কুলের চেয়ে সে অনেক ভাল। বিশেষ করিয়া সে ইস্কুলের সেক্রেটারি শ্রীহরির জানাশুনা লোক, সে মনে করে জমিদারই দেশের প্রভু, পালনকর্তা, আজ্ঞাদাতা, তাহার ইস্কুলে সে কখনই স্বর্ণকে পড়িতে দিবে না। কখনই না। জংশনের ইস্কুল অন্য দিক দিয়াও ভাল, ঘরের কাছে; জংশনে থাকিলে জগন ডাক্তার খোঁজখবর করিতে পারিবে। যাক, স্বর্ণদের সম্বন্ধেও সে একরূপ নিশ্চিন্ত। এইবার তাহার সত্য সত্যই ছুটি। আঃ, সে বাঁচিল!

•

জংশনে সে যখন নামিল, তখন বেলা আর নাই। সূর্য অস্ত গিয়াছে, দিনের আলো ঝিকিমিকি করিতেছে ময়ূরাক্ষীর বালুময় গর্ভের পশ্চিম প্রান্তে, যেখানে মনে হয় ময়ূরাক্ষীর দুটি তটভূমি একটি বিন্দুতে মিলিয়া দিগন্তের বনরেখার মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর গর্ভ প্রায় জলহীন। শীতের দিন, নদীর গর্ভে বালিতে ঠাণ্ডার আমেজ লাগিয়াছে ইহারই মধ্যে। নদীর বিশীর্ণ ধারায় ক্বচিৎ কোথাও জল এক হাঁটু। ঘাটে আসিয়া দেবু মুখ-হাত ধুইয়া একটু বসিল। তাহার জীবনে কিছুদিন হইতে অবসাদ আসিয়াছে—আজ সে অবসাদ যেন শেষরাত্রির ঘুমের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। খোকন আগের দিন মারা গিয়াছিল—পরের দিন রাত্রি দুইটার সময় মারা গিয়াছিল বিলু। সেদিন শেষ রাত্রে যেমন ভাবে ঘুম তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—আজ অবসাদও তেমনিভাবে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যাক্, কাজ তাহার শেষ হইয়াছে। পরের বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়াছে—ভূতের ব্যাগার খাটার আজ হইতে পরিসমাপ্তি। আর কোন কাজ নাই—কোন দায়িত্ব নাই।

দেবুর মনে পড়িয়া গেল—ন্যায়রত্ন সেদিন ঠিক এইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। সে উদাস দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিল। ময়ূরাক্ষীর জলপ্রবাহের পর বালির রাশি, তারপর চর, এ-দেশে বলে—'ওলা', ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে এবার চাষ বিশেষ হয় নাই, উর্বর পলিমাটি ফাটিয়া উষর হইয়া পড়িয়া আছে। চরভূমির বাঁধ। বাঁধের ওপাশে পঞ্চগ্রামের মাঠ। বন্যার পর আবার তাহাতে ফসলের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। সে অবশ্য নামে মাত্র। পঞ্চগ্রামের মাঠকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া পঞ্চগ্রাম। সাড়া নাই, শব্দ নাই, জরাজীর্ণ পাঁচখানা গ্রাম যেন চর্ম-কঙ্কালের বোঝা লইয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। শীত-সন্ধ্যার সূর্যালোকের শেষ আভার মধ্য হইতে উত্তাপ ইহারই মধ্যে উপিয়া গিয়াছে। দেবু উঠিল। জল পার হইয়া বালি ভাঙিয়া সে আসিয়া উঠিল বাঁধের উপর। স্বর্ণদের বাড়ীতে খবর দিয়া বাড়ী ফেরাই ভাল মনে হইল। তিনকড়ির সাজা অনিবার্য—এ তাহারাও জানে, তবু তাহারা উদ্বেগ লইয়া বসিয়া আছে। মানুষের মন ক্ষীণতম আশাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া মানুষ কুটা ধরিয়া বাঁচিতে চায় কথাটা অতিরঞ্জিত, কিন্তু সামান্য একটা গাছের ডাল দেখিলে সেটাকে সে ছাড়ে না—এটা সত্য কথা। স্বর্ণ এখনও আশা করিয়া আছে যে, তাহার বাবা যখন দোষ স্বীকার করিয়াছে, তখন জজসাহেব মৌখিক শাসন করিয়াই ছাড়িয়া দিবেন। সাজা দিলেও অতি অল্প কয়েক মাসের সাজা হইবে। এ সংবাদে স্বর্ণ আঘাত পাইবে—কিন্তু উপায় কি? স্বর্ণের বৃত্তি পাওয়ার সংবাদটাও দেওয়া হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেবু স্বর্ণের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিবে। সব কাজ সারিয়া শেষ করিতে হইবে। আর নয়। সে একবার বাহির হইতে পারিলে বাঁচে।

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল—বাঁধের পাশে ময়ূরাক্ষীর চরের উপর জঙ্গলের ভিতরে যেন নিঃশব্দ ভাষায় কাহারা কানাকানি হাসাহাসিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। পাশেই শ্মশান। দেবুর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার বিলু এবং খোকন এইখানেই আছে। তবে কি তাহারাই? হ্যাঁ, তাহাদের দেহ নাই, কণ্ঠযন্ত্রের অভাবে বুকের কথা শব্দহীন বায়ুপ্রবাহের মত শুনাইতেছে। তাহারা মায়ে-ছেলেতে বোধ করি খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। হাসাহাসি কানাকানির ঢেউ শূন্যলোক ভরিয়া গিয়া লাগিয়াছে গাছের মাথায় মাথায়। শ্মশানের ভিতর জঙ্গলের মধ্যে—অশরীরী আত্মা দুটি ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে। খেলায় মাতিয়া তাহারা যেমন নাচিয়া-নাচিয়া চলিয়াছে, তাহাদের চলার বেগের আলোড়নে শীতের ঝরা পাতার মধ্যে ঘূর্ণি জাগিয়াছে; বোধ হয় খোকন ছুটিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য পিছন পিছন ছুটিয়াছে বিলু। ঠিক তাই। তাহাদের উল্লসিত চলার চিহ্ন—পাতার ঘূর্ণি এ গাছের আড়াল হইতে ও গাছের আড়ালে চলিয়াছে নাচিয়া-নাচিয়া। দেবু আর এক পা নড়িতে পারিল না। সে যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল। ভয়-বিস্ময়-আনন্দ সব মিশাইয়া সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! তাহার ইচ্ছা হইল—সে একবার চিৎকার করিয়া ডাকে—বিলু—বিলু—খোকন! কিন্তু তাহার গলা দিয়া

স্বর বাহির হইল না। কিন্তু তাহারাও কি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না? তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে তাহাদের এত অবহেলা কেন? পরের বোঝা দশের কাজ লইয়া ভুলিয়া আছে—এইজন্য? কয়েক মুহূর্ত পরেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য অশরীরীদের পদক্ষেপ স্তব্ধ হইয়া গেল। তবে তাহারা কি তাহাকে দেখিয়াছে? হ্যাঁ। ঐ যে আবার নিঃশব্দ ভাষায়—আর হাসাহাসি-কানাকানি নাই—এবার নিঃশব্দ অভিমান-ভরা একটানা সুর উঠিয়াছে। এবার যেন তাহারা ডাকিতেছে—আয়—আয়—আয়—আয়। আকাশে বাতাসে—গাছের মাথায় মাথায়—পঞ্চগ্রামের মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে সেই নিঃশব্দ ভাষার উতরোল আহ্বান। হ্যাঁ, তাহারাই তাহাকে ডাকিতেছে। তাহার সর্বশরীর ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিয়া উঠিল—সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রী যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। হাতের পায়ের আঙুলের ডগায় যেন আর স্পর্শবোধ নাই। কতক্ষণ যে এইভাবে অসাড় অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল কে জানে, হঠাৎ একটা দূরাগত ক্ষীণ সুরধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। শব্দের স্পর্শের মধ্য দিয়া জীবিত মানুষের সঙ্গে অস্তিত্ববোধ তাহার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিকে সচেতন করিয়া তুলিল, সকালের রৌদ্রের আলোক ও উত্তাপের স্পর্শে—রাত্রের মুদ্রিত দলপদ্মের মত আবার দল মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার ভুল ভাঙিল; বুঝিল' বিলু-খোকনের হাসাহাসি কানাকানি নয়, বাতাস ও গাছের খেলা; শীতের বাতাসে—তালগাছের মাথায় পাতায়-পাতায় শব্দ উঠিতেছে। জঙ্গলের ঝরা পাতায় ঘূর্ণি জাগিয়াছে। ওদিকে পিছনে—ময়ূরাক্ষী-গর্ভে মানুষের গান ক্রমশঃ নিকটে আগাইয়া আসিতেছে।

কাহারা গান গাহিতে গাহিতে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া এই দিকেই আসিতেছে। শুক্লপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীর একফালি চাঁদ রূপার কাস্তের মত পশ্চিম আকাশে মৃদু দীপ্তিতে জল্‌-জল্‌ করিতেছে; প্রকাণ্ড বড় ঘরে প্রদীপের আলোর মত অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না। লোকগুলি আসিতেছে—অস্পষ্ট ছায়ার মত। অনেকগুলি লোক, স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে দল বাঁধিয়া আসিতেছে। হঠাৎ মনে পড়িল—ও! বাউড়ী, মুচি, ডোমেরা সব কলে খাটিয়া ফিরিতেছে। এতক্ষণে দেবু চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে ভাবিতেছিল—বিলুর কথা নয়, খোকনের কথা নয়, ঐ লোকগুলির কথা। উহাদের সাড়ায় সে যে আশ্বাস আজ পাইয়াছে, তাহা সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। উহাদের মঙ্গল হউক। তাহাদের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া দেবুর আনন্দ হইল। তবু ইহারা অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। দেড় মাস এখনও হয় নাই, ইহাদের মধ্যে অনেকে তিষ্ঠিয়াছে। অভাব-অভিযোগ অনেক আছে, তবুও দু-বেলা দু-মুঠা জুটিতেছে। বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই সকলে ঢোল পাড়িয়া বসিবে। ইহাদের সম্বন্ধে দেবু নিশ্চিন্ত হইয়াছে। একটা বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়াছে। এইবার আজই স্বর্ণদের বোঝা নামাইবার ব্যবস্থা সে করিয়া আসিবে। অনেক বোঝা সে বহিল—আর নয়। ইহার মধ্যে কতদিন কতবার সে ভগবানের কাছে বলিয়াছে—হে ভগবান্‌, মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও।...কিন্তু মুক্তি পায় নাই। কতদিন বিলু ও খোকার চিতার পাশে কাঁদিবে বলিয়া

বাহির হইয়াও কাঁদিতে পায় নাই। মানুষ পিছনে পিছনে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মুহূর্তে তাহার মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল বিলু-খোকাকে ভুলিয়া থাকিয়া তাহার মনের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আজ নির্জন ঐ শ্মশানের ধারে দাঁড়াইয়া বিলু খোকার অশরীরী অস্তিত্বের আভাস অনুভব মাত্রেই তাহার মন চেতনা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরে অন্তরে পরিত্রাণ চাহিয়া সারা হইয়া গেল। ঐ মানুষ কয়টির সাড়া পাইয়া তাহার মনে হইল সে যেন বাঁচিল। নিজেকে নিজেই ছি-ছি করিয়া উঠিল। সংকল্প করিল—না, আর নয়, আর নয়।

দেখুড়িয়ায় ঢুকিবার মুখেই কে অন্ধকারের মধ্যে ডাকিল —কে? পণ্ডিত মাশায় নাকি?

চিন্তামগ্ন দেবু চমকিয়া উঠিল—কে?

—আমি তারাচরণ।

—তারাচরণ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সদর থেকে ফিরলেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তিনকড়ির মেয়াদ হয়ে গেল? কতদিন?

—চার বছর।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ বলিল—অন্যায় হয়ে গেল পণ্ডিত মাশায়। ঘরটা নষ্ট হয়ে গেল।...তারপর হাসিয়া বলিল—কোন্ ঘরটাই বা থাকল?. রহম-চাচারও আজ সব গেল।

—সব গেল! মানে?

—দৌলতের কাছে হ্যাণ্ডনোট ছিল, তার নালিশ হয়েছিল; সুদে-আসলে সমান সমান, তার ওপর আদালত-খরচা চেপেছে। প্রথম আজ অস্থাবর হল। কি আর অস্থাবর? মেরেকেটে পঞ্চাশটা টাকা হবে। বাকীর জন্য জমি ক্রোক হবে। জমিতে খাজনা বাকী পড়ে এসেছে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। সে যেন পথ চলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

পরামাণিক বলিল—এ আর রহম-চাচা সামলাতে পারবে না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারাচরণ বলিল—একটা কথা শুধোব পণ্ডিত মাশাই?

—বল।

—আপনি নাকি তিনকড়ির কন্যের বিয়ে দেবেন? বিধবা বিয়ে?

দেবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কে বললে তোমায়?

তারাচরণ চুপ করিয়া রহিল।

দেবু উষ্ণ হইয়াই বলিল—তারাচরণ!

—আজ্ঞে?

—কে রটাচ্ছে এসব কথা বল তো? শ্রীহরি বুঝি?

—আজ্ঞে না।

—তবে ?

তারাচরণ বলিল—ঘোষাল বলছিল।

—হরেন ঘোষাল !

—হ্যাঁ।

দপ করিয়া মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু কি বলিবে দেবু খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ পর বলিল—মিছে কথা তারাচরণ। তবে হ্যাঁ, স্বর্ণ রাজী হলে ওর বিয়ে আমি দিতাম।

স্বর্ণদের বাড়ীতে যখন দেবু আসিয়া উঠিল—তখন মা ও মেয়ে একটি আলো সামনে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সমস্ত শুনিয়া তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহ একটা কথা বলিতে পারিল না।

তারপর দেবু স্বর্ণের বৃত্তি পাওয়ার সংবাদ দিল। তাহা শুনিয়াও স্বর্ণ মুখ তুলিল না।

স্বর্ণের মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—আমি আপনাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলাম। স্বর্ণের মা বলিল—তুমি যা বলবে তাই করব। তুমি ছাড়া আর তো কেউ নাই আমাদের।

এমন সকরুণ স্বরে সে কথা কয়টি বলিল যে, দেবু কিছুতেই বলিতে পারিল না যে আমি আর কাহারও বোঝা বহিতে পারিব না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—আমি তো এখানে থাকব না খুড়ী-মা !

—থাকবে না ?

স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল ; এতক্ষণে সে বলিল—কোথায় যাবেন দেবু-দা ?

—তীর্থে যাব ভাই।

—তীর্থে ?

—হ্যাঁ ভাই, তীর্থে। শূন্য ঘর আর আমার ভাল লাগছে না।

স্বর্ণ আর কোন কথা বলিতে পারিল না। স্তব্ধ নীরব হইয়া গেল মাটির পুতুলের মত। কিছুক্ষণ পর আলোর ছটায় দেবুর নজরে পড়িল স্বর্ণের চোখ হইতে নামিয়া আসিতেছে জলের দুটি ধারা। সে মুখ ঘুরাইয়া লইল। মমতায় তাহার অবিশ্বাস নাই, তাহার প্রাণে অফুরন্ত মমতা। এখানকার মানুষকে সে ভালবাসে নিতান্ত আপনজনেরই মত। এক শ্রীহরি ছাড়া কাহারও সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য নাই। এখানকার মানুষ তো দূরের কথা—এখানকার পথের কুকুরগুলিও তাহার বাধ্য ও প্রিয়। গ্রামের কয়েকটা কুকুর ইদানীং উচ্ছিষ্ট-লোভে জংশনে গিয়া পড়িয়াছে। তাহারা জংশনে তাহাকে দেখিয়া আজও যে আনন্দ প্রকাশ করে

—সে তাহার মনে আছে। আজই দুইটা কুকুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ময়ুরাক্ষীর ঘাট পর্যন্ত আসিয়াছিল। এখানকার গাছপালা, ধুলা-মাটির উপরে তাহার এক গভীর মমতা। এই গ্রাম লইয়া কতবার কত কল্পনাই সে করিয়াছে! কত অবসর-সময়ে কাগজের উপর গ্রামের নকশা আঁকিয়া পথঘাটের নূতন পরিকল্পনা করিয়াছে! কোথায় সাঁকো হইলে উপকার হয়, কোথায় অসমান পথ সমান হইলে সুবিধা হয়, বাঁকা পথ সোজা হইলে ভাল লাগে, বন্ধ পথকে বাড়াইয়া গ্রামান্তরের সঙ্গে যুক্ত করিলে ভাল হয়—কত চিন্তা করিয়া ছবি আঁকিয়াছে। গ্রামের লোক, এ অঞ্চলের লোকও তাহাকে ভালবাসে এ কথা সে জানে। তাহারাই আবার তাহাকে পতিত করে, তাহার গায়ে কলঙ্কের কালি লেপিয়া দেয়, তাহাকে আড়ালে ব্যঙ্গ করে —তবুও তাহারা তাহাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা দেবুও অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। কিন্তু সে মমতার প্রতি ফিরিয়া চাহিলে আর তাহার যাওয়া হইবে না। সে আপনাকে সংযত করিয়া মুখ ফিরাইয়াই বলিল—তোমার ব্যবস্থা—যা বলেছিলাম আমি, তাতে তোমার অমত নাই তো?

স্বর্ণ মাটির দিকে চাহিয়া বোধ করি বারকয়েক ঠোঁট নাড়িল, কোন কথা বাহির হইল না।

দেবু বলিয়া গেল—আমার ইচ্ছা তাই। ভেবে দেখ—এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা কিছু হতে পারে না তোমাদের। জংশনের স্কুলে চাকরি করবে, পড়বে। তোমার মাইনে বৃত্তি প্রভৃতিতে নগদ পনের-ষোল টাকা হবে। ওদের চেপে ধরলে কিছু বেশীও হতে পারে। এর ওপর সতীশকে আমার জমি ভাগে দিলাম—সে তোমাদের মাসে এক মণ হিসেবে চাল দিয়ে আসবে। স্বাধীনভাবে থাকবে। ভবিষ্যতে ম্যাট্রিক পাস করলে চাকরিতে আরও উন্নতি হবে। লেখাপড়া শিখলে মনেও বল বাড়বে। কতজনকে তখন তুমিই আশ্রয় দেবে—প্রতিপালন করবে। আর গৌরও নিশ্চয় ফিরবে এর মধ্যে।

দেবু চুপ করিল। স্বর্ণের উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না। দেবু আবার প্রশ্ন করিল—খুড়ী-মা?

একান্ত অনুগৃহীতজনের মানিয়া লওয়ার মতই স্বর্ণের মা দেবুর কথা মানিয়া লইল—তুমি যা বলছ তাই করব বাবা।

দেবু বলিল—স্বর্ণ?

—বেশ।...একটি কথায় স্বর্ণ উত্তর দিল।

দেবু এবার মুখ ফিরাইয়া স্বর্ণের দিকে চাহিল। স্বর্ণ এখনও আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই, তাহার চোখের কোণের জলের ধারাটি এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

দেবু উঠিয়া পড়িল; এসবই তাহার না-জানার অভিনয়ের পিছনে ঢাকা পড়িয়া থাকা ভাল। নহিলে কাঁদিবে অনেকেই।

•

তিন দিন পর যখন দেবু বিদায় লইল, তখন সত্যসত্যই অনেকে কাঁদিল।

বাউড়ীরা কাঁদিল। সতীশের ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল—চোখে জল টল্‌মল্‌ করিতেছিল। সে বলিল—আমাদের দিকে চেয়ে কে দেখবে পণ্ডিত মাশায়!

পাতু নাই, সে অনিরুদ্ধের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে—নহিলে সেও কাঁদিত। পাতুর মা হাউমাউ করিয়া কাঁদিল—আঃ, বিলু মা রে! তোর লেগে জামাই আমার সন্নেসী হয়ে গেল।

আশ্চর্যের কথা, ইহাদের মধ্যে দুর্গা কাঁদিল না। সে বিরক্ত হইয়া মাকে ধমক দিল—মরণ! থাম বাপু তুই!—

দেবুর জ্ঞাতিরা কাঁদিল। রামনারায়ণ কাঁদিল, হরিশ কাঁদিল—শ্রীহরিও বলিল—আহা, বড় ভাল লোক! তবে এইবার দেবু খুড়ো ভাল পথ বেছে নিয়েছে।

হরেন ঘোষালও কাঁদিল—ব্রাদার, আবার ফিরে এসো।

জগন ডাক্তারও দেবুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করিয়া কাদিল, বলিল—আমিও জংশনে জায়গা কিনছি, এখানকার সব বেচে দিয়ে ওখানেই গিয়ে বাস করব। এ গাঁয়ে আর থাকব না।

ইরসাদ আসিয়াছিল। সেও চোখের জল ফেলিয়া বলিয়া গেল—দেবু-ভাই, এবাদতের কাজে বাধা দিতে নাই। বারণ করব না—খোদাতালা তোমার ভালই করবেন। কিন্তু আমার দোস্ত কেউ রইল না।

রহম আসে নাই। কিন্তু সে-ও নাকি কাঁদিয়াছে। ইরসাদই বলিয়াছে—রহম-চাচার চোখ দিয়ে পানি পড়ল ঝর্‌-ঝর্‌ করে। বললে—ইরসাদ বাপ, তুমি বারণ করিয়ো। সব্বস্বান্ত হয়েছি— এ মুখ দেখাতে বড় সরম হয়। নইলে আমি যাতাম—বুলতাম যেয়ে দেবুকে।

ময়ূরাক্ষী পার হইয়া সে একবার ফিরিয়া দাড়াইল। পঞ্চগ্রামের দিকে চাহিয়া দাড়াইল। ওপারের ঘাটে একটি জনতা দাঁড়াইয়া আছে। সে চলিয়া যাইতেছে দেখিতেছে। তাহাদের পিছনে বাঁধের উপরে কয়েকজন, দূরে শিবকালীপুরের মুখে দাড়াইয়া আছে মেয়েরা।

দেবুর মনে পড়িল—এককালে এ রেওয়াজ ছিল, তখন কেহ কোথাও গেলে গ্রাম ভাঙিয়া লোক বিদায় দিতে আসিত। পঞ্চগ্রামে যখন ছিল ঘরে ঘরে ধান, জোয়ান পুরুষ, আনন্দ-হাসি-কলরব, যখন বৃদ্ধেরা তীর্থে যাইত, গ্রামের লোকেরা তখন এমনই ভাবে বিদায় দিতে আসিত। ক্রমে ক্রমে সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। আপনিই উঠিয়া গিয়াছে। আজ উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও মানুষের অন্ন জোটে না, শক্তি নাই—কঙ্কালসার মানুষ শোকে ম্রিয়মাণ, রোগে শীর্ণ; তবু তাহারা আসিয়াছে, এতটা পথ আসিয়া অনেকে হাঁপাইতেছে, তবু আসিয়াছে—ঘোলাটে চোখ হতাশা-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া এই বিদায়ী বন্ধুটির দিকে চাহিয়া আছে।

দেবু তাহাদের দিকে পিছন ফিরিল। নাঃ, আর নয়। সকলকে হাত তুলিয়া দূর হইতে নমস্কার জানাইয়া শেষ বিদায় লইল। সে আর ফিরিবে না। সে জানে ফিরিলেও আর সে পঞ্চগ্রাম দেখিতে পাইবে না। এখানকার মানুষের পরিত্রাণ নাই। জীবনের গাছের শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে। পঞ্চগ্রামের মাটি থাকিবে—মানুষগুলি থাকিবে না। পাতা-ঝরা শুকনা

গাছের মত বসতিহীন পঞ্চগ্রামের রূপ তাহার চোখের সামনে যেন ভাসিয়া উঠিল।

না—সে আর ফিরিবে না।

আসে নাই কেবল স্বর্ণ ও স্বর্ণের মা। স্বর্ণের জন্য স্বর্ণের মা আসিতে পারে নাই। দুর্গা বলিল, স্বর্ণ কাঁদিতেছে, সেদিন সে-রাত্রে বাপের উপর জেলের হুকুমের কথা শুনিয়া সেই যে বিছানায় পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে শুরু করিয়াছে, তাহার আর বিরাম নাই।

দেবু কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাড়াইল। যাইবার সময় স্বর্ণ ও স্বর্ণের মাকে না দেখিয়া সে একটু দুঃখিত হইল। দেবুর মনে হইল—সে ভালই করিয়াছে। আর সে ফিরিবে না।...

মাস ছয়েক পর।

দেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে আবার একটা দেশপ্রেমের জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে। যাদুমন্ত্রে যেন প্রতিটি প্রাণের প্রদীপে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা। সে উত্তেজনায় শহর-গ্রাম চঞ্চল—পল্লীর প্রতিটি পর্ণকুটীরেও সে উচ্ছ্বাসের স্পর্শ লাগিয়াছে। উনিশ-শো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চগ্রামেও উত্তেজনা জাগিয়াছে।

জগন ডাক্তার আসিয়াছিল জংশন স্টেশনে। তাহার পরনে খদ্দরের জামা-কাপড, মাথায় টুপি। ডাক্তারও এই উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে সে বিদায় দিতে আসিয়াছে। গাড়ীতে তাঁহাকে তুলিয়া দিল, ট্রেনখানা চলিয়া গেল। জগন ফিরিল। হঠাৎ তাহার পিঠে হাত দিয়া কে ডাকিল—ডাক্তার!

জগন পিছন ফিরিয়া দেখিয়া আনন্দে উৎসাহে যেন জ্বলিয়া উঠিল, দুই হাত প্রসারিত করিয়া দেবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দেবু-ভাই, তুমি?

—হ্যাঁ ডাক্তার, আমি ফিরে এলাম।

—আঃ। আসবে আমি জানতাম দেবু-ভাই। আমি জানতাম।

হাসিয়া দেবু বলিল—তুমি জানতে?

—রোজই তোমায় মনে করি, হাজারবার তোমার নাম করি। সে কি মিথ্যে হয় দেবু-ভাই! অন্তর দিয়ে ডাকলে পরলোক থেকে মানুষের আত্মা এসে দেখা দেয়, কথা কয়, তুমি তো পৃথিবীতে, এই দেশেই ছিলে।...ডাক্তার হাসিল।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না ডাক্তার, মানুষের আত্মা আর আসে না। আজ তিন মাস অহরহ ডেকেও তো কিছু দেখতে পেলাম না!

কথাটায় ডাক্তার খানিকটা স্তিমিত হইয়া গেল। নীরবে পথ চলিয়া তাহারা নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবু বলিল—বস ভাই ডাক্তার। খানিকটা বস।

—বসবার সময় নাই ভাই। চলি, আজ আবার মিটিং আছে।

—মিটিং!

—কংগ্রেসের মিটিং। আমাদের এখানে মুভমেণ্ট আমরা আরম্ভ করে দিয়েছি কিনা। আজ মাদক বর্জনের মিটিং।

দেবু উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—তুমি চলে গেলে! হঠাৎ একদিন তিনকড়ির ছেলে গৌর এসে হাজির হ'ল একটা মস্ত বড় পতাকা নিয়ে—কংগ্রেস ফ্ল্যাগ। বললে—২৬শে জানুয়ারী এটা তুলতে হবে।

—গৌর ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ। সেই তো এখন আমাদের কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। সে এখান থেকে চলে গিয়ে কংগ্রেস-ভলেণ্টিয়ার হয়েছিল। ফিরে এসেছে গাঁয়ের কাজ করবে বলে। তুমি নাই দেখে বেচারা বড় দমে গেল। বললে—দেবু-দা নাই! কে করবে এসব? আমি আর থাকতে পারলাম না দেবু-ভাই,—নেমে পড়লাম। উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ডাক্তার অনর্গল বলিয়া গেল সে-কাহিনী। বলিল—ঘরে ঘরে চরকা চলছে, প্রায় সমস্ত বাউড়ী-মুচীই মদ ছেড়েছে, গাঁয়ে পঞ্চায়েত করেছি, চারদিকে মিটিং হচ্ছে। চল, নিজের চোখেই দেখবে সব। এইবার তুমি এসেছ, এইবার বান ডাকিয়ে দোব। তোমাকে কিন্তু ছাড়ব না। তুমি যে মনে করছ দুদিন পরেই চলে যাবে, তা হবে না।

দেবু বলিল—আমি যাব না ডাক্তার। সেই জন্যই আমি ফিরে এলাম। তোমাকে তো বললাম, অনেক ঘুরলাম ক-মাস। ছাব্বিশে জানুয়ারী আমি এলাহাবাদে ছিলাম। সেখানে সেদিন জহরলালজী পতাকা তুললেন, দেখলাম। সেদিন একবার গাঁয়ের জন্য মনটা টন্‌-টন্‌ করে উঠেছিল ডাক্তার, সেদিন আমি কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিল—সব জায়গায় পতাকা উঠল—বুঝি আমাদের পঞ্চগ্রামেই উঠল না। সেখানে মানুষ শুধু দুঃখ বুকে নিয়ে—ঘরের ভেতরে মাথা হেঁট করেই বসে রইল এমন দিনে। ফিরে আসতেও ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু জোর করে মনকে বললাম—না, যে পথে বেরিয়েছিস্, সেই পথে চল্।...তারপর কিছুদিন ওখানে ত্রিবেণী-সঙ্গমে কুঁড়ে বেঁধে ছিলাম। দিনরাত ডাকতাম বিলুকে খোকনকে! সেখানে ভাল লাগল না। এলাম কাশী। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে গিয়ে বসে থাকতাম। এই শ্মশানেই হরিশ্চন্দ্রের রোহিতাশ্ব বেঁচেছিল। কিন্তু—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—তোমার কথা হয়তো মিথ্যে নয়। প্রাণ দিয়ে ডাকলে পরলোকের মানুষ আসে, দেখা দেয়। আমি হয়তো প্রাণ দিয়ে ডাকতে পারি নি। ন্যায়রত্ন মশাই কাশীতে ছিলেন তো, তিনি আমাকে বলেছিলেন—পণ্ডিত, তুমি ফিরে যাও। এ পথ তোমার নয়। এতে তুমি শান্তি পাবে না। তা ছাড়া পণ্ডিত, ধ্যান করে ভগবানকে মেলে। কিন্তু মানুষ মরে গেলে সে আর ফেরে না, তাকে আর পাওয়া যায় না। বাইরে দেখতে পাওয়ার কথা পাগলের কথা, মনের মধ্যেও তাকে পাওয়া যায় না।...যত দিন যায়,

তত সে হারিয়ে যায়। নইলে আর মরণের ভয়ে অমৃত খোঁজে কেন মানুষ! আমার শশীকে আমি ভুলে গিয়েছি পণ্ডিত। তোমাকে সত্য বলছি আমি, তার মুখ আমার কাছে ঝাপসা হয়ে এসেছে। তা নইলে বিশ্বনাথের ছেলে অজয়কে নিয়ে আমি আবার সংসার বাঁধি?···

তা ছাড়া···দেবু বলিল—ঠাকুর মশায় একটা কথা বললেন, পণ্ডিত, যে মরে, তাকে আর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না, মানুষের মনেও সে থাকে না; থাকে—সে যা দিয়ে যায়—তারই মধ্যে। শশী আমাকে দিয়ে গিয়েছে সহ্যগুণ। আমার মধ্যে সে তাতেই বেঁচে আছে। তোমার স্ত্রীকে একদিন দেখেছিলাম—শান্ত হাস্যময়ী মেয়ে। তোমাকেও আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি। তুমি ছিলে অত্যন্ত উগ্র, অসহিষ্ণু। আজ তুমি এমন সহিষ্ণু হয়েছ—তার কারণ তোমার স্ত্রী। সে তো হারায় নি। সে তো তোমার মধ্যেই মিশে রয়েছে। বাইরে যা খুঁজছ পণ্ডিত, সে তাদের নয়—সেটা তোমার ঘর-সংসারের আকাঙ্ক্ষা।···দেবু চুপ করিল। জগনও কোন উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—আজও ঠিক বুঝতে পারলাম না ডাক্তার, আমার মন ঠিক কি চায়! বিলু-খোকনকে ভাবতে বসতাম, তারই মধ্যে মনে হত গাঁয়ের কথা, তোমাদের কথা। তোমার কথা, দুর্গার কথা, চৌধুরীর কথা। গৌরের কথা—যাক্ সে দুষ্টু তা হলে ফিরেছে!

ডাক্তার বলিল—অদ্ভুত উৎসাহ গৌরের! আশ্চর্য ছেলে! ওর বোন স্বর্ণও খুব কাজ করছে। চরকার ইস্কুল করছে। চমৎকার সুতো কাটে স্বর্ণ।

—স্বর্ণ! স্বর্ণ পড়ছে তো? চাকরি করছে তো?

—হ্যাঁ। তবে চাকরি আর থাকবে কিনা সন্দেহ বটে।

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যায় যাবে। তাই তো ভাবতাম ডাক্তার। যখন দেখতাম চারিদিকে মিটিং, শোভাযাত্রা, দেখতাম মাতাল মদ ছাড়লে, নেশাখোর নেশা ছাড়লে, ব্যবসাদার লোভ ছাড়লে, রাজা, ধনী, জমিদার, প্রজা, চাষী, মজুর—একসঙ্গে গলাগলি করে পথ চলছে—তখন আমার চোখে জল আসত। সত্যি বলছি ডাক্তার, জল আসত। মনে হত আমাদের পঞ্চগ্রামে হয়তো কোন পরিবর্তনই হল না—কিছু হয় নাই। শেষটা আর থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম।

ডাক্তার বলল—চল, দেখবে অনেক কাজ হয়েছে।···হাসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—যা গৌর-চেলা ছেড়ে গিয়েছ তুমি!

গৌর জ্বলিয়া উঠিল প্রদীপের শিখার মত। দেবু-দা!

স্বর্ণ প্রণাম করিয়া অতি নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল,—ফিরে এলেন!

দুর্গা বলিল—তাহারও লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই,—গাঢ়স্বরে সর্বসমক্ষে বলিল,—পরাণটা জুড়ালো জামাই-পণ্ডিত।

গৌর বলিল—এইখানেই মিটিং হবে আজ। এইখানেই ডাক, সবাইকে খবর দাও। বল—দেবু-দা এসেছে। সে বাহির হইয়া পড়িল।

দেবুর বাড়ীতেই কংগ্রেস কমিটির অফিস; আপন দাওয়ায় বসিয়া দেবু দেখিল—গৌর আয়োজনের কিছু বাকি রাখে নাই। স্বর্ণ তাহাকে ডাকিল—আসুন দেবু-দা, হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া দেবু বিস্মিত হইল। ঘরখানার শ্রী যেন ফিরিয়া গিয়াছে, চারিদিক নিপুণ যত্নে মার্জনায় ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। দেবু বলিল—বাঃ! এখন এ বাড়ীর যত্ন কে করে?

স্বর্ণ বলিল—আমি। আমরা তো এখানে থাকি।

দেবু বলিল—খুড়ী-মা কই?

স্বর্ণ বলিল—মা নেই দেবু-দা।

দেবু চমকিয়া উঠিল—খুড়ী-মা নেই!

—না। মাস-দুয়েক আগে মারা গিয়েছেন।

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বড় দুঃখিনী ছিলেন খুড়ী-মা। হাত-মুখ ধুইয়া সে নিজের সুটকেসটি খুলিয়া, একখানা খদ্দরের শাড়ী বাহির করিয়া স্বর্ণকে দিয়া বলিল—তোমার জন্যে এনেছি।

স্বর্ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ম্লান হইয়া গেল, ম্লান মুখে বলিল—এ যে লাল চওড়া-পেড়ে শাড়ী দেবু-দা?

দেবু চমকিয়া উঠিল, স্বর্ণ বিধবা—একথা তাহার মনেই হয় নাই! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—তা হোক। তবু তুমি পরবে। হ্যাঁ, আমি বলছি।

গৌর আসিয়া ডাকিল—আসুন দেবু-দা। সব এসে গিয়েছে।

দেবু বাহিরে আসিল। সমস্ত গ্রামের লোক আসিয়াছে। দেবুকে দেখিয়া তাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া আসিল। শীর্ণ, অনাহার-ক্লিষ্ট মুখের মধ্যে চোখগুলি জল্‌-জল্‌ করিতেছে। সে যেদিন যায় সেদিন এই চোখগুলি ছিল যেন নির্বাণমুখী প্রদীপের শিখার মত। আজ আবার সেগুলি প্রাণের ছবি সংযোগে জল্‌-জল্‌ করিয়া জ্বলিতেছে দীপ্ত শিখায়। উচ্ছ্বাসে উত্তেজনায়, জাগরণের চাঞ্চল্যে শীর্ণদেহ মানুষগুলি দৃঢ়তার কাঠিন্যে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়া আছে। সে অবাক্‌ হইয়া গেল। সে পঞ্চগ্রামের মানুষের ধ্বংস নিশ্চিত ভাবিয়া চলিয়া গিয়াছিল—তাহারা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে; কণ্ঠে স্বর জাগিয়াছে, চোখে দীপ্তি ফুটিয়াছে, বুকে একটা নূতন আশা জাগিয়াছে।

দাওয়া হইতে দেবু জনতার মধ্যে নামিয়া আসিল।

সাতাশ

তিন বৎসর পর। উনিশ-শো তেত্রিশ সাল।

জেলার সদর শহরের জেল-ফটক খুলিয়া গেল। ভোরবেলা; সূর্যোদয় তখনও হয় নাই, শুধু চারিদিকের অন্ধকার কাটিয়া সবে প্রত্যুষালোক জাগিতেছে। পূর্বদিগন্তে জ্যোতির্লেখার চকিত ক্রমবিকাশের লেখাও শুরু হয় নাই। পাখীরা শুধু ঘন ঘন ডাকিতেছে।

জেল-ফটক খুলিয়া গেল। দেবু বাহিরে আসিল। উনিশ-শো ত্রিশ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সে দণ্ডিত হইয়াছিল। দণ্ডিত হইয়াছিল দেড় বৎসরের জন্য। ত্রিশ সালের জুন মাসে---বাংলা মাসের আষাঢ় মাসে জেলাময় সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী হইয়াছিল। সেই আদেশ অমান্য করিয়া সে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিল---সভা করিয়াছিল। শুধু দণ্ডিতই হয় নাই, মাথায় আঘাত পাইয়া সে আহতও হইয়াছিল, দেড় বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই—গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে—তাহার মুক্তি পাওয়ারই কথা ছিল। অধিকাংশ দণ্ডিত কর্মীই মুক্তি পাইল; কিন্তু মুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে আটক আইনে বন্দী হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার জেলে ঢুকিয়াছিল। মুক্তির আদেশ আসিয়াছে। আজ সে মুক্তি পাইল। ট্রেন খুব সকালে, পূর্ব সন্ধ্যায় মুক্তির আদেশ আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবুর মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কর্তৃপক্ষকে সে বলিয়াছিল—ভোরের ট্রেন যাতে ধরতে পারি—তার ব্যবস্থা যদি করে দেন, তবে বড় ভাল হয়।

কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করিতে অবহেলা করেন নাই। ভোরবেলায় স্টেশনে যাওয়ার জন্য মোটর বাসও বলিয়া দিয়াছেন। দেবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে মোটর বাসের হর্ন শুনা যাইতেছে। জেলখানায় পাঁচিলের চারিপাশেও প্রকাণ্ড জেল-ক্ষেত, সমস্তটাকে ঘিরিয়া বেশ উঁচু এবং মোটা মাটির পগারের উপর বড় বড় ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের সারি; সেই সারির মধ্যে কতকগুলি সুদীর্ঘ-শীর্ষ ঝাউ গাছ ভোরের বাতাসে শন্-শন্ শব্দে ডাক তুলিতেছে; সদ্যমুক্ত দেবুর মনে সে ডাক বড় রহস্যময় মনে হইল। মনে কোন্ দূরান্তে ধ্বনিত আকুল আহ্বানের কম্পন ওই গাছের মাথায় মাথায় অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। পরক্ষণেই সে হাসিল। কে তাকে ডাকিবে?

আবার মনে হইল—আছে বই কি! সে তো দেখিয়া আসিয়াছে—পঞ্চগ্রামের মানুষের বুকে সে কী উচ্ছ্বাস—সমুদ্রের জোয়ারের মত জোয়ার—তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রাণের কত মমতা তাহার প্রতি, তাহারাই ডাকিতেছে। গৌর, জগন, হরেন, সতীশ, তারাচরণ, ভবেশ, হরিশ, ইরাসদ, রামনারায়ণ, অটল, দুর্গা, দুর্গার মা—সকলেই তাহার পথ চাহিয়া আছে, সকলেই তাহাকে ডাকিতেছে। স্বর্ণ—স্বর্ণ তাহার পথ চাহিয়া আছে। স্বর্ণ এতদিনে বোধ হয় ম্যাট্রিক দিবার চেষ্টা করিতেছে। জেলে থাকিতে সে সংবাদও পাইয়াছে—সে পড়িতেছে। স্বর্ণ নিজেও তাহাকে পত্র লিখিয়াছে, তাহার হাতের লেখা, তাহার পত্রের ভাষা দেখিয়া দেবু খুশি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে চমক লাগিয়াছে।

এই দীর্ঘ-দিনের বন্দিত্বের মধ্যে তাহারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বন্দিত্বের বেদনা দুঃখ সত্ত্বেও এই সময়ের মধ্যে নানা আটক-বন্দীদের সঙ্গে থাকাটাই সে জীবনের একটা আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিয়াছে। পড়াশুনাও সে করিয়াছে অনেক। দীর্ঘকাল পর মুক্ত পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া সে অনুভব করিল—পৃথিবীর রঙ যেন বদলাইয়া গিয়াছে, সুরের যেন বদল হইয়াছে। আগের কালে, এই জেলে যাওয়ার পূর্বে ওই ঝাউগাছের শব্দ কানে আসিলেও হয়তো মনে এমন করিয়া ধরা পড়িত না; পড়িলেও ওটাকে মনে হইত ওপারের সাড়া—বিলু-খোকনের ডাক—ময়ূরাক্ষীর বাঁধের ধারে, সন্ধ্যার পর, নির্জন তালগাছের পাতায় একটা বাতাসের সাড়া যে ডাকের ইঙ্গিত দিয়া তাহাকে এতটা দেশ-দেশান্তরে ঘুরাইয়া লইয়া ফিরিয়াছিল—বুঝি সেই ডাক।

বাসটা আসিয়া দাঁড়াইল। দেবু বাসে চড়িয়া বসিল।

পূর্বমুখে বাসটা চলিয়াছে। শহরের প্রান্তদেশ দিয়া প্রান্তরের বুকের লাল ধুলায় আচ্ছন্ন রাজপথ। সম্মুখে পূর্বদিগন্ত অবারিত। আকাশে জ্যোতির্লেখার খেলা চলিয়াছে, মুহুর্মুহু বর্ণচ্ছটার রূপান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে। রক্তরাগ ক্রমশ ঘন হইয়া উঠিতেছে। সূর্য উঠিতে আর দেরি নাই। গ্রাম সম্বন্ধেই সে ভাবিতেছিল। জেলে বসিয়া সে চিন্তা করিয়াছে, অনেক বই পড়িয়াছে, যাহার ফলে একটি সুন্দর পরিকল্পনা লইয়া সে ফিরিতেছে। এবার সুন্দর করিয়া সে গ্রামখানিকে গড়িবে। যে উৎসাহ, যে জাগরণ, কঙ্কালের মধ্যে যে মহাসঞ্জীবনীর সঞ্চার সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সে কল্পনা করিতেছিল, পঞ্চগ্রামের লোকেরা শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। ভাঙা পথ সংস্কার করিয়া নদী-নালায় সেতু বাঁধিয়া কাঁটার জঙ্গল সাফ করিয়া, শ্মশানের ভাগাড়ে হাড়ের টুকরা সরাইয়া পথ করিয়া তাহারা ঋদ্ধির পথে চলিয়াছে।

বাসখানা স্টেশনে থামিল।

দেবু নামিয়া পড়িল। একটা স্যুটকেস্ এবং একপ্রস্থ বিছানা ছাড়া অন্য জিনিস তাহার ছিল না—সে দুইটা নিজেই হাতে করিয়া নামিয়া পড়িল।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সামনেই পূর্ব দিক। সূর্য উঠিতেছে। স্টেশনের সামনের প্রান্তরটার ও-মাথায় কয়েকখানা পাশাপাশি গ্রাম, সেখানে সকালেই ঢাক বাজিতেছে। আশ্বিন মাস। পূজার ঢাক বাজিতেছে। দেবু প্ল্যাটফর্মটায় ঘুরিতে ঘুরিতে একটা মিষ্ট গন্ধ পাইল। এ যে অতি পরিচিত তাহার চিরদিনের প্রিয় শিউলি ফুলের গন্ধ! চারিদিকে চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল প্ল্যাটফর্মের রেলিংয়ের ওপাশে স্টেশনের কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স-শ্রেণীর পাশে একটি বড় শিউলি গাছ। তলায় অজস্র ফুল পড়িয়া আছে, সকালের বাতাসে এখনও টুপটাপ্ করিয়া ফুল খসিয়া পড়িতেছে; তাহার মনে পড়িল—নিজের বাড়ীর সামনের শিউলি-ফুলের গাছটি। সকালের বাতাসের মধ্যেও তাহার সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল—চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিল স্বপ্নাতুর।

টিকিটের ঘণ্টায় তাহার চমক ভাঙিল।

টিকিট করিয়া সে আবার প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্ল্যাটফর্মে ক্রমশ ভিড় বাড়িতেছে। যাত্রীর দল এখানে ওখানে জিনিসপত্র মোট-পোঁটলা লইয়া বসিয়া আছে—দাঁড়াইয়া পাঁচজনে জটলা করিতেছে। দুই-চারিজনের চেনা মুখও দেবু দেখিতে পাইল। তাহারা সকলেই সদরের লোক, কেহ উকিল, কেহ মোক্তার, কেহ ব্যবসায়ী। দেবু তাহাদের চেনে। সে-আমলে দেবুরও মনে হইত, ইহারা সব মাননীয় ব্যক্তি, তাই তাহার মনে পরিচয়ের একটা ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। দেবুকে তাহারা চেনে না। হঠাৎ নজরে পড়িল, কঙ্কণার একজন জমিদারবাবুও রহিয়াছেন। দিব্য সতরঞ্চি পাতিয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই আসর জমাইয়া ফেলিয়াছেন, গড়গড়ায় নল দিয়া তামাক টানিতেছেন। ভদ্রলোকের সে-আমলের চালটি এখনও ঠিক আছে। যেখানেই যান, গড়গড়া তাকিয়া সঙ্গে যায়—আর গঙ্গাজলের কুঁজা। গঙ্গাজল ছাড়া উনি অন্য কোন জল খান না। নিয়মিত কাটোয়া হইতে একদিন অন্তর গঙ্গাজল আসে। সেকালে দেবু এই গঙ্গাজল-প্রীতির জন্য ভদ্রলোককে খাতির করিত। যাই হোক, তাঁহার ওই নিষ্ঠাটুকু তিনি বজায় রাখিয়াছেন। সে তখন ভাবিত, গঙ্গাজলের ফল কোন কালেও ফলিবে না। সে আজ হাসিল।

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

দেবু মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে সস্তা সাহেবী পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোক। সাহেবী পোশাক হইলেও ভদ্রলোকটিকে আধময়লা ধুতি-জামা-পরা বাঙালী ভদ্রলোকের মতই মনে হইল, নিতান্ত মধ্যবিত্ত মানুষ।

দেবু বলিল—আমাকে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাড়ী কি শিবকালীপুর?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো? দেবু আন্দাজ করিল, লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের লোক।

—আপনার নাম বোধ হয় দেবনাথ ঘোষ?

—হ্যাঁ। দেবুর স্বর রূঢ় হইয়া উঠিল।

—একবার এদিকে একটু আসবেন?

—কেন?

—একটু দরকার আছে।

—আপনার পরিচয় জানতে পারি?

—নিশ্চয়। আমার নাম জোসেফ নগেন্দ্র রায়। আমি ক্রিশ্চান। এখানেই এককালে বাড়ী ছিল—কিন্তু পাঁচ-ছ বছর হল আসানসোলে বাস করছি। কাজও করি সেইখানে। এখানে এসেছিলাম আত্মীয়দের বাড়ী, আজ ফিরে যাচ্ছি আসানসোলে। আমার স্ত্রী বললেন—উনি আমাদের পণ্ডিত দেবনাথ ঘোষ। আপনার কথা তাঁর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার জেল এবং ডিটেনশনের সময়ও খবর নিয়েছি এখানে। আজ বুঝি

রিলিজড হলেন ?

দেবু অবাক হইয়া গেল, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না, শুধু বলিল—হ্যাঁ।

—আমার স্ত্রী একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—আপনার স্ত্রী !

—হ্যাঁ। দয়া করে একবার আসতেই হবে। ওই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

দেবু দেখিল—একটি দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণ মেয়ে জুতা পায়ে আধুনিক রুচিসম্মতভাবে ধবধবে পরিষ্কার একখানি মিলের শাড়ী পরিয়া তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পাশেই তাহার আঙুল ধরিয়া আড়াই-তিন বছরের ছোট একটি ছেলে। তাহার খোকনের মত।

মেয়েটিকে দেখিয়াই দেবুর মনে বিস্ময়ের চমক লাগিল। কে এ! এ তো চেনা মুখ! বড় বড় চোখে উজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টি, এই টিকলো নাক—ও যে তাহার অত্যন্ত চেনা! কিন্তু কে? অত্যন্ত চেনা মানুষ অপরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে নূতন ভঙ্গিতে অভিনব সজ্জায় সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যাহার মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহার নাম ও পরিচয়। বিস্মিত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেবু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, মেয়েটিও কয়েক পা আগাইয়া আসিল—বোধ হয় ঘনিষ্ঠ মুখোমুখি দাঁড়াইতে বিলম্ব তাহার সহ্য হইতেছিল না। হাসিয়া মেয়েটি বলিল—মিতে !

পদ্ম! কামার-বউ! দেবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে সে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই পদ্ম? চোখে জল্-জল্ অসুস্থ দৃষ্টি, শঙ্কিত সন্তর্পিত অপরাধীর মত পদক্ষেপ, জীর্ণ কাপড়, শীর্ণ দেহ, কণ্ঠস্বরে উষ্মা, তিক্ততা, কথায় উগ্রতা,—সেই কামার-বউ ?

পদ্ম আবার বলিল—মিতে! ভালো তো ?

দেবু আত্মস্থ হইয়া বলিল—মিতেনী? তুমি!

—হ্যাঁ। চিনতে পারনি—না ?

—দেবু স্বীকার করিল—না, চিনতে পারি নি। চিনেছি, মন বলছে চিনি, হাসি চেনা, টানা চোখ চেনা, লম্বা গড়ন চেনা—তবু ঠাহর করতে পারছিলাম না—কে !

পদ্মের মুখ অপূর্ব আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সে শিশুটিকে বুকে তুলিয়া হইয়া বলিল—আমার ছেলে।

এক মুহূর্তে দেবুর চোখে জল ভরিয়া উঠিল। কারণ সে জানে না। চোখ দুইটা যেন স্পর্শ-কাতর, রস-পরিপূর্ণ ফলের মত পদ্মের ওই দুইটি শব্দের ছোঁয়ায় ফাটিয়া গেল।

পদ্মই আবার বলিল—ওর নাম কি রেখেছি জান ?

দেবু বলিল—কি ?

—ডেভিড্ দেবনাথ রায়।

পাশ হইতে নগেন রায় বলিল—আপনার নামে নাম রাখা হয়েছে। উনি বলেন—ছেলে আমাদের পণ্ডিতের মত মানুষ হবে।

দেবু নীরবে হাসিল।

পদ্ম দেশের লোকের খবর লইতে আরম্ভ করিল ; প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল দুর্গার কথা।

দেবু বলিল—ভালই থাকবে। আমি তো আজ তিন বছর পর ফিরছি মিতেনী !

পদ্ম বলিল—লক্ষ্মী পূজোর দিন দুর্গার কথা মনে হয়। লক্ষ্মী তো আমাদের নাই ; কিন্তু আমাদের জমি আছে, ধান উঠলে নতুন চাল ঘরে এলে পিঠে করি, সে-দিনে মনে হয়। ষষ্ঠীর দিনে মনে হয়। ষষ্ঠীর কথা মনে পড়ে।

দেবু হাসিল। আনন্দে তাহার বুক যেন ভরিয়া গিয়াছে। পদ্মের এই রূপ দেখিয়া তাহার তৃপ্তির আর সীমা নাই।...

—এই এই ঘণ্টি মারো, ট্রেন আতা হ্যায়।...

দেবু ফিরিয়া দেখিল—নীল প্যাণ্টালুন ও জামা গায়ে একজন লোক লাইন ক্লিয়ারের লোহার গোল ফ্রেমটা হাতে করিয়া চলিয়াছে, মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল অনি-ভাইকে। সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল—অনি ভাই মধ্যে ফিরে এসেছিল মিতেনী।

পদ্ম স্থিরদৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া রইল।

দেবু বলিল—সে কলকাতায় মিস্ত্রীর কাজ করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছিল।...

বাধা দিয়া পদ্ম বলিল—তার কথা থাক্ মিতে। তোমাদের সে কামার-বউ তো এখন আমি নই।

তাহার কথা শুনিয়া দেবু আশ্চর্য হইয়া গেল। পদ্মের কথাবার্তার ধারা সুদ্ধ পাল্টাইয়া গিয়াছে।

পদ্ম বলিল—সে দুঃখু-কষ্ট-অভাবের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে—সুখের মুখ দেখেছে। শুনে আমার আনন্দ হল। কিন্তু আমি এই সব চেয়ে সুখে আছি পণ্ডিত। আমার খোকন—আমার ঘর—পণ্ডিত, অনেক দুঃখে আমি গড়ে তুলেছি। পরকাল ?—বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল—পরকাল আমার মাথায় থাক। একালেই আমি স্বর্গ পেয়েছি। আমার খোকন !—বলিয়া সে ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

ঠং ঠং ঠং ঠন্‌ন্‌-ন্‌-ন্ করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

দেবু বলিল—তাহলে যাই মিতেনী ?

নগেন রায় তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে আমি কিন্তু আজ কথা বলতে পেলাম না !

দেবু বলিল—আপনার ছেলের বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করবেন, যাব আমি।

পদ্ম বলিল—তুমি আসবে পণ্ডিত ? আমাদের বাড়ি ?

—আসব বই কি মিতেনী !

ট্রেনে চাপিয়া চোখ বন্ধ করিয়া সে পদ্মের ওই অপরূপ ছবিখানি মনে মনে যেন ধ্যান করিতে বসিল। পদ্মের ছবি মিলাইয়া গিয়া অকস্মাৎ মনে পড়িল স্বর্ণকে। লেখাপড়া শিখিয়া

স্বর্গ এমনই সার্থক হইয়া উঠে নাই! নিশ্চয় উঠিয়াছে।

জংশনে সে যখন নামিল, তখন বেলা দশটা।

শরতের শুভ্র দীপ্ত রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল্ করিতেছে। আকাশ গাঢ় নীল---মধ্যে মধ্যে, সাদা হালকা খানা-খানা মেঘের টুকরা ভাসিয়া চলিয়াছে—দ্রুততম গতিতে। ময়ূরাক্ষীর কিনারা ধরিয়া বকের সারি দেবলোকের শুভ্র পুষ্পমালোর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। প্ল্যাটফর্ম হইতেই ময়ূরাক্ষীর ভরা বুক দেখা যাইতেছে—জল আর এখন তেমন ঘোলা নয়; ভরা নদীতে ওপার হইতে এপারের দিকে খেয়ার নৌকা আসিতেছে। জংশনের কতকগুলা চিমনিতে ধোঁয়া উঠিতেছে।

সে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া আত্মগোপন করিয়াই একটা জনবিরল পায়ে-চলা পথ ধরিল। এখানে প্রায় সকলেই তাহারা চেনা মানুষ। তাহাকে দেখিলে তাহারা সহজে ছাড়িবে না। তাহারা তাহাকে ভালবাসে।

ময়ূরাক্ষীর ঘাটে গিয়া সে নামিল। খেয়া-নৌকাটা ওপার হইতে এপারে আসিতেছে।

এপারের ঘাটে অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। ওপারের ঘাটেও অনেকে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও দেবুকে দেখিল। কয়েকটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল---তাহারাও ওপার হইতে চিৎকার করিয়া উঠিল—দেবু-দা! দেবু-দা! জন-দুয়েক ছুটিয়া চলিয়া গেল গ্রামের দিকে। দেবু হাসি-মুখে হাত তুলিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিল।

খেয়া-মাঝি শশী ভল্লা স্মিতমুখে বলিল—পণ্ডিত মাশায়! ফিরে এলেন আপুনি?

--হ্যাঁ! ভাল আছ তুমি?

শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমাদের আবার ভাল থাকা পণ্ডিত মাশায়! কোন-রকমে বেঁচে আছি, নেকনের (অদৃষ্ট লিখনের) দুঃখু ভোগ করছি আর কি।

দেবুর অন্তরের আনন্দ-দীপ্তি লোকটির কথার সুরের ভঙ্গিমায় ম্লান হইয়া গেল। পাশে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও সকলেই কেমন স্তিমিত স্তব্ধ, সামান্য দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিল। শশীর সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল কিন্তু সকলেই।

দেবু মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—ছেলেপিলে সব ভাল আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ওই বেঁচে আছে কোন রকমে। জ্বর-জ্বালা, ঘরে খেতে নাই, পরনে কাপড় নাই, এই ভাদ্দ মাস—বুঝলেন, দুঃখু-কষ্টের আর অবধি নাই।

সেই পুরানো কথা।—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। অনাহারে রোগে আবার—আবার পঞ্চগ্রাম মরিতে বসিয়াছে।

দেবু আশ্বাস দিয়া বলিল—এবার বর্ষা ভাল, ধানও ভাল—আর ক'দিন গেলেই ধান উঠবে। অভাব ঘুচবে। ভয় কি?

শশী অদ্ভুত হাসিয়া বলিল—আর ভয় কি! ভরসা আর নাই পণ্ডিত মাশায়। সব গেল।

—দেবু-ভাই! দেবু!···চিৎকার করিয়া বাঁধের উপর হইতে কে যেন ডাকিতেছে।

দেবু ফিরিয়া দেখিল। জগন-ভাই, ডাক্তার—ডাক্তার তাহাকে ডাকিতেছে। খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিতেছে। দেবু নৌকার উপরে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বলিল—জগন-ভাই!

ডাক্তার চিৎকার করিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্! সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলিও চিৎকার করিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্।

দেবুও হাসিয়া বলিল—বন্দে মাতরম্।

ডাক্তার হাঁপাইতেছে, সে ছুটিয়া আসিয়াছে বোধ হয়। সে বেশ অনুমান করিল, সমস্ত গ্রামের লোক বোধ হয় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

শিবকালীপুরের ঘাটে নামিতেই ডাক্তার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। ছেলেগুলির মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগে প্রণাম করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। হাসিমুখে দেবু তাহাদের মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওই হয়েছে! ওই হয়েছে!

তবু তাহারা মানে না, কিশোর প্রাণের আবেগে চাঞ্চল্যে তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর হাতের স্যুটকেস এবং বিছানার মোটটা কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই মাথায় করিয়া লইল। সারিবন্দী হইয়া পায়েচলার পথে কিশোরবাহিনী আগাইয়া চলিল—দৃপ্ত উল্লসিত পদক্ষেপে। কিন্তু তবু যেন দেবুর মনে হইল, এ বাহিনী সম্পূর্ণ নয়। কই? গৌর কই? সর্বাগ্রে যাহার চলিবার কথা, সে কই? দেবু বলিল—ডাক্তার, গৌর কোথায় বল তো?

—গৌর! ডাক্তার বলিল—জেল থেকে এসে সে তো এখান থেকে একরকম চলেই গিয়েছে।

—চলে গিয়েছে?

—হ্যাঁ। সে কলকাতায় কোথায় থাকে। মধ্যে মধ্যে আসে, দু-চার দিন থাকে; আবার চলে যায়। এই ক'দিন আগে এসেছিল।

—চাকরি করছে?

—চাকরি না; ভলেণ্টিয়ারী করে। কি করে ভাই, সে-ই জানে।—তাহারা বাঁধের উপর উঠিল।

দেবু বলিল—স্বর্ণ? স্বর্ণ কেমন আছে ডাক্তার? সে কি—সে বোধ হয় জংশনেই আছে, না?

—হ্যাঁ। জংশনে সেই থেকে মাস্টারি করে। ওখানেই থাকে। ভারি চমৎকার মেয়ে হে। এবার ম্যাট্রিক দেবে।

দেবু একবার পিছন ফিরিয়া জংশনের দিকে চাহিল। কিন্তু দাঁড়াইবার অবকাশ ছিল না। কিশোরবাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারা থামিতে চায় না।

সম্মুখেই পঞ্চগ্রামের মাঠ। আশ্বিনের প্রথম। বর্ষাও এবার ভাল গিয়েছে। ধান এবার ভাল। ইহারই মধ্যে ঝাড়েগোড়ে খুব জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। নয়া ধান-গাছের ঝাড় যেন কালো মেঘের মত ঘোরালো। মধ্যে মধ্যে কোন নালার ধারে—জমির আলের উপর কাশের ঝাড়ের মাথায় সাদা ফুল ফুটিয়াছে, আউস ধানের শীষ উঠিয়াছে, ওই কঙ্কণা, ওই

কুসুমপুর, ওই তাহার শিবকালীপুর! ওই মহাগ্রাম! মহাগ্রাম নজরে পড়িতেই সে যেন একটা প্রচণ্ড ঘা খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মুহূর্তের জন্য সে চোখ বুজিল। দেহের সকল স্নায়ু ব্যাপ্ত করিয়া বহিয়া গেল একটা দুঃসহ অন্তর-বেদনার মর্মান্তিক স্পর্শ। জগন পিছন হইতে বলিল—দেবু!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু আবার অগ্রসর হইল ; বলিল—ডাক্তার!

ডাক্তার বলিল—কি হল ভাই? দাঁড়ালে?

দেবু সে কথার উত্তর দিল না, প্রশ্ন করিল—ঠাকুর মশায়? ঠাকুর মশায় আর এসেছিলেন?

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।···কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিল—বিশ্বনাথের খবর জান তুমি?

—জানি।—জেলেই খবর পেয়েছিলাম।

বিশ্বনাথ নাই। বিশ্বনাথ জেলের মধ্যেই মারা গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর আত্মসংবরণ করিয়া দেবু মুখ তুলিল। বিশ্বনাথের জন্য অন্ধকার রাত্রে জেলখানার গরাদ-দেওয়া জানালায় মুখ রাখিয়া সে রাত্রির পর রাত্রি কাঁদিয়াছে। আর তাহার কান্না আসে না।

ওই দেখুড়িয়া। বিস্তীর্ণ মাঠখানায় বুকভরা নমনীয় চাপ-বাঁধা ধান কমনীয় সবুজ ; বাতাসের দোলায় মুহূর্তে মুহূর্তে দুলিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিতেছে। কিন্তু কোথাও কোন লোকের সাড়া আসিতেছে না। পাশাপাশি আধখানা চাঁদের বেড়ের মত পাঁচখানা গ্রাম—স্তিমিত—স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ নীরবে চলিয়া দেবু বলিল—তারপর জগন-ভাই, কি খবর বল দেশের!

—দেশের?

—হ্যাঁ। আমাদের এখানকার!

—সব মরেছে, সব গিয়েছে, সব শেষ হয়ে গেল। খায়-দায় আধ-পেটা, ঘুমোয়, ব্যাস সে-সব আর কিছু নাই।

—বল কি?

—দেখবে চল।

আবার নীরবে তাহারা চলিল। ছেলেগুলি নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে গোলমাল করিতেছে। দেবুর মুখের দিকে কয়েকবার ফিরিয়া দেখিয়া তাহাদের কলরবের উৎসাহ নিভিয়া গিয়াছে। ধান-ভরা মাঠে কানায় কানায় ভরিয়া জল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশ্বিন মাস—কন্যা রাশি। "কন্যা কানে কান—বিনা বায়ে তুলা বর্ষে—কোথায় রাখবি ধান!" আশ্বিনে মাঠ ভরিয়া জল দিতে হয়।

মধ্যে নিড়ানের কাজ চলিতেছে। দেবু বিস্মিত হইল, কৃষকেরা অপরিচিত। সাঁওতাল সব।

সে বলিল—এরা কোত্থেকে এল ডাক্তার ?

জগন বলিল—শ্রীহরি ঘোষ আর ফেলু চৌধুরী আনিয়েছে ডুমকা থেকে ওদের।

দেবু আর একটু বিস্মিত হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল।

ডাক্তার বলিল—এসব জমি প্রায় সব শ্রীহরি আর চৌধুরীর ঘরে ঢুকেছে।

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল ; পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে !

শিবপুরের পাশ দিয়া মজা চৌধুরী-দীঘিটা ডাইনে রাখিয়া দুধারে বাঁশ-বাগানের মধ্য দিয়া কালীপুরের প্রবেশের পথ।

ডাক্তার বলিল—চৌধুরী খালাস পেয়েছেন।

দেবু একটা ম্লান হাসি হাসিল। হ্যাঁ—খালাস পাইয়াছেন বটে।

ছেলের দল গ্রাম-প্রবেশের মুখে আর মানিল না। তাহারা হাঁকিয়া উঠিল—জয়, দেবু ঘোষ কি জয় !

গ্রামের ভিতর হইতে কে ছুটিয়া আসিতেছে।

দেবু নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ও কি দুর্গা ? হ্যাঁ, দুর্গাই তো। ক্ষারে-ধোওয়া একখানি সাদা থান কাপড় পরিয়া, নিরাভরণা, শীর্ণ দেহ, মুখের সে কোমল লাবণ্য নাই, চুলের সে পারিপাট্য নাই—সেই দুর্গা এ কি হইয়া গিয়াছে !

দেবু বহিল—দুর্গা ? এ কি তোর শরীরের অবস্থা, দুর্গা ? তুই এমন হয়ে গিয়েছিস কেন ?

দুর্গার সব গিয়াছে—কিন্তু ডাগর চোখ দুইটি আছে, মুহূর্তে দুর্গার বড় বড় চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

ডাক্তার বলিল—দুর্গা আর সে দুর্গা নাই। দান-ধ্যান—পাড়ায় অসুখ-বিসুখে সেবা—

দুর্গা লজ্জিত হইয়া বলিল—থামুন ডাক্তার-দাদা। তারপরেই বলিল—উঃ, কতদিন পর এলে জামাই !

পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপের উপর শ্রীহরিকে দেখা গেল। শ্রীহরির কপালে তিলক-ফোঁটা। জগন বলিল—শ্রীহরি এখন খুব ধর্ম-কর্ম করছে !

আটাশ

দুর্গা ঘর খুলিয়া দিল। ঘর-দুয়ার সে পরিষ্কার রাখিত ; আবারও সে একবার ঝাঁটা বুলাইয়া জল ছিটাইয়া দিল।

দেবু রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে দেখিতেছিল। চাষী-সদগোপ পল্লীর অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে। প্রতি বাড়ীতে তখন ভাঙন ধরিয়াছে। জীর্ণ চালের ছিদ্র দিয়া বর্ষার জলের ধারা দেওয়ালের গায়ে হিংস্র জানোয়ারের নখের আঁচড়ের মত দাগ কাটিয়া দিয়াছে ; জায়গায় জায়গায় মাটি ধ্বসিয়া ভাঙন ধরিয়াছে।

জগন অতিরঞ্জন করে নাই ; পঞ্চগ্রামের সব শেষ হইয়াছে।

কত লোক যে এই কয় বৎসরে মরিয়াছে—তাহার হিসাব একজনে দিতে পারিল না। একজনের বিস্মৃতি অন্যজন স্মরণ করাইয়া দিল। এমন মরণ তাহারা মরিয়াছে যে, মরিয়া তাহারা হারাইয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহাদের দেহ শীর্ণ, শীর্ণতার মধ্যে অভাব এবং রোগের পীড়নের চিহ্ন সর্ব অবয়বে পরিস্ফুট, কণ্ঠস্বর স্তিমিত, চোখের শুভ্রচ্ছদ পীতপাণ্ডুর, দৃষ্টি বেদনাতুর, কালো মানুষগুলির দেহবর্ণের উপরে একটা গাঢ় কালিমার ছাপ, জোয়ান মানুষের দেহ-চর্মে পর্যন্ত কুঞ্চনের জীর্ণতা দেখা দিয়াছে। শুধু তাই নয়—মানুষগুলি যেন সব বোবা হইয়া গিয়াছে।

দেবু এমন অনুমান করিতে পারে নাই।

তাহার মনে পড়িল সেদিনের কথা। সে যেদিন জেলে যায়—সেই দিনের মানুষের মুখগুলি।

সে কি উৎসাহ! প্রাণশক্তির সে কি প্রেরণাময় উচ্ছ্বাস! সে কথা মনে হইলে—আজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

একে একে অনেকেই আসিল। মৃদুস্বরে কুশল প্রশ্ন করিল—দেবু কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উদাসভাবে দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—আর আমাদের ভাল-মন্দ!

এই কথায় একটা কথা দেবুর মনে পড়িয়া গেল।

তিরিশ সালে আন্দোলনের সময় একদিন তাহাকে তাহারা প্রশ্ন করিয়াছিল—আচ্ছা, এতে কি হবে বল দিকিনি!

দেবুও তখন জানিত না এসব কথা। অস্পষ্ট ধারণা ছিল মাত্র। নিজেরই একটি অদ্ভুত কল্পনা ছিল ; তাই সেদিন আবেগময়ী ভাষায় তাহাদের কাছে বলিয়াছিল। সে অদ্ভুত কল্পনা তাহার একার নয়, পঞ্চগ্রামের মানুষ সকলেই মনে মনে এমনই একটি অদ্ভুত কাল্পনিক অবস্থা কামনা করে।

সে সেদিন বলিয়াছিল—উহারই মধ্যে মিলিবে সর্ববিধ কাম্য। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, অভয়। প্রত্যাশা করিয়াছিল—আর কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না, উৎপীড়ন থাকিবে না, মানুষে কেহই আর অন্যায় করিবে না, মানুষের অন্তর হইতে অসাধুতা মুছিয়া যাইবে, অভাব ঘুচিয়া যাইবে, মানুষ শান্তি পাইবে, অবসর পাইবে, সেই অবসরে আনন্দ করিবে, তাহারা হাসিবে, নাচিবে, গান করিবে, নিয়মিত দুটি বেলা ইষ্টকে স্মরণ করিবে।...

লোকে মুগ্ধ হইয়া তাই শুনিয়াছিল।

একজন বলিয়াছিল—শুনে তো আসছি চিরকাল—এমনি একদিন হবে! সে তো সত্যকালে যেমনটি ছিলো গো! বাপ-ঠাকুরদাদা সবাই বলে আসছে তো!

দেবু সেদিন আবেগবশে বলিয়াছিল—এবার তাই হবে।

তাহারা সেকথা বিশ্বাস করিয়াছিল—সত্যযুগের কথা। শুধু কি ওইটুকুই সত্যযুগ!

গরুর রঙ হইবে ফিট সাদা, মানুষের চেয়েও উঁচু হইবে। গাইগরুগুলি দুধ দিবে অফুরন্ত, পাত্র হইতে উথলিয়া পড়িয়া মাটি ভিজিয়া যাইবে। সাদা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড আকারের বলদের একবারের কর্ষণেই চাষ হইবে। মাটিতে আসিবে অপরিমেয় উর্বরতা, ফসলের প্রতিটি বীজ হইতে গাছ হইবে, শস্যের মধ্যে কোনটি অপুষ্ট থাকিবে না। মেঘে নিয়মিত বর্ষণ দিবে; পুকুরে পুকুরে জল কানায় কানায় টলমল করিবে। মানুষ এমন আকারে ছোট, দেহে শীর্ণ থাকিবে না, বলশালী দীর্ঘদেহ হইয়া তাহারা পৃথিবীর বুকে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ··

এবার এই দীর্ঘকাল জেলের মধ্যে থাকিয়া দেবু অন্য মানুষ হইয়াছে। তাহার কাছে আজ পৃথিবীর রূপ পাল্টাইয়া গিয়াছে। সে জানিয়াছে, এদেশের মানুষ মরিবে না। মহামঙ্গলময় মূর্তিতে নবজীবন লাভ করিবে। চার হাজার বৎসর ধরিয়া বার বার সংকট আসিয়াছে—ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে—সে সংকট সে ধ্বংস-সম্ভাবনা সে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নব-জীবনে জাগ্রত হইয়াছে। সে সমস্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়া কথাগুলির মধ্যে শুধু পিতৃ-পিতামহের নয়—যুগ-যুগান্তরের অতীতকালে মানুষের এই ইতিহাসের সঙ্গে তাহার নূতন মনের কল্প-কামনার অদ্ভুত মিল প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল। শুধু তাই নয়, মানুষের জীবনী-শক্তির মধ্যে অমরত্বের সন্ধান পাইয়াছে সে। অমর বই কি। দিন দিন মানুষের বুকের উপর মানুষের অন্যায়ের বোঝা চাপিতেছে। অন্যায়ের বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে বিন্ধ্য-গিরির মত—মানুষের প্রায় নাভিশ্বাস উঠিতেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত মানুষ, অদ্ভুত তাহার সহনশক্তি, নাভিশ্বাস ফেলিয়াও সেই বোঝা নীরবে বহিয়া চলিয়াছে; অদ্ভুত তাহার আশা—অদ্ভুত তাহার বিশ্বাস! সে আজও সেই কথা বলিতেছে, সে দিন-গণনা করিতেছে—কবে সে দিন আসিবে! মানুষ—এই দেশের মানুষ মরিবে না। সে থাকিবে। থাকিবে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরং।

•

রামনারায়ণ এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। দেবুর পাঠশালা উঠিয়া যাইবার পর সে-ই এখানকার নূতন পণ্ডিত হইয়াছে। দেবুর জ্ঞাতি। সে হাসিমুখে আসিয়া হাজির হইল।—ভাল আছ দেবু-ভাই?

তাহাকে দেখিয়া দেবুর ইরসাদকে মনে পড়িল। কেমন আছে সে?

—ইরসাদ-ভাই! সে কেমন আছে? এখানেই আছে তো?

—হ্যাঁ। পাঠশালা ছেড়ে সে মোক্তারি পড়ছে। আর কৃষক-সমিতি করছে।

—ইরসাদ-ভাই কৃষক-সমিতি করছে? ইরসাদের মাথাতেও পোকা ঢুকিয়াছে!

—হ্যাঁ। দৌলত শেখেরা লীগ করেছে। ইরসাদ কৃষক-সমিতি করেছে।

—ইরসাদের শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে ঝগড়া মেটে নি বোধ হয়?—দেবু হাসিল।

—না। তবে সে আবার বিয়ে করেছে।

—বিয়ে করেও ইরসাদ কৃষক-সমিতি করছে! বলিয়া দেবু আবার হাসিল।

রামনারায়ণ কিন্তু রসিকতাটুকু বুঝিল না—সে বলিল, তা তো জানি না ভাই। বলিয়াই অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িল—বলিল—রহম-চাচা কিন্তু গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে দেবু-ভাই।

দেবু চমকিয়া উঠিল।—গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে!

রামনারায়ণ বলিল—মনের ক্ষোভে গলায় দড়ি দিলে রহম-চাচা। বাবুরা সেই জমিটা নিলেম করে নিলে। সেই ক্ষোভেই—।…রামনারায়ণ তাহার ঘাড়টা উল্টাইয়া দিল।

দেবু এক মুহূর্তে স্তব্ধ স্তম্ভিত হইয়া গেল। রহম-চাচা গলায় দড়ি দিয়েছে!

জগন আসিয়া বলিল—খাবার রেডি দেবু-ভাই, স্নান কর। যাও যাও সব, এখন যাও। ও বেলায় হবে সব।

দুপুরের সময় দেবু একা বসিয়া ভাবিতেছিল।

সামনের শিউলি গাছটার দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—এলোমেলো ভাবনা। শিউলি-তলার রৌদ্র-স্নান-করা শিউলিগুলি হইতে একটি অতি সকরুণ মৃদু গন্ধ আসিতেছে। শরতের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। সামনে পূজা। দুর্বল দেহেও মানুষ পূজা উপলক্ষে ঘর-দুয়ার মেরামতের কাজে লাগিয়াছে। বর্ষার জলের দাগের উপর গোবরমাটির ঘন প্রলেপ বুলাইতেছে। জগন তাহাকে বলিয়াছিল—সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু না। তাহার কথাই সত্য। তাহারা বাঁচিয়া আছে। বাঁচিতে চায়। তাহারা মরিবে না। তাহারা সুখ চায়, স্বাচ্ছন্দ্য চায়, ঘর চায়, দুয়ার চায়, আরও অনেক চায়—নূতন জীবনে সে সত্যযুগের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে-শান্তিতে পুনরুজ্জীবন পরিপূর্ণ চায়। তাহারা নিজেদের জীবনে যদি না পায়, তবে পুত্র-পৌত্রাদি রাখিয়া যাইতে চায়—তাহারা সে-সব পাইবে।

ওদিকে একটা দমকা হাওয়া শিউলি গাছটাকে আলোড়িত করিয়া দিয়া গেল। গাছের পাতায় যে ঝরা ফুলগুলি আটকাইয়া ছিল, ঝরিয়া মাটিতে পড়িল।

দেবু লক্ষ্য করিল না। সে ভাবিতেছিল, সবাই থাকিবে—মরিবে শুধু সে-ই নিজে। তাহার নিজের জীবনে তো এসব আসিবে না। তাহার পরে—সন্তান সন্ততির মধ্যেও সে থাকিবে না। তাহার সঙ্গেই তো সব শেষ।

ঠিক এই সময় শিউলি ফুলের ম্লান গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া ঢুকিল। চকিত হইয়া দেবু চারিদিকে চাহিল। মনে হইল, বিলুর গায়ের গন্ধ পাইল যেন, পরক্ষণেই বুঝিল, না—এ শিউলির গন্ধ।

অথচ আশ্চর্য, বিলুর মুখটা ঠিক মনে পড়িতেছে না! মনে করিতে গেলেই—। চাবুক-মারা ঘোড়ার মত তাহার সারাটা অন্তর যেন চমকিয়া উঠিল।

হায় রে, হায় রে মানুষ!

দাওয়া হইতে সে প্রায় লাফ দিয়া পড়িয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার ফিরিয়া আসিল শিউলি গাছের তলায়। কতকগুলা

* *

শিউলি ফুল কুড়াইয়া লইয়া চলিতে শুরু করিল।

আজ তিন বৎসর বিলু-খোকনের চিতার ধারে যাওয়া হয় নাই। সে ফুলগুলি হাতে করিয়া শ্মশানের দিকে চলিল।

সারাটা দুপুর সে সেই চিতার ধারে বসিয়া রহিল।

তীর্থে যাইবার পূর্বে সে বিলু-খোকনের চিতাটি বাঁধাইয়া দিয়াছিল। দেখিল, বৎসর বৎসর ময়ূরাক্ষীর পলি পড়িয়া সে চিতা মাটির নিচে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাঁচ-সাত জায়গা খুঁড়িয়া সে চিতাটি বাহির করিল। কোঁচার খুঁট ভিজাইয়া ময়ূরাক্ষী হইতে জল আনিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিল। বার বার ধুইয়াও কিন্তু মাটির রেশের অস্পষ্টতা মুছিয়া মনের মত উজ্জ্বল করিতে পারিল না। শেষে ক্লান্ত হইয়া তাহার উপর সাজাইয়া দিল ফুলগুলি।

অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে হাসিল। ওই শিউলি ফুলগুলির সঙ্গেই তার তুলনা চলে। এতক্ষণ বসিয়া একমনে চিন্তা করিয়াও সে বিলু-খোকনকে স্পষ্ট করিয়া মনে করিতে পারিল না। মনে পড়িল ন্যায়রত্নের কথা। তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্র শশিশেখরকে মনে করিতে পারেন না বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—শশিশেখর তাঁহার মধ্যে আছে, শুধু শশিশেখর যাহা তাঁহাকে দিয়া গিয়াছে তাহারই মধ্যে। বিলু-খোকনও ঠিক তেমনি ভাবেই তাহার মধ্যে আছে। রূপ তাহাদের হারাইয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চকিতের মত মনে পড়িয়া আবার মিলাইয়া যায়। আবার অন্ধকার রাত্রে শ্মশানে বাতাসের শব্দের মধ্যে তাহাদের অশরীরী অস্তিত্বের চাঞ্চল্য কল্পনা করিয়া দেহের স্নায়ুমণ্ডল চেতনা-শূন্য, অসাড় হইয়া যায়। দেবু হাসিল।

বেলা গড়াইয়া গেল, সে গ্রামে ফিরিল।

তাহার দাওয়ার সম্মুখে গ্রামের লোকজনেরা আসিয়া বসিয়াছে। কোন একটা উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছে। ইরসাদ-ভাইও আসিয়াছে, জগন বসিয়া আছে। সে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইরসাদ আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।—আঃ, দেবু-ভাই, কতদিন পর! আঃ!

উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছে—নবীনকৃষ্ণের একটা জোতের নীলাম লইয়া। রামনারায়ণ বলিতেছে—নূতন আইনেও এ ডিক্রি রদ হইবে না!

নূতন প্রজাস্বত্ব আইন পাস হইয়াছে। সেই আইনের ধারা আলোচনা হইতেছে। নবীন উত্তেজিত হইয়া বলিতেছে—আলবৎ ফিরবে। কেন ফিরবে না?

জগন মন দিয়া ডিক্রিটা পড়িতেছে।—দেবুকে দেখিয়া জগন ডিক্রির কাগজটা রাখিয়া বলিল—আমাদের এখানেও কৃষক-সমিতি করা যাক, দেবু-ভাই!

ইরসাদ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। দেবু বলিল—বেশ তো! কালই কর। তাহার মন যেন এমনই কিছু চাহিতেছিল। জগন তখনই কাগজ কলম লইয়া বসিয়া গেল।

ঠিক সেই সময়েই চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল হরেন ঘোষাল।—ব্রাদার, তোমার পথ চেয়েই বসে আছি। আমার কথা কেউ শোনে না। এবার লাগবই।

জগন বলিল—থাম ঘোষাল !

দেবু হাসিয়া বলিল—কি ? ব্যাপারটা কি ?

ঘোষাল বলিল—সার্বজনীন দুর্গাপুজো। এবার লাগতেই হবে, জংশনে হচ্ছে। আমি কতদিন থেকে বলছি।

দেবু বলিল—বেশ তো। হোক্ না সার্বজনীন পুজো।

ঘোষাল তৎক্ষণাৎ একটা কাগজ কলম লইয়া বসিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইল বাউড়ী-মুচির দল। কলে খাটিয়া তাহারা সবে ফিরিয়াছে। ফিরিয়াই দেবুর খবর পাইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে। দলের নেতা সেই পুরাতন সতীশ। সতীশও আজকাল কলে কাজ করে। তাহার গরু-গাড়ী লইয়া কলের মাল বহিয়া থাকে। চাষও আছে। চাষের সময় করে চাষ। কলের মজুরি পাইয়া সকলেই মদ খাইয়াছে। সতীশ তাহাকে প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—আপুনি ফিরে এলেন—পরাণটা আমার জুড়লো।

অটল বলিল—আমাদের পাড়ায় একবার পদার্পন করতে হবে।

—কেন ? কি ব্যাপার ?

—গান। গান শুনতে হবে।

—কিসের গান ?

—আমাদের গান।

সুতরাং পদার্পন করিতেই হইবে।

দেবু হাসিয়া ইরসাদ এবং জগনকে বলিল—চল ভাই। গান শুনে আসি।

লোকগুলি মন্দ নাই ; কলে খাটে—পেটে খাওয়ার কষ্ট বিশেষ নাই, পরনের বেশভূষাতে দৈন্য সত্ত্বেও শহরের কিছু ছাপ লাগিয়াছে, কিন্তু ঘর-দুয়ারগুলির অবস্থা ভাল নয়। কেমন যেন একটা পড়ো বাড়ীর ছাপ লাগিয়াছে। কয়েকখানা ঘর একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে। যাইতে যাইতে দেবু প্রশ্ন করিল—এ ঘরগুলো খসে পড়ছে কেন সতীশ ?

সতীশ বলিল—যোগী, কুঞ্জ, শম্ভু—ওরা সব চলে গিয়েছে সাহেবগঞ্জ। বলে গেল—যাক এখন ভেঙে, ফিরে এসে তখন ঘর আবার করে লোব।

ওদিকে ঢোল বাজিতে আরম্ভ হইল।

সতীশ গান ধরিল—

> "ভাল দেখালে কারখানা—
> দেবু পণ্ডিত অ্যানেক রকম দেখালে কারখানা ;
> হুকুম জারি করে দিলে মদ খেতে মানা।"

দেবু বলিল—না, ও গান শুনব না। অন্য গান কর সতীশ।

—ক্যানে, পণ্ডিত মাশায় ?

—না, অন্য গান কর। ফুল্লরার বার-মেসে গান কর।...

গান যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি অনেক।

ইরসাদকে ঐখান হইতে বিদায় দিয়াই সে ফিরিল। জগন মাঝখানেই একটা 'কল্' আসায় চলিয়া গিয়াছে। বাউড়ী-পাড়া পার হইয়া খানিকটা খোলা জায়গা। শরতের গাঢ় নীল আকাশে পুবদিক্ হইতে আলোর আভা পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ উঠিতেছে। সে দাঁড়াইল। বাড়ী ফিরিবার কোন তাগিদ তাহার নাই। আজ এবেলা খাবার ব্যবস্থা করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। দুর্গারও বোধ হয় মনে হয় নাই। হইলে সে নিশ্চয় এতক্ষণ তাগিদ দিত। দুর্গা এখন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া তাহার শরীরও খুব দুর্বল। হয়তো জ্বর আসিয়াছে। উঠিতে পারে নাই।

দূরে তাম্রাভ জ্যোৎস্নার মধ্যে পঞ্চগ্রামের মাঠ নরম কালো কিছুর মত দেখাইতেছে। ময়ূরাক্ষীর বাঁধের গাছগুলিও কালো চেহারা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঁধের গায়ের চাপ-বাঁধা শরবন কালো দেওয়ালের মত মনে হইতেছে। ওই অর্জুন গাছটার উঁচু মাথা! ওই গাছটার তলায় শ্মশান, বিলু-খোকনের চিতায় সে আজই ফুল দিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য, তাহাদের অভাবটা আছে। তাহারাই হারাইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তেই মনে পড়িতেছে—খাবারের কথা। বাড়ী গিয়া কি খাইবে—তাহার ঠিক নাই। হাসি আসিল প্রথমটা। তারপর মনে হইল—বিলু থাকিলে খাবার তৈয়ারি করিয়া সে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিত। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

সে স্থির করিয়াছে—আবার সে পাঠশালা করিবে। পাঠশালার ছেলেদের সে লেখাপড়া শিখাইবে, তাহাদের কাছে বেতন লইবে। বিনিময়! সেবা নয়, দান নয়। দেনা-পাওনা! সে তাহাদের লেখাপড়ার মধ্যে তাহার জীবনের আশ্বাসের কথা জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যাইবে। বুঝাইয়া দিয়া যাইবে—জানাইয়া দিয়া যাইবে—তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না। সে বাঁচিয়া দুঃখ-কষ্টের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে—পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে ধনুকের মত, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইতেছে মনে হইতেছে, চোখ ছটকাইয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছে—তবু সে চলিয়াছে সেই সুদিনের প্রত্যাশায়। সেদিন মানুষের যাহা সত্যকার পাওনা—তাহা তোমরা পাইবে। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য, আরোগ্য, অভয়—এ তোমাদেরও পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি—তাহা শোন—আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও চেয়ে ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই।...মানুষের সেই পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। সেই দিনের দিকে চাহিয়াই মানুষ দুঃসহ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। সযত্নে রাখিয়া চলিয়াছে, পালন করিয়া চলিয়াছে—আপন বংশপরম্পরাকে। যে মহা আশ্বাস সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহার স্থির বিশ্বাস—মুক্তি একদিন আসিবেই। যেদিন আসিবে,

সেদিন পঞ্চগ্রামের জীবনে আবার জোয়ার আসিবে ; সে আবার ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জমান হইয়া উঠিবে। শুধু পঞ্চগ্রাম নয়, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রাম হইতে নবগ্রাম, নবগ্রাম হইতে বিংশতি গ্রাম, পঞ্চবিংশতি গ্রাম, শত গ্রাম, সহস্র গ্রামে জীবনের কলরোল উঠিবে। সে হয়তো সেদিন থাকিবে না ; তাহার বংশানুক্রমও থাকিবে না।

চলিতে চলিতে সে হঠাৎ থমকিয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল। তাহার মনের ওই অবসন্নতার যেন চকিতে একটা রূপান্তর ঘটিয়া গেল। সমস্ত দেহের স্নায়ুতে শিরায় একটা আবেগ সঞ্চারিত হইল। সে কি পাগল হইয়া গেল ? জীবনের সকল অবসন্নতা কিসে কাটাইয়া দিল এক মুহূর্তে ? এ কি মধুর সঞ্জীবনীময় গন্ধ ! দমকা বাতাসে শিউলি-ফুলের গন্ধ আসিয়া তাহার বুক ভরিয়া দিয়াছে। সে বুঝিতে পারে নাই, আচমকা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ গন্ধটির মধ্যে যেন কি একটা আছে। অন্তত তাহার কাছে আছে। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, রোমাঞ্চ দেখা দিল শীতার্তের মত। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে গন্ধ অনুসরণ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বাড়ীর সামনের সেই শিউলি-গাছের তলায়। দেখিল, বাতাসে টুপ্-টাপ্ করিয়া একটি দু'টি ফুল গাছের ডাল হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িতেছে। পাপড়িগুলিতে এখনও বাঁকা ভাব রহিয়াছে। সবেমাত্র ফুটিতেছে। সদ্য-ফোটা শিউলির গন্ধের মধ্যে সে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কত ছবি তাহার মনে পর পর জাগিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

—কে ? কে ওখানে ? নারীকণ্ঠে কে প্রশ্ন করিল।

আবিষ্টতার মধ্যেই দেবু বলিল—আমি।

দেবুর দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল একটি মেয়ে। জ্যোৎস্নার মধ্যে সাদা কাপড়ে তাহাকে অদ্ভুত মনে হইতেছিল, সে যেন অশরীরী কেহ। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল ও কে ? বিলু ? না। চাঞ্চল্য সত্ত্বেও আজ তাহার মনে পড়িল—একদিনের ভ্রমের কথা।

—বাপ্ রে ! সেই সন্ধ্যেবেলা থেকে এসে বসে রয়েছি—বলিতে বলিতেই সে আসিয়া দাঁড়াইল একেবারে দেবুর কাছটিতে। আরও কিছু মেয়েটি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু বলিতে পারিল না। দেবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে দেখিল ; মেয়েটি বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই কি দেবু চিনিতে পারে নাই ? অথবা চিনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না ? পরমুহূর্তেই দেবু তাহার চিবুকে হাত দিয়া তাহার মুখখানি আকাশের শুভ্র জ্যোৎস্নার দিকে তুলিয়া ধরিল। এই তো, এই তো—এই তো নব জীবন—ইহাকেই যেন সে চাহিতেছিল। বুঝিতে পারিতেছিল না।

মেয়েটি বলিল—আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি স্বর্ণ।

—স্বর্ণ ?

স্বর্ণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। বলিল—হ্যাঁ। বলিয়াই হেঁট হইয়া দেবুকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল—বিকেলবেলা খবর পেলাম। সন্ধ্যের সময় এসেছি। জংশন দিয়েই তো এলেন ! একটা খবর দিলেন না ?

দেবু কোন উত্তর দিল না। বিচিত্র দৃষ্টিতে সে তাহাকে দেখিতেছিল। এই স্বর্ণ! তিন বৎসরে এ কি পরিপূর্ণ রূপ লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া আজ দাঁড়াইল? পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে—শরতের ভরা ময়ূরাক্ষীর মত স্বর্ণ। চোখে-মুখে জ্ঞানের দীপ্তি, সর্বদেহ ভরিয়া তরুণ স্বাস্থ্যের নিটোল পুষ্টি, গৌর-দেহবর্ণের উপর উঠিয়াছে রক্তোচ্ছ্বাসের আভা। মুহূর্তের জন্য তাহার মনে পড়িল পদ্মকে।

স্বর্ণ তাহাকে ডাকিল—দেবু-দা!

—কি স্বর্ণ?

—আসুন, বাড়ীর ভিতরে আসুন। রান্না করে বসে আছি। কতবার দুর্গাকে বললাম ডাকতে। কিছুতেই গেল না।

—তুমি আমার জন্য রান্না করে বসে আছ? অবাক্ হইয়া গেল।

-হ্যাঁ। এখানে এসে দেখলাম, রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থা হয় নি, বেশ মানুষ আপনি! দেবু একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল।

পদ্মের সঙ্গে স্বর্ণের পার্থক্য আছে। পদ্মের মধ্যে উল্লাসের উচ্ছ্বাস আছে—স্বর্ণ নিরুচ্ছ্বসিত, স্বর্ণকে দেখিয়া তাহার পলক পড়িতেছে না।

স্বর্ণ আবার ডাকিল—দেবু-দা! এমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন?

প্রগাঢ় স্নেহ এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে দেবু হাত বাড়াইয়া স্বর্ণের হাতখানি ধরিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কিছু বলবার কথা ছিল স্বর্ণ!

স্বর্ণ তাহার স্পর্শে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জ্বর-জর্জর মানুষের মত দেবুর হাতখানি উত্তপ্ত। স্বর্ণ হাতখানা টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল, দেবুর হাতের মুঠা আরও শক্ত হইয়া উঠিল। মৃদু গাঢ়স্বরে সে বলিল—ভয় পাচ্ছ স্বর্ণ! ভয় করছে তোমার?

–দেবু-দা! একান্ত বিহ্বলের মত স্বর্ণ অর্থহীন উত্তর দিল।

—ভয় করো না। তুমি তো সেই চাষীর ঘরের অক্ষয়পরিচয়হীনা হতভাগিনী মেয়েটি নও। ভয় করো না। হয়তো এই মুহূর্তটি চলে গেলে আর আমার কথা বলা হবে না। স্বর্ণ, আমি আজ বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাকে—ভালবেসেছি।

স্বর্ণ কাঁপিতেছিল। দেবুকে ধরিয়াই কোন রূপে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রি চলিয়াছে ক্ষণ-মুহূর্তের পালকময় পক্ষ বিস্তার করিয়া। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান-পরিবর্তন ঘটিতেছে। কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমীর চাঁদ আকাশে প্রথম-পাদ পার হইয়া দ্বিতীয় পাদের খানিকটা অতিক্রম করিল। ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকিত শরতের আকাশে শুভ্র ছায়াপথ আকাশবাহিনী নদীর মত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, শুভ্র ফেনার রাশির মত ওগুলি নীহারিকাপুঞ্জ। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের রূপান্তর ঘটিতেছে; চোখে দেখিয়া বুঝা যায় না।

দেবু স্বর্ণকে বলিয়া চলিয়াছে—তাহার যে কথা বলিবার ছিল। তাহার নিজে কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানো কথা। নূতন যুগের আমন্ত্রণ নূতন

ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ভরা ধর্মের সংসার—

দেবু বলিল—তোমার আমার সে সংসারে সমান অধিকার, স্বামী প্রভু নয়—স্ত্রী দাসী নয়—কর্মের পথে হাত ধরাধরি করে চলব আমরা। তুমি পড়াবে এখানকার মেয়েদের—শিশুদের, আমি পড়াব ছেলেদের—যুবকদের। তোমার আমার দুজনের উপার্জনে চলবে আমাদের ধর্মের সংসার।

দুর্গা তাহাদের কাছেই বসিয়া সব শুনিতেছিল। সে অবাক্ হইয়া গেল।

শুধু তাহাদের নয়—পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা; অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে—ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম, মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট, সবল-দেহ—আকারে তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলা-ফেরা করিবে। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার, পথঘাট। ঝক্‌ঝকে বাড়ীগুলি অবারিত আলোয় উজ্জ্বল—মুক্ত বাতাসের প্রবাহে নির্মল সুস্নিগ্ধ। সুন্দর সুগঠিত সুসমান পথগুলি বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, পঞ্চগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া, সুদূরপ্রসারী হইয়া চলিয়া যাইবে—শিবকালীপুর হইতে দেখুড়িয়া—দেখুড়িয়া হইতে মহাগ্রাম, মহাগ্রাম হইতে কুসুমপুর, কুসুমপুর হইতে কঙ্কণা, কঙ্কণা হইতে ময়ূরাক্ষী পার হইয়া জংশনের দিকে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে যাইবে সেই পথ। সেই পথ ধরিয়া যাইবে পঞ্চগ্রামের মানুষ, পঞ্চগ্রামের শস্য-বোঝাই গাড়ী দেশ-দেশান্তরে। শত গ্রামের—সহস্র গ্রামের মানুষ তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া সেই পথ ধরিয়া আসিবে পঞ্চগ্রামে।

স্বর্ণ স্তব্ধ হইয়া অপলক চোখে দেবুর দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছে; লজ্জা সংকোচ কিছুই যেন নাই। শুধু তাহার মুখখানি অল্প অল্প রাঙা দেখাইতেছে। দুর্গা দেবুর সব কথা বুঝিতে পারিতেছে না—তবু একটা আবেগে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছে; শুনিতে শুনিতে চোখ হইতে তাহার জল গড়াইয়া আসিল।

দেবু বলিল—সেদিনের প্রভাতে মানুষ ধন্য হবে। পিতৃপুরুষকে স্মরণ করবে ঊর্ধ্বমুখে—সজল চোখে। আমাদের সন্তানেরা আমাদের স্মরণ করবে; তাদের মধ্যেই আমরা পাব—তাদেরই চোখে আমরা দেখবো সেদিনের সূর্যোদয়।

হঠাৎ দুর্গা প্রশ্ন করিয়া বসিল—সে আর থাকিতে পারিল না—বলিল—জামাই!

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বল্। একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—কিছু বলছিলি?

কথাটা দুর্গার মত প্রগল্‌ভাও বলিতে গিয়া বলিতে পারিতেছিল না। জামাই পণ্ডিতের ভরসা পাইয়া সে বলিল—আমাদের মত পাপীর কি হবে জামাই? আমরা কি নরকে যাব?

হাসিয়া দেবু বলিল—না দুর্গা—নরক আর থাকবে না রে। সবই স্বর্গ হয়ে যাবে। ছোট-বড়র ছোট থাকবে না—অচ্ছুৎ-ছুতের অচ্ছুৎ থাকবে না—ভাল-মন্দের মন্দ থাকবে না—

—তাই হয়? কি বলছ?

—ঠিক বলছি রে। ঠিক বলছি। মানুষ চার-যুগ তপস্যা করছে—এই নতুন যুগের জন্যে। এই আশার নিয়মেই রাত্রির পর দিন আসে দুর্গা। দিনের পর মাস আসে, মাসে মাসে বছরের পর বছর আসে—পার হয়। মানুষেরা সেই আশা নিয়ে বসে আছে। সে দিনকে আসতেই হবে।

দুর্গা মনে মনে বলিল—সে দিন যেন জামাই তোমাকে আমি পাই। বিলু-দিদি মুক্তি পেয়েছে আমি জানি। স্বর্ণও যেন সেদিন মুক্তি পায়—নারায়ণের দাসী হয়। আমি আসব এই মর্ত্যে—তোমার জন্যে আসব, তুমি যেন এস। আমার জন্যে একটি জন্মের জন্যে এস। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম। করছি এই জন্যে। তোমাকে পাবার জন্যে।

কৃষ্ণা-সপ্তমীর চাঁদ মধ্য-আকাশে পৌঁছিতেছে, বর্ণ তাহার পাণ্ডুর স্তিমিত হইয়া আসিতেছে; রাত্রি অবসানের আর দেরি নাই।

আশ্বিনের প্রথমে মাঠে চাষীদের অনেক কাজ—নিড়ানের কাজ, অনেকের ক্ষেতে আউশ পাকিয়াছে—ধান কাটার কাজ রহিয়াছে—এই ভোরেই চাষীরা মাঠে যাইবে। মেয়েরা ঘর-দুয়ারে মাড়ুলী দিতেছে। তাহাদেরও এখন সমস্ত ঘরগুলিকে ঝাড়িয়া কলি ফেরানোর মত নিকানোর কাজ—তাহার উপর আলপনা-আঁকার কাজ। পূজায় মুড়ি ভাজার কাজ, ছোলা পিষিয়া সিউই ভাজার কাজ, নাড়ু তৈয়ারীর কাজ—অনেক কাজ রহিয়াছে। এমনি করিয়া পালে-পার্বণে ঘর নিকাইয়া আলপনা দিয়া ঘরগুলিকে শ্রীসম্পন্ন করিতে হয়। সম্মুখে মহাপূজা আসিতেছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন শহরে কলের দশ-বারোটা বাঁশী বাজিতেছে—একসঙ্গে। সতীশদের পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—কলের কাজে যাইতে হইবে। কত কাজ! কত কাজ!! কত কাজ!!! গাছে চারিদিকে পাখীরা কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। দুর্গা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—ভোর হয়ে গেল। যাই, ঘরে দোরে জল দিই! স্বর্ণও উঠিয়া গলায় আঁচল দিয়া দেবুকে প্রণাম করিল। বলিল—আমায় গিয়ে তুমি নিয়ে এস। যেদিন নিয়ে আসবে, আমি আসব। দুর্গার চোখ হইতে দুটি জলের ধারা নামিয়া আসিয়াছে। ঠোঁটের প্রান্তে প্রান্তে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্ধকার কাটিয়া সূর্য উঠিতেছে—প্রভাত চলিয়াছে ক্ষণমুহূর্ত প্রহর দিন রাত্রির পথ বাহিয়া সেই প্রত্যাশিত প্রভাতের দিকে।

প্রেম ও প্রয়োজন

মাঝখানে দালাল দাঁড়াইয়াছিল মহাজন কড়ি গাঙ্গুলী। সেই এহেন অঘটন ঘটাইল, তাহারই যোগাযোগে রমণদাস বিক্রয় করিল। রমণদাস দাম পাইল মন্দ কি!

কড়ি গাঙ্গুলীর নিকট হইতে পাঁচশো টাকার বন্দকী দলিলখানা ফেরত পাইল, আমডহরার জোলে বিঘা সাতেক জমি, আর হালের জন্য একজোড়া গরু। তবে ভবিষ্যতের আশা বিপুল। রমন সেই আশাতেই ভোর হইয়া কাজটা করিল। কড়ি গাঙ্গুলী বোলেচালে ভবিষ্যৎটিকে রমণের চোখের সম্মুখে সুপ্রত্যক্ষ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে রমণদাসের কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়া বেশ মিঠা হাসির রেশ ফুটিয়া উঠিল। লোহা নরম হইয়াছে দেখিয়া কড়িও সঙ্গে সঙ্গে ঘা দিয়া বসিল, কহিল—হবে কি? সেদিন মনে কর তোর হয়েছে। কাল দেখবি যখন জুড়িগাড়ি এসে তোর দোরে দাঁড়াবে।

রমণদাস মুগ্ধ হইয়া গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি দিয়া বসিল। ঘরে স্ত্রী ক্ষুণ ক্ষুণ করিতেই সে গাঙ্গুলীর কথাগুলিই তাহাকে সাড়ম্বরে বুঝাইয়া দিয়া বলিল—কথাটা একটু তলিয়ে বুঝিস, বুঝলি মাগী—তলিয়ে বুঝিস। নইলে মাটি আর গরুর জন্যে কি রমণদাস মেয়ে বিক্রি করে? রমা যেদিন গয়না পরে গাড়ি চড়ে বাড়ির দোরে এসে নামবে সেই দিনই দেখবি। আর গাঁয়ের লোক যেদিন সুপারিশের জন্য এসে জ্বালাতন করবে সেই দিন বুঝবি। ঐ কড়ি গাঙ্গুলী, ওকেও আসতে হবে, দেখিস তুই—ও-ও এসে বলবে, 'দাস, রমাকে বলে এই কাজটা আমার করিয়ে দিতে হবে। না হয় আমার দুটো কান তোর বঁটি দিয়ে কেটে দিস। কথাগুলো পরে না বোঝে তুই বুঝিস।

পরে পাঁচজনেও নির্বোধ নয়, সে কথাটা তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল। কিন্তু পরের ঈর্ষা করা নাকি মানুষের স্বভাব। তাহারা রমণদাসের নিন্দার আর বাকী রাখিল না। পাড়াগাঁয়ে সংবাদপত্রের অভাব আছে সত্য, কিন্তু সংবাদদাতার অভাব নাই। রমণের বন্ধু হেলু মণ্ডল আসিয়া কহিল—আর দাদা, এরই মধ্যে শালাদের ছটফটানির আর অন্ত নেই।

রমণদাস পুলকিত হইয়া কহিল—কি রকম, কি রকম শুনি!

হেলু কহিল—শালারা রাতারাতি ধম্মের গাছ হয়ে উঠেছে। কেউ ধম্ম দেখাচ্ছে, কেউ বলছে পতিত করব। মাগীগুলোর তো ঘাটে পথে ঐ কথা ছাড়া আর কথাই নেই। গালে হাত দিয়ে সব বলছে—হায় কলিকাল,—বিধবা মেয়ে, অ্যা!

রমণদাস হাসিতে শুরু করিল—কি বলছে, পতিত করবে—না? হি-হি-হি। ধম্ম—না কি ভায়া, অ্যা-হি-হি-হি।

সে হাসি তাহার আর শেষ হয় না। স্তরে স্তরে গমকে গমকে বাহির হইতে শুরু করিল। হেলু উঠিয়া গেল। তখনও সে মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে তাহার স্ত্রীর নিকটে আসিয়া অতি বিস্তারে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিল—দেখলি মাগী, বলেছিলাম কি না? দেখলি, এরই মধ্যে শালাদের উঁসখুসানি!

গোবরে পদ্ম ফোটে না, কিন্তু গরিবের ঘরে নীচ জাতির মধ্যে রূপ দেখা যায়। রমণদাস জাতিতে নিম্নবর্ণ, অবস্থায় দরিদ্র, কিন্তু তাহার কন্যা রমা রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে রূপ অপরূপ না হইলেও স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। রমাকে কাহারও একবার দেখিয়া আশ মেটে না। বরাবর দেখিতে ইচ্ছা করে।

এই রমাই বিক্রয় হইল। ক্রয় করিলেন এই অঞ্চলের জমিদার মহেন্দ্রবাবু। বিপত্নীক জমিদারের বালক পুত্রকে প্রতিপালন করিতে একটি নারীর প্রয়োজন ছিল।

পত্নীবিয়োগের পর বাবু আর বিবাহ করিলেন না। বিগতা ভাগ্যবতী পত্নীর প্রতি প্রেম তাহার একটা কারণ হয়তো বটে, কিন্তু আরও একটা কারণ ছিল। মহেন্দ্রবাবু সেটা নিজ-মুখেই বলিয়া থাকেন।

—কি হবে আবার বিয়ে করে? আবার কতকগুলো ছেলেপিলের পাল বাড়ানো তো? সম্পত্তি টুকরো টুকরো করে কেটে ভাগ হবে। ও আমি পছন্দ করি না। বেশী কতকগুলো ছেলেমেয়ে—ও হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ।

চাঁদের কলঙ্করেখার মত ঐশ্বর্যের সঙ্গে সত্যের এ দাম্ভিকতা মানায় ভাল। সুতরাং পুত্রের জন্য এখন একটি নারীর প্রয়োজন হইল।

কড়ি গাঙ্গুলী ওরফে এককড়ি গাঙ্গুলী বাবুর মহালের মধ্যে মহাজনী কারবার করিয়া থাকে। বাবুর অনুগত বুদ্ধিমান লোক সে। বুদ্ধিমান কড়ি চট করিয়া বাবুব এই প্রয়োজনটির গুরুত্ব অনুভব করিল। বিজ্ঞাপন না দিলেও এই নারীটির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রয়োজন তাহাও সে অনুমান করিয়া লইল।

এদিকে রমণদাসের খতখানা যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আবার রমাও ভাসিয়া যাইতেছে। সব দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে অনুভব করিল এই সুযোগে রমার একটা গতি করিয়া দিলেই সব সমস্যা অতি সহজে মিটিয়া যায়। কারণ বাবুর মনে মনে ছকা বিজ্ঞাপনের নারীমূর্তিটির সহিত রমা যেন খুব ভাল মিলিয়া যাইতেছে। ভরসা করিয়া গাঙ্গুলী উঠিয়া পড়িল।

রমণদাসকে রাজী করিয়া সেদিন সে রমাকে লইয়া বাবুর দরবারে হাজির হইল। অজুহাত একটা নালিশের। বিধবা রমাকে দেবর ভাশুর খাইতে দেয় না, বিষয়সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই। নালিশ তাই লইয়া, খোরপোষ কিংবা বিষয়ের ভাগ রমাকে পাইতে হইবে।

মহেন্দ্রবাবু তখন তাঁহার খাস বৈঠকখানার কামরায় বসিয়া ছিলেন। জনা-দুই কর্মচারী সম্মুখের টিপয়টার উপর কতকগুলি খাতাপত্র ফেলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতেছিল। গাঙ্গুলী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তারপর পিছনের পানে উদ্দেশ করিয়া একটা শোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

আয় আয়,—এগিয়ে আয়। পেন্নাম কর পেন্নাম কর। সিঁড়ির নীচে উঁচু দেওয়ালের আড়ে দাঁড়াইয়া রমা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। গাঙ্গুলীর হাঁকে সে কয় পা অগ্রসর

হইয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল। গাঙ্গুলী আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় কিসের রে বাপু? কান্নাই বা কিসের? বাবুর পায়ে গড়িয়ে পড, সব উপায় হবে তোর।

রমা কিন্তু আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাঙ্গুলী বিরক্ত হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল—চল ফিরে তোর বাবার কাছে। বাবা কি বলে দিলে তোর? পায়ে চেপে ধরতে বলে দেয় নি? দয়া কি মানুষের অমনি হয়? .বাবা তোর আর ভাত দেবে না তা মনে থাকে যেন।

রমা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—সম্পত্তি তারাই ভোগ করুক কাকা, আমি খেটে খাব। বাবুর সামনে আমি যেতে পারব না।

সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। কড়ি গাঙ্গুলী খাঁটি বাস্তব রাজ্যের লোক, সে রমার এই আকুলতা আমলেই আনিল না। একরকম জোর করিয়াই রমাকে সে মহেন্দ্রবাবুর সম্মুখে আনিয়া কহিল—পেন্নাম কর, পায়ের ধূলো নে।

কড়ি গাঙ্গুলীর হাঁকেডাকে সকলেই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। কিন্তু এমনটি কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

হরিণীর মত শঙ্কিতা, অতি কোমল ফুলের মত একটি নারী। জটিল বিষয়তত্ত্বটির যেন খেই হারাইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু মেয়েটির মুখ হইতে দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারেন না। কর্মচারী দুইজনও চকিতের মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মহেন্দ্রবাবু অকারণে নড়িয়া-চড়িয়া ভাল হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, কি হয়েছে এর? বস তুমি।

কড়ি এতক্ষণে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিল—কাজটা শেষ হোক আপনার।

মহেন্দ্রবাবু কড়ির মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, হুঁ। তারপর আর একবার খাতাপত্রগুলি টানিয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিন্তু জটিল বিষয়টি আরও যেন জট পাকাইয়া বসিয়া আছে। সহসা হাতের পেন্সিলটি ফেলিয়া দিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এর পরে নিয়ে এসো। নিজেরা আগে ভাল করে বুঝে তার পরে বোঝাতে এসো।

কর্মচারী দুটিও বাঁচিল। তাহারা নিঃশব্দে খাতাপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। সিঁড়ির পথে নামিবার সময় তাহাদের চোখে চোখে কি একটা কথার আদানপ্রদান হইয়া গেল। এ-ও একটু হাসিল, ও-ও একটু হাসিল।

মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে কহিলেন—কি, ব্যাপার কি?

গাঙ্গুলী রমাকে বলিল—বল, বাবুকে সব খুলে বল।

কিন্তু রমা যেন মূক হইয়া গেছে।

গাঙ্গুলী একটা ধমক দিয়া কহিল—বল না রে বাপু।

রমা কিছু কহিল না। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন—তুমিই

বল না হে বাপু। ছেলেমানুষকে এ রকম ধমক দিচ্ছ কেন?

ধমক খাইয়া গাঙ্গুলীর ছাতিটা দশহাত হইয়া উঠিল। আড়ম্বর করিয়া নালিশের বিবরণ সবিস্তারে গোচর করিয়া কহিল—এখন হয়েছে কি জানেন, হতভাগীর একূল-ওকূল দুকূল যেতে বসেছে। এক কূল খেলে কপাল, অন্য কূলে ভাই-ভাজ দিচ্ছে কাঁটা। বাপ-মা তো আর ফেলতে পারে না। কিন্তু ভাই-ভাজের সে সহ্য হয় না। আর তারা পুষতেই বা পারবে কোথায় বলুন। আমার কাছেই তো পাঁচশো টাকা দেনা। বাড়িঘর পর্যন্ত বন্ধক রয়েছে। এখন আপনার চরণে এনেছি, ভাসিয়ে দিতে হয়, কিনারা করতে হয়—যা করতে হয় আপনি করুন।

মহেন্দ্রবাবু কাঁচা লোক নন। বিষয় জট পাকাইতে তাঁহাব মত তীক্ষ্ণধী লোক এ অঞ্চলে আর নাই। জলের ধারে দাঁড়াইয়া তিনি অথই জলের মাছের সন্ধান করিতে পারেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আবার একবার গাঙ্গুলীর মুখের পানে চাহিলেন। তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, শোন—এদিকে।

অন্তরালে গাঙ্গুলীকে কহিলেন, তোমার কি চাই বল?

ভূমিকা তিনি ভালবাসেন না। পরিষ্কার সোজা কথা তাঁহার। গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইয়া একটু আমতা আমতা করিতেই তিনি সোজাসুজি কহিলেন—তোমার চেয়ে ঢের বদমাশ আমি গাঙ্গুলী, তোমার মতলব কি খুলে বল দেখি।

গাঙ্গুলী প্রথমেই ধমক খাইয়া একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে কতকগুলা অসংলগ্ন কথা জড়াইয়া একটা অর্থহীন উত্তর দিয়া বসিল—আজ্ঞে তা ওর বাপ-মা—

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—ওর বাপ-মায়ের দোহাই ছাড়ো। সে থাকলে তো ওর বাপকেই তুমি এখানে আনতে পারতে। ওকে নিয়ে এলে কেন?

—আজ্ঞে ওর নালিশ, ও বাদী—

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—বাদী বিবাদী সাক্ষী সমন উকীল আদালত ওসব ছাড়ো। তোমার নিজের কথা বল। কি চাই তোমার? সেই টাকাটা উদ্ধার তো?

গাঙ্গুলী হাত জোড় করিয়া কহিল—আজ্ঞে এর বাপও পাঁচশো টাকা ধারে।

বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—অর্ধেক পাবে, আড়াই শো টাকা। খত ওর বাপকে দিতে হবে। আর যা দিতে হয় সে দেব আমি। ও থাক আমার বাড়িতে, ছেলেটাকে মানুষ করবে।

গাঙ্গুলী বাকীটা আর বাবুকে কহিতে দিল না; কৃতজ্ঞতার কলরব তুলিয়া বাবুকে নির্বাক করিয়া দিয়া কহিল—দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, সে তো ওর ভাগ্যি, মহাভাগ্যি। নে নে রমা, পেন্নাম কর, পেন্নাম কর। হতভাগা মেয়ে ইদিকে আয়। সে হিড়হিড় করিয়া রমাকে ওপাশ হইতে টানিয়া আনিয়া বাবুর সামনে আবার দাঁড় করাইয়া দিল। প্রণাম করিবার হেতু বুঝিবার কোন প্রয়োজন রমার ছিল না। দুনিয়াতে সে পায়ের তলাতেই তো পড়িয়া আছে। আজ্ঞামাত্র প্রণামও সে করিল। কিন্তু ভাগ্য যে তাহার সহসা কেমন করিয়া

সৌভাগ্য হইয়া উঠিল তাহা সে বুঝিল না। সে তো জানে ভাগ্য তাহার দগ্ধ হইয়া গেছে। পোড়াকপালী যে তাহার ডাকনাম! একান্ত সরল বিস্ময়ে রমা তাহার ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া বামুনকাকার পানে চাহিল। বামুনকাকা গদগদ হইয়া কহিল—রাজার মা, তুই রাজার মা হলি রমা। খোকাবাবুকে মানুষ করবি, এখানেই থাকবি। না বিইয়ে গোপালের মা হয়েছিল এক যশোদা আর সেই-ভাগ্যি হল তোর।

এ সংবাদে রমার বঞ্চিত চিত্তে একটা উল্লাস জাগিয়া উঠিল। সে উল্লাসের একটি তরঙ্গ তাহার অধরের তটরেখায় মৃদু উচ্ছ্বাসে দেখা দিল। মহেন্দ্রবাবু রূপের এই নব বিকাশে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গাঙ্গুলী বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল—তা হলে আজ আসি হুজুর।

একাগ্রতা ভঙ্গে বাবু একটু চকিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন—মেয়েটি তাহলে বাড়ির ভেতরে যাক।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—ওর বাড়িতে একবার বলা দরকার তো। তা কাল-পরশু যেদিন হোক আমি নিজে এসে—

বাধা দিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—পরশু নয় কাল। কালই ওকে তুমি নিয়ে আসবে। আর শোন, এদিকে এসো।

আবার অন্তরালে গাঙ্গুলীকে লইয়া গিয়া কহিলেন—বেশী চাল চালতে যেও না, গাঙ্গুলী। তাহলে হবে সবই, মধ্যে থেকে মরবে তুমি। বুঝলে?

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ, সর্বনাশ! দেখুন দেখি, আমার ঘাড়ে কি দশটা মাথা গজিয়েছে নাকি? কালই আমি ওকে নিজে সঙ্গে করে এনে রেখে যাব।

বাবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—আচ্ছা।

—আর নেহাৎ যদি কাল না হয় তবে পরশু।

বাবু কহিলেন—হুঁ যাও।

গাঙ্গুলী কিন্তু গেল না। দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বাবু কহিলেন—হ্যাঁ—তাহলে আজ যাও।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গাঙ্গুলী আবার ফিরিল। এবার যেন মরীয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে আমার টাকার ব্যবস্থাটা তা হলে—

মহেন্দ্রবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া কহিলেন, ভয় নেই, সে হবে, তোমার দায়ে আমি ইনসলভেন্সি নেব না। ও যদি কাল এখানে আসে তো পরশু তোমার ব্যবস্থা হবে। টাকাটা যে দেব সে আমি ওর সম্পত্তির দাম থেকে দেব। ও এসে ওর স্বামীর সম্পত্তি আমাদের লিখে দেবে। সেই দাম থেকে তুমি টাকাটা পাবে। তারপর ওর দেওর ভাসুরের সঙ্গে আমি বুঝে নেব। নইলে মানুষ কেনা তো আমার ব্যবসা নয়।

গাঙ্গুলী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর আবার বাবুকে গিয়া কহিল—ও আর বাড়ি গিয়ে কি করবে? আজ থেকেই এখানে থাক। আমি বাড়ি গিয়ে সব বলব'খন।

বাবু কহিলেন—না যাক, একবার ঘুরেই আসুক।

বেশ প্রসন্ন মন লইয়া গাঙ্গুলী ফিরিতে পারিল না। দেনাপাওনার সংসারে সে ধারে কারবার পছন্দ করে না। অন্ততঃ ধারে দেওয়া গাঙ্গুলীর নীতি নয়; দোকানী গুপো দত্তর কথাটা তাহার খুব ভাল লাগে। দোকানে ধার চাহিলে সে বড় বড় গোঁফ জোড়াটা নাড়িতে নাড়িতে সবিনয়ে কহে—বিলাত ফেলতে আমি পারব না বাবা। বিলাত এখান থেকে অনেক দূর। সে যাবার ক্ষমতা আমার নাই।

ধার দেওয়াকে গাঙ্গুলীর দেশে বলে বিলাত ফেলা। গাঙ্গুলীও মনে মনে তাহার এই বিলাতের কথা ভাবিতেছিল। তাহার বিলাত যাইতে তো লাগিবার কথা একদিন। কিন্তু মধ্যের ব্যবধানে সমুদ্র যদি অকস্মাৎ পরিধিতে বাড়িয়া যায়! কিংবা কাঁপিতে থাকে! তবে? লাল কাঁকর বিছানো সরকারী পাকা রাস্তা বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরিয়া বিসর্পিল গতিতে চলিয়া গিয়াছে। দুপাশে শ্যাম-শোভাময় অবারিত মাঠ। উপরে আকাশ প্রসন্ননীল। আশ্বিনের প্রথমেই আউশ ধানের সদ্যোদ্গত মঞ্জরীগুলি হইতে একটি সূক্ষ্ম মৃদু গন্ধ উঠিতেছে। শরতের রৌদ্রের একটি সুপ্রসন্ন শুভ্রতা মানুষের চিত্তে অকারণে উল্লাস জাগাইয়া তোলে। রমার চিত্তেও ঠিক এমনি একটি মৃদু উল্লাস জাগিয়াছিল। রাস্তায় ঠিকাদারের লোক রাস্তা মেরামত করিতে লাগিয়াছে। সাঁওতাল পুরুষ-নারী সব, সকলের সবল কালো দেহে সুস্থতার একটি স্নিগ্ধ আনন্দ। রুক্ষ চুলে জবাফুল গোঁজা, দৃঢ় দেহের সবল লীলায়িত গতির সঙ্গে সঙ্গে জবার শীষগুলি তালে তালে নাচিতেছে।

রমার বেশ ভাল লাগিল এদের। একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ার তলায় একটি নধরকান্তি শিশু একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের উপর শুইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতেছিল। তাহার মা আসিয়া কৃত্রিম কোপে আপন ভাষায় তিরস্কারের মধ্য দিয়া তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। শিশুটি পরমানন্দে জননীর বুকভরা স্নেহধারা পান করিতে আরম্ভ করিল। মায়ের বুকের খাটো কাপড়খানি অবোধ শিশুর হাতের টানে খসিয়া গেছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, কোন সংকোচ নাই মায়ের। লজ্জা যেদিক দিয়া মানুষের মনে আসে জননীটি বোধ করি সেদিকের পানে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল।

রমা বার বার মুখ ফিরাইয়া ওই মা ও শিশুটিকে দেখিতেছিল। গাঙ্গুলীকাকা বড় খর-গতিতে চলিয়াছে, নতুবা একটু দাঁড়াইত সে ঐ গাছতলাটিতে। চলিতে চলিতে রমা সহসা প্রশ্ন করিল—বাবুর ছেলেকে দেখেছ তুমি কাকাঠাকুর? কাকাঠাকুর তখনও মনে মনে বিলাতের দূরত্ব-সীমা জরীপ করিতেছিল। তবু সে অন্যমনস্ক ভাবেই কহিল—হুঁ!

—খুব সুন্দর, না?

—হুঁ।

—কত বড় বটে?

কাকাঠাকুর আর কথা কহিলেন না।

রমা আবার প্রশ্ন করিল—আমাদের ঘেটুর মত?

গাঙ্গুলী সহসা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—বকবক্ করে বকিস নে বাপু। এত

* * *

বেহায়া তুই তা আমি জানতাম না। গলায় দড়ি দিস একগাছ।

এ তিরস্কারে মেয়েটির মৃদু আনন্দটুকু নির্বাপিত সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোর মত মিলাইয়া গেল। বড় বড় চোখ দুটির বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া রমা এককড়ির পানে চাহিল। বিস্মিত বিষণ্ন সে দৃষ্টি। বাক্যের রূঢ়তায় সে আঘাত পাইয়াছিল। আর সবিস্ময়ে সে ভাবিতেছিল গলায় দড়ি দিবার মত বেহায়াপনা সে কি করিল।

মাথা অবনত করিয়া সে গাঙ্গুলীর পিছনে পিছনে চলিয়াছিল। চোখের জল যদি পড়ে তবে মা ধরণী সে অপরাধ তাঁহার আপন বুকে লুকাইবেন।

এ শিক্ষাটুকু রমা নিজে অর্জন করিযাছে, কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় নাই।

বাবুর বাড়িতে ঢুকিয়া রমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঐশ্বর্যের এমন প্রদীপ্ত আত্মপ্রকাশ সে আর কখনও দেখে নাই। তাহাদের গ্রামের চাটুজ্যেদের ছোট ছেলে কলিকাতায় কাজ করে। তাহার ঘর দেখিয়া তাহার কত আনন্দ হইত। ঘরটিতে একখানি তক্তপোষ, দেওয়ালে ছোট বড় কতগুলি ছবি টাঙানো। বাক্সগুলি বৃন্দাবনী ছিটের ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা থাকে। ছোট একটি টুলের উপর একটি কলের গান।

আর এখানকার প্রতিটি জিনিস এত উজ্জ্বল যে স্পর্শ করিয়া দেখিতে রমার ভয় হইল। সাপের জিভের মত একটি সূক্ষ্ম দীপ্ত রশ্মি যেন বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ঘরের মেঝেগুলো এত পিছল আর শীতল যে বমা চমকিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ নাই। সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া মেঝেটায় হাত বুলাইয়া দেখিল। কই, জল তো হাতে লাগে নাই! সে সবিস্ময়ে মেঝের উপর আবার হাত রাখিয়া মর্মরের শীতলতা অনুভব করিল।

কে পিছন হইতে কহিল—কি করছ?

পিছন ফিরিয়া রমা দেখিল ও-বাড়ির নলিনী দিদিমণি।

এই নলিনী দিদিমণিই খোকাবাবুকে এতদিন মানুষ করিতেছিল। নলিনী দিদিমণি নাকি ডাক্তারি পাস করা মেয়ে। গিন্নীমায়ের অসুখের সময় সে এখানে আসিয়াছিল। তাঁর মৃত্যুর পর খোকাবাবুকে মানুষ করিবার জন্য তাহাকে রাখা হইয়াছিল। এখন আবার তাহাকে বাবুর ডাক্তারখানায় কাজ করিতে হইবে।

সলজ্জ বিস্ময়ে সে মৃদুস্বরে কহিল—এত ঠাণ্ডা!

—মার্বেল পাথর কিনা। মার্বেল পাথর ভারী ঠাণ্ডা হয়। এখানে সব ঘরেই মার্বেল দেওয়া আছে। ঘরে চলো না, দেখবে এখন মার্বেলের বেদী। গরমের সময় শোবে দেখবে কত আরাম।

নলিনী হাসিল।

রমা সবিস্ময়ে নলিনীর পানে চাহিল। সে মার্বেল পাথর কি তাহা তো জানে না। কিন্তু সে প্রশ্ন করিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল।

নলিনী কহিল—এস, তোমায় সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিই। আমার ওপর আবার ভার পড়েছে।

চলিতে চলিতে নলিনী আবার কহিল—জান তো একজনের জবাব হলে তাকে কাজের ভার নতুন লোককে বুঝিয়ে দিতে হয়!

রমা জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

নলিনী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। রমাকে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কসাইয়ের কাছে জানোয়ার-বাচ্চা সুন্দর হলে কি আসে যায়?

কাহাকে কি উদ্দেশে কথাটা নলিনী বলিল রমা বুঝিতে পারিল না।

সে কহিল—কি বলছ দিদিমণি?

—বলছি ভগবানের বিচারের কথা। কসাইয়ের সঙ্গে ভগবানের কোন তফাত নাই।

রমা কহিল—ছি, ঠাকুর-দেবতাকে অমন কথা বলতে নাই।

নলিনী হাসিয়া কহিল—আর বলব না। এস এখন, যা করতে চলেছি তাই করি।

সমুখের ঘরখানায় ঢুকিয়া রমা অপূর্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। দেওয়ালের এমন সুন্দর রঙ! আকাশের রঙের সঙ্গে কোন তফাৎ নাই। তাহার মধ্যে আবার এমন সুন্দর লতা পাতা ফুলের সারি! নলিনীর অলক্ষ্যে সে চট করিয়া একবার দেওয়ালে হাত বুলাইয়া দেখিল। নলিনী তখন কলের পাখা দেখাইতেছিল। কেরোসিন তেলের জোরে নাকি পাখাটা আপনি ঘোরে।

দেওয়ালের গায়ে এত বড় বড় ছবি রমা আর কোথাও দেখে নাই। একটায় যেন ঠিক সূর্য উঠিতেছে। আবার একটায় আকাশের গায়ে ঘন মেঘ জমিয়াছে, মেঘের প্রতিটি স্তর দেখা যাইতেছে। আর একদিকে চাহিয়া রমা লজ্জায় মরিয়া গেল। উলঙ্গ একটি মেয়ের ছবি রহিয়াছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঠিক তাহারই পাশে আরও একটা। কিন্তু মেয়ে দুটি বড় সুন্দর। রমা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কহিল—চল দিদিমণি, ও-ঘরে যাই।

সে ঘরটায় প্রবেশ করিয়া রমা চমকিত হইয়া উঠিল। এ কি! চারিদিকে সে আর নলিনী দিদিমণি!

রমার সুপরিস্ফুট চমক কাহারও চোখ এড়াইবার নয়। নলিনী হাসিয়া কহিল—আয়না-ঘর এটা। এই ঘরে সাজপোশাক করতে হয়। চুল বাঁধতে হয়।

—এত বড় আয়না? মানুষের চেয়েও উঁচু?

একখানি আয়না অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে আবার কহিল—এত আয়না কি জন্যে দিদিমণি?

—আশপাশ পেছন সামনে সব দেখা যায়। দেখবে যখন চুল বাঁধবে এ ঘরে বসে।

নলিনী একটা আশ্চর্য হাসি হাসিল। রমার তাহা ভাল লাগিল না। সে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার পূর্বেই নলিনী ত্রস্তভাবে কহিল—ওমা বাবু যে! এস এস, চলে এস।

নলিনী চকিতের মধ্যে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোটি পুরুষ চারিদিক হইতে রমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। রমাও পলাইতে গেল। কিন্তু মার্বেলের অতি মসৃণতায় পা পিছলাইয়া সে একটি অতি অস্ফুট চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। চারিদিকে দর্পণে ভীতকম্পিতা স্খলিতবাসা তরুণীর অনাবৃত যৌবন তাঁহার বুকের মধ্যে যেন একটা নেশা জাগাইয়া তুলিতেছিল। শুধু নেশা নয়,—একটা অনুকম্পাকোমল মোহও তাহার মধ্যে ছিল। অবলা মেয়েটির এই ভীতিত্রস্ত ভঙ্গী তাঁহার বড় ভাল লাগিল। নতুবা এই পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার বিরক্ত হইবার কথা। অন্য কেহ এমনভাবে পড়িয়া গেলে তাহাকে অকর্মণ্য অপদার্থ বলিয়া ধমক দিতেন,—তাহার জবাব হওয়াও বিশেষ আশ্চর্যের কথা ছিল না। ভ্রূও তাঁহার কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই কোমল মোহটা তাঁহার সমস্ত মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সঞ্চারিত হইতেছিল। সেই মোহবশে তিনি নিজেই আসিয়া রমাকে দুটি বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। স্পর্শেরও একটা রূপ আছে, অনুভূতি তাহা প্রত্যক্ষ করে। প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও ঘুমন্ত মানুষ সাপের শীতল স্পর্শে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, অঙ্গ তাহার জুড়াইয়া যায় না। মহেন্দ্রবাবুর স্পর্শেও এমনি একটি রূপ ছিল, রমা শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তে মুহূর্তে মহেন্দ্রবাবুর মুঠি দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। সবল দৃঢ় পেষণে তাহার বাহু দুইটি যেন ভাঙিয়া যাইতেছিল। রমার যন্ত্রণার অবধি ছিল না। কিন্তু চিৎকার করিয়া কাঁদিতে তাহার সাহস হইল না। হাজার অবলা হইলেও সে নারী। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধের স্বরূপ যে কি, একটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আপনি তাহার জানা হইয়া গেল। ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্ষুধাবোধের মত এ বোধ নারীর নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনি জাগে। মানুষের মধ্যে এ প্রকৃতির জাগরণ।

রমা প্রতি মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা করিতেছিল। সমস্ত শরীর তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিদ্রোহ করিবার মত শক্তি এ সংসারে সকলের থাকে না, কিন্তু খানিকটা বাধা দিবার উপযুক্ত শক্তি সকলেরই আছে, চিৎকার করিতেও মানুষ পারে। কিন্তু এই জাতীয় মানুষের সে সাহস কখনও থাকে না। রমা ভয়ে চোখ মুদিয়া ফেলিল। তাহার চোখভরা জল চোখের পাতার চাপে গাল বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। মহেন্দ্রবাবুর সুদৃঢ় মুঠি শিথিল হইয়া আসিল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহারও মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। অকস্মাৎ দুটি কথা রমার কানে আসিয়া পৌঁছিল—ছেড়ে দিন!

নলিনী দিদিমণির কণ্ঠস্বর।

নলিনীর কণ্ঠস্বরে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ়তা ছিল। যে স্বরে আঘাত বা অমর্যাদা কাহাকেও করে না, কিন্তু দৃঢ়তায় সে অলঙ্ঘনীয়। মহেন্দ্রবাবু নলিনীর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে চমকিয়া

উঠিলেন। মৃদু আকর্ষণে রমার হাতখানি আকর্ষণ করিয়া নলিনী আবার তেমনি ভাবে কহিল—ছেড়ে দিন!

মহেন্দ্রবাবু ছাড়িয়া দিলেন। কম্পিতা রমার হাত ধরিয়া নলিনী ধীরভাবে অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন সহজ মানুষ হইয়া উঠিলেন। চিত্তের অপরাধ-বোধের ক্ষণিক দুর্বলতা তাঁহার ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ তিনি ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিলেন। কর্তৃত্বাভিমানী মানুষের মনে যে সুলভ অপমানবোধ থাকে—সেই বোধ বিপুল ক্ষোভে জাগ্রত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড উগ্রতায় তিনি ভীষণ হইয়া উঠিলেন। একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল—নলিনী!

শান্ত, সহজ স্বরে উত্তর আসিল--আসছি আমি।

মেয়েটার স্পর্ধায় মহেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন সহজভাবে কেহ কখনও তাঁহার ক্রোধকে উপেক্ষা করে নাই। দারুণ ক্রোধে তিনি যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার অভ্যাস নয়। ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ কখনও তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার ক্রোধ কাজ করে সাপের মত। আলোকে সে বাস করে বিবরে, শত্রুর দুর্দশা-রজনীর অন্ধকারে বিপুল গর্জনে আত্মপ্রকাশ করিয়া আক্রমণ করে।

মহেন্দ্রবাবু আর সে ঘরে দাঁড়াইলেন না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আপনার বসিবার ঘরে তিনি চলিয়া গেলেন। মুক্ত জানালার পাশে একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন। আবার তিনি উঠিলেন। বড় আলমারীটা চাবি-বন্ধ ছিল না, থাকেও না—সেখান হইতে টানিয়া বাহির করিলেন বোতল ও ছোট একটি গ্লাস। মদ তিনি খান, কিন্তু অপরিমিত পানকে তিনি ঘৃণা করেন। ছোট গ্লাসটি তাঁহার পরিমাপের পরিমিত নির্দিষ্ট। গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ঢালিয়া সেটুকু নিঃশেষে পান করিলেন। তাহার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। সিগারেটটা টানিতে টানিতে তিনি ভাবিতেছিলেন এটা বোধহয় নলিনীর বিদ্বেষ। তাঁহার অধরে মৃদু একটি হাসি খেলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পূর্বের ক্ষোভ তাঁহার আনন্দে রূপান্তরিত হইতেছিল।

সম্মুখের ভেজানো দরজা খুলিয়া গেল। সে শব্দে আকৃষ্ট হইয়া চাহিয়া দেখিলেন নলিনী ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার ক্রোধের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া কেহ কখনও দাঁড়ায় নাই। নলিনী কহিল—আমায় ডাকছিলেন আপনি?

মহেন্দ্রবাবু চেয়ারটার উপর খাড়া হইয়া বসিলেন। কথা তিনি মনে মনে খুঁজিতেছিলেন।

নলিনী আবার কহিল—কি বলবেন বলুন? আপনার সঙ্গে এক ঘরে এমন করে বসে থাকাটা লোকের চোখে বড় খারাপ ঠেকবে।

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন—কে তোমায় আসতে বললে? আমার তো কোন

প্রয়োজন ছিল না ?

একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া নলিনী একটু হাসিল। তারপর কহিল—তাহলে বোধ হয় আমারই ভুল হয়ে থাকবে। আমি যেন শুনলাম আপনি আমায় ডাকলেন। যাক্, আমারও একটু দরকার ছিল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নলিনী একখানা কাগজ বাহির করিয়া চেয়ারটার হাতলের উপর নামাইয়া দিল। তারপর একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্যই দরজাটা খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু পিছন হইতে মহেন্দ্রবাবু ডাকিলেন—শোন।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু কাগজখানা ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন—এর মানে ?

শান্তস্বরে নলিনী উত্তর দিল—ওর মানে তো খুবই সহজ। আমি কাজে জবাব দিচ্ছি। আমি আর এখানে থাকতে চাই না।

—কেন ? মহেন্দ্রবাবুর ললাটে বিরক্তির সারি সারি কুঞ্চিত রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

নলিনীর চোখে-মুখেও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল—এর আমি জবাব দিতে চাই না। এ বিষয়ে নিশ্চয় আমার স্বাধীনতা আছে।

মহেন্দ্রবাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বিবরের ভুজঙ্গ পরিপূর্ণ আলোকে আত্মপ্রকাশ করিতে চায় না সত্য, কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিলে সে আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। বিপুল গর্জনে তখন সে বাহির হইয়া আসে। একটা বেতনভোগিনীর বার বার এরূপ ঔদ্ধত্যে তাঁহার বাহ্যিক ক্রোধহীনতার মুখোশ সহসা যেন খসিয়া গেল। কর্কশ কণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—জান তুমি, এখানে তোমায় খুন করে দিলেও আমার কিছু হয় না। স্ত্রীলোক বলে রেহাই আমার কাছে নাই। সাবধান হয়ে কথা বল তুমি।

অকস্মাৎ এমন উত্তর নলিনী প্রত্যাশা করে নাই। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হইয়া গেল। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে সে কহিল—তা আমি জানি। সে তো আমার না-দেখা নয়। আমি নিজের চোখেই যে তা দেখেছি।

এ কথায় মহেন্দ্রবাবু কেমন যেন হইয়া গেলেন। সর্বনাশী মেয়েটার অভিযোগটা যে ভীষণ। তিনি নলিনীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী বলিয়াই গেল—আপনার স্ত্রীকে যেভাবে আপনি হত্যা করেছেন, স্লো-পয়জেন করা তার চেয়ে ভীষণ কিছু নয়। আইনের চোখে এটা হত্যাপরাধ নয়, কিন্তু একদিন এক জায়গায় এর বিচার হয়ত হবে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি ফুটিল। তিনি কহিলেন—বিচার যদি হয় তবে তোমার নাম সাক্ষীর তালিকায় থাকবে নিশ্চয়। যাক্ এসব মতলব ছাড়। আর একবার যদি এমন কথা তোমার মুখে শুনি—তোমায় সত্যিই আমি খুন করাব।

—তা হয়ত পারেন। কিন্তু সে আপনাদের ওই সরল নিরক্ষর চাষী প্রজাকে। আপনি

তো আমার পরিচয় জানেন। বেশ্যার মেয়ে আমি। আপনাদের এই ধনী জাতদের সর্বনাশ করা আমার না হোক—আমার জাতের পেশা। আমার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমাকে খুন করা খুব নিরাপদ হবে না জানবেন। আপনাদের জমিদার জাতটাই এমন আত্মম্ভরী। আপন এলাকার মধ্যে নিজেদের রাজা বলতেও আপনাদের লজ্জায় বাধে না। তাই এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

মহেন্দ্রবাবু এবার চুপ করিয়া গেলেন। শূন্য-গর্ভ বস্তু আঘাতের উত্তরে বিপুল গর্জন করিয়া উঠে, দুনিয়া তাহাকে ভয় করে না। কিন্তু নিরেট লোহার আঘাতে যে শব্দোত্তর আসে তাহা মৃদু তবে দৃঢ়তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় তাহার মধ্যে থাকে। ওই দৃঢ় মৃদুস্বরের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত আছে। সে উপেক্ষণীয় তো নয়ই, বরং আঘাতকারীর চিন্তার বস্তু।

মহেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ পর কহিলেন—আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু আবার ডাকিলেন—হ্যাঁ, খোকার গয়নাগুলো আর তোমায় কিছু গয়না দেওয়া হয়েছিল—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—খোকার গয়না আমি খাজাঞ্চীবাবুর জিম্মায় দিয়েছি, কখানা তার গায়ে আছে। তার রসিদ আমি খাজাঞ্চীবাবুর কাচ থেকে নিয়েছি। আর আমার—সেগুলো তো আমারই প্রাপ্য। জীবনের কৃতকর্মের গ্লানিকে আমি ভুল বলে মাথায় করে নিয়ে যেতে চাই না। আমার জন্মগত পেশা বলেই জমা-খরচ করতে চাই। সে আমার কাছে আছে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন কূল পাইলেন। তিনি চেয়ার হইতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—পুলিসে খবর দেব আমি।

নলিনী এ কথার কোন জবাব দিল না। ধীরভাবে দরজা খুলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া দরজাটায় হাত দিলেন। কিন্তু কি মনে হইল, আর দরজাটা খুলিলেন না। চিন্তান্বিত ভাবে চেয়ারটায় আবার বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হাঁকিলেন—কানাই!

কানাই বাবুর খাস খানসামা। সে আসিতেই তিনি কহিলেন—মেয়ে ডাক্তারের ফাইল নিয়ে কেরানীবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আর শোন, আলমারী থেকে বোতলটা—না থাক্, এক গ্লাস ঢেলে দিয়ে যা শুধু।

কানাই চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দরজাটার বাহিরে কে গলা ঝাড়িয়া আপনার আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করিল। মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এস।

কেরানীবাবু আসিয়া একটা ফাইল চেয়ারের হাতলটার উপর নামাইয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ফাইলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। দেখিয়া

শুনিয়া ফাইলটা বন্ধ করিয়া বলিলেন—ইনি রেজিগনেশন দিচ্ছেন। কিন্তু এগ্রিমেণ্ট রয়েছে দেখছি আরও তিন মাসের। এঁকে একটা নোটিশ দিয়ে দাও যে আমরা তোমার রেজিগনেশন নিতে পারব না। তুমি যদি চলে যাও তবে ক্ষতির দায়ী হতে হবে। আর একজন কাউকে সদরে পাঠিয়ে দাও, সে উকিলদের কাছে জেনে আসুক এর জন্য ফৌজদারী সোপর্দ করা যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত টিকুক চাই না টিকুক প্রথমটায় এমন একটা কিছু করা যায় কিনা।

নীরবে কেরানীবাবু ফাইলখানা তুলিয়া লইলেন। তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—একটি ভদ্রলোক এসে বসে আছেন। টিউবওয়েল কোম্পানীর লোক নাকি।

মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—হুঁ। কেরানীবাবুর আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। তিনি দরজার দিকে ফিরিলেন। পিছন হইতে বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, তাকে থাকতে বল আজ। কাল তার সঙ্গে কথা কইব। গ্রামের মধ্যে তিনটে টিউবওয়েল করিয়ে দেব ভাবছি। বড় জলের কষ্ট গ্রামের মধ্যে।

কেরানীবাবু এবার দরজায় হাত দিয়েছিলেন। বাবু কহিলেন—আর তোমাদের খালি পালাই-পালাই শব্দ! গভর্নমেণ্ট হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টে একখানা পত্র লেখ দিকি টিউবওয়েল বসানোর কথা জানিয়ে। গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন হয়ে গেল, কেউ যদি কিছু ভাবে!

কেরানীবাবু যাইতে যাইতে কহিলেন—কড়ি গাঙ্গুলী এসে বসে আছে।

অকস্মাৎ খড়ের আগুনের মত মহেন্দ্রবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন—যাও, যাও, যা বললাম তাই কর গিয়ে। ওটাকে দূর করে দিতে বল কাছারী থেকে।

ততক্ষণে কেরানীবাবু নিজের পশ্চাতে দরজাটার আড়াল দিয়া বাঁচিয়াছেন।

মহেন্দ্রবাবু চিন্তা করিতেছিলেন দেশের ম্যালেরিয়ার কথা। এ চিন্তা বড়লোকের শখ কি না কে জানে, কিন্তু তাঁহার এ চিন্তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। জীবনের পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়, আত্মীয়-সমাজ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক-একসময়ে এই বিচিত্র মানুষটির মনে এই ধারার চিন্তা জাগিয়া উঠিত। তখন অর্থের প্রতি মমতা তাঁহার থাকিত না, আপন দেহের প্রতি দৃকপাত করিতেন না। অকস্মাৎ ভূমিকম্প-জীর্ণ পাথরের বুক হইতে নির্ঝরিণী উৎসারিত হইত। আবার অকস্মাৎ সে উৎস রুদ্ধ হইয়া যাইত। সেদিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসরও তখন তাঁহার থাকিত না। তখন তিনি নিজের মনে মনেই বলিতেন—নির্বোধ—নির্বোধের কাজ হয়েছে এটা! এক-একসময় নির্বোধটা কেমন করে যে প্রবল হয়ে ওঠে!

দরজার বাহিরে আবার কাহার অতি কুণ্ঠিত মৃদু সাড়া পাওয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ বিরক্তিভরেই কহিলেন—কে?

দরজা অল্প ফাঁক করিয়া কড়ি গাঙ্গুলীর লম্বা মুখখানি উঁকি মারিল।

রুক্ষস্বরে মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—কি?

—আজ্ঞে আমার একটু কাজ ছিল।

—পরে এস। আমার শরীরটা ভাল নেই।

দরজাটা বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু অল্প একটু হাসিলেন। মানুষের এই ধরনের ভয় দেখিয়া বড় কৌতুক বোধ হয় তাঁহার। কিন্তু কি একটা কথা অকস্মাৎ তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইতেই তিনি উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেন। দরজার ধাক্কায় ওপাশে কে একজন মৃদু আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বাবু দেখিলেন কড়ি গাঙ্গুলী নাকে হাত বুলাইতেছে। দরজার ধাক্কাটা বেচারার নাকে আঘাত করিয়াছে। আঘাতের উপরেও বেচারা মহেন্দ্রবাবুর সহিত চোখাচোখি হইতেই চমকিয়া চোরের মত ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু কিন্তু তাহাকে কঠোর কিছু বলিলেন না।

বরং মৃদুস্বরেই কহিলেন—এই যে তুমি আছ। ভালই হয়েছে, শোন দিকি !

কড়ি চতুর লোক, গরজের দাম সে বোঝে। মুহূর্তে তাহার ভোল পাল্টাইয়া গেল। সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বাবুর অনুসরণ করিয়া ঘরের মধ্যে বিনা আদেশেই একখানা চেয়ার টানিয়া জাঁকিয়া বসিল। এবং সে-ই প্রথম কথা কহিল—আপনার দরজাগুলো ভারী বিশ্রী।

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—একটা বাঁদরকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সেটা লাফিয়ে বসল একেবারে চেয়ারটার মাথায়। ফলে চেয়ারটা গেল উল্টে। তখন বাঁদরটাও ঠিক একই কথা বলেছিল, বুঝেছ গাঙ্গুলী !

গাঙ্গুলী হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিল। 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' কথাটার দাম গাঙ্গুলীর বেশ জানা আছে, বহু ক্ষেত্রেই বহু ব্যঙ্গই হাসিয়া উড়াইতে হয় তাহাকে।

মহেন্দ্রবাবু তাহার হাসিটা কমাইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, শোন—আমি তোমার সেই টাকার কথা ভাবছিলাম। এখনও তো মেয়েটির দলিল হয় নি—

গভীর অভিনিবেশের সহিত গাঙ্গুলী শুনিতেছিল, এবং কথার শেষ যে কি হইবে তাহাও সে মধ্যপথে বুঝিয়া লইয়াছিল। সুতরাং সে মধ্যপথেই বলিয়া বসিল—তার আর কি ! আজই দলিল হয়ে যাক।

—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম, তুমি এখানে এসেছ, দলিলখানা তুমিই থেকে ওর টিপসই-টই সব করিয়ে দাও না। মেয়েটিও এখানে নতুন, কিছু ভাবতেও তো পারে।

হাসিয়া গাঙ্গুলী কহিল—আজ্ঞে না, সে ভয় কিছু নাই। জানোয়ারেও মাথা নাড়ে, কিন্তু রমা—

অকস্মাৎ বিরক্ত হইয়া বাবু কহিলেন—এইটেই আমি ঠিক পছন্দ করি না এককড়ি। মানুষের যদি আত্মা বলে বস্তু না থাকে—তবে সে কি মানুষ !

কড়ি এ কথার উত্তর বোধহয় জানিত না, কিংবা সে যাহা জানে তাহা দিতে সাহস করিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার কহিলেন—না, এই মানুষই ভাল এককড়ি। এদের রাগ কখনই হয় না। অন্যায়ে অবিচারে এরা দুঃখ করেই সন্তুষ্ট থাকে। যাক, প্রয়োজনের পক্ষে এরা খুব ভাল। দেখ, এখানে যে মেয়ে-ডাক্তারটি আছে সে বোধহয় মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে ভড়কে দিচ্ছে।

গাঙ্গুলী গরজের কথাটার এতক্ষণে হদিস পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার একখানা কণ্ঠস্বর দশখানা হইয়া উঠিল—দেখুন দিখি, সে হারামজাদীর কি সাধ্যি রমাকে ভাংচি দেয় আমি থাকতে! রাধে! রাধে! রমা সে মেয়েই নয়। বলুন না এখুনি তার চুলের মুঠি ধরে দিই আপনার পায়ের জুতোয় তার পিঠ ভেঙ্গে।

দরজার বাহিরে আবার সাড়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—কে?

—আজ্ঞে আমি। এস্টেটের নায়েবের কণ্ঠস্বর।

—এস। জরুরী কাজ আছে কি কিছু?

—কয়েকটা মামলার দিন আছে কাল।

—হ্যাঁ, যাই চল। কড়ি, তা হলে তুমি ওবেলা এস।

কড়ি চুপি চুপি কহিল—একটু বসলে হত না হুজুর? আমি দিতাম আপনার সামনেই রমাকে শাসিয়ে।

বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—এখন থাক।

কড়ি ছাড়িবার পাত্র নয়, সে কহিল—আমি তা হলে বরং রমাকে ডেকে একবার—।

মহেন্দ্রবাবু কথাটা কানেই তুলিলেন না। তিনি ডাকিলেন—কানাই, দরজাটা বন্ধ করে দে। তুমি বেরিয়ে এস গাঙ্গুলী। আর কানাই,—শোন্!

মৃদুস্বরে কানাইকে কহিলেন—একটা চাপরাসীকে বলে দে, মেয়ে-ডাক্তারের বাড়িতে পাহারা থাকতে। ও বোধহয় পালাবে।

নলিনী আপনার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বসিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল। রমা এক-পাশে নীরবে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

নলিনী কহিল—ওই ব্র্যাকেটের ওপর থেকে ফুলদানী দুটো দিতে পার ভাই? আর ওই ছবিখানা? না ওখানা নয়, ওটা বাবুর ছবি। ওই যে পাশেই খোকাবাবুর ছবি—ওইখানা।

নলিনী ছবিখানা বাক্সে পুরিয়া তাহার উপর কাপড় ঢাকা দিল। তারপর আবার অন্য জিনিস গুছাইতে আরম্ভ করিল। রমা মৃদুস্বরে কহিল—দিদিমণি!

কাজ করিতে করিতেই নলিনী উত্তর দিল—কি?

—তুমি কি সত্যিই আজ চলে যাবে?

প্রশ্নটির মধ্যে এমন কিছু ছিল না, কিন্তু রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বাক্যের প্রত্যক্ষ অর্থ ছাড়াও যেন অনেক কিছু ছিল। নলিনী মুখ ফিরাইয়া রমার দিকে চাহিল।

নলিনীর উদ্ধত চোখ দুটির উপর সকরুণ দৃষ্টি মিলাইয়া রমা বলিল—আমার কি হবে দিদিমণি!

প্রশ্নটির অভ্যন্তরের প্রচ্ছন্ন হতাশার সকরুণ সুরটুকু নলিনীকে বিশেষ করিয়া স্পর্শ করিল।

সে আবার হাতের কাজ ফেলিয়া নতমুখে বোধহয় এই প্রশ্নেরই উত্তরের সন্ধান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছ রমা ?

ম্লান হাসিয়া রমা কহিল—হাজার বোকা হলেও আমি তো মেয়েমানুষ দিদিমণি।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও নলিনী আপন মনে ভাবিতেছিল, এই পৃথিবীর বুকের উপর সে অতি বাস্তব উলঙ্গ সত্য সুকঠোর ভাবে শুনাইয়া দিয়া দয়া মায়া স্নেহ প্রেম সব যে মেকী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেও ঠিক সেই পথটি অতি সূক্ষ্ম রেখায় রেখায় অনুসরণ করিবে, কিন্তু রমার এ প্রশ্নের উত্তরে সে-পথ ধরাইয়া দিতে সে পারিল না। সে নিজেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

রমা কহিল—দিদিমণি ?

—ভাই !

—কি হবে আমার ?

—সেই কথাই তো ভাবছি বোন। কিন্তু কূল-কিনারা খুঁজে যে কিছু পাচ্ছি না।

—আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল না দিদিমণি। আমি তোমার কেনা ঝিয়ের মত থাকব।

একটু চিন্তা করিয়া নলিনী ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল—না। তোমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মত শক্তি আমার নেই। এখানে এলে বের হয়ে যাওয়া সহজ কথা নয় ভাই। আমিও আজ ছ-মাস ধরে পথ খুঁজছি। আজ তুমি এসেছ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে যদি পথ পাই ! তবুও সে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই।

তারপর ঘরখানি নীরব নিস্তব্ধ। কূলহারা দুটি নারী—অসীম শূন্যতার মধ্যে আজও যাহার সন্ধান হয় নাই, বাক্যে যাহাকে প্রকাশ করা যায় না, মন যাহাকে কল্পনা করিতে পারে না—রূপহীন—আকারহীন এক আশ্রয়ের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, বোধ করি তাহারই জন্য কয় ফোঁটা জল রমার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

কানাই খানসামা আসিয়া কহিল—এই যে তুমি এখানে রয়েছ ! তোমাদের গাঁয়ের গাঙ্গুলী মশাই এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

গাঙ্গুলীর নাম শুনিয়া রমা বুঝিল কথাটা বলা হইয়াছে তাহাকেই, সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কই, কোথায় কাকাঠাকুর ?

কানাই কহিল—এখানে কি এসেছে সে ! সে আছে ওদিকের ঘরে বসে। আমার সঙ্গে এস তুমি।

রমা উঠিয়াছিল, কিন্তু নলিনী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—বস তুমি রমা। কানাই, যাও, তুমি গাঙ্গুলী মশাইকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

সবিস্ময়ে কানাই বলিল—এখানে !

—হ্যাঁ, দোষ কি ? এটা তো আমাদের অন্দর নয়, আমাদের বাসা এটা। আমি তো সকলের সামনেই বের হই।

কানাই আমতা আমতা করিয়া কহিল—কি সব ওদের ঘরোয়া কথা !—

—তা হোক, আমি সরে যাচ্ছি ও-ঘরে। যাও, তুমি তাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও। রমা এখন যেতে পারবে না, ওকে আমার দরকার আছে।

কানাইকে যেন অগত্যাই যাইতে হইল। রমা নলিনীকে পরম আশ্বাসভরে কহিল—আর আমার কোন ভাবনা নাই দিদিমণি, আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে চলে যাব।

নলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটি অদ্ভুত হাসি হাসিয়া কহিল—তোমাকে না দেখলে ভগবান যে সরল সে আমি বিশ্বাস করতাম না।

মৃদু হাসিয়া রমা কহিল—কেন দিদিমণি ?

প্রত্যুত্তরে নলিনী শুধু হাসিল।

কানাইয়ের গলা বাহির হইতে শোনা গেল—আসুন, এদিকে আসুন।

তাহার পেছন পেছন বারান্দার মোড় ঘুরিয়া গাঙ্গুলী দেখা দিল। রমাকে সম্মুখে দেখিয়া গাঙ্গুলী কহিল—এই যে রমা ! বেশ ভাল লাগছে তো ? তারপর—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, নলিনীকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বাইশ-তেইশ বছরের শ্যামবর্ণের মেয়েটি তো হেলা করিবার মত নয়। না থাক তাহার রমার মত রূপ, কিন্তু এ যে সম্ভ্রম করিবার মত নারী, মণিবেদীর উপর এই তো শোভা পায়। গাঙ্গুলী ব্যাপারটা বুঝিল। এখানে প্রয়োজন রূপসী দাসীর। সঙ্গে সঙ্গে অল্পক্ষণ পূর্বের একটা কথাও মনে পড়িল, বাবু বলিতেছিলেন– না, এই মানুষই ভাল গাঙ্গুলী। এদের অধিকার-বোধ নেই, এরা জীবনে শুধু দুঃখ করেই সন্তুষ্ট।

বাবুর বুদ্ধির উপর শ্রদ্ধার পরিমাণ তাহার বাড়িয়া গেল। দৃপ্তা নারী পুরুষের জীবনে একটা অশান্তি—এ বিষয়ে গাঙ্গুলী ভুক্তভোগী।

গাঙ্গুলীর চমক ভাঙিল নলিনীর কথায়। একটি নমস্কার করিয়া সে কহিল—আপনি এই ঘরে রমার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলী নমস্কারের ত্রুটিটা সারিয়া লইয়া কহিল—না—না—না। আপনার যাবার কোন দরকার নাই। বরং আপনি থাকাই ভাল। ভালই হবে, সে ভালই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিজেই যেন তাহার ফলোপলব্ধি করিতেছিল। তারপর সে কানাইয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—তুমি তা হলে কানাই—তা হলে—

কানাইকে চলিয়া যাও বলিতে সাহস হইল না। কিন্তু সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে ভাবটা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কানাই তাহা গ্রাহ্যই করিল না।

নলিনী এটা লক্ষ্য করিল। সে কহিল—যাও না কানাই এখান থেকে। তোমায় উনি যাবার জন্য বলছেন।

কানাই হাসিয়া কহিল—আমার কাছে গাঙ্গুলী মশাই লুকোন না কিছু।

নলিনীর অসহ্য বোধ হইল। সে তীক্ষ্নস্বরে কহিল। তবু উনি আজ তোমায় যাবার জন্য বলছেন। না তোমার হুকুম আছে যে এখনে কেউ গোপন কথা কইতে পাবে না ! •

কানাই নলিনীর এই উত্তেজিত তীক্ষ্ণ ধরনটিকে বড় ভয় করিত। নলিনীর কথায় অপ্রস্তুতের মত সে পালাইয়া বাঁচিল।

সঙ্গে সঙ্গে গাঙ্গুলী একরূপ কানাইয়ের পিঠের উপরেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, কহিল—লুকিয়ে কথা শোনা এখানকার লোকের একটা স্বভাব। এ বাড়ির তো সব বেটা গোয়েন্দা পুলিস। আশ্চর্য দস্তুর কিন্তু!

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—আপনাদের এখানে অনেক আশ্চর্য রকমের দস্তুর আছে দেখতে পাই। মানুষ কেনা-বেচা পর্যন্ত হয় দেখছি।

এমনধারা বাঁকা অথচ পরিষ্কার কথা গাঙ্গুলী কখনও শোনে নাই।

সে মহা লজ্জিত অপরাধীর মতই কহিল—সত্যিই আমার অপরাধের অন্ত নাই। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার অনুতাপের আর সীমা নাই। আর এমন যে হবে তা আমি বুঝতে পারি নি। বাবু যে ভদ্রলোক হয়ে এত বড় পাষণ্ড! ছি—ছি—ছি! আমায় বললেন, গাঙ্গুলী, সভ্য মানুষ ওরা, ছেলে মানুষ করা ওদের পোষায় না—তুমি যদি একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে—ঈশ্বরের দিব্যি—মা ভদ্রকালীর পুষ্প ছুঁয়ে আমি বলতে পারি, বুঝলেন! আপনার ভাতে হাত পড়বে—

নলিনী তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—আমার সঙ্গে কথা কইবার তো কোন প্রয়োজন নাই আপনার। রমাকে কি বলবেন বলুন আপনি! আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—গেলে তো চলবে না মা। সন্তানকে এ পাপ থেকে যে উদ্ধার করতেই হবে। চাষা-ভূষা মানুষ, কথার দোষ ধরলে তো চলবে না, মা।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—আমার কি হবে কাকাঠাকুর?

গাঙ্গুলীর গলা যেন ভাঙিয়া আসিতেছিল, ঘোলাটে চোখ দুটি ছলছল করিতেছিল, সে কহিল—তাই তো মা রমা, তোর কি উপায় করি আমি!

রমা ব্যাকুলভাবে কহিল—আমায় এখান থেকে নিয়ে চল বামুনকাকা।

ব্যগ্রভাবে কড়ি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—পারবি? পারবি এখান থেকে লুকিয়ে পালাতে রমা? একবার যদি বেরুতে পারিস তুই এখান থেকে—তারপর আমি দেখে নেব। এমন লুকিয়ে রাখব তোকে। হুঁ-হুঁ বাবা, আমারও নাম কড়ি গাঙ্গুলী।

—কেমন করে যাব কাকা?

—এই এই এঁকে ধর। উনিই যদি পারেন কোনরকমে। বুদ্ধি দেখছিস না—তেজ দেখছিস না?

নলিনী কহিল—মাপ করবেন। আমি বোধ হয় আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মাপ করার অনুরোধটা কড়ি বোধ হয় শুনিতেই পায় নাই, সে উত্তর করিল—আজই তা হলে ওকে এখান থেকে কোনরকমে বার করে দিন, আপনার যাবার আগেই। ভালই হয়েছে, আমিও আছি এখানে আজ।

সঙ্গে সঙ্গে রমাও মিনতি করিয়া কহিল—তোমার পায়ে পড়ি দিদিমণি।

বাহিরে রুদ্ধ দ্বারে কে আঘাত করিল।

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কড়ি কহিল—নিশ্চয় শালা কানাই, লুকিয়ে শুনেছে বেটা সব। বিকৃত মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, বিচ্ছিন্ন দন্তপাটী বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিল। নলিনী অগ্রসর হইয়া দুয়ারটা খুলিয়া কহিল—কে ?

দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল সুবোধ বালকের মত সেই কেরানীবাবুটি। একখানি পিওন-বই নলিনীর সম্মুখে ধরিয়া কহিল—চিঠি আছে একখানা।

সই করিয়া দিয়া চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া নলিনী ঈষৎ হাসিল।

কেরানীবাবু কহিল—এর পর জবাব আদান প্রদান তো আদালত মারফতেই হবার কথা। আজ্ঞে বিবেচনা করে দেখলে একবার ভাল হয়।

নলিনী নতমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর কহিল—তাই হবে। আমার চুক্তির সময় আমি শেষ করেই দিয়ে যাব।

কেরানী কহিল—তা হলে তাই গিয়ে বলি বাবুকে ?

—বলবেন।

কেরানীবাবু চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলীর আর থাকিতে সাহস হইতেছিল না। সে মৃদুস্বরে কহিল—আমিও তাহলে যাই, বুঝলেন ? বেটা সরিঙ্গী আবার দেখে গেল। ওই যে দেখছেন সরিঙ্গী চেহারা আর কান্না-কান্না মুখের ভাব—ও শালা একেবারে টিপে ষষ্ঠী—ছেলে খান দশটি। বিশ্বাস নাই বেটাকে। তাহলে আজই কোনরকমে—বুঝলেন কিনা, তারপর আমি বুঝে নেব।

সে আর দাঁড়াইল না। চিরাভ্যস্ত দ্রুত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। কানাই দরজার পাশেই ছিল। গাঙ্গুলী তাহাকে দেখিবামাত্র কহিল—বাবা, এ কড়ি গাঙ্গুলীর ভেল্কি! মেয়ে-ডাক্তারের মত ফিরে গেল—সে থেকে গেল। বললাম, বাবা এত সুখ-ঐশ্বর্য পাবে কোথায় ?

কানাই সে কথার কোন জবাব দিল না, কহিল—বাবু ডেকেছেন আপনাকে।

কড়ির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কেন রে, কেন ?

—সে আমি জানব কি করে বলুন দেখি ?

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আমি বেশ বুঝেছি—এ তুই বেটা দুর্মুখের কাজ।

তারপর চলিতে চলিতে সে আপন মনেই বলিল—যেমন রাজা রামচন্দ্র তেমনি হয়েছে চর দুর্মুখ। যাবেন লক্ষ্মী পাতালে। আমার করবি ঘেঁচু—আমি থোড়াই কেয়ার করি। কড়ি গাঙ্গুলীরও তেজারতি চল্লিশ হাজার, সে বাবা তোবলা-মোবলা নয়। আর ভগবান এত লোককে নেন—এ বেটাকে নেয় না গো!

কানাই তখন অনেকটা পিছনে একটা চাপরাসীকে হাত-মুখ নাড়িয়া কি বুঝাইতেছিল সে সংবাদ গাঙ্গুলীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। আড়চোখে আশপাশ দেখার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহার।

রমা কহিল—কোন রকমে আমাকে এখান থেকে বের করে দাও দিদিমণি। আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে—

নলিনী কহিল—না রমা, বাঘের মুখ থেকে অজগরের মুখে তুলে দিতে সাহায্য আমি করতে পারব না। এখানে থাকলে দুমুঠো খেতে তুমি পাবে, কিন্তু কড়ি গাঙ্গুলীর হাতে পড়লে জীবনে কোন দুঃখ হতেই নিষ্কৃতি তুমি পাবে না।

তারপর চোখ দুটি তুলিয়া সকরুণভাবে রমা কহিল—তবে আমার কি হবে দিদিমণি?

হাসিয়া নলিনী কহিল—ভয় কি ভাই, তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে জড়ালাম আমি। তাতে আমার ভাগ্যে যা থাকে থাক।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—তাই তুমি যাচ্ছ না দিদিমণি?

নলিনী কহিল—হ্যাঁ। তারপরেই ডাকিল, কানাই, কানাই!

কানাই তখনও চাপরাসীটার সহিত কথা কহিতেছিল। নলিনীর ডাকে সে আসিয়া দাঁড়াইতেই নলিনী বাক্স খুলিয়া কয়খানা গহনা তাহার হাতে দিয়া কহিল—এই গয়নাগুলো খাজাঞ্চীর কাছে জমা রেখে এস তো। একটা রসিদ এনো যেন।

কানাই কহিল—আপনি তা হলে যাচ্ছেন না, কেমন দিদিমণি?

বিষণ্ণভাবে নলিনী কহিল—এখনও আমার অদৃষ্টের ভোগ যায় নি কানাই, চুক্তির সময় পার হয় নি। কিন্তু ও চাপরাসীটা ওখানে কেন? আমার ওপর পাহারা পড়েছে বুঝি?

কলরব করিয়া কানাই কহিল—দেখুন দেখি, কি যে বলেন আপনি! এই বেটা ভূত, হিঁয়া কাহে বসকে রতা হ্যায়? ভাগ ভাগ হিঁয়াসে!

ঘরের দেওয়ালের ব্র্যাকেটের ওপর একটা টাইমপিস টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছিল। নলিনী সেটার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে। নির্বাক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে রমা কখন মেঝের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নলিনী বাহিরের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে দিবসান্তের নিষ্ক্রিয়তা ঘনাইয়া উঠিতেছে। দূরে শুধু কয়টা ছাগল তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নলিনী চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘুমন্ত রমাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল।

নিদ্রাভঙ্গে রমা চকিতের মত উঠিয়া কহিল—কি দিদিমণি?

—এস, উঠে এস।

—কোথায়?

—এস না আমার সঙ্গে। একটু মাঠের দিকে যাব। ঘরের মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে।

রমা গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া নলিনীর পিছন ধরিল।

সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে। অতলের অন্ধকার মাটির বুক ভেদ করিয়া অস্তরাগদীপ্তি আকাশের দিকে উঠিতেছিল। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির সীমানার শেষপ্রান্তে বাগান-ঘেরা পুকুরটার মধ্যে ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। দু-পাশের ছোট ছোট আমগাছগুলির মধ্যে দিয়া পায়ে-চলা সরু পথখানি ধরিয়া নলিনী আসিয়া দাঁড়াইল পুকুরটির এ-প্রান্তে। তারপর কাঁটাতারের বেড়াটা কোনরূপে পার হইয়া একেবারে মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

রমা বিস্মিত হইয়া কহিল—আর কোথা যাবে দিদিমণি?

নলিনী কহিল—স্টেশনে। এই পথ ধরে গেলেই সোজা হবে—ওই দেখ সিগনালের আলো দেখা যাচ্ছে।

—স্টেশনে কেন যাবে?

—এই ট্রেনেই আমরা কলকাতা যাব।

রমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সে কহিল—আবার কবে ফিরে আসবে?

—আবার কি ফিরে আসে রমা! লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছ না?

—কিন্তু তোমার জিনিসপত্তর গয়না-কাপড় সব যে পড়ে রইল!

বিরক্তিভরেই নলিনী কহিল—থাক। বেশী কথা তুমি কয়ো না রমা—কে কোথায় শুনতে পাবে।

নীরবে দ্রুতপদেই তাহারা চলিয়াছিল। কিন্তু রমা অকস্মাৎ আবার বলিয়া উঠিল—অত সুন্দর কাপড়গুলো—গয়না—আক্ষেপের একটা দীর্ঘনিশ্বাস বোধ করি আপনি তাহার বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল।

চলিতে চলিতেই নলিনী বলিল—ও-গুলো তুমি নেবে রমা?

রমার লজ্জা হইল, সে চুপ করিয়া রহিল। নলিনী আবার কহিল—ও-গুলো সব তোমাকে আমি দিতে পারি।

বিস্মিত কণ্ঠে একটা বিচিত্র স্বরে রমা বলিয়া উঠিল—সমস্ত!

—সমস্ত, সমস্তই তোমাকে আমি দিচ্ছি রমা। তুমি একটা কাজ কর।

এবার রমা যে স্বরে উত্তর দিল—সে স্বর কিন্তু পূর্বের স্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অকস্মাৎ যেন সে কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণভাবে সে কহিল—ওসব নিয়ে আমি কি করব দিদিমণি!

নলিনী বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করিল—কেন—গয়না পরবে।

ম্লান কণ্ঠেই রমা উত্তর দিল—আমি যে বিধবা দিদিমণি।

নলিনী এ কথার জবাব দিতে পারিল না। একটি সকরুণ বেদনায় তাহার মন ভারাক্রান্ত

হইয়া উঠিল—লজ্জাও হইয়াছিল। না ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন একটি প্রশ্ন করার জন্য মনে তাহার গ্লানির অন্ত ছিল না। দুইটি নারীই ইহার পরে নীরবে চলিয়াছিল। সকরুণ বিষণ্ণতার মধ্যে যেন সমস্ত কথার উপাদান হারাইয়া গিয়াছে।

স্টেশনে আসিয়া নলিনী রমাকে লইয়া প্লাটফর্মের একপ্রান্তে অন্ধকারপ্রায় একটি স্থানে বসিয়া কহিল—বেশী কথাবার্তা বলো না রমা; রেলে না চড়লে বিশ্বাস নেই।

তখনও ট্রেন আসতে খানিকটা বিলম্ব ছিল। এদিকে ওদিকে দুই-চারিটি যাত্রীর দল বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। স্টেশনের বাহিরে একটা চায়ের দোকানে একটা ছোঁড়া হাঁকিতেছিল—চা গরম—বাবু বিড়ি পান!

কোন গাড়ির একটি গরু কখন দড়ি খুলিয়া পলাইয়াছে—গাড়োয়ানটা গরুটাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমাগত তাহাকে গাল দিতেছিল—এমন শালার বে-আক্কেলে গরু তো আমি দেখি নাই!

কাহাদের একটি বউ আসিয়া রমাদের অনতিদূরে বসিল। পেঁটরাটি নামাইয়া সঙ্গের পুরুষটি কহিল—বস তুমি এইটার ওপর—আমি পান বিড়ি লিয়ে আসি।

রমা নলিনীকে চুপি চুপি কহিল—বউটির সঙ্গে আলাপ করব দিদিমণি?

অন্ধকারের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়—নলিনী দৃষ্টি হানিয়া বসিয়াছিল লাইনের ধারে।

সে রমার কথায় মুখ ফিরিইয়া কহিল—না। বস চুপ করে।

নলিনীর মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল একটি বিষণ্ণ চিন্তার ধারা, সেই চিন্তাতে আবার সে নিমগ্ন হইয়া গেল। টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই নলিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল—তুমি বস রমা, আমি টিকিট করে আনি।

টিকিট-ঘরের জানালার ধারে নলিনী একখানা দশ টাকার নোট আগাইয়া দিয়া কহিল—দুখানা হাওড়ার টিকিট দেবেন তো।

চুড়ি-পরা মসৃণ-ত্বক হাত দেখিয়া আর কণ্ঠস্বর শুনিয়া টিকিটবাবুটি আলোটি জোর করিয়া দিলেন। জানালার জালতির গায়ে নাকটা চাপা পড়িয়া চ্যাপটা হইয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি কহিলেন—কোথাকার?

তাঁহার অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখিয়া নলিনী মনের এই অবস্থাতেও না হাসিয়া পারিল না। সে কহিল—হাওড়ার।

—একখানা?

—না—দুখানা।

টিকিটের আলমারির খোপে খোপে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি হাওড়ার টিকিট অনুসন্ধান করিতেছিলেন—আর মুখে বলিতেছিলেন—হাওড়া হাওড়া হাওড়া।

অকস্মাৎ আবার তিনি জালতির গায়ে নাক চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ ক্লাস?

—থার্ড ক্লাস।

—হুঁ—থার্ড ক্লাস—হাওড়া হাওড়া। খুঁজিতে খুঁজিতে নলিনীর ভাগ্যক্রমে টিকিট

পাওয়া গেল। টিকিট দুখানা লইয়া নলিনী রমার কাছে আসিয়া কহিল—উঠে এস রমা।

—দাঁড়ান আপনি।

নলিনী চমকিয়া উঠিল, প্লাটফর্মের আলোগুলো তখন সবেমাত্র জ্বলিতে শুরু করিয়াছে—সেই আলোতে নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল দুটি লোক। একজন পুলিসের পোশাক পরা ভদ্রলোক, অপরজন মহেন্দ্রবাবুর মোকদ্দমা সেরেস্তার কর্মচারী মিত্তির মশায়।

নলিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে কহিল—আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ।

নলিনী নীরবে তাহাদের বক্তব্যের অপেক্ষা করিল।

পুলিশ কর্মচারীটি কহিল—আপনার বিরুদ্ধে একটা চার্জ আছে। আপনি এখানকার হাসপাতালের যন্ত্রপাতি আর মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির কিছু টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

নলিনীর মনে হইল পায়ের তলা হইতে মাটিটা যেন সরিয়া যাইতেছে। সে এ আশঙ্কা করে নাই। অপর যে কোন অভিযোগ শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই চুরির অভিযোগ তাহার কল্পনাতীত। এ যুগে যে এর চেয়ে ঘৃণ্য অভিযোগ আর কল্পনা করা যায় না।

কিছুক্ষণ পর সে প্রশ্ন করিল—কেউ কারও নামে চুরির অভিযোগ করলেই কি আপনারা তাকে অ্যারেস্ট করে থাকেন ?

দারোগা কহিল—হ্যাঁ, তাই নিয়ম। অবশ্য চুরি যে হয়েছে তার সন্তোষজনক প্রমাণ দেখিয়ে আমাদের বিশ্বাস করাতে হবে। তারপর ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার গৃহস্থের বা অভিযোগকারীর থাকবে।

—ও। দেখুন আমারও আজ গয়না চুরি গেছে। আমি জানি সে গয়না মজুত আছে এখানকার মহেন্দ্রবাবুর খাজাঞ্চীখানার সিন্দুকে।

এবার কথা কহিল মিত্তির মশায়—বাবুর মোকর্দমা সেরেস্তার কর্মচারীটি—কবে আপনার গয়না চুরি গেল ?

—আজই।

—সে সংবাদ আপনি পুলিসে দেন নি কেন ?

—আমার ইচ্ছা হয় নি।

মৃদু হাসিয়া কর্মচারীটি কহিল—এও যে একটা মস্ত বড় অফেন্স আপনার। এর জন্যও পুলিস কেসে পড়তে হবে আপনাকে।

নলিনী কঠিন হাসি হাসিয়া কহিল—অর্থাৎ অপরাধ যত কিছু সবই আপনাদের রচনায় আমাকেই পাকে পাকে ধরেছে। বেশ—এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন ?

দারোগা কহিল—আমার সঙ্গে আপনাকে আসতে হবে। আসুন।

—চলুন। এস রমা।

রমা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ওদিকে ট্রেনটা আসিয়া পড়িয়াছিল। যাত্রীর কলরবে স্টেশন প্লাটফর্মটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নলিনী ও রমাকে লইয়া স্টেশন ঘরের মধ্যে পুলিস কর্মচারীটি তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিল।

—আপনার জিনিসপত্রগুলো একবার দেখতে চাই আমি।

নলিনী দৃপ্ত ভাবেই উত্তর দিতেছিল। সে উত্তর দিল—জিনিসপত্র তো সঙ্গে কিছু নেই আমার। থাকবার মধ্যে আমার পরনে যা রয়েছে—তাই। এর মধ্যে কি কিছু লুকিয়ে রাখতে পারি বলে আপনার মনে হয়?

মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—অন্য জিনিস না থাকতে পাবে—কিন্তু টাকা কি নোট বা গয়না এ-সব;—না কি বলছেন দারোগাবাবু, এ্যাঁ?

সভয় বিস্ময়ে নলিনী চমকিয়া উঠিল, বলিল—আপনার কি আমার দেহ তল্লাস করে দেখতে চান?

মিত্তির মশায়ই জবাব দিল—আইন তো তাই বটে। তার আর আমরা কি করব বলুন—এ্যাঁ—না কি বলছেন দারোগাবাবু?

নলিনী স্টেশনঘরের টেবিলটার উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুর লজ্জা গোপন করিল। জীবনে লজ্জাকর বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া মানুষের যখন কোন উপায় থাকে না—তখন অনেক সময় সে জোর করিয়া টানিয়া আনে কৃত্রিম একটা দম্ভপূর্ণ সাহসিকতা। কিন্তু তাহার জীবন যেমন অল্প তেমনি যে মূল্যহীন। মুহূর্তে মুহূর্তে স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত সে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। নলিনীরও ঠিক এমনি একটি অবস্থা আসিয়াছিল। সে টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া উদ্যত ক্রন্দন সম্বরণের চেষ্টা করিতে চাহিল।

বাহিরে একটা ছোঁড়া ফিরি করিয়া ফিরিতেছিল—গরম চা—চা গরম বাবু।

দারোগা হাঁকিল—এই বেটা চা গরম—এই! দে তো এখানে চা দু কাপ। আপনি খাবেন চা? আমাদের লেডি ডাক্তারকে বলছি।

নলিনী টেবিলের উপরেই মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

মিত্তির মশায় কহিল—তবে আর দু কাপ নেবেন কেন?

দারোগা বলিল—আপনি?

গলার মালায় হাত দিয়া মিত্তির মশায় উত্তর করিল—আজ্ঞে না, চা কি পান, কি তামাক, বিড়ি কি সিগারেট ও আমি খাই না। ও-গুলো তো জীবনে নেসেসিটি নয়, না কি বলেন দারোগাবাবু? জীবনে চা খেয়েছি তিন কাপ। বুঝলেন কিনা—১২৯৫ সালে আষাঢ় মাসে। বেশ মনে আছে ২৫শে আষাঢ় আমার সর্দি করেছিল খুব—চা তখন দেশে নতুন উঠেছে, সেই একদিন এক কাপ খেয়েছি। আর সেকেণ্ড কাপ খাই এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়ে—সে হল আপনার ১৩০২ সালের ১২ই মাঘ। রাত্রে পড়তে পড়তে ঘুম আসছিল, সেদিন খাইয়েছিল

আমাদের ক্লাস ফ্রেণ্ড—হরগোবিন্দ সেন—সে এখন মুন্সেফ।

দারোগা কহিল—জানি তাঁকে আমি, হুগলিতে ছিলেন তিনি—

সঙ্গে সঙ্গে মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—ছিল— বোধ হয় নাইন্টিন এইট থেকে নাইন্টিন ইলেভন পর্যন্ত হুগলিতে ছিল হরগোবিন্দ। সেই দিন আমাকে খাইয়েছিল। আর একদিন বর্ষায় খুব ভিজে জিয়াগঞ্জ স্টেশনে এক কাপ চা কিনে খেয়েছি। সে বোধ হয় ১৩২৭ সালের শ্রাবণে—১৬ই শ্রাবণ। তা নইলে আমি জীবনে চা কখনও খাই নি। দোকানের মিষ্টিও কখনও খাই নি আমি—মিষ্টির মধ্যে বাতাসা আর গুড়। হোটেলেও ভাত কখনও খাই না, যেখানে যাই আলু-ভাতে-ভাত—ওই একপাকে যা হল আর কি—তাই খাই। আমার ব্যাগে সব থাকে—চাল, ডাল, আলু, মুন, মসলা—শিশিতে তেল—

দারোগা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তাহলে ব্যাগও তো আপনার মস্ত বড়। চামড়ার—

জিভ কাটিয়া মিত্তির মশায় বলিল—রাম রাম—ক্যাম্বিসের, চামড়ার জুতোই আমি পায়ে দিই না। ক্যাম্বিসের—

মিত্তির মশায়ের কথায় একটা বাধা পড়িল। একজন আগন্তুক দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—মাস্টার মশায়, টিকিটটা কাকে দেব? কেউ নেই তো গেটে।

টেবিল-ল্যাম্পের আলোক পরিপূর্ণভাবে আগন্তুকের দেহের উপর পড়িয়াছিল। একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক—গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ তাহার, শুভ্র একটি পাঞ্জাবিতে তাহাকে মানাইয়াছিল বড় চমৎকার।

দারোগা তাহাকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠিল—নমস্কার সঞ্জীববাবু, এই ট্রেনে নাকি?

সঞ্জীবও প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল—নমস্কার। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ট্রেনেই এলাম জামালপুর থেকে। তারপর আপনারা কোথায়?

দারোগাবাবু কোন উত্তর দেবার পূর্বেই মিত্তির মশায় চেয়ার ছাড়িয়া বিলক্ষণ হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—প্রণাম। ভাল আছেন সঞ্জীববাবু?

প্রত্যুত্তরে সঞ্জীব ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিল— প্রণাম। হ্যাঁ ভালই আছি। তারপর আপনি কেমন?

ভদ্রলোক একেবারে আঁতকাইয়া উঠিলেন, অদ্ভুত ভঙ্গিতে কহিলেন—রাধে, রাধে, রাধে। ই—কি ব্যবহার মশায় আপনার, ই—কি ব্যবহার মশায়? ই তো ভাল নয়? আপনি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র—

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—প্রণাম করলে আমি প্রণামই করে থাকি মিত্তির মশায়। কারও প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি না।

মিত্তির মশায় অবজ্ঞাভরে কহিল—এ-সব হল আজকালকার ফ্যাশান—না কি বলেন দারোগাবাবু? বাঙালীর মত ফ্যাশানের দাস আর কোনও জাতে নাই। অ্যাঁ—না কি বলেন দারোগাবাবু—অ্যাঁ?

সঞ্জীব উত্তর দিল—সেইটেই বাঙালীর জীবনে বড় ভরসার কথা মিত্তির মশায়। সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে পারে, নতুনকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে পারে—এমনি জাতই পৃথিবীকে ভবিষ্যতে নতুন কিছু দিতেও পারে। যাক, মাস্টার মশায় গেলেন কোথায়? টিকিটখানা দিই কাকে?

মিত্তির মশায় কিন্তু কথাটা এত সহজে ভুলিতে পারিল না। সে কহিল—আচ্ছা আপনি জাত মানেন না?

—না।

—তবে পৈতে রাখেন কেন আপনি গলায়?

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—পৈতে তো রাখি না।

—রাখেন না?

—না।

—আপনি তা হলে অতি—অতি—। যোগ্য বিশেষণ বোধ হয় মিত্তিব খুঁজিয়া পাইল না।

সঞ্জীব কৌতুকভরে কহিল—অতি অতি—তাবপব কি বলুন মিত্তির মশায়।

দারোগাও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। মিত্তির মশায়ের অঙ্গ কিন্তু জলিয়া যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—জানি না মশায়, যান। বামুনকে গাল দিয়ে আমি পাপের ভাগী হই আর কি! না কি বলেন দারোগাবাবু, অ্যাঁ? নাইন্টিন ফোরে বর্ধমানে রমেশ চ্যাটুজ্যে উকিল ব্রাহ্মধর্ম যখন নেয়, বুঝলেন কিনা, তখন এমনি একদিন আমার সঙ্গে মহা তর্ক। আমি বলেছিলাম, মশায়, এর পব বুঝবেন—এখন বক্তেব তেজ আছে—এর পর বুড়ো বয়সে বুঝবেন। হয়েছেও তাই—গত বৎসর মাঘ মাসে, বোধ হয় ৮ই তারিখে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। কত দুঃখই করলেন রমেশবাবু, বললেন, মিত্তির মশায়, এ হয়েছে আমার সাপের ছুঁচো গেলা, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে গেলাম।

সঞ্জীব টিকিটখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া কহিল—থাক টিকিটখানা এইখানেই। আমি যাই, রাত্তির হচ্ছে।

দারোগা অনুরোধ করিয়া বলিল—আরে বসুন না মশায়, যাবেনই তো। চা খান এক কাপ।

এই—এই বেটা চা-গরম!

বাধা দিয়া সঞ্জীব কহিল—থাক, দরকার হবে না দারোগাবাবু। অনর্থক ব্যস্ত হবেন না আপনি।

দারোগাবাবু প্রশ্ন করিল—তারপর কদিন থাকবেন এখানে? করছেন কি আজকাল?

এ প্রশ্নে সঞ্জীব হাসিয়া ফেলিল। কহিল—একটা কথা মনে পড়ে গেল দারোগাবাবু। একজনের গাড়ি মেরামতের দরকার হয়েছিল, পথে কামারকে দেখে পথেই ধরেছিল যে এটা তুমি এইখানেই মেরামত করে দিয়ে যাও।

দারোগাও হাসিয়া উঠিল—তারপর বলিল—মাপ করতে হবে সঞ্জীববাবু—যে উদাহরণটা দিলেন ও অভ্যেস এ সংসারে একটা লোক বাদ দিয়ে বোধ করি ন'শো নিরানব্বই জনের। কে বেশী খাটতে চায় বলুন ?

সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে—

বাধা দিয়া দারোগাটি কহিল—থাক সঞ্জীববাবু, প্রশ্ন আমি বুঝেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন আপনার কাছে প্রত্যাশা করি নি। পৃথিবীতে চিরদিন নতুন এবং সবলকে সন্দেহ বা চোখে চোখে সবাই রেখে এসেছে, এবং ভবিষ্যতেও বোধ করি রাখবে। যাকে বোঝা যায় না সেই এ সংসারে আশঙ্কার বস্তু।

—যাক ও কথা মশাই—ও আলোচনায় ফল নেই। আপনার কথার বরং উত্তর দিই। এখন এখানে কিছুদিন থাকব। মায়ের শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না—তার ওপর বয়সও হয়েছে তাঁর, কোন্ দিন হয়ত মারা যাবেন, শেষ মুহূর্তে দেখা হবে না—বা হয়ত সৎকারই হবে না।

চট করিয়া মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—মা মারা গেলে কি করবেন আপনি—কোন্ মতে সৎকার করবেন ?

সঞ্জীব বলিল—কথাটা আপনি এখনও ভোলেন নি দেখছি। মায়ের সৎকার আমার হিন্দু মতেই করতে হবে, কারণ মা আমার নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তাঁর অভিপ্রায় এবং তাঁর ধর্মপদ্ধতি অনুযায়ী, তাঁর সৎকার হওয়াই সঙ্গত। নইলে সৎকার যে কোন মতে করতে আমার বাধা নাই। যে কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বা সৎকারে আমি যোগ দিতে পারি বা দিয়ে থাকি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন সে ভাবিল—তারপরে কহিল—বেশ লাগে আমার অন্ধকার রাত্রে নির্জন বসতিহীন প্রান্তরে জলন্ত চিতার উপর শবদাহ দেখতে। চোখের ওপর দেহখানা ছাই হয়ে যায়—জলন্ত আগুনের উপর থাকে শুধু ওই সত্যটি আর চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে লীন হয়ে যায় স্বার্থপর সংসার।

অকস্মাৎ সে হাসিয়া কহিল—বড্ড বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে গেছি দেখছি। থাক, চলি দারোগাবাবু।

নলিনী মুখ তুলিয়াছিল—অশ্রুর চিহ্ন তখনও মুখে পরিস্ফুট রূপে দেখা যাইতেছিল। সে কহিল—একটু দাঁড়ান !

সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া কহিল—আমাকে বলছেন ? আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে আগে—ও, আপনি লেডি ডাক্তার না ?

নতমুখে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। বড় বিপদে পড়ে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

সঞ্জীব দারোগার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—দারোগা বোধ হয় প্রস্তুতই ছিল—

সে বলিল—আপনার বোধ হয় এর মধ্যে থাকা উচিত হবে না সঞ্জীববাবু। এঁর বিরুদ্ধে চুরির চার্জ দিয়ে ডায়েরী করেছেন মহেন্দ্রবাবু।

নলিনী উত্তেজিত ভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না—না—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা। আমি আর যাই হই চুরি করতে আমি পারি না। আমায় আটকে রাখতে চায়

এরা। সে আর কিছু বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

সঞ্জীব দারোগার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি চুরি করেছেন ইনি দারোগাবাবু?

মিস্তির মশায় বলিয়া উঠিল—এ আপনার ইল্‌লিগাল হচ্ছে মশায়। পাবলিক সারভেণ্টের কর্তব্যে বাধা দেওয়া বে-আইনী। নাইন্টিন টোয়েনটি নাইনে ডিসেম্বরের রেকর্ড খুলে দেখবেন সিমিলার কেস এই থানাতেই হয়েছে।

সঞ্জীব সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে দারোগাকেই প্রশ্ন করিল—কি চার্জ দারোগাবাবু?

দরোগা বলিল—হাসপাতালের ইনস্ট্রুমেণ্ট আর কিছু নগদ টাকা ইনি নাকি চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতা।

—সে-সব জিনিস কি এঁর কাছে পাওয়া গেছে?

—না। তবে কিছু টাকা—একখানা দশ টাকার নোট স্টেশন মাস্টারের কাছে পেয়েছি, ইনি টিকিট করেছেন তা দিয়ে—নোটখানার পেছনে মহেন্দ্রবাবুর এস্টেটের স্ট্যাম্প মারা আছে।

নলিনী কহিল—সে আমার মাইনের টাকা। ওঁদের এস্টেট থেকেই মাইনে পেয়েছি আমি।

সঞ্জীব বলিল—আপনারা এখন কি করতে চান দারোগাবাবু?

দারোগা প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া উত্তর দিল—আপনি কি এঁর জামিন হতে পারবেন সঞ্জীববাবু? কেসের সময় হাজির করে দেবেন। কিন্তু এ ব্যাপারটায় আপনি হাত না দিলেই ভাল হত—বোধ হয় আপোসেই মিটে যেত। আর জানেন তো মহেন্দ্রবাবুকে—

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—জানি, সেই জন্যেই এঁর কথায় অবিশ্বাস করতে পারছি না আমি।

মিস্তির মশায় অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—কিন্তু এই মাগীর পরিচয় জানেন?

রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব কঠিন স্বরে কহিল—চুপ করুন আপনি।

পিছনে মনিবের জোর থাকিলে কুকুর সহজে ভড়কায় না। এত বড় ভূমিদারের কর্মচারী এওটুকুতে দমিল না, বলিয়া উঠিল—মাগী খৃষ্টান—

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব বলিল—আর কিছু বলবার আছে আপনার?

এই দৃষ্টিতে মিস্তির মশায় একটু দমিয়া গেল—সে ঈষৎ মৃদুভাবে বলিল—বাবুর—বাবুর রক্ষিতা—

—আর কিছু?

মিস্তির মশায়ের বাক্‌-যন্ত্রটার দম যেন ফুরাইয়া গেল, অতি শিথিল মৃদুভাবে সে কহিল—না।

ও-পাশে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নলিনী মুখ লুকাইয়া ছিল। রুদ্ধকণ্ঠের কয়েকটি কথা ভূমিতলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলের কানে আসিয়া পৌঁছিল—সত্যি, সত্যি।

সঞ্জীব এক মুহূর্তের জন্য নলিনীর পানে তাকাইয়া কহিল—আমি এঁর জামিন হচ্ছি দারোগাবাবু।

দারোগা উঠিয়া কহিল—আসুন তাহলে থানায়, জামিননামায় সই করে দিতে হবে আপনাকে।

জামিনের আবশ্যকীয় কাগজপত্রে সহি ইত্যাদি শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল। মিত্তির মশায় প্রয়োজনীয় বিবরণটুকু নীর হইতে ক্ষীরের মত ছানিয়া ছানিয়া ছোট নোট-বইখানিতে নোট করিয়া লইল। তারপর আসন ছাড়িয়া উঠিবার সময় সঞ্জীবকে বলিল—প্রণাম সঞ্জীববাবু, কাজটা আপনার মত লোকের যোগ্য কাজ হল। আর কি জানেন, এ কাজ মানায়ও আপনার মত লোককে।

সঞ্জীব হাসিয়া কহিল—প্রণাম। কিন্তু আপনাদের চোখেও কি আমাদের যোগ্যতা ঠেকে মিত্তির মশায়?

মিত্তির মশায় সঞ্জীবের কথা শেষ হইবার পূর্বেই লাফাইয়া উঠিয়াছিল, রাধে রাধে গোবিন্দ হে! আপনি যে কি করেন সঞ্জীববাবু, ছি-ছি-ছি! না—না রাধে রাধে—এ আপনার ভারি অন্যায় মশায়। আপনি ভারি ইয়ে।

সঞ্জীব উত্তর দিল—স্টেশনে তো এর আগে অনেক কথা হয়ে গেল, তারপর যে আপনি এমনি ভুল করে বসবেন এ আমি কেমন করে বুঝব বলুন!

মিত্তির মশায় সহসা সঞ্জীবের হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিল—দোহাই সঞ্জীববাবু, আমাকে আর পাপের পঙ্কে ডোবাবেন না। পায়ের ধুলো আমায় দিন। আর রহস্য করবেন না।

সঞ্জীব ধীরভাবে কহিল—আমি কি রহস্যের ভঙ্গিতে আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি এতক্ষণ? আমার তো তা বোধ হয় না। সত্যিই আপনাকে আমি বলছি—আপনাকে আমি রহস্য করি নি—এ আমার ধর্ম। আপনার ধর্মে যেমন কতকগুলো আচার আছে, এও তেমনি আমার ধর্মের নিয়ম, আচার, আমার চেয়ে হীন বলে কারও প্রণাম গ্রহণ করি না।

মিত্তির মশায় তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পরিত্যক্ত চেয়ারটায় আবার বসিয়া পড়িল। তারপর ঊর্ধ্বমুখে থানার চাল-কাঠামোর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাদের থানাটি কিন্তু বেশ চমৎকার, দারোগাবাবু। চালের কাঠামো কি! অথচ দেখুন, একশো বছরেরও বেশী দিনের ঘর। আজকাল এমন ঘর আর হয় না—না কি বলেন, অ্যাঁ?

—নবগ্রামে একখানি এমনি ঘর আছে—বুঝলেন, হারাধন চাটুজ্যের ১২২৫ সালের ঘর, অথচ এখনও কি শক্ত!

সঞ্জীব দারোগাকে নমস্কার করিয়া নলিনীকে কহিল—আসুন।

মিত্তির মশায় দারোগাকে বলিতেছিল—এরও বয়স অনেক দিনের। বড়দলে সাল-সন লেখা আছে। ১৩০৩ সালে এ থানায় আমি প্রথম আসি, বুঝলেন দারোগাবাবু, তখন

দেখেছি, বোধ হয় ১২৪৮ সাল লেখা আছে, নয় দারোগাবাবু, অ্যা ?

ততক্ষণে সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইয়া রাস্তার উপর নামিয়াছে। দারোগাবাবু মিত্তির মশায়ের কথার কি একটা জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মিত্তির মশায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আগে আলোটা একবার দেন তো মশায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আলোটা তুলিয়া লইয়া একটা জায়গার মাটি লইয়া মাথায় বুকে বুলাইয়া লইল। ঐ স্থানটিতেই সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল। আলোটা নামাইয়া দিয়া মিত্তির মশায় কহিল—দেখুন দেখি মশায় এঁচোড়-পক্ক বামুনের ছেলের কাজ ! আরে বাপু বামুনের ছেলে তুই ! দেশের অধঃপতন দেখুন দেখি একবার ! রাধে রাধে। ধর্ম গেলে আর রইল কি ? নমস্কার দারোগাবাবু, কিন্তু কাজটা আপনি ভাল করলেন না মশায়। জামিনটা না দিলেই হত। বড় দারোগাবাবু থাকলে—

দারোগাবাবু মৃদু হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—ঐ ছেলেটি বড় পাকা ছেলে মিত্তির মশায় —সাহস হল না। পরন্তু খবরের কাগজেই বোধ হয় যেটুকু ঘটল এ সংবাদটুকুও দেশময় রটে যাবে। নিজের মাথার দামটা নিজের কাছে খুব বেশী মিত্তির মশায়। কি বলেন আপনি ?

মিত্তির মশায় আবার চাপিয়া বসিল। কহিল—যা বলেছেন মশায়। এর একটা বিহিত—

দারোগাবাবু বলিল—আপনার বাবুকে বলুন না। একট দুগ্ধপোষ্য বালককে জব্দ করতে তিনি পারছেন না ! ওরে, আমার খাবার তৈরি করতে বল তো। তাহলে—

জোড়হাতে বিনীত নমস্কারের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাইয়া সদর রাস্তার দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিল।

মিত্তির মশায় অগত্যা উঠিল। থানা হইতে পথে নামিতে নামিতে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—পড়ে ডেঁপোটা একবার একটা ফৌজদারী মামলায় !

রাস্তায় নামিয়া সঞ্জীব কহিল—তারপর আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

নলিনী অসঙ্কোচেই উত্তর দিল—আপনার বাড়ি। নইলে আর এ গ্রামে আমায় আশ্রয় কে দেবেন বলুন ? আপনার পরিচয় শুনেছিলাম—দু-একবার দেখেওছিলাম—তাই স্টেশনে আপনার আশ্রয় চেয়েছিলাম। নইলে এখানে অপর কোথাও আশ্রয় নিলে ঘুমিয়ে উঠে দেখতাম যেখানকার মানুষ সেখানেই আছি।

সঞ্জীব একটু নীরব থাকিয়া বলিল—সে প্রস্তাব আমি আগেই করতাম এবং করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাতে একটু অসুবিধা—আপনাদেরই অসুবিধা হবে বলে মনে হয়।

বিচিত্র হাসি নলিনীর মুখে দেখা দিল। সে কহিল—আমাদের অসুবিধা !

—হ্যাঁ, আপনাদেরই অসুবিধা। কথাপ্রসঙ্গে শুনেছেন বোধ হয় আমার মা সেকেলে নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তিনি হয়ত—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—যার কটু কথা বা যেন্নাই যদি তিনি করেন, সে আমার

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হবে সঞ্জীববাবু—। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার পরিচয় তো আপনার কাছে গোপন নেই—আমাদের জাতের গর্ভধারিণীদের মুখের পরিচয় আপনি জানেন না তাই এমন কথা বললেন। এক পাশে বারান্দায় শুয়ে থাকব রাত্রিটার মত।

সঞ্জীব কহিল—কিন্তু সে যে আমার চোখে বড় খারাপ ঠেকবে। আপনারা আমার অতিথি—

হাসিয়া নলিনী কহিল—হাজতের চেয়ে যে সে অনেক ভাল সঞ্জীববাবু। তা ছাড়া প্রচলিত যুগপ্রথায় অতিথিরও সে ক্লাসিফিকেশন সমাজে চল হয়ে গেছে। এই তো আপনাদের এখানে বাবুদের বাড়িতে সেদিন দেখলাম মুসলমান রাজকর্মচারীর এঁটো কাপ ধরে নিতে দশ-বারোখানা হাত একসঙ্গে এগিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে ছিল একটি ব্রাহ্মণ কনেস্টবল—সে বেচারা চা পেলেই না সেদিন,—সে জলে ভিজেও ছিল, সেই ভিজে অবস্থায় সত্যিই হয়তো তারও এক কাপ চায়ের দরকার ছিল।

সঞ্জীব বলিল—এটাতে গৃহস্থের আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু যতখানি ওজনের দোষ আপনি চাপাচ্ছেন ততখানিও সত্যি নয় বলে আমার মনে হয়। জাতিভেদ আমি মানি নে। যে মানে তার কাছেও অথিতির জাতিভেদ থাকা উঁচিত নয়। সুতরাং স্বজাতি ভিন্ন জাতির কথাটা ধরা যায় না। তারপরে যে ভেদ সেটা হয়েছে গুণ-কৌলীন্যে—ধন-কৌলীন্যের অপরাধ ওখানে স্পর্শ করে নি। ওইটেই আমার মনে হয় সব চেয়ে হীন কৌলীন্য—ওটা একটা অপরাধ।

সঞ্জীবের এ কথাটা নলিনীর বেশ পছন্দ হইল না, কিন্তু যে লোকটি তাহাকে এ হেন বিপদে মাত্র একটি অনুরোধে জীবনের অমার্জনীয় অপরাধ উপেক্ষা করিয়া উদ্ধার করিল—আবার আশ্রয় দিতে চলিয়াছে, তাহার সহিত এ লইয়া তর্ক করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ভাবিল মতের মর্যাদার চেয়ে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ তাহার বহুগুণে বেশী হওয়া উচিত। আজ যদি সে মতের মর্যাদা করিতে চায় তবে সে নিজের অমর্যাদাই করিবে বেশী।

অবসর পাইয়া রমা মৃদুস্বরে বলিল—দিদিমণি, আমাদের বাড়ি চল না?

নলিনী স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুমি কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ রমা! এই রাত্রের অন্ধকারে—এই দেশের পথ দিয়ে তোমাদের বাড়ি যেতে তোমার সাহস হয়?

লজ্জিত হইয়া রমা কহিল—না—না। তবে বাবুর মা বকবে বলছিলে যে তাই—

সঞ্জীব ব্যস্তভাবে এ কথার জবাব দিল—না না না। সে ভয় নেই। মা কটু কথা কখনও বলবেন না। তবে তিনি স্পষ্টভাষিণী। স্পষ্ট সত্য অনেক সময় রূঢ় হয়। আর ছোঁওয়া-নাড়ার বাছবিচার তিনি করে থাকেন, এই পর্যন্ত।

নলিনী হাসিয়া কহিল—কাকে কি বলছেন সঞ্জীববাবু? কটু কাকে বলে সে ও বোঝে না। সত্যই বা কি বস্তু সেও ও জানে না। ওর কথা আপনি ধরবেন না। ভাল করে না দেখলে ও যে কি সে বিচার করা যায় না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—উনি কে?

—ও উনি নয়। জগতে ও সকলের স্নেহাস্পদা হবার যোগ্যা। ওর পরিচয় এর পরে বলব। ওর দৃষ্টিতে এ সংসারে খারাপ ও কাউকে দেখে নি। ওদের গ্রামের মহাজন এককড়ি গাঙ্গুলীও ওর কাছে দেবতুল্য ব্যক্তি।

সদর রাস্তা হইতে একটা গলির পথে মোড় ফিরিয়া সঞ্জীব কহিল—তাই তো—একটা আলো হলে ভাল হত। অচেনা গলি, পথে চলতে—

অকস্মাৎ পাশের কোন অন্ধকার গোপন স্থান হইতে একটি লোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সঞ্জীব চমকিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

চাপা গলায় উত্তর হইল—আমি—আমি গাঙ্গুলী-খুড়ো, এককড়ি গাঙ্গুলী। তারপরে ভাল আছ তো বাবা সঞ্জীব?

সঞ্জীব বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—আপনি এখানে এমনভাবে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছিলেন? এমনধারা চাপা গলায়—

—দেওয়ালের কান আছে রে বাবা, দেওয়ালেরও কান আছে। ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে—বুঝলে বাবা! এ গাঁয়ে তুমি যে কথাটি চেঁচিয়ে বলেছ—তিন কান করেছ, সেইটাই গিয়ে কাছারীতে রিপোর্ট হয়েছে।

সঞ্জীব এখানকারই মানুষ —এখানকার মানুষের পরিচয় তার অজ্ঞাত নয় এবং এখানকার প্রচলিত ভাষার.প্রবচনগুলোর অর্থও সে জানে। কাছারীর উল্লেখ করিতেই সে বুঝিল এ জাল রচনায় গাঙ্গুলীর মত কৃতী কৌশলী ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন হস্তও আছে। সে কহিল—এ ব্যাপারের তাহলে আপনি সব জানেন?

স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতকণ্ঠে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড, পাষণ্ড, মহাপাষণ্ড, বুঝলে বাবাজী, চণ্ডাল নরাধম বেটা। ধন থাকলেই কিছু মানুষ হয় না, ধার্মিক হয় না, মহাপুরুষ হয় না। জিজ্ঞাসা কর এই এঁকে—আমাদের লেডি ডাক্তারকে, ভাল মানুষের মেয়ে উনি—নিজে অতি ভাল লোক। মুখের সামনে বললে মনে হবে তোষামোদ করছি, কিন্তু সত্যি বলছি আমি, অ।ত মহৎ লোক উনি। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর তুমি, কি মহাপাষণ্ড চণ্ডাল—ইতর—

অনর্গল অর্থহীন প্রলাপের কোন জবাব হয় না। সঞ্জীব বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল—কি সব বাজে বকছেন আপনি? চুপ করুন।

ইহাতেও গাঙ্গুলী নিরস্ত হইল না। সে এদিক ওদিক চাহিয়া লইয়া সঞ্জীবের কানের কাছে সহসা মুখটা লইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল—ওই শালা মহেন্দ্রবাবু!

সঞ্জীব উষ্ণভাবে কহিল—বুঝলাম, কিন্তু তার প্রতিবিধান আমি কি করতে পারি? তাছাড়া ওরকমধারা গালাগাল দেওয়া পছন্দ করি না গাঙ্গুলী মশায়।

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বাসভরে কহিল—সেই কথাই তো বলি—যে ধার্মিক হবে, যার মনুষ্যত্ব থাকবে, সংশিক্ষা যার আছে, সে তো এই কথাই বলবে। এই তো তাদের কাজ। এই এত বড় গ্রামে সহায়হীনা দুটি স্ত্রীলোক বিপদাপন্ন হল, তা কোন বেটার সাধ্যি হল না আঙুলটি

ভুলতে—। যত সব গরু ভেড়ার জাত, বিষকুম্ভপয়োমুখম—

নলিনীরও বিরক্তি বোধ হইতেছিল—সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—সে ধরনের মানুষ আমরা দেখেছি গাঙ্গুলী মশায়। এ নিয়ে মিছে আর চিৎকার করবেন না আপনি।

চট করিয়া গাঙ্গুলী জবাব দিল—সে তো হাজারে হাজারে সংসারে রয়েছে—দেখবেন বৈ কি। এই আমাকেই দেখুন না। আমিও তো তাই। নইলে ওই চণ্ডাল ইতরের তাঁবেদারী করি আমি স্বার্থের জন্য—।

নলিনী অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে উলঙ্গভাবে প্রত্যক্ষ কবিয়া দেওয়ায় সে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। তাহার মনে সন্দেহ জন্মিয়া গেল যে হয়তো বা লোকটাকে যাহা সে ভাবিয়া আসিয়াছে ততখানি হীন সত্যই সে নয়। স্বার্থের দাস তো সংসারে হাজারে ন'শো নিরানবব্বই জন। কিন্তু স্বার্থে অন্ধ সে-ই নয় যে স্বার্থপরতা হেতু গ্লানি অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। মানুষ তাহার অন্তরে আজও বাঁচিয়া আছে।

সঞ্জীব কহিল—আমার কাছে কি আপনার কোন দরকাব আছে? অত্যন্ত শুষ্ক কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গিটি পর্যন্ত উগ্র।

গাঙ্গুলী কিন্তু বিরক্ত হইল না। সে মোলায়েম করিয়া বলিল—আছে বৈকি বাবা। সৎকর্ম করলে আশীর্বাদ করতে হয়। সেটা যে অবশ্য কর্তব্য। সেই আশীর্বাদ কবব বলেই—নইলে আমার গাড়ি সন্ধ্যে থেকে এসে বসে আছে। আর এই রমাকে নিয়ে যাব। ওর বাপ-মা কেঁদে কেঁদে নদী গঙ্গা ভাসালে। মহাপাতক থেকে মুক্ত হব বাবা আমি। তোমারই দৌলতে—সৎসাহসে, নইলে মহাপাপে ডুবতে হত আমাকে।

নলিনী ইহার উত্তর দিল—কাল ওকে নিয়ে যাবেন গাঙ্গুলী মশায়। এই রাত্রে—

বাধা দিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কোন ভয় নেই আপনার—কোন ভয় নেই। এমন পথ দিয়ে নিয়ে যাব যে কীটপতঙ্গে টের পাবে না।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সে হবে না গাঙ্গুলী মশায়। ও যখন আমার আশ্রয়ে এসেছে তখন তো এমন ভাবে আপনার হাতে দিতে পারব না আমি। কাল ও বাপকে সঙ্গে করে এখানে আসবেন, আমি বিবেচনা করে তখন যা হয় করব।

চমকিয়া উঠিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—তার মানে?

পরিষ্কার কণ্ঠে সঞ্জীব উত্তর দিল—তার মানে আপনাকে বিশ্বাস করে ওকে আপনার হাতে আমি দিতে পারব না।

—আমি যজ্ঞোপবীত ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

—যজ্ঞোপবীতে আমার বিশ্বাস নেই গাঙ্গুলী মশায়—আমার নিজেরও পৈতে নেই।—

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী বলিল—আচ্ছা বাপু, সে তুমি নাই বিশ্বাস কর, কিন্তু রমা যখন যেতে চাচ্ছে তখন তুমি আটক করবার কে শুনি?

সঞ্জীব কোন কিছু বলিবার পূর্বেই নলিনী রমার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, রমা?

যেন তাহার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হইতেছিল।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—আমি বাড়ি যাব দিদিমণি।

গদগদ হইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—ওই-ওই শুনলে তো বাবা সঞ্জীব। রমা বলছে ও বাড়ি যাবে।

নলিনী বলিয়া উঠিল—কিন্তু উনি যে আমাদের জন্যে জামিন হয়ে এলেন, সে জামিনের—

মধ্যপথেই সঞ্জীব কহিল—না, সে শুধু আপনার জন্যে। ও মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল না—জামিনও আমায় হতে হয় নি।

তারপরে রমাকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল—যাও তুমি তাহলে ওঁর সঙ্গে। বলিয়া সম্মুখের গৃহদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—মা মা মা!

পিছন হইতে গাঙ্গুলী আবার ডাকিয়া বলিল—ওগো বাবাজী, আর একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। আমার সেই বন্ধকী তমসুকখানা—অনেকদিন হয়ে গেল—তোমার বাবার আমলের ব্যাপার।

সঞ্জীব যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—কি—কি বলছেন আপনি? সে তো—

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া হ্যারিকেন হাতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা বাহির হইয়া কহিলেন—সঞ্জীব? কখন এলি বাবা? আর কার গলা শুনছিলাম! এ মেয়েটি কে রে?

সঞ্জীব কহিল—দাঁড়াও সে-সবই শুনবে। গাঙ্গুলী মশায়—কই গাঙ্গুলী মশায়?

গাঙ্গুলীকে দেখা গেল না, রমাও নেই—নিরন্ধ্র অন্ধকার পিছনে থমথম করিতেছিল।

নলিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কহিল—কাল স্নানে যখন যাবেন তখন আপনার পায়ের ধুলো নেব। আজ ভাগ্যে আমার নেই মা।

মা মেয়েটির মুখের ওপরে আলো ধরিয়া আর একবার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন—ইনি এখানকার মেয়ে-ডাক্তার, নয় রে সঞ্জীব?

সঞ্জীব তখনও বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে গাঙ্গুলীর সন্ধান করিতেছিল, সে সেই অবস্থাতেই উত্তর দিল—হ্যাঁ মা।

মায়ের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি একটু সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—ইনি এখানে কেন?

কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় চমকিয়া উঠিয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইল। সে কোন উত্তর দিবার পূর্বে নলিনীই উত্তর দিয়া বলিল—আপনার বাড়ি অধিকাংশ লোকেই যে-জন্য আসে, মা আমিও সেই জন্য এসেছি। আমি বড় বিপদে পড়েছি, মা। এখানকার মহেন্দ্রবাবু আমায় জেলে দিচ্ছিলেন আমি চুরি করেছি বলে। পথে স্টেশনে সঞ্জীববাবুর দেখা পেয়ে ওঁর আশ্রয় চেয়েছিলাম। ইনি জামিন হয়ে আমায় উপস্থিত মুক্ত করে এনেছেন।

মায়ের মুখ আরও থমথমে হইয়া উঠিল। তিনি সঞ্জীবকে কহিলেন—এর পরিচয় তুমি জান সঞ্জীব?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ যেন রন্ রন্ করিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—জানি মা, স্টেশনে মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী সতীশ মিত্তিরের কাছে সমস্ত পরিচয় পেয়েছি। সে যত গ্লানিকর ইতিহাস ছিল সব আমায় জোর করে শুনিয়ে তবে ছেড়েছে। ইনিও অকপটে সত্য যেটুকু স্বীকার করেছেন। কিন্তু মা ইনি যাই হোন, ইনি স্ত্রীলোক, আর বেশ বুঝলাম আমি, মিথ্যা ষড়যন্ত্রে এঁকে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে শুধু মাত্র বিপদাপন্ন করে এঁকে আয়ত্ত করবার জন্য। সেক্ষেত্রে—

উষ্ণভাবে কথার অবশেষটুকু যেন মা শেষ করিয়া দিলেন, কহিলেন—তাই তোমার অমনি দয়া হয়ে গেল—কেমন?

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল, এ-কথার কোন জবাব দিল না। উত্তর দিয়া মাকে সে আর অধিক উত্তপ্ত করিল না। নলিনীর বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। এতখানি কল্পনা করে নাই সে। তাহার মনে হইতেছিল এর চেয়ে থানা-হাজত বহুগুণে ছিল ভাল। সেখানে যতই না দুঃখ থাকুক—অনধিকারের হীনতা সেখানে তাহার ছিল না। আর চোরের অপমান তো তাহার হইয়াই গিয়াছে। লাঞ্ছনা সেখানে যতই থাকুক—গঞ্জনা সেখানে ছিল না।

মা কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন—এস বাড়ির ভেতরে এস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে আর হবে কি? এস গো তুমিও এস, তোমার আর দোষ কি বল? আমার দয়ার সাগর ছেলে তোমায় না আনলে তো আর তুমি আসতে না বাছা। এ যদি আগে জানতাম আমি তবে যে গর্ভে আগুন ধরিয়ে দিতাম! নাও মহাপুরুষ, মুখ-হাত ধুয়ে ফেল—কাপড় ছাড়, না এই আশ্বিনের রাত্রেই স্নান হবে?

সঞ্জীব কহিল—স্নানই করব। সে ব্যাগ খুলিয়া কাপড় গামছা বাহির করিতে বসিল।

মা নলিনীকে কহিলেন—তুমি মুখ-হাত ধোও বাছা। এস আমার সঙ্গে, এস জায়গা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

নিজেই তিনি এক বালতি জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। দুইটি ঘরের মধ্যস্থলে তিনদিক অবারিত বেশ একটি নিরিবিলি স্থান। তলদেশটি বাঁধানো থাকায় কোন অসুবিধা নাই। এক দিকের দেওয়ালের হুকে একটি কেরোসিনের ডিবে ঝুলাইয়া দিয়া কহিলেন—কাপড় ছাড়বে তো বাছা?

ঘাড় নাড়িয়া নলিনী ইঙ্গিতে জানাইল—না।

রূঢ়স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন—খ্রীষ্টান হও আর যাই হও বাছা—ময়লা কাপড় ছাড়াটা উচিত। এ কি আচারভ্রষ্ট তোমরা! এগুলোতে ধর্ম হোক আর না হোক, শরীর তো ভাল থাকে। ও, তোমার কাপড়-চোপড় কিছু নাই বুঝি? দাঁড়াও, সঞ্জীবের কাপড় একখানা এনে দিই তোমায়।

অল্পক্ষণ পরেই একখানা কাপড় আনিয়া হুকে ঝোলাইয়া দিলেন। একটি সাবান নামাইয়া দিয়া কহিলেন—এই নাও সাবান রইল। আর জল যদি দরকার হয় তবে আমায় ডেকো, বুঝলে ?

মুখ-হাত ধুইতে ধুইতে নলিনী ভাবিতেছিল, এইবার মা বোধ হয় পুত্রের উপর আর এক দফা ঝাল ঝাড়িবেন।

এবার আর তাহার উপস্থিতি হেতু ওই দুর্দান্ত মুখরারও যেটুকু চক্ষুলজ্জা আছে—সেটুকুও থাকিবে না। সে শিহরিয়া উঠিল।

মায়ের গলাও শোনা গেল।

মা বলিতেছিলেন—কি খাওয়া হবে মহাপুরুষ ? দুটো ভাতে ভাত চড়িয়ে দিই, কি বলিস ?

ছেলে কহিল—তাই দাও।

—তবে তুই পুকুরে স্নান করতে যাবি আর শম্ভু বাগ্দীকে বলবি দুটো আড়ার মাছ দিয়ে যাবে সে।

—সে বলব। কিন্তু তুমি বস তো একটু, একটা কথা শোন দেখি।

—কাল সকালে শুনব কথা। যা তুই এখন স্নান করে আয়—আমার অনেক কাজ। উনোনে আঁচটা দিয়ে দিই।

নলিনী এই সময় মুখ-হাত ধুইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাতা-পুত্রের কথার সুরে সে ভরসা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল—আঁচটা আমি দিয়ে দেব মা ?

মা ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—না বাছা, তুমি আমার ঘরে আগন্তুক অতিথি মানুষ। তোমাকে ও কাজ করতে দেওয়া আমার পাপ হবে। তুমি বরং বস ওখানে, সঞ্জীব, তোর সতরঞ্চিটা দে তো বের করে পেতে।

সঞ্জীব ঘর খুলিয়া একখানা সতরঞ্চি বাহির করিয়া বিছাইয়া দিল, কহিল—মা ঠিকই বলেছেন, আপনি অতিথি, আমরা আপনার পরিচর্যা করব। আপনি বিশ্রাম করুন একটু। আপনার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে আজ।

উনোনের মুখে বসিয়া আঁচ দিতে দিতে মা বলিলেন—আহা কচি মেয়ে, তার উপর অত্যাচার দেখ তো !

সে কণ্ঠস্বর ওই মুখরার কণ্ঠে বিস্ময়ের বস্তু। সে স্বরকারুণ্য নলিনীকে স্পর্শ করিল। সে সতরঞ্চির উপর বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমস্ত দিনের যুদ্ধক্লান্ত মনের অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহখানিকে যেন নাগপাশের মত বেড়িয়া ধরিল। এমনি একটি মুহূর্তের শুধু যেন অপেক্ষা ছিল, সেই মুহূর্তটি পাইবামাত্র দেহটা যেন এক নিমেষে ভাঙিয়া গেল, ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া সে সতরঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। ঊর্ধ্ব দৃষ্টির সম্মুখে শরতের নিবিড় নীল আকাশভরা ঔজ্জ্বল্য তাহার ভাল লাগিল। ভাল

জাগিবারই কথা—মনে মনে তখন তাহার ক্লান্ত আনন্দ, তাহার বিপদ আজ সুসহায়ের আশ্বাসের মধ্যে নিরাপদে কাটিয়া গিয়াছে। তারার মালার মধ্য দিয়া শুভ্র ছায়াপথখানি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এখনও বর্ষার বাতাস বন্ধ হয় নাই। পূবে সজল হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল। নলিনীর চোখ দুটি আসন্ন ঘুমে নিমীলিত হইয়া আসিতেছিল।

স্বপ্নহীন নিশ্চিন্ত নিদ্রা হইতে সে জাগিয়া উঠিল সঞ্জীবের মায়ের ডাকে। ডাকিয়া তুলিয়া তিনি কহিলেন—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছ মা, ডেকে তুলতে আমারই কষ্ট হচ্ছিল। ওঠ মা, মুখে দুটো দিয়ে নাও।

নলিনী লজ্জিত হইয়া কহিল—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মা কহিলেন—ঘুমের আর দোষ কি মা? মুখে একটু জল দাও, ওই ঘটিটাতেই জল আছে।

মুখে হাতে জল দিয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—সঞ্জীববাবু খেয়েছেন?

মায়ের কণ্ঠস্বর উগ্র হইয়া উঠিল—বলো না বাছা সে আপদের কথা—আমার জীবনের অশান্তি সে। এই রাত্রে বেরিয়েছেন মহাপুরুষ, তার এক নাইট স্কুল আছে, তাই দেখতে। তুমি খেয়ে নাও বাছা—তার অপেক্ষায় তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে। রাত এগারটার গাড়ি চলে গেল। সে যখন আসবে তখন খাবে। এই রাত্রে খবর না নিলে তার আর ঘুম হচ্ছিল না। কখনও কোন দিন যদি শান্তি সে দিলে আমায়।

সঞ্জীবের জন্য অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস নলিনীর হইল না। মুখ ফুটিয়া বলিতে তাহার ভয় হইল—কি জানি এই দুর্মুখী কি বলিয়া বসিবে! আহার তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় সঞ্জীব আসিয়া উপস্থিত হইল। মা কহিলেন—পায়ে জল দে ফের। যত সব ছোটলোক পাড়া মাড়িয়ে এলি তুই।

সঞ্জীব স্যাণ্ডেলটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—ছোটলোক কথাটা তোমার ব্যবহার করা উচিত নয় মা। এবার আমি ওদের বলে দেব—না খেয়ে ওরা শুকিয়ে মরবে তবু তোমার সাহায্য নেবে না আর।

মা গর্জন করিয়া উঠিলেন—এত রাত্রে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলি নাকি তুই? যা বলছি তাই কর। মুখ ফসকে ভুল হয়ে যাওয়াটা দোষের নয়।

হাসিতে হাসিতে সঞ্জীব পা ধুইয়া কহিল—গিয়েছিলাম একবার হারাণদার বাড়ি। ও বুড়ো তো সব জানে। ও-ও বললে, বাবা কড়ি গাঙ্গুলীর টাকা সব শোধ করে দিয়েছেন। পঁচিশ টাকা কম ছিল। তা সে টাকা ভদ্রলোকের মীমাংসায় বাবা রফা পেয়েছিলেন। গাঙ্গুলী আজ-কাল করে দলিলখানা আর ফেরত দেয় নি। হারাণদাও কতবার ওই দলিলের জন্ত গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে। তোমায় শুনতে বললাম তখন—শুনলে না তুমি।

আমি এই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—কেন? এ কথা হঠাৎ ওঠবার কারণ কি হল? কড়ি কি ফের সেই টাকা দাবী করছে নাকি? তার গলাও যেন শুনছিলাম তখন?

আসনে বসিয়া সঞ্জীব কহিল—হ্যাঁ মা। সেই কথাই বলছিল আজ। আমার পেছনে পেছনেই আসছিল। তুমি দরজা খুললে সে-সময়—সেই সময় পালাল।

ভাতের থালাটা কোলের কাছে আগাইয়া দিয়া মা কহিলেন—আরও কত হবে এর পরে। এই তো প্রথম।

সঞ্জীব একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—কি বলছ, কিছু যে বুঝতে পারলাম না, মা!

ঈষৎ হাসিয়া মা জবাব দিলেন—ভীমরুলের চাকে আজ খোঁচা দিয়েছ—তার পাল্টা আক্রমণের সময়ে বুঝতে পারলাম না বললে চলবে কেন?

সঞ্জীব আরও বিস্মিত হইয়া কহিল—বল কি মা? এ কি মহেন্দ্রবাবুর কাজ?

—হ্যাঁ, বাবা। এতে কোন ভুল নেই। কড়ি গাঙ্গুলী মহেন্দ্রবাবুর পোষা কুকুর, সে যা করে মনিবের মনস্তুষ্টির জন্যই করে থাকে। তবে তার নিজের পেট ভরাটা হল প্রথম লক্ষ্য।

সঞ্জীব খাইতে খাইতে ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ সে বলিয়া উঠিল—এতদূর হীন মানুষ হতে পারে? আমি তো তার কোন অনিষ্ট করি নি?

মা বলিলেন—ওরে গ্রহদেবতায় মানুষের যখন অনিষ্ট করে তখন বিপন্নের উপকার করলে তারা উপকারীর উপর সন্তুষ্টই হয়। কিন্তু মানুষ যখন মানুষের অপকার করে তখন বিপন্নের উপকার করতে গেলে মানুষ হয় রুষ্ট—মানুষের রাগের ভাগ নিতে হয়।

সঞ্জীব নীরবে আহার করিয়া গেল। মা আবার তাহাকে কহিলেন—ভয় কি বাবা! ভগবান আছেন, তিনি কখনও সৎকাজে কারও অমঙ্গল করেন না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—ভগবান তো জানি নে মা, আমি তোমাকেই আমার ভগবান বলে মানি। ভয় আমি করব না।

মা জ্বলিয়া উঠিলেন—এইটেই তোমার সব চেয়ে বড় অপরাধ সঞ্জীব। ভগবান মানি না কি? এ যদি কর সঞ্জীব তবে তোমার সঙ্গে আমার বাস করা চলবে না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—মানি নে তো বলি নি আমি, বললাম জানি না।

মা বলিলেন—ওরে তাঁকে আগে মানতে হয় তবেই তাঁকে জানতে পারা যায়।

নলিনীর চোখ ভরিয়া জল আসিল। এত গভীর নিষ্ঠার সহিত ভগবানকে নির্দেশ তাহার কাছে কেহ কখনও করে নাই। সে যেন দেবস্থলের সান্নিধ্য অনুভব করিল। আকাশ ভরা তারার দিকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সকালে যখন নলিনী উঠিল তখনও রৌদ্র ভাল করিয়া উঠে নাই। গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষসন্নিবেশের অন্তরাল ছাড়াইয়া সূর্য তখন চোখের সম্মুখে আকাশের কোলে দেখা দেয় নাই। কিন্তু

বাহিরে আসিয়া সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সঞ্জীবের মায়ের তখন স্নান হইয়া গিয়াছে। তুলসীমঞ্চের নীচে বসিয়া তিনি দেবার্চনা করিতেছিলেন। ওদিকে রান্নাঘরের বারান্দায় উনোনে কয়লা গম্ গম্ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে। কেট্‌লীতে চায়ের জল গরম হইতেছিল।

সঞ্জীবের মা পূজায় বিরতি দিয়া বলিলেন—মুখ হাত ধুয়ে ফেল বাছা। মাঠে যেতে সঞ্জীব চায়ের জল চাপিয়ে দুধ আনতে গেছে।

নলিনী তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইবার স্থানে গিয়া দেখিল—মাজন, বাঁশের একটি জিভছোলা, সাবান সমস্ত দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালের গায়ে হুকে একখানি ধোওয়া ফিতেপাড় কাপড় ঝুলিতেছিল। ওপাশ হইতে মা আবার ডাকিয়া কহিলেন—মোটা কাপড়ই দিতে হল বাছা, সঞ্জীবের তো খদ্দরের কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় নেই। কি করব?

এই পরিচর্যায় নলিনীর লজ্জার আর সীমা রহিল না। তাহার অপরাধ যেন পাহাড়প্রমাণ হইয়া উঠিল। সে একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর শুধুমাত্র কাপড়খানি ঘাড়ে ফেলিয়া খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে ফিরিল একেবারে স্নান সারিয়া।

সঞ্জীব উনোনের কাছে বসিয়া চায়ের জল ফোটা দেখিতেছিল। সে সদ্যস্নাতা নলিনীকে দেখিয়া কহিল—এ কি, আপনি কি ওই ডোবাটায় স্নান করে এলেন নাকি?

ঈষৎ হাসিয়া নলিনী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল, তখনও তাহার ভাল করিয়া মাথা মোছা হয় নাই।

মা পূজা সারিয়া উঠিতেছিলেন, তিনি কথাটা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি বাছা, কি ধারার মানুষ গো তুমি? আমি জল রাখলাম, সব উয্যুগ করে রাখলাম—সে তোমার পছন্দ হল না বুঝি? শেষে জ্বর হলে তোমার সেবা করবে কে বল তো? নিজেরও তো একটা বিবেচনা বলে জিনিস আছে?

নলিনী হাসিমুখেই ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করিল—আপনার তোলা জলে কি আমি স্নান করতে পারি, মা? সে পাপ যে কখনও খণ্ডন হত না আমার।

সঞ্জীবের মা অতি রূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু এঁদো ডোবায় ডুব দিয়ে জ্বর হলে যে তখন আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। তখন যে আমার জাত বাঁচানো দায় হবে।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—উনি ডাক্তার মানুষ মা, রোগ ওঁদের ভয় করে।

মা বলিয়া উঠিলেন—তা করবে বৈকি। সে ভয় করে না কারুর—তোদের গাঁয়ের প্রবল-প্রতাপ মহেন্দ্রবাবুকেও না। দে বাপু দে, একটা কুইনিনের পিল ওকে দে। চায়ের সঙ্গে খেয়ে নাও বাছা। আমাকে আর বিপদে ফেলো না।

নলিনী বাহিরে আসিয়া কি একটা বলিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখপানে চাহিয়াই সঞ্জীবের মা বলিয়া উঠিলেন—রাম রাম—ও কি বিচ্ছিরি করে চুল ফিরিয়েছ তুমি গো? মাঠের মতন কপাল বের করে—ও কি ভঙ্গী হয়েছে তোমার? যাও যাও, সঞ্জীবের ঘরে আয়না চিরুনি আছে, চুলটা ভাল করে ফিরিয়ে এস—কেমন করে হালফ্যাশানে চুল বাঁধ গো তোমরা! একে তো ওই ছিরি তোমার রূপের—তার ওপর ও কি ভঙ্গী করে রেখেছ?

কালো-কুচ্ছিত মানুষ আমি দেখতে পারি না বাপু।

সঞ্জীব ঈষৎ বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইঙ্গিতে অনুনয় করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—ও ঘরে সামনেই টেবিলের ওপর আয়না চিরুনি পাবেন। কিছু মনে করবেন না, মায়ের আমার—

নলিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো ?

সঞ্জীব খুশী হইয়া উঠিল, সে বলিল—যান তাহলে, শীগগির আসবেন—চা তৈরি করছি আমি।

যাইতে যাইতে নলিনী কহিল—চা খাব না আমি।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন ?

নলিনী তাহার আরক্ত চোখ দুটি ফিরাইয়া লইয়া কহিল—আপনারা আমায় মনে করেছেন কি বলুন তো ? মেয়েমানুষ হয়ে আমি এত বড় লজ্জাহীনা যে আপনার তৈরি চা আমি খাব !

নলিনীর চোখে জল আসিয়াছিল। সে দ্রুতপদে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সঞ্জীব মৃদুস্বরে মাকে কহিল—ছি মা, লোকে কুৎসিত হলে কি—

মা দেবার্চনা শেষ করিয়া পূজার স্থান মার্জনা করিতেছিলেন—তিনি সবিস্ময়ে ঝংকার দিয়া উঠিলেন—তা বলে কালোকে কালো বলব না ? ওর চোখ আর চুল ছাড়া কোনখানটা মুখের ভাল বল দেখি ?

সঞ্জীব মৃদুস্বরে কহিল—তা হয়তো নয়—কিন্তু মনে তো কষ্ট হতে পারে।

মা কহিলেন—ওরে না—মেয়েমানুষ এত বোকা নয়। তারা স্নেহ ঘেন্না বেশ ভাল বুঝতে পারে। ভাল যদি না বাসব তবে মুখখানি ওর যাতে সুন্দর লাগে তা করতে আমি বলব কেন ?

চুল ফিরাইয়া নলিনী হাসিমুখে আসিয়া বসিল, কহিল—সরে বসুন আপনি, চা আমি তৈরি করব।

সঞ্জীব ইতস্তত: করিতেছিল। মা বলিয়া উঠিলেন—দে না বাপু এগিয়ে—মেয়েমানুষেরই তো কাজ ওসব। আমি তো ওসব তোদের ছুঁইও না।

নলিনী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কাপ-কেটলী আগাইয়া লইয়া চা তৈয়ারি করিতে বসিল।

মা কহিলেন—দেখ তো বাছা কেমন টুকটুকে লাগছে মুখখানি। কেশ দিয়েছেন ভগবান বেশ করবার জন্য। বেশ না করলে মানাবে কেন ? তা না উটকো-মুখী চওড়া কপাল বের করে—ছি !

এক কাপ চা সঞ্জীবকে আগাইয়া দিয়া নিজে একটা টানিয়া লইল। তারপর সঞ্জীবকে কহিল—কুইনিন ট্যাবলেট ?

মা তরকারির বঁটি পাড়িতেছিলেন—কথাটা তাঁহার কানে গিয়াছিল। ঘর হইতে কাগজ-

মোড়া কুইনিনের পিল আনিয়া আলগোছে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—তুইও একটা খা সঞ্জীব। আর ওগো বাছা—এগুলি বাপু তোমাকে ধুয়ে নিয়ে আসতে হবে, বুঝেছ ?

নলিনীর মনের গ্লানি সব ঘুচিয়া গেল। সে আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—বেশ।

সঞ্জীব সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল—আপনি কি আজই কলকাতা যাবেন ?

নলিনী যেন এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে চকিত হইয়া উঠিল, কহিল—হ্যাঁ, তাই যাব। আজই বৈকি।

উৎসাহহীন অন্যমনস্ক চিত্তে নলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কি উদ্দেশ্যে যে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে কিছুতেই তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভ্রূ-ললাট কুঞ্চিত করিয়া সে চিন্তা করিল। অবশেষে অকস্মাৎ মনে হইল জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া লইতে হইবে, আজই তাহার কলিকাতা যাত্রার দিন।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। মনে হইতে তাহার হাসি আসিল। গুছাইয়া লইবার মধ্যে আছে তাহার একখানি তোয়ালে। আর সবই সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। যে কাপড়খানা সে পরিয়া আছে সেখানি পর্যন্ত অপরের। মনটা তাহার বিষাইয়া উঠিল—এমন করিয়া পরমুখাপেক্ষী অনুগ্রহ-ভিখারী হইয়া থাকার লজ্জাকর বেদনা মনের মধ্যে স্থচের মত বিঁধিতেছিল। কলিকাতা যাইবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ও-ঘরে দাওয়ার উপর বসিয়া মা ও ছেলেতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। মা কি বলিতেছেন আর সঞ্জীব একখানা কাগজে সেইগুলিই বোধ হয় লিখিতেছে। নলিনী বেশ সাড়া দিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

মা মুখ তুলিয়া কহিলেন—বসো। সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। নলিনী একপাশে বসিল। মা ছেলেকে কহিলেন—হল, মুড়ি-ভাজুনীর কাপড় লিখলি ?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। কিন্তু আর তোমার কত আছে ? এই তো দশ জোড়া হয়ে গেল।

মা বলিলেন—আরও আছে। যারা চিরকাল পেয়ে আসছে তারা এ পূজোর সময় কাপড় না পেলে ছাড়বে কেন ? জানিস কীর্তি না করতে পারি বৃত্তি কখনও লোপ করতে নেই।

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—মা, এই বৃত্তিতেই আমাদের সর্বনাশ হল। দান নিয়ে নিয়ে জাতটার ভিক্ষে করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—দান কাকে বলছিস তুই ? দান করে লোকে দয়া করে। আর বৃত্তি হল সম্মান। এ যে তারা নেয় এই আমাদের ভাগ্যি। আর শাকওয়ালী, মাছওয়ালী এদের তো হল পাওনা। সম্বচ্ছর তারা আমাদের উপকার করে, খাটে; তার

জন্ত এ তো তাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

সঞ্জীব আবার হাসিল, কহিল—বেশ, বল আর ক-জোড়া চাই?

—কার কার হল বল্ দেখি?

ফর্দটায় চোখ বুলাইয়া সঞ্জীব পড়িয়া গেল, পুজোর শাড়ি লালপেড়ে একজোড়া, কুমারী পূজোর শাড়ি একজোড়া। গুরুপ্রণামী থান একজোড়া, পুরোহিতের ধুতি একখানা। ব্রাহ্মণডিহির রাম চাটুজ্যের বৃত্তি ধুতি একখানা। কানাই গাঙ্গুলীর বৃত্তি ধুতি—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—ধুতি নয় থান লেখ্। কানাই গাঙ্গুলী মরে গেছে, বিধবা মেয়ে পরবে, থানই ভাল। তারপর?

—মাহিন্দার রাখালের মোটা ধুতি একজোড়া, গেঞ্জি একটা—

—ওদের কাপড় চওড়াপাড় নিয়ে আসবি। অভাবী মানুষ, সময় অসময় ওর বউও যেন পরতে পায়।

সঞ্জীব সংশোধন করিয়া লইয়া কহিল—ঠিক বলেছ মা। তাহলে কৃষেণদেরও ঐ রকম হবে তো?

মা কহিলেন—হ্যাঁ। তারপর পড়ে যা।

—মেছুনীর শাড়ি একখানা। রোজদার মুদীর একখানা, গয়লানীর শাড়ি একখানা, ঘাসওয়ালীর শাড়ি একখানা। তারপর তোমার মুড়ি-ভাজুনীর কাপড়—কি রকম হবে বলে দাও।

—ওখানা ধুতিপাড় নিয়ে আসবি। বিধবা মানুষ, শাড়ি তো হবে না।

—বেশ, তারপর?

—ধোপানীর শাড়ি লেখ্। আর ভাল ধোওয়া শান্তিপুর কি ফরাসডাঙ্গার শাড়ি একখানা। কিম্বা আজকাল খদ্দরের ঢাকাই শাড়ি বেশ ভাল দেখে তাই নিয়ে আসবি।

সঞ্জীব কহিল—কার জন্যে, ফর্দে নাম লিখব কার?

মা বলিলেন—কোন নাম লিখতে হবে না, এমনি লেখ্ না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইলি যে? তোর বড় বদ অভ্যেস হয়ে পড়ল সঞ্জীব। কথায় কথায় তোকে আমায় কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? লেখ্, আটপৌরে তোর আবার খদ্দর চাই বুঝি, খদ্দর দু'জোড়া আর পোশাকী একজোড়া, ভাল জামা একটা।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাকে কি এখনও ছেলেমানুষ পেলে মা যে পুজোতে আমার পোশাক চাই!

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন—হ্যাঁ চাই। আমি বলছি তুই লেখ্। আমি মরি তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস। হ্যাঁ, আর মেয়েদের ভাল জামা যা পাওয়া যায় নিয়ে আসবি, তার সঙ্গে সেমিজ দুটো।

সঞ্জীব লেখা শেষ করিয়া কহিল—এইবার আমি লিখি—মায়ের পরদের থান একখানা, আটপৌরে দু'জোড়া—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—আটপৌরে একজোড়া লেখ্, আমার কাপড় জমে আছে, তোর পুরানো কাপড়ে আমার অনেক চলে যায় যে। আর তোর পুরানো কাপড় আমায় সব দিয়ে যাবি। ওয়াড় দেব, সলতে পাকাতে হবে।

সঞ্জীব কহিল—বেশ। ফর্দ শেষ হল তো ?

--হ্যাঁ। আর মশলাপাতি যা, সে গাঁয়ের থেকে আনলেই হবে।

এতক্ষণে অবসর পাইয়া নলিনী বলিল—আমি তা হলে আজকেই যেতে চাই, মা।

গম্ভীর ভাবে মা বলিলেন—পূজোর পর যাবে। চারদিন পর পূজো, এ সময় ঘর থেকে কাউকে যেতে দিতে আছে ?

নলিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল—তা হোক, আমি তো দৈবক্রমে আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি, আমার যাওয়া-আসায়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—বড় জেদী মেয়েছেলে তোমরা বাপু একালের। পূজোর সময় কুকুর বেড়াল মানুষ বাড়ি থেকে তাড়ায় না, তা তুমি তো মানুষ। না বাছা, তুমি তো মানুষ, ওসব মতলব ছাড় তুমি। তিনি চলিয়া গেলেন।

নলিনী কহিল—সঞ্জীববাবু !

সঞ্জীব বলিল—এ ক'দিন এখানেই থেকে যান।

—না।

মৃদুস্বরে সঞ্জীব কহিল—আপনার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে এখানে ?

দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—হ্যাঁ। অশুচির মত—

বিবর্ণমুখে সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি আপনাকে বলেছিলাম—

—হ্যাঁ বলেছিলেন। কিন্তু অশুচি অস্পৃশ্যকে এত সেবাযত্ন করে আরো অপমানের বোঝা অসহ্য করে তুলবেন এ তো বলেন নি। সঞ্জীববাবু, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

ও-ঘর হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন—ওগো ও মেয়ে, তোমার ময়লা কাপড়চোপড় কি কি আছে বের করে দাও দেখি। আজ সব ধোপার বাড়ি যাবে। পূজোর পর আট দিন আবার কাপড় দিতে নেই।

নলিনী উত্তর দিল না।

সঞ্জীব কহিল—উনি আজই চলে যাবেন, মা।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—যাব বললেই যাওয়া হয় না। আমার সংসারেরও একটা কল্যেণ-অকল্যেণ আছে। আর বলি হ্যাঁগা বাছা—তোমাকে কি এখানে কেউ কাঁটার ওপর বসিয়ে রেখেছে যে, যাই-যাই ছাড়া আর কথা নেই তোমার ? এস জল খাবে এস, আর কি কি ময়লা কাপড় আছে বের করে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে কহিল—আমার কাপড় তো এই—ওই একখানি ছাড়া—

মা বলিলেন—ওরে সঞ্জীব, গাঁয়ের দোকান থেকেই ধোওয়া সুতীর কাপড় একজোড়া এনে দে এখুনি। সেমিজ আনবি দুটো। ওগো বাছা, এস না, তোমার জলখাবার হাতে

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমি? বড় বেয়াড়া স্বভাব তোমাদের।

নলিনীকে উঠিতে হইল।

সঞ্জীব হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। আহার নলিনীর মুখে উঠিতেছিল না। বার বার ভিতরের উদ্বেলিত অশ্রুরাশি তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দু'চোখের তটভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া প্লাবন বহাইতে চাহিতেছিল।

সঞ্জীব ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এখনও খাওয়া হয় নি! নিন নিন, শেষ করে নিন। একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিল। সঞ্জীব কহিল, বাগ্দীপাড়ায় একটা ডেলিভারী কেস আছে। কাল সকাল থেকে ব্যথা খাচ্ছে।

নলিনী আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেছিল, মা পাশ হইতে বাধা দিয়া কহিলেন—আগে খেয়ে নাও, তারপর যাবে। কতক্ষণে হবে তার ঠিক কি?

নলিনী কহিল—আর আমি খেতে পারব না, মা।

মা কহিলেন -খেয়ে নাও বলছি, খুব খেতে পারবে। নইলে আমি জোর করে খাইয়ে দেব তোমাকে। আমি এখনও স্নান করি নি তা মনে রেখো।

নলিনী আবার বসিল।

রোগিণীর অবস্থা সত্যসত্যই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পরমায়ুর বলেই হউক আর নলিনীর কৃতিত্বের জন্যই হউক নলিনী নিরাপদে প্রসব করাইয়া হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সঞ্জীব কহিল—আপনার মুখের হাসিতে বুঝতে পারছি—সংবাদ সুসংবাদ।

উচ্ছ্বসিত হইয়া নলিনী বলিল—ভগবানের দয়া, আমার শক্তিতে কিছু হত না সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভগবানকে মনে মনে প্রণাম করুন। হাত আপনার ক্লেদাক্ত, কপালে স্পর্শ করে সেখানে ক্লেদের ছাপ মারবেন না।

নলিনী নিষেধ মানিল না। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—এ ক্লেদের ছাপ ধুলে মুছে যায় সঞ্জীববাবু।

কিন্তু উত্তাপ হইতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া সঞ্জীব বাধা দিয়া বলিল—হাত-পা ধুয়ে ফেলুন আগে।

নলিনী দেখিল সাবান, তোয়ালে, গামলায় জল, সব প্রস্তুত হইয়া আছে। গামলার জল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। তাহারই একপাশে একখানা নতুন ধোওয়া-সুতীর লালপাড় শাড়ি ও একটি সেমিজ রাখা হইয়াছে।

সঞ্জীব কহিল—বসুন আপনি, আমি জল তুলে দিই।

নলিনী লজ্জিত স্বরে বলিয়া উঠিল—না না, সে হবে না। আপনি জল তুলে

দেবেন সে হবে না।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন ?

সলজ্জ ভাবে নলিনী বলিল—না ছি, পুরুষের সেবা কি স্ত্রীলোকে গ্রহণ করতে পারে সঞ্জীববাবু ?

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—আপনি ভুল করছেন, আমরা কর্মসাথী, কমরেডস।

খাস বৈঠকখানার বারান্দার ইজিচেয়ারের উপর বসিয়া মহেন্দ্রবাবু দাঁত দিয়া আঙুলের নখ কাটিতেছিলেন। এই আচরণটুকু তাঁহার গভীর চিন্তামগ্নতার পরিচায়ক। সম্মুখে টি-পয়টার উপর কয়েকখানা বই পড়িয়া ছিল। একখানা তাঁহার Criminal Procedure Code, একখানা How to make money, একখানা Goat-keeping, অপর দুইখানা বাংলা বই—একখানা জ্যোতিষ দর্পণ, অপরখানি সংক্ষিপ্ত বেদান্তসার।

মিত্তির মশায় আসিয়া আভূমি-নত নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বাবু সজাগ হইয়া উঠিলেন। খাড়া হইয়া বসিয়া কহিলেন—এই যে এসেছ। মামলাটার কতদূর কি হল ?

মিত্তির মশাই বলিল—পুজোর ছুটি সামনে, ছুটির আগে আর কিছু হবে না। তবে রিপোর্ট সেখানে গিয়েছে—পুলিস অফিসে।

বাবু আবার নখ কাটিতে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পর কহিলেন—মামলাটি চালিয়ে ফল নেই। ওটা এইখানেই চেপে দাও। অনেক কিছু কেলেঙ্কারি হবে—দারোগাবাবুর কাছে একবার যাও তুমি। আর ধীরেন কেরানীকে একবার ডেকে দাও।

মামলায় মিত্তির মশায়ের নিষ্ঠা প্রবল। সে কহিল—আজ্ঞে থেফ্‌ট্ কেস, ডায়েরী করে মামলা তুলে নিতে গেলে শেষে যে বিপদে পড়তে হবে। সঞ্জীব পিছনে রয়েছে, যদি পাল্টা মামলা কিছু রুজু করে ?

বাবু কহিলেন—হুঁ। তা হলে লেডি ডাক্তারকে বাদ দিয়ে হাসপাতালের চাকরটাকে ঠেলে দাও। যন্ত্রপাতিগুলো কাউকে দিয়ে ওর ঘরে রাখিয়ে দাও। জেল হলে ওর মেয়ে-ছেলেকে কিছু টাকা দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্চ করিয়ে দাও—বুঝলে ?

মিত্তির মশায়ের তাহাতে আপত্তি ছিল না। ব্যক্তিবিশেষকে আসামী করিতে মস্তিষ্ক-পীড়ার তাহার কোন হেতু ছিল না। মামলা চলিলেই তাহার হইল।

সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—যে আজ্ঞে। নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

পিছন হইতে ডাকিয়া বাবু বলিলেন—ধীরেন কেরানীকে পাঠিয়ে দাও। তারপর জ্যোতিষ দর্পণখানা তুলিয়া লইয়া কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া একটা নির্দিষ্ট স্থানে নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতে বসিলেন। স্থানটায় Napolean's Fate Book-এর প্রশ্নোত্তরে মীমাংসার নিয়ম ও কুণ্ডলীচক্র অঙ্কিত ছিল। কয়েকবার বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে অন্তরের কোন গোপন সমস্যার

ফলাফল দেখিলেন। হয়তো উত্তর মনঃপূত হইল না, বইখানাকে সজোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া খুলিলেন বেদান্তসার বইখানা। বেদান্তেও বোধ করি চিত্ত স্থির হইল না।

বই বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুলিলেন বোতলের ছিপি। গ্লাস দুই পানীয় পান করিয়া খাটখানার উপর বসিয়া গুনগুন করিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের গান একখানি।

বাহিরে আসিয়া দুর্বল কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়ার ইঙ্গিতে ধীরেন কেরানীকে কহিলেন—ও তুমি!

মাথা চুলকাইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—শোন, এক কাজ কর দেখি। নতুন যে অ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটি হয়েছে সেই সোসাইটির তরফ থেকে আমাদের সঞ্জীব মুখুজ্যেকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে এস। লেখো যে আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা যে আপনার মত কর্মী এই সোসাইটির ভার গ্রহণ করেন। আপনার সম্মতি পেলে আমরা সেই মত ব্যবস্থা করব। বুঝলে?

ঘাড় নাড়িয়া বেচারী ধীরেন জানাইল—হ্যাঁ, সে বুঝিয়াছে।

হাতের নখ কাটিতে কাটিতে বাবু বলিলেন—এই বেলাতেই পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে?

সম্মুখের প্রকাণ্ড হাতাটার ওপাশেই সরকারী রাস্তার ওপর একটা কোলাহল জাগিয়া উঠিতেই কথাটা আর অগ্রসর হইল না। দেখা গেল প্যাকাটির মত একটা মানুষ গলা ফাটাইয়া বিক্রম প্রকাশ করিতেছে আর লাফ মারিয়া মারিয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে। লোকটা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, জান না, বেটা তুমি আমাকে জান না! ধারো না তুমি আমার কাছে, বেটা বদমাশ? নালিশ করব আমি। যা-তা পেয়েছ তুমি আমাকে? আমার নাম এককড়ি গাঙ্গুলী।

বাবু কহিলেন—দেখ তো হে—কার সঙ্গে কি হল গাঙ্গুলীর?

ধীরেন কহিল—ডাকব এখানে?

হাসিয়া বাবু কহিলেন—ডাকবে বৈকি। ওর আগমন-সংবাদ জানাবার জন্যই ও ঠিক এই জায়গাটিতেই এমন করে লাফ মেরে চীৎকার করছে। ডাক এখানে।

ধীরেন অগ্রসর হইয়া গেল। তখনও গাঙ্গুলী চীৎকার করিতেছিল এবং লাফ দিতেছিল। মধ্যে মধ্যে হাতার দেওয়ালের ওপরে তাহার ছোট মাথাটি পুতুলনাচের পুতুলের মত দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ সব পরিবর্তিত হইয়া গেল, আস্ফালন নীরব, ছায়াছবির মত গাঙ্গুলীর মাথাও আর উপরে ঠেলিয়া উঠিল না। বাবু বুঝিলেন ধীরেন ঘটনাস্থলে পৌছিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই গাঙ্গুলী হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবুই প্রশ্ন করিলেন—কি হল কি, গাঙ্গুলী?

গাঙ্গুলী ভণিতা আরম্ভ করিল—আজ্ঞে আপনার রাজ্যের বিচারই এই। বুকে বসে সব দাড়ি ছিঁড়তে চায়। পাওনাদারের পাওনা পাওনাই নয়—সে চোথা কাগজে আছে—ইচ্ছে হয় তো দেব নইলে দেব না। এখন আমার যা পাওনা তাই তুমি দাও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু কহিলেন—এ তো হল ভণিতা। তারপর ঘটনাটা কি শুনি?

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে এই বেটা তারা মোদক। রমা বলেছিল,—কাকা, খোকার জন্ম চার আনার মিষ্টি নিয়ে এস। খোকা মানে রমার ভাইপো—তাকে সে মানুষ করেছে কিনা। পয়সা বেচারার হাতে ছিল না, বললে—দুদিন পরে পয়সাটা দেব কাকা। তাই বললাম বেটাকে—ওরে, দে চার আনার মিষ্টি। লিখে রাখ্‌ রমণ দাসের নামে—দুদিন পরে দামটা পাবি। বেটা বলে কিনা—আজ্ঞে না, ধার দিতে পারব না।

মোদক ছোকরাও পিছন পিছন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে করজোড়ে কহিল—হুজুর আমি বললাম, আপনার নামে লিখে রাখি। তা গাঙ্গুলী মশায় বললেন—না, আমার নামে লিখবি কেন? ঐ রমণ দাসের নামে লিখে রাখ্‌। তোর গরজ তো ভারী রে ব্যাটা। মোয়া খাবেন কিষণচাঁদ আর কড়ি গুনব আমি? আজ্ঞে যার তার নামে—।

বাবু বলিলেন—যা তুই, ভাল মিষ্টি এক টাকার বেশ করে হাঁড়িতে বন্ধ করে এখানে এনে দিয়ে যা। খাতায় লিখে রাখবি।

রোকাটা লইয়া মোদক দেখিল—বাবু সহি করিয়াছেন গাঙ্গুলীর হইয়া—শ্রীএককড়ি গাঙ্গুলী, বঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বুকের হাসিটা মুখে ঠেলিয়া উঠিবার পূর্বেই সে চলিয়া গেল।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—মিষ্টিগুলো তোমার বাড়িতে আর খালি হাঁড়িটা ওদের কাছে পৌছবে না তো এককড়ি?

অকস্মাৎ গাঙ্গুলী প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিল—সে হাসি তাহার আর থামিতে চায় না। হাসিতে হাসিতেই সে বলিল—বেশ বলেন আজ্ঞে আপনি!

—শুধু হাঁড়িটা ওদের বাড়ি পৌচবে না তো—অ্যা-হি-হি-হি। বেশ বলেন!

তারপর হাস্য সম্বরণ করিরা কোঁচায় মুখ মুছিয়া বলিল—কেমন বংশ হুজুরদের দেখতে হবে। স্বর্গীয় কর্তাবাবুর রসিকতায় নাকি মরা মানুষকেও হাসতে হত।

বাবু উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন—গাঙ্গুলীকে বলিয়া গেলেন—বস তো তুমি, কথা আছে। অল্পক্ষণ পরেই একটা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া ইজিচেয়ারটায় চাপিয়া বসিলেন।

গাঙ্গুলী কহিল—আমাকে কি বলবেন বলছিলেন?

সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছাড়িতে ছাড়িতে বাবু বলিলেন—হুঁ। মুখের ধোঁয়াটা নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেলে বলিলেন—তুমি শেয়াল পণ্ডিতের কথা জান এককড়ি?

পরম বিস্ময়ে গাঙ্গুলী বলিল—সে আবার কি আজ্ঞে?

সিগারেটে আর একটা টান মারিয়া বাবু বলিলেন—শোন। এক অতি ধূর্ত শেয়াল ছিল। সে নদীর ধারে গর্তের মধ্যে লেজ পুরে দিত। গর্তের মধ্যে কাঁকড়াগুলো রাগে তার লেজের রোঁয়া কামড়ে ধরত। অমনি সে লেজটিকে বের করে কাঁকড়াগুলিকে জলপ

করে ভাবত, কি পণ্ডিত সে! বনের সাধারণ জন্তুগুলোও ভাবত—কি বুদ্ধিমান শেয়াল পণ্ডিত! ক্রমশঃ তাহার সাহস বাড়তে লাগল। চাতুরি খেলে কুকুর বাচ্চা—বেড়াল বাচ্চা—ভালুক বাচ্চা খেয়ে দেমাক চরমে তার বেড়ে গেল।

গাঙ্গুলী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে ছেলেবয়সে কি আমোদই হত এই সব গল্প শুনে!

বাবু বলিলেন—দেখ তো ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে বোতল গেলাসটা আছে, নিয়ে এস তো গাঙ্গুলী। কানাই বেটা যে কোথায় যায়!

গাঙ্গুলী বোতল গ্লাস আনিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বোতল গ্লাস লইয়া ফিরিবার মুখে দেখিল, দুয়ারের দুই বাজুতে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া বাবু দাঁড়াইয়া। ঘরের চারিদিকের অপর দেওয়ালগুলি বন্ধ। এদিকের দেওয়ালের গায়ে কতকগুলা শিকার করা জানোয়ারের চামড়া টাঙানো রহিয়াছে। তাহারই ঠিক মধ্যস্থলে দুইখানা তলোয়ার গুণচিহ্ন রেখার মত পরস্পরকে কাটাকাটি করিয়া ঝুলিতেছে। তাহারই উপরে ঢাল। দুয়ারের পাশেই র‍্যাকের মধ্যে সারি সারি বন্দুক ঊর্ধ্বমুখে শোভা পাইতেছে।

বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—শোন তারপর, বাকি গল্পটা তোমায় বলি শোন। বনের কতকগুলো নির্বোধ জানোয়ারকে প্রতারণা করে তার সাধ হল বাঘের সঙ্গে চাতুরী খেলবে। পণ্ডিত নাম তার সার্থক করবে। বাঘের কাছে সে একদিন এল, হুজুর ভাল শিকার আছে। কিন্তু আমার একটা শিকার পাঁকে পড়ে গেছে সেটা উদ্ধার করে দিতে হবে আগে। বাঘ রাজী হল, কিন্তু বললে, আমার শিকার আগে এনে দাও। এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হল ক্রমে।

তারপর—অদ্ভুত বিকৃত স্বরে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—বড় তেষ্টা পেয়েছে আমার হুজুর, একটু জল—।

ঈষৎ হাসিয়া বাবু বলিলেন—বোতলে জল—গেলাস তোমার হাতেই রয়েছে গাঙ্গুলী, একটু খাও। গলাও ভিজবে···বুকেও একটু বল পাবে।

সত্যই গাঙ্গুলী গ্লাসে পানীয় ঢালিতে ঢালিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করিয়া লইয়া গাঙ্গুলী দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল—বাবুর হাতে বন্দুক। একটা দরজার পিঠে হেলান্ দিয়া সম্মুখের দরজায় একটি পা তুলিয়া এবার তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। দুই হাতে বন্দুকটা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছেন।

চোখে চোখ পড়িতেই বাবু কহিলেন—জান এককড়ি—এই বন্দুকটা আমার বহুদিনের বন্দুক। এতে কখনও একটি গুলিও আমার নষ্ট হয় নি।

গাঙ্গুলী মেঝের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—দোহাই হুজুর রক্ষে করুন। আমি আজই সন্ধ্যেতক রমাকে এনে দিয়ে যাব। দোহাই হুজুর।

—দেখো!

—নইলে আমার দশটা বাবা।

—আরও চাই আমার, সঞ্জীবের বাপের সেই তমসুকখানা, বুঝলে ?

—সে আমার কাছেই আছে মা-বাপ।

বন্দুক রাখিয়া দিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিয়া বাবু কহিলেন—বাইরে এস।

বাহিরে আসিয়া জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কিছু দেবেন না হুজুর সঞ্জীবের দলিলটার জন্য ? সুদে-আসলে পাঁচশো হয়েছে হুজুর।

সে বাবুর পা ছুইটা জড়াইয়া ধরিল।

বাবু বলিলেন—পা ছাড় এককড়ি। দেব—কিছু দেব তোমাকে। আজই দেব।

অপরাহ্নের দিকে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। নলিনী চায়ের পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া কহিল—একবার রোগীটিকে দেখলে হত যে।

চায়ের পেয়ালাটা লইয়া সঞ্জীব কহিল—সত্যি কথা, চলুন দেখে আসবেন, চলুন।

নিজের জন্য চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে নলিনী বলিল—চলুন। তারপর আবার বলিয়া উঠিল—আপনাদের দেশ কিন্তু আমার বড় ভাল লাগে। লাল মাটির দেশ—তারই মাঝে মাঝে সবুজ মাঠ বড় চমৎকার।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—যাবেন বেড়াতে, আমার সঙ্গেই চলুন না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মা রাগ করবেন না তো ?

সম্মুখে ওদিকে ভাঁড়ার ঘরে মা পূজার পাতি গুছাইয়া ভাণ্ডারে তুলিতেছিলেন। সঞ্জীব ডাকিল—মা !

—কি রে ?

—আমাদের মেয়ে-ডাক্তারকে আজ একবার আমাদের দেশের মাঠ দেখিয়ে নিয়ে আসি। কোন কাজ নেই তো তোমার ?

—ও আবার আমার কি কাজ করবে ? তা যা না। যাবার মুখে বাগ্দীপাড়ার হারাণকে বলে যাস বাগ্দী-বউকে যেন পাঠিয়ে দেয় একবার। আর দুটো মাছের জন্য বলে যাবি—নলিনীর বড় কষ্ট হচ্ছে খাবার।

সঞ্জীব নলিনীকে তাড়া দিয়া বলিল—নিন, নিন—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, দেরি করবেন না।

একটু উচ্ছ্বসিত ভাবেই নলিনী বলিয়া উঠিল—আগে আপনি নিন—চা খেয়ে পেয়ালাটা আমায় দিন দেখি। চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে আনতে হবে না ?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার এঁটো কাপ আমি ধোব আজ—আপনার কাপটা যদি আমায় না দেন তো নিজে ধুয়ে ফেলুন।

হাতের কাপটা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া নলিনী বলিল—ভারী অবাধ্য আপনি—

কথাটা অর্ধসমাপ্তই থাকিয়া গেল। পরমুহূর্তেই সে একরকম ছুটিয়া খিড়কির পথে

কাপ-কেটলী হাতে বাহির হইয়া গেল। ঘাট হইতে ফিরিয়া সে একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সঞ্জীব হাঁকিল—হল আপনার? কোন উত্তর আসিল না। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ডাক দিল—আসুন, বেলা যায় যে!

নলিনী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—চলুন।

তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সঞ্জীব মুগ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বাঃ চমৎকার! চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে। নার্সের বাংলা সংস্করণ দেখেছি। কিন্তু রূপে শোভায় এমন সেবিকা-মূর্তি এর আগে আমি দেখি নি মিস গাঙ্গুলী।

নলিনীর পরিধানে ছিল শুভ্র বেশ—হাফ-হাতা একটি ব্লাউস, তাহার উপর মিহিপাড় সঞ্জীবের ধুতি একখানি হালফ্যাসানের বেড় দিয়ে পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, আর মাথায় ছিল সাদা একখানি রুমাল ইরাণী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা। তাহার দীঘল সুশ্যাম দেহখানি শুভ্র পরিচ্ছদে সত্যই মানাইয়াছিল চমৎকার। কিন্তু মাথায় ওই ইরাণী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা রুমালখানি তাহার সে শোভা শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নার্সদের মত মস্তক-আবরণ বাঙালীর মেয়েকে এমন মানায় না।

নলিনীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—ওতে আমি লজ্জা পাই সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আমরা কমরেড মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তা হলেও আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ।

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জীব বলিল—না মিস গাঙ্গুলী, কর্মক্ষেত্রে কর্মের সমারোহের মধ্যে থাকে শুধু মানুষ। কর্মের প্রকৃত অধিকার-বোধ ছাড়া অপর সমস্ত সত্তা ভুলে যেতে হয়। কমরেড কথাটির গুরুত্ব বড় বেশী।

সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী দেখিল—প্রশান্ত উচ্ছ্বাসহীন মুখ।

ধীরে ধীরে সে বলিল—কিন্তু মার্জনা করবেন সঞ্জীববাবু, সেখানে তা হলে তো সৌন্দর্যের মোহে উচ্ছ্বাস প্রকাশের অধিকার বা অবকাশ না থাকাই উচিত।

দূরে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব বলিল—উচ্ছ্বাস নয়, আনন্দ। আনন্দ উপলব্ধির পথ যে রোধ করা যায় না মিস গাঙ্গুলী। এ পথ রোধ করতে পারে কে জানেন—পারে এক মৃত্যু। আর পরস্পরকে দেখে আনন্দ পাওয়াই হল বন্ধুত্ব। কমরেডস হতে হলে ওটা চাই, না হলে চলে না।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। কেন জানি না কোন যুক্তিই তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিল না। সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত লোক-চলা আঁকা-বাঁকা পথে সঞ্জীব চলিয়াছিল আগে, সে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল পিছনে পিছনে।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—কি হারাণদা, রোগী কেমন আছে?

নলিনী দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল বাগ্দীপাড়ায় তাহারা আসিয়া গিয়াছে। সম্মুখের বড় বাঁশ-ঝাড়ের ছায়াঘন পরিচ্ছন্ন তলদেশটিতে তাঁহাদের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। পাশেই অদূরে

তার পাঁচটি দিগম্বর ছেলে পরস্পরের গায়ে ধূলা ছিটকাইয়া কলহ করিতেছিল। বড় ছেলেটি অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—এই এই দাদাঠাকুর আইচে। চুপ, চুপ, সব চুপ কর।

একজন বলিল—এই শালা সতে, হুঁকোটা নামা কেনে। শালা টানছে দেখ লবাবের মত।

হারাণ সঞ্জীবকে কহিল—রোগী আপনাদের কিপাতে ভালই, দাদাভাই। আহা মেম ডাক্তারের যে যতন।

স্মিত হাস্যে নলিনী কহিল—চল, একবার দেখে আসি চল।

হারাণ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—এ অবেলাতে থাক্ মা। ছুঁলে তো চান করতে হবে। কাল বরং চানের আগে—

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—না, না, না, কে বললে আমাকে চান করতে হবে? মানুষ ছুঁলে কি মানুষকে চান করতে হয়?

হারাণ বলিল—তবুও এ বেলা থাক মা। কাল সকালেই দেখবেন। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের পুজো-আচ্চা হবে।

নলিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই অস্পৃশ্য জাতি—যাহারা আপন অস্পৃশ্যতার কাল্পনিক অপরাধ নির্বিবাদে মাথায় করিয়া অসঙ্কোচে বিশ হাত দূরে সরিয়া যায়—তাহাদের নিকটও কি সে অস্পৃশ্য! ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—বেশ তো সঞ্জীববাবু, আপনি একবার পাল্‌সের বিটটা গুনে দেখে আসুন না।

জোড়হাত করিয়া হারাণ বলিল—আজ থাক্ মা, যেদিন আমাদের দেবতার পুজো হয় সেদিন ডাক্তার কবরেজ সব বন্ধ। তাঁর উপর নির্ভর করে চিরদিন তো থাকতে পারি না, একটা দিন কি একটা বেলা তাও যদি না থাকতে পারি তবে আর তাঁকে মান্য করা কেনে।

কথা কয়টিতে নলিনীর মনের গ্লানি এক মুহূর্তে যেন ধুইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বলিল—তাই হবে হারাণদা। তোমাদের বউকে একবার মা ডেকেছেন। কিছু মাছ দিয়ে আসতে বলেছেন।

তারপর সঞ্জীবের হাতখানি নিঃসঙ্কোচে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিল—আসুন, আসুন সঞ্জীববাবু, বেড়াবার সময় চলে যাচ্ছে। আপনাদের দেশ আমার বড় ভাল লাগে।

চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিল—কি কুসংস্কার দেখুন। এ ওদের ভাঙা দরকার।

দৃঢ়কণ্ঠে নলিনী বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু, ওখানে ওদের চেয়ে আপনি অনেক দুর্বল। ওখানে ধরে নাড়া দিতে গেলে অক্ষমতায় নিজের কাছেই লজ্জা পাবেন আপনি।

সঞ্জীব মৃদু স্বরে কহিল—কিন্তু ভাঙতে হবে ওদের আত্মধ্বংসী হীনত্ব বোধ। ওদের মধ্যে আশ্রয় গেড়ে রয়েছে।

নলিনী উচ্ছ্বলিত ভাবে বলিয়া উঠিল—যা করবেন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে করুন সঞ্জীববাবু। ভুলবেন না এ ভারতবর্ষ—আর্যভূমি।

সঞ্জীব কথায় বাধা দিল, সে বলিল—মাটি মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর একটা অংশ। রাজা ভরতের শাসনাধীন থেকে নাম পেয়েছে ভারতবর্ষ।

নলিনী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—ভুল, ভুল, এ আপনার ভুল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভুলের পর ভুল রচনা করেই তো মানুষ প্রগতির ইতিহাস রচনা করে চলেছে। হয়ত আমার মত ভুল। কিন্তু সে নিয়ে ঝগড়া করার যোগ্য স্থান এটা নয়, মিস গাঙ্গুলী। ওরা সব কেমন ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে আছে দেখুন।

নলিনী দেখিল উলঙ্গ শিশুর দল হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে।

যে ছেলেটা প্রকাণ্ড হুঁকাটা টানিতেছিল সে হুঁকা পর্যন্ত টানিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ঘরের দুয়ারে দুয়ারে শান্ত বধূর দল অবগুণ্ঠনান্তরাল হইতে কৌতুকোজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে।

সঞ্জীব বলিল—তার চেয়ে চলুন নির্জন মাঠে গলা ফাটিয়ে তর্ক করা যাবে।

একটা উলঙ্গ ছেলে অকস্মাৎ হিহি করিয়া হাসিয়া কহিল—হি হি হি, বর-কনেতে ঝগড়া লেগে গেছে মাইরি—হি হি হি।

মুহূর্তে নলিনী আপনার হাতখানা টানিয়া লইল।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আপনি ছেলেমানুষ, মিস গাঙ্গুলী। ওই হাড়িদের কথায় কান দেন আপনি?

গ্রামের বসতি ছাড়াইয়াই আশ্বিনেব সবুজ অবারিত মাঠ বিপুল আলস্যে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা শ্রেণীবদ্ধ তালগাছ শরতের প্রসন্ন নীলাভ শূন্যপথে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে দিকচক্রবালে গ্রাম-বন-শোভার ঘন সবুজের সহিত আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ।

চলিতে চলিতে নলিনী বলিয়া উঠিল—সকল সত্তা ভুলে কমরেড হওয়া যায় সঞ্জীববাবু, কিন্তু যাকে আপনি অস্বীকার করতে চান সেই ঈশ্বরকে বুকের মধ্যে অহরহ অনুভব করা চাই।

সঞ্জীব বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিয়া গেল—হারাণের কথা শুনলেন? সে সত্যি সত্যিই আজ ভগবানের উপর নির্ভর করে আছে। তাঁকে আজ সে অনুভব করছে। তাঁরই ছোঁয়াচ আমাকেও লাগল। মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত সত্তাকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম এতগুলো লোক আমাদের দিকে চেয়ে আছে। নিঃসঙ্কোচে আপনার হাত ধরলাম।

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু মনে করবেন না। আপনি বড় বেশী সেন্টিমেণ্টাল।

হাসিমুখেই নলিনী উত্তর দিল—সেন্টিমেণ্ট ভাবের উচ্ছ্বাসই হল জীবনের লক্ষণ সঞ্জীববাবু। সমুদ্রে নদীতে তাই প্রাণের উচ্ছ্বাস ওঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গে। ঘটিবাটির জলে তরঙ্গ ওঠে না। মাটির বুকে ওঠে ফসলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু পাথরের বুকে ওঠা শেওলার দাগও স্থায়ী হয় না। তাতে গড়া হয় শুধু মৃতের ওপর কবর, স্মৃতিমন্দির।

সঞ্জীব মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

সবুজ মাঠের বুকচেরা আলপথ পায়ে পায়ে শেষ হইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা। দুধারের ঘন সবুজ মাঠের মধ্য দিয়া বিসর্পিল-গতি লাল কাঁকড়ের পথ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া চড়াইয়ের উপরে উঠিয়াছে। দুধারে বনফুলের গাছগুলি সবুজ ফলভারে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বড় শিরীষ, বেল, অশ্বত্থ ও আউচ ফুলের গাছ। আউচ ফুলের গাছগুলি মুক্তার মত ছোট ছোট সাদা ফুলের শুবকে শুবকে যেন আলো হইয়া আছে। পথের ধারেই হাতের কাছে একটা গাছ হইতে নলিনী একটা ফুলের স্তবক ভাঙিয়া লইল।

একটি সরু ডালের মাথায় অজস্র ফুলে পাতায় কে যেন তোড়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

স্তবকটা দেখাইয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—এই ফুলের গোছাটাকে কি বলবেন সঞ্জীববাবু? এ থেকে বোধ হয় ফল হয় না। একে কি বলবেন প্রকৃতির সেন্টিমেণ্ট-এর সৃষ্টি, শক্তির অপচয়!

স্বভাবগত মৃদু হাস্য সহকারে সঞ্জীব উত্তর দিল—প্রকৃতির সেন্টিমেণ্ট কখনও মাত্রা ছাড়ায় না নলিনী দেবী, মাত্রাবোধেই সংসারে হয়েছে ছন্দের সৃষ্টি। এই ছন্দকে অতিক্রম করলেই সংসারে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। সেন্টিমেণ্ট-কে আমি নিম্নস্থান দিই না। সেন্টিমেণ্ট-ই সংসারের বৃহৎ কর্মের প্রেরণা দেয়। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট অতিমাত্রায় হলেই কর্ম হয় পণ্ড। প্রকৃতিকে সর্বশক্তির মূল-আদ্যাশক্তি বলে মানি আমি। কিন্তু ইচ্ছাময়ী বলে ফুলে ফলে পূজা আমি করতে পারি নে।

চড়াইয়ের মাথায় উঠিয়া পথটা প্রকাণ্ড একটা বাঁক ফিরিয়াছে। সঞ্জীব বলিল—আসুন বাঁ দিকে ভাঙি। আর পথ নয়, অসমতল প্রান্তর। একটু সাবধানে চলবেন।

নলিনী সঞ্জীবের কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার কথায় সে চিন্তা ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে সজাগ দৃষ্টি প্রসারিত করিল। লাল কাঁকরের টিলা, ছোট পাহাড়ের মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটাবন। লাল মাটির বুকটা কালো রঙের গোল কাঁকর আর নানা বর্ণের পাথরে সমাচ্ছন্ন। সন্তর্পণে স্যাণ্ডেল চালাইয়া টিলার মাথার উপর উঠিয়া নলিনী মুগ্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় টিলার পর টিলা, এ উহার বুকে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুইটা টিলার মধ্যস্থলে উপত্যকার মত সমতল-ভূমিতে শস্যক্ষেত্রে হিল্লোলিত-শীর্ষ ধান্য-লক্ষ্মীর অপরূপ শোভা। ক্ষেত্রগুলির বেড়ায় বেড়ায় তাল-বৃক্ষের সারি।

নলিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—চলুন, চলুন, আগে ওই টিলাটার ওপরে গিয়ে উঠি।

টিলাগুলির গা বাহিয়া ঝর্ণার জলধারার পথে পথে নদীর জন্মকথার ইতিবৃত্ত লেখা। ক্ষুদ্র রেখাগুলি নীচে নামিতে নামিতে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমশঃ গভীর ও পরিসর হইয়া চলিয়াছে। এ যেন ভূপৃষ্ঠের একখানি মানচিত্র।

নালার গর্ভে নামিয়া পড়িয়া নলিনী বালুকারাশির উপর ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল। নালাটার দুই পার্শ্বে জলে-কাটা মাটির গায়ে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের কোনটি লাল, কোনটি প্রগাঢ় হলুদ, কোনটি কালো। এখানে ওখানে বিবিধ বর্ণ ও আকারের উপলখণ্ডের স্তূপ। বাছিয়া

বাছিয়া নলিনী পাথর কুড়াইয়া আঁচল ভরিতেছিল। সহসা একটা কাঁটাবন হইতে ফর ফর শব্দে দুইটা পাখি উড়িয়া গিয়া দূরে টিলার মাথায় বসিয়া কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। নলিনী চমকাইয়া উঠিল।

অদূরে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—তিতির পাখি।

নলিনী হাসিয়া আবার পাথর কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিছন হইতে সঞ্জীব ডাকিল—একটা জিনিস দেখুন।

নলিনী দেখিল সঞ্জীবের হাতে বড় একটা লাল কাঁকরের চাপ। একটা পাথরের উপর সেটাকে রাখিয়া আর একটা পাথর দিয়া আঘাত করিতেই কাঁকরের ঢেলাটা ভাঙিয়া চুর চুর হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল সুকোমল গভীর রক্তবর্ণের মৃৎপিণ্ড। সেই মৃৎপিণ্ড দিয়া একটা পাথরের গায়ে গভীর রক্তবর্ণের দাগ টানিয়া দিয়া সঞ্জীব বলিল—এই হল গিরিমাটি। হলুদ রঙের এই মাটিও পাওয়া যায়।

নলিনী আবদারের সুরে বলিল—দিন না, দিন না দেখে দেখে, সংগ্রহ করে দিন না সঞ্জীববাবু।

কয়েকটা টুকরা সংগ্রহ করিয়া লইয়া সঞ্জীব বলিল—চলুন ওপরে ওঠা যাক। সরু একখানি রাস্তা। দু-পাশে খৈরী কাঁটার বন। মাঝে মাঝে শরবন বায়ু আন্দোলনে শির শির করিয়া দুলিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ডাক্তার মানুষ আপনি—একটা ওষুধ চিনে রাখুন। এর নাম হচ্ছে ষড়পঙ্ক—ব্যথার খুব ভাল ওষুধ।

নলিনী বিস্মিত হইয়া কহিল—এ কি শরবন নয়!

কোন উত্তর না দিয়া একটা পাতা ছিঁড়িয়া সঞ্জীব দু হাতে দলিয়া নলিনীর নাকের কাছে ধরিল। চমৎকার একটা গন্ধে নলিনীর বুক ভরিয়া গেল। গোটাকয়েক পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—কি নাম বললেন, ষড়পঙ্ক—নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু এদিকে দেখুন—সূর্য অস্ত চলেছে। তখন তাহারা টিলাটার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে।

নলিনী বলিয়া উঠিল—কিন্তু এ কি চমৎকার ফল সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব ঘুরিয়া দেখিল একটা বড় খৈরী কাঁটার গাছ আচ্ছন্ন করিয়া একটা লতা উঠিয়াছে, আর সেই লতায় ধরিয়া আছে অপরূপ রাঙা রাঙা ফল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—এ ওর ধার করা রূপ নলিনী দেবী। আপনাদের অধর শোভা চুরি করে ওর এত শোভা—ওর নাম হচ্ছে বিম্বফল।

নলিনী কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—আমরা কমরেড সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—নিশ্চয়। নইলে বিম্বফল না বলে বলতাম তেলাকুচার ফল। চলিত ভাষায় আমাদের এখানে ওর নাম তেলেকুচা।

দূরে আর একটা টিলার উপর দিয়া একখানা গরুর গাড়ি চলিয়াছিল। তাহারই পাশে সাঁওতালদের একটা পল্লী। দিবসান্তে কুটীরে কুটীরে ধোঁয়া উঠিতেছে, এতক্ষণে উহাদের রান্না চড়িল। সম্মুখে একটা টিলার অন্তরালে সূর্য অস্তে চলিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিলেও পূর্বদিগন্তে শুক্লা শারদ চতুর্থীর ক্ষীন চন্দ্রকলার আলোক দেখা দিয়াছিল। সন্তর্পণে পথ চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—কে ?

ওদিক হইতে একজন মানুষ চলিয়া আসিতেছিল। সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কে ? কে তুমি ?

তারপর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবেই বলিল—স্ত্রীলোক বলে বোধ হচ্ছে !

নলিনী অগ্রসর হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত মানুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—কে, রমা ?

ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া রমা কহিল—দিদিমণি !

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—তুমি এখানে এমন সময় কোথায় চলেছ রমা ?

কাঁদিতে কাঁদিতেই রমা কহিল—আমায় বাঁচাও দিদিমণি। আবার গাঙ্গুলী কাকা আমায় বাবুদের বাড়ি পাঠাবে। বাবু বাবাকে টাকা দিয়েছে। বাবা আমায় বিক্রি করেছে, আজই সন্ধ্যেবেলা আমায় নিতে গাড়ি আসবে। তখন আমি বুঝতে পারি নি, আমায় বাঁচাও তোমরা।

নলিনী প্রশ্ন করিল—কিন্তু এ পথে এই সন্ধ্যেবেলা তুমি যাচ্ছিলে কোথায় ?

—আমার মাসির বাড়ি। ঐ সামনের গাঁয়ে আমার মাসির বাড়ি।

সঞ্জীব কহিল—সেখানে যাবে তুমি ?

আকুলস্বরে রমা বলিল—না, না বাবু। তখন আমি বুঝতে পারি নি। মায়ের জন্য মন কেমন করেছিল তাই চলে গিয়েছিলাম। বাবু !

নলিনী কহিল—সঞ্জীববাবু !

প্রশান্ত স্বরে সঞ্জীব উত্তর দিল—এস রমা।

বিজয়া দশমীর দিন।

এখানে নবপত্রিকা ও ঘট বিসর্জনান্তেই বিজয়া সম্ভাষণ আরম্ভ হয়, এই চিরদিনের প্রথা। সঞ্জীব বিজয়া সম্ভাষণের জন্য নতুন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া ডাকিল—মা !

কেহ কোন উত্তর দিল না। সে আবার ডাকিল—মা !

এবার সম্মুখের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল নলিনী। বলিল—মা তো এখনও অঞ্জলি দিয়ে ফেরেন নি ?

সঞ্জীব সে কথার কোন জবাব দিল না, বলিয়া উঠিল—এ কি, আপনি এখনও কাপড়-

চোপড় ছাড়েন নি যে ?

নলিনী কহিল—কেন ?

—বেশ যা হোক। এত বড় পুজোটা গেল, সে দেখলেন না! এদিকে দেখি ঈশ্বর পূজায় আপনার দারুণ নিষ্ঠা। তার ওপর আজ বিজয়া-দশমী, বাঙালী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বদিন। আজ নববস্ত্র পরিধান করে নতুন উদ্যম নিয়ে আমাদের হয় নব বৎসর।

নলিনী চুপ করিয়া রহিল। সঞ্জীবের চোখের দৃষ্টি তখন উল্লাসে উচ্ছ্বসিত, সহজ দৃষ্টিশক্তি থাকিলে সে দেখিতে পাইত কালো মেয়েটির বর্ণ বিষণ্ণতার ঘন ছায়ায় সজল মেঘের মত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

সে উৎসাহভরেই বলিয়া গেল—দেখবেন, এক্ষুনি রাস্তা দিয়ে দলে দলে গ্রামের লোক দুর্গা মায়ের ঘাটে চলবে। সেখানে জীবনে জয় কামনা করে হাতে অপরাজিতার বলয় পরবে, হরিদ্রার প্রসাদ খেয়ে দেহের পবিত্রতা রক্ষা করবে। তারপর বিজয়া সম্ভাষণ আরম্ভ হবে। স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে সাজসজ্জা করে বাড়ি বাড়ি প্রণাম করে ফিরবে। পুজো আপনি দেখলেন না—আজ আপনাকে বেরুতেই হবে। কাপড়চোপড়—তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্বেই নলিনী ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া গেল। মেয়েটির গতির মন্থরতা এতক্ষণে তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া সে ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী! কোন উত্তর আসিল না। সঞ্জীব এবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নলিনী স্তব্ধ হইয়া তক্তাপোশখানির উপরে বসিয়া ছিল। সঞ্জীব স্নেহকোমল স্বরে আবার ডাকিল—নলিনী দেবী!

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া নলিনী তাহার দিকে চাহিল। বলিল—বলুন।

—কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন, বিজয়ার সময় আর বেশী নেই। আজ নতুন সাজসজ্জা করতে হয়, উঠুন।

নলিনী একটু হাসিল—উদয়াকাশের বিলীয়মান তারকার মতই সে হাসি সকরুণ ক্ষীণ। সে হাসিটুকুর রেশ তাহার অধরতটে থাকিতে থাকিতেই সে বলিল—না।

—কেন? আপনার কি হল?

অস্থির হইয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—না, না, আমায় মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। আমি যেতে পারব না।

তাহার চোখ ছল-ছল করিতেছিল। উচ্ছ্বসিত কয়টি ফোঁটা মাটির উপর ঝরিয়াও পড়িল। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত নলিনীর বেদনার কারণটুকু সঞ্জীবের মনে সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সে নতমুখেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

পিছন হইতে নলিনী বলিল—আমায় একটু কাঁচা হলুদ এনে দেবেন?

সঞ্জীব বলিল—দেব। কিন্তু মনকে এমন ভাবে পীড়িত করবেন না মিস গাঙ্গুলী। যে ভুল যে ভ্রান্তি পেছনে ফেলে এসেছেন তার দিকে ফিরে চাইতে গেলে সম্মুখের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হয়। তাতে জীবন হয় পঙ্গু। ভুলে যান, ওকথা ভুলে যান আপনি।

অতি কাতরস্বরে পিছন হইতে উত্তর আসিল—পারি নে, পারছি নে, বোধ হয় সে পারা যায় না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব মুখ ফিরাইতে দেখিল, অন্তরের উচ্ছ্বসিত বেদনার আবর্তে ছোট্ট নদীটির মতই সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নলিনী কাঁদিতেছিল। সঞ্জীব নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলস্বরে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ছি, কাঁদবেন না মিস গাঙ্গুলী, কাঁদবেন না।

নলিনী তবুও কাঁদিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—কিসের লজ্জা আপনার? কার চেয়ে ছোট আপনি? দয়া মায়া মনুষ্যত্ব সত্যনিষ্ঠায় আপনি তো কারও চেয়ে ছোট নন। উঠুন, উঠুন, কাঁদবেন না। নলিনীর হাত ধরিয়া সে একবার মৃদু আকর্ষণ করিল।

নলিনী বলিয়া উঠিল—না, না, না। আমায় একটু একা থাকতে দিন।

—দিদিমণি!

ডাক শুনিয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া রমা। তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল—কিছু বলছ রমা?

ত্রস্তভাবে দৃষ্টি নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে রমা বলিল—দিদিমণিকে ডাকছিলাম, তা থাক।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মুখ বাড়াইয়া নলিনী বলিল—আমায় ডাকছ রমা?

রমা তখন চলিয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—আমি যাই তা হলে। মনকে কিন্তু এমন ভাবে অনর্থক পীড়ন করবেন না। আমার অনুরোধ রইল।

সে চলিয়া গেল। নলিনী আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল—রমা! রমা!

দরজার পাশ হইতে রমা উঁকি মারিয়া বলিল—দাদাবাবু চলে গিয়েছেন দিদিমণি? আমি যাব?

এই মুহূর্তে অন্য কেহ এ কথা বলিলে নলিনী অপমান বোধ না করিয়া পারিত না। কিন্তু এই নির্বোধ মেয়েটার কথায় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। সে কহিল—হ্যাঁ চলে গেছেন তিনি। এস তুমি। কিছু বলছিলে আমায়?

ঘরের মধ্যে রমা প্রবেশ করিয়া বলিল—বিজয়া দেখতে যাবে না দিদিমণি? কাপড়চোপড় ছাড়!

নলিনী কহিল—না, ভাই, আমি যাব না। আমার শরীর খারাপ করেছে, তুমি বরং যাও।

রমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর একান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিল—তোমার ওই পুরানো কাপড় আর সেমিজটা আমি আজ পরব দিদিমণি? আমার কাপড়টা বড় মোটা। আর তোমার কাপড়ের পাড়টা কেমন ভাল!

নলিনী পরম স্নেহভরে স্বল্প হাস্যের সহিত ঘাড় দোলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

প্রবল উৎসাহে রমা বলিয়া উঠিল—নেব দিদিমণি ?

হাসিয়া নলিনী স্পষ্টাক্ষরে সম্মতি দিল—নাও। তোমায় দিলাম ও-গুলো।

চঞ্চলা বালিকার মতই লঘুপদে রমা চলিয়া গেল। ওই চঞ্চল গতির স্পর্শ ছোঁয়াচের মত যেন নলিনীর মনে রঙ ধরাইয়া দিল। সে চাহিয়া রহিল রমার ওই চঞ্চল-গতি-চিহ্নিত গমন-পথটির দিকে, মৃদু হাসির রেশটুকু মুখে তার লাগিয়াই ছিল। কতক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের খোলা জানালার দিকে সে চাহিল। সে ভাবিতেছিল—সে কেন রমা হইতে পারে না ? অপরাধ-বোধহীন এমন একটি অকুণ্ঠিত শিশুচিত্ত কেন তাহার নয় ? মনশ্চক্ষুর কেন এমন একটি অকলঙ্ক শুভ্র দৃষ্টি তাহার নাই ? রমার দৃষ্টিতে তাহার গাঙ্গুলী কাকা ভাল মানুষ, মহেন্দ্রবাবুকেও সে ভাল লোক ভাবে।

অকস্মাৎ একটি কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—রমা ! রমা ! রমা !

হাসিমুখে রমা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমায় ডাকছ দিদিমণি ?

নলিনী দেখিল, তাহার কাপড় বদলানো হইয়া গিয়াছে—পরনে তাহার সেমিজ আর তাহারই মাদ্রাজী শাড়িখানা। অপটু হাতের বিন্যাসে সেমিজটা কুঁকড়াইয়া গিয়াছে। পরিধান করিবার অপকর্ষ ভঙ্গিতে কাপড়খানা শ্রীহীন ভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু রূপ যাহার আছে—পরিচ্ছদ বিন্যাসের শ্রীহীনতা তাহার শ্রীকে পীড়িত করিতে পারে না। এই বেশ-বিন্যাসেই তাহাকে মানাইয়াছে বড় চমৎকার।

নলিনী বলিল—আমার তখন মনে হয় নি রমা। তুমি সঞ্জীববাবুকে জিজ্ঞাসা করে তবে যেন বেরিও।

রমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন দিদিমণি ?

একটু বিরক্ত হইয়া নলিনী কহিল—এত ছেলেমানুষ তো তুমি নও, রমা ? জান তো—এটা হল মহেন্দ্রবাবুর রাজ্য ! তার বিপক্ষে যে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা না করে বেরিয়ে যদি কোন বিপদ ঘটে তখন কি হবে ?

রমা নীরবে চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—তুমি দাদা-বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দাও দিদিমণি।

কেন কে জানে, বেশ-বিন্যাসপরায়ণা রমাকে নলিনীর বড় ভাল লাগিতেছিল না।

নলিনী এবারও বিরক্তিভরে বলিল—কেন ? তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না ?

রমা মুখ নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—আমার বড় লজ্জা লাগছে দিদিমণি। তখন দাদাবাবু কি মনে করেছেন বল তো ?

—কখন ? এই ছন্নছাড়া মেয়েটির কথাবার্তার অর্থও যেন ছন্নছাড়া। সে অর্থ নলিনীর বোধগম্য হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—কখন ?

—যখন সেই তোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি এসে পড়লাম। রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুস্পষ্ট লজ্জার রেশ গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল।

কঠিন স্বরে তিরস্কার করিয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—ছি রমা, তুমি এত নীচ!

রমার মুখ ম্লান হইয়া গেল—সে সকরুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চেষ্টা করিল নলিনীর মুখের দিকে। কিন্তু পারিল না, অবশেষে নতমুখেই মন্থর পদক্ষেপে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আর কখনও বলব না দিদিমণি।

নলিনী একান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল—এই রমা! হায় রে হতভাগ্য মানুষ! পাপকে এড়াইবার পথ নাই—কোন পথ নাই! মনের কোন অন্ধকার কোণে সে লুকাইয়া থাকে, অকস্মাৎ সুযোগমত বীভৎস হাসি হাসিয়া মুখ তুলিয়া একদিন আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তা করিতে করিতে পক্ষ বিস্তার করিয়া মন চলিয়া যায় কত দূর-দূরান্তর। একসময় তাহার মনে হয় ইহার জন্য দায়ী মানুষ নিজে। শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের প্রবেশের গোপন পথ রচনা করিয়াছে সে-ই স্বয়ং! রমার বুকেও সে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে।

বাড়ির বাহির হইতে কে ডাকিতেছিল—সঞ্জীববাবু! সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব বাড়িতে ছিল না। মাথায় ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া মা দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ স্বর অপেক্ষা উচ্চকণ্ঠেই কহিলেন—কে?

—আমি মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী।

মা বলিলেন—সঞ্জীব তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফিরে আসুক, বলব তাকে আমি। কি দরকার আমায় বলে যেতে পার। এস না বাবা, ভেতরে এস।

লোকটি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—তিনি এলেই আসব বরং আমি, দেনাপাওনার ব্যাপার।

একটু হাসিয়া মা বলিলেন—দেনাপাওনার ব্যাপার হলে আমিই জানব ভাল। সে তো বাইরে বাইরে ফেরে, সে এসব জানেও না। কিসের দেনাপাওনা, কার সঙ্গে দেনাপাওনা?

—আজ্ঞে একখানা তমসুক আছে। বারো বছর হতে চলল উশুলের পর। তামাদী হবে, তাই বাবু পাঠালেন।

—কে? মহেন্দ্রবাবু? কিন্তু তার কাছে তো ঋণ আমরা কখনও করি নি।

মাথা চুলকাইয়া কর্মচারীটি জবাব দিল, আজ্ঞে দলিলখানা হচ্ছে এককড়ি গাঙ্গুলীর। সে বাবুকে দলিলখানা বিক্রি করেছে। প্রায় পাঁচশো টাকা বাকি দাঁড়াচ্ছে।

এই সময়ে এদিকের দরজা দিয়া সঞ্জীব প্রবেশ করিয়া কহিল—বেশ যা হোক তুমি, মা। সমস্ত ঠাকুরবাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান। বাবুর কর্মচারীটিকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—কি ব্যাপার মা? আপনি যে এ সময়ে ঘোষ মশায়?

ঘোষ মশায় বলিল—বাবু পাঠালেন আপনার কাছে। এককড়ি গাঙ্গুলীর একখানা বন্ধকী দলিল তিনি কিনেছেন। সেখানা তামাদীর মুখে। তাই খবর দিয়ে পাঠালেন

তিনি। আপনার বাবার সম্পাদন করা তমস্থক, আপনি জানেন বোধ হয়।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সঞ্জীব উত্তর করিল—বাবা সে ঋণ শোধ করেছেন বলেই আমাদের ধারণা। তবে যদি সত্যিই পাওনা থাকে তবে নিশ্চয় শোধ দেব আমি। বাবার ঋণ কখনও রাখব না।

বাধা দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—তুই চুপ কর সঞ্জীব। শোন গো বাছা, তোমার বাবুকে গিয়ে বলবে সে দলিলের টাকা সঞ্জীবের বাপ শোধ দিয়ে গেছেন। পঁচিশ টাকা বোধ হয় বাকি ছিল কিন্তু সে টাকা রফা পাওয়ার কথা ছিল। গাঙ্গুলী আজ-কাল করে দলিলখানা ফেরত দেয় নি। ও টাকা আমাদের দেয় নয়—আমরা দেব না।

বাবুর কর্মচারী ঘোষ মশায় বিজ্ঞ হাস্যের সহিত বলিল—কিন্তু মা, দলিলে যখন বাকি রয়েছে, দলিলও যখন ফেরত হয় নি, তখন আদালতে গেলে যে আদায় হবেই, তখন আদালত খরচাও যে লাগবে।

মা এবার তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার সহিত বলিলেন—তাই দেব। পঁচিশ টাকার বাকিতে যদি পাঁচশো টাকা দিতেই রাজার হুকুম হয় তাও দেব। কিন্তু সে মীমাংসা না হলে এক পয়সাও দেব না। বল গিয়ে তোমার বাবুকে।

কর্মচারীটি সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সঞ্জীববাবু!

মা উত্তর দিলেন। বলিলেন—ও আর নতুন উত্তর কি দেবে বাবা? আমি থাকতে ও কে? ওই ওর উত্তর। এই কথাই তোমাদের বাবুকে গিয়ে জানাও তুমি।

লোকটি তবুও সঞ্জীবকে প্রশ্ন করিল—এই জবাবই কি ঠিক সঞ্জীববাবু? একটা আপোস করলে হত না?

মা বলিয়া উঠিলেন—দেখ বাবা, আজ বিজয়া-দশমীর দিন, আজ কাউকে রুক্ষ কথা বলতেও নেই—কারও কাছ থেকে শুনতেও নাই। যাও তুমি বাবা, যা বললাম তাই গিয়ে তুমি বল।

জমিদারের কর্মচারী আর বাস্তুঘুঘুতে বড় বেশী নাকি তফাত নাই। বাস্তুঘুঘু তাড়াইলেও যায় না, একটু সরিয়া গিয়া আবার গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ডাকে। ঘোষ মশায় এতটুকু বলাতে দমিবার পাত্র নয়, বেশ একটু মোলায়েম করিয়া সে বলিল, বললেই তো হয়ে গেল মা, হাতের তীর বেরিয়ে গেল। ঝগড়া বিবাদ বাধানো সোজা মা, মেটানোই কঠিন। তার চেয়ে একটা আপোস, সঞ্জীববাবু একবার গেলেই—

মা বলিলেন —জানি, কিন্তু সঞ্জীব যাবে না। তুমি যাও।

গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি বাড়িটা ব্যাপ্ত করিয়া যেন রন্ রন্ শব্দে বাজিতেছিল। ঘোষ মশায় আর অপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। ছোট একটা নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের বারান্দায় আহারের ঠাঁই করিয়া দিয়া মা বলিলেন—আয় খেয়ে নে সঞ্জীব। বিজয়ার সময় আর বেশী নেই।

আসনের উপর বসিয়া সঞ্জীব বলিল—একটা কথা ভেবে দেখবার আছে মা। তুমি ভেবে দেখো। মহেন্দ্রবাবুকে মোকদ্দমায় হারিয়ে জিততে পারা যাবে না। আপীলের পর আপীল করে আমাদের তিনি ধ্বংস করবেন। এটা হল ওঁার একটা অস্ত্র। এই করেই বহু লোকের সর্বনাশ তিনি করেছেন। অথচ মাথা উঁচু করে চলেন। উনি হারেন কোন্‌খানে জান মা—যেখানে লোক ওঁর মিথ্যে-অন্যায় দাবী জেনেও টাকা ফেলে দিয়ে আসে সেখানে। সেখানে উনি মাথা হেঁট করে টাকা কুড়িয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করেই থাকেন—আর মাথা তুলতে পারেন না।

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন - না।

সঞ্জীব বলিল—তা ছাড়া পঁচিশ টাকা তো বাকি ছিল। রফার কথা সত্যি কিনা কে বলবে ? বাবাকে ঋণী করে রাখা—

বাধা দিয়া মা কহিলেন—তার পাপ তোকে স্পর্শ করবে না সঞ্জীব—সে পাপ আমার।

সঞ্জীব আর কোন কথা কহিল না। নিশ্চিন্ত হইয়া নীরবে সে আহার করিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন—নলিনীকে তুই কলকাতায় রেখে আয়। আমাদের যা হয় হবে—কিন্তু আশ্রয় যখন দিয়েছি—তখন বিপদের আঁচ যেন ওদের গায়ে না লাগে।

পরদিন সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

রমার সম্পর্কে কি করা হইবে বহুক্ষণ চিন্তার পর নলিনী বলিয়াছিল—রমাকে আমি নিয়ে যাই সঞ্জীববাবু। ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি নার্স করে তুলতে পারি তাহলে ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সঞ্জীব উল্লসিত আগ্রহে বলিয়াছিল—এই, এই কথাটাই যেন আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম মিস গাঙ্গুলী। তাই হোক—এর চেয়ে ভাল কিছু ওর পক্ষে হতে পারে না।

ট্রেনে চড়িয়া সঞ্জীব ও নলিনী তর্ক-বিতর্কে কামরাখানা যেন মাতাইয়া তুলিল। সুবিধাও হইয়াছিল বেশ—তাহারা তিনটি প্রাণী ব্যতীত অপর কেহ সে গাড়িতে ছিল না। রমা এক কোণে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে উল্কাবেগে। সম্মুখ হইতে গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া আসে আবার পিছনে পড়িয়া যায়। প্রতি গ্রামখানিকেই রমার মনে হয় ওই আমাদের গ্রাম। ক্রমশঃ দেশের রূপ পরিবর্তিত হইতেছিল। এবার গ্রামগুলি আরও নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন—মৃত্তিকার রঙ কালো। সে গেরুয়া মাটির দেশ আর নাই।

এদিকে সঞ্জীব তখন বলিতেছিল—আর নয় মিস গাঙ্গুলী, বর্ধমান এগিয়ে আসছে। চিৎকার করে ক্ষিধেকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। এতেই পকেট অনেক খালি হয়ে যাবে।

নলিনী বলিল—যে আপনার খাওয়া! পাখিতেও বোধ হয় আপনার চাইতে বেশী খায়।

সঞ্জীব হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—হয়েছে। খাওয়া নিয়ে বাড়িতে দিবারাত্রি মায়ের গার্জেনীর ঠেলায় অস্থির। গাড়িতেও শেষকালে বান্ধবী গার্জেন হয়ে উঠলেন। আমার অদৃষ্ট!

নলিনীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—না, আপনাকে পারবার জো নেই। সকল কথাকেই আপনি হাসির ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

উচ্চ হাসির শব্দে রমা জানালা হইতে মুখ ফিরাইয়া এদিকে চাহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া আবার জানালার বাহিরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সঞ্জীব বলিল—না না, এমন করে বাইরে ঝুঁকে থেকো না রমা। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে। হয়তো লাইনের পাশের গাছপালার ডালে আঘাতও লাগতে পারে।

রমা একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, কিন্তু মুখ ফিরাইল না। মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে কি যে বলিল তাও বেশ বোঝা গেল না।

নলিনী তাহাকে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিল—দেশের জন্যে মন কেমন করছে রমা?

মৃদু হাসিয়া রমা বলিল—না।

—তবে, তবে এমন করে রয়েছ যে?

অতি মৃদুস্বরে রমা বলিল—তোমরা কথা কইছ—। আর সে বলিতে পারিল না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কি?

নলিনীর মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিল, সেও কথার কোন জবাব দিল না।

বিজয়া-দশমীর পরদিন কাছারীতে বসিয়া মহেন্দ্রবাবু পরামর্শ করিতেছিলেন সদরনায়েবের সঙ্গে। একটি জাল রচনার প্রণালী ও কৌশলই ছিল আলোচ্য বিষয়।

বাবু বলিলেন—দেখ, ওকে টাকা দিলে জলে পড়বে বলে আমার মনে হয় না। সে হ্যাণ্ডনোটেই হোক আর মর্টগেজেই হোক। প্রথমেই মর্টগেজে নিতে চাইলে ও এগুবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া বলিলেন—মানী লোক তো। মানের ভয়টা এ জগতের লোকের সব চেয়ে বেশী।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল।

বাবুই বলিতেছিলেন—এই সব ইডিয়েটদের কথা মনে হলে আমার হাসি পায় হরিচরণ। ধর্ম দেখায় এরা। আত্মানং সততং রক্ষেৎ—এই কথাটাই হল বাস্তব জগতের সব চেয়ে বড় ধর্মের কথা অথচ এটাকেই করে ওরা অবহেলা।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার বলিলেন—আমায় এরা বলে অধার্মিক পাপী, অথচ আমার ঐশ্বর্য সম্পদের ঈর্ষা করতে ছাড়ে না। আঙুর ফল টক গল্পটা খুব ঠিক, যাক, এক কাজ কর তুমি, কোনও থার্ড পার্টিকে দিয়ে ওর কাছে প্রস্তাব করে পাঠাও যে টাকা হ্যাণ্ডনোটেই দেওয়া হবে। সে-ই যেন অনুরোধ উপরোধ করে এটা করে দিচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক

হওয়া চাই। ওই সব লোকের মত ইডিয়ট ধর্মপরায়ণ গর্দভ হলে সব মাটি হবে।

নায়েব এতক্ষণে কথা কহিল। সে অতি মৃদুভাষী লোক। শ্রোতার যে কানটি তাহার দিকে থাকে সেই ভিন্ন অন্য কানে তাহার কথা যায় না।

সে বলিল—এতগুলো টাকা, একটু ভেবে দেখা উচিত। হ্যাণ্ডনোটে টাকা দেবেন, কিন্তু কাল যদি সে সম্পত্তি হস্তান্তর করে কি বেনামী করে ফেলে!

পেন্সিলের প্রান্তদেশটি ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু নীরব হইয়া রহিলেন। কপালের রেখাগুলি কুঁচকাইয়া চিন্তারেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন, না। তারপর বলিলেন স্পষ্ট ভাষায়, এ বুদ্ধি ওর হবে না। বললাম তো ও একটা গর্দভ।

মৃদু হাসিয়া নায়েব বলিল—একালে বুদ্ধি দেবার তো লোকের অভাব নেই। বুদ্ধি অপরে দেবে।

হাসিয়া বাবু বলিলেন—তুমি ছেলেমানুষ। বাস্তব সংসারের অভিজ্ঞতা এখনও হয় নি তোমার। আইনের কূটকৌশল যত কিছু, সবই তো আইনের বইয়েই আছে। সে-সব বই সব উকিলই পড়ে কিন্তু সবাই রাসবিহারী ঘোষ হয় না কেন? বুদ্ধি দিলেও সে নেবার ক্ষমতা ওর নেই।

নায়েব চুপ করিয়াই রহিল। স্বল্পভাষী লোক। তর্ক ভালবাসে না।

বাবু বলিলেন—এসব বুদ্ধি ওর কানে ঢুকবে কিন্তু মাথায় যাবে না। মন সায় দেবে না। বললাম তো ধর্মভীরু মানী লোক ওরা, প্রথমে ভাববেন ধর্ম, তারপর ভাববেন সুনামের কথা, তারপর হবে ভয়, কি জানি ফন্দী যদি না টেঁকে!

নায়েবের এসব মন্তব্য তবুও বেশ মনোমত হইল বলিয়া বোধ হইল না, কুণ্ঠিত ভাবেই সে বলিল—দেখুন যা আপনার ইচ্ছা হয়।

বাবু বলিলেন, পাশার ঘুঁটি আড়ি না দিয়ে গেলে উপায় নাই। আড়ি দিয়েও মার খায়, আক্ষেপ করে না। কিন্তু পার হয়ে গেলে ষোল আনাই লাভ। দাঁও ওকে, হ্যাণ্ডনোটেই ওকে টাকা দাও। এক বছর পরে তুমি মর্টগেজ আমার কাছে করে নিয়ো।

তারপর আবার ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া বলিলেন—লোক চেনার ক্ষমতা তোমাদের হয় নি এখনও। ওরা সব বড় মজার লোক। মরাল অব্লিগেশনের দড়ি একবার পরাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সে দড়ি ওরা কখনও ছিঁড়বে না, ছিঁড়তে চেষ্টা পর্যন্ত করবে না, ভাববে লোহার শিকল। হাঁসের মত, জান তো হাঁসের ঘরে দড়ি ফেলে দিলে হাঁসগুলো ভয়েই মরে যায়, দড়িটাকে সাপ ভেবে।

নায়েব এবার বলিল—তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি।

—হ্যাঁ। মৌজা বনমালীপুর আমার চাই। ঘর থেকে বেরিয়েই পরের সীমানায় পা দিতে হয়। আর লাভও, মৌজাটাও ভাল। যে কোন উপায়ে—কে? কি বলছ তুমি?

সঞ্জীবের উত্তর-বাহক ঘোষ মশায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে প্রণাম করিয়া বলিল—

আজ্ঞে সঞ্জীব মুখুজ্যের ওখানে গিয়েছিলাম আমি। সে বললে—

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু বলিলেন—পরে শুনব। এর চেয়ে ওটা জরুরী বিষয় নয়। যাও, ওঘরে আপনার জায়গায় গিয়ে বসে কাজ কর এখন।

ঘোষ মশায় চলিয়া গেল।

নায়েবের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া ঘোষ মশায়কে ডাকিলেন। বলিলেন—কি বললে সঞ্জীব? জ্ঞান হয়েছে একটু?

সঞ্জীব ও তাহার মায়ের কথাগুলি অলংকার দিয়া বর্ণনা করিয়া ঘোষ মশায় বলিল—আজ্ঞে ছেলের চেয়ে দেখলাম মায়ের তেজই বেশী।

মহেন্দ্রবাবু গুম হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—আচ্ছা যাও তুমি।

নায়েবকে বলিলেন—সঞ্জীবের নামে একটা আর্জি করে দাও।

নায়েব বলিল—ওর মা যা বলেছে সেটা একবার ভেবে দেখবার কথা। শেষ পর্যন্ত এতে ঠকতে হবে হুজুর।

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বাবু বলিলেন—হাইকোর্ট পর্যন্ত আপীল লড়তে সঞ্জীবের খড়ের চাল বিক্রি হবে না?

—তার চেয়ে একটা ক্রিমিনাল কেস করলেই বোধ হয় ঠিক হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে মহেন্দ্রবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিলেন।

এবার অতি মৃদু স্বরে কয়টি কথা তাঁহাকে বলিয়া নায়েব সহজ স্বরে বলিল—ওর বাপ-মা আত্মীয়স্বজন সবাই আমাদের পক্ষে রয়েছে। মেয়েটা হাতে আসে ভালই, নইলে ওকে মাইনর বলে চালিয়ে দিতে হবে। এ সেকসনে আর পার নাই। পাঁচ-ছ বছর নির্ঘাত।

বাবু আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে একটা লোক পাঠিয়ে দাও।

মনের উচ্ছ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন। খাস বৈঠকখানায় বসিয়া ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড খুলিয়া তাহার নীরস ধারাগুলির নাগপাশে বাঁধিয়া মনের উচ্ছ্বাসটুকু নিথর করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় সঞ্জীবকে পনের-ষোল দিন অপেক্ষা করিতে হইল। একটা মধ্যশ্রেণীর হোটেলে উঠিয়া নলিনীর জন্ত একটা বাসার সন্ধান করিতেই প্রথম আট-দশ দিন কাটিয়া গেল। বাসা তখনও ঠিক হয় নাই। সেদিন তখন কথা হইতেছিল বাসা লইয়াই।

নলিনী বলিল—বড় রাস্তার ওপরে হলেই ভাল হয়। প্রথম প্র্যাকটিসের মুখে আগে প্রয়োজন ডাক্তারের অস্তিত্বটা লোককে জানানো। খান-দুই ঘর, রান্নাঘর, কলঘর, বাথরুম এই হলেই যথেষ্ট আমার পক্ষে। বাসার খরচ চালানো তো বড় সোজা কথা হবে না। একটু

হাসিয়া নলিনী আবার বলিল—আর চাকরি নয় সঞ্জীববাবু। কষ্ট অবশ্য কিছু হবে। কিন্তু পুরুষের তাঁবেদারী করার চেয়ে সে কষ্ট অনেক সহনীয়।

সঞ্জীব বলিল—চাকরি করলেই যে পুরুষের তাঁবেদারী করতে হবে, এর কোন মানে নেই মিস গাঙ্গুলী।

তেমনি হাসিয়া নলিনী বলিল—আছে বৈকি সঞ্জীববাবু। সমস্ত পৃথিবীটারই যে এখনও ষোল-আনার মালিক আপনারা। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে যে দেশ যতই চিৎকার করুক, সকল দেশেই স্ত্রী-স্বাধীনতা আসলে একটি শূন্যগর্ভ পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইরে দেখাবার জন্য মঙ্গল-কলসের মত শৌখীন পাত্রই একটা তৈরী হয়েছে, কিন্তু অন্তঃসার-শূন্য। তাই চিৎকারটাও খুব প্রবল আর উচ্চ। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিন—সব দেশেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক হল পুরুষ। অবশ্য এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। কারণ তারা স্ত্রীলোকের চেয়ে বলশালী।

সঞ্জীব বলিল—বলপ্রয়োগ করাটাই যে নীতিবিগর্হিত হয়ে উঠছে দিন দিন, মিস গাঙ্গুলী।

হাসিয়া নলিনী বলিল—ও-কথার কোন অর্থ হয় না সঞ্জীববাবু। পৃথিবীতে যদি নীতি প্রচার হয় যে লোভের মূল হল দৃষ্টি, অতএব সবাই চোখ বন্ধ করে থাক, সেটা যেমন অসম্ভব এটাও ঠিক তাই। দৃষ্টিশক্তি থাকতে অন্ধ হওয়ার কল্পনা যেমন হাস্যকর, বল থাকতে সে বলপ্রয়োগ করবে না, এ কল্পনাও ঠিক তাই। না, চাকরি আর নয়। আমাদের দেশে প্রভুর সেবা করতে হয় আবার সর্বভাবে।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আপনি যে রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলেন। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষদের সঙ্গে যদি নারীর কখনও যুদ্ধ হয়, তবে আপনিই বোধ হয় হবেন বিদ্রোহের ধ্বজা-বাহিনী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল, কি যেন সে ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—পুরুষ জাতটাকে আমি ঘৃণা করি না সঞ্জীববাবু। তাকে প্রভু বলে নারীকে মানতেই হবে। তাকে মানতে চাই আমি পিতারূপে—স্বামীরূপে, পরিণত বয়সে সন্তান-রূপে। প্রতিপালক প্রভুরূপে তাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি—ভয় করি। বন্ধুরূপেও তাকে আমি পেতে চাই না। বন্ধুত্বের আবরণের মধ্যেও পুরুষ নারীর অজ্ঞাত শত্রু।

সঞ্জীবের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল—মিস গাঙ্গুলী, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এ আলোচনা এখন থাক।

সেই গাঢ়স্বরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অকম্পিত দৃষ্টি মেলিয়া নলিনী বলিয়া গেল—সাপের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের মত এ বন্ধুত্ব ভয়ানক। সাপও পোষ মানে না—মানা সম্ভব হয় না; কিন্তু কি করবে সে, তার বিষদাঁতের জন্য তো সে দায়ী নয়। বন্ধুত্বের বিনিময় করতে গিয়ে সে বিষদাঁত একদিন-না-একদিন মানুষের দেহে বিঁধে যায়। নারী-পুরুষেরও তাই, সঞ্জীববাবু। অসতর্ক মুহূর্তে ব্যবধান ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেই সে পুরুষের বন্ধুত্ব হয়ে দাঁড়ায় উন্মত্ত মোহ। নারীরও বুকে বিষ আছে, কিন্তু সে বিষ নীলকণ্ঠের মত গোপন করে রাখে তারা। মোহে

নারীর উন্মত্ততা আসে না, সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। নলিনীর রূঢ় বাক্যে সে আঘাত পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে নাই। নির্যাতিতা মেয়েটির বুকের অসহনীয় বেদনার জন্য তার করুণার আর অন্ত ছিল না। ঘরের মধ্যে নলিনী একাই বসিয়া রহিল। নির্জনতার অবকাশের মধ্যে আছে একটি উচ্ছ্বাস প্রকাশের মোহ।

নলিনীর ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আয়ত চোখ দুইটির কূল ভরিয়া অশ্রু টলমল করিতেছিল।

রমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশভূষায় একটি বিশেষত্ব ছিল। মাথার এলানো চুলগুলি রুক্ষ ধূসর সৌন্দর্যে মেঘের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেহের তৈলমসৃণ সুগৌর বর্ণ মসৃণতাহীন উগ্রতায় ঈষৎ রক্তিম।

নলিনী তখনও আপনার কথাটা ভাবিতেছিল। সে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।

রমাই সলজ্জভাবে হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চুলে বড় আঠা ধরেছিল, তাই সাবান দিলাম আজ। কিন্তু মুখ-হাত যে বড় জ্বলছে দিদিমণি।

কোলের আঁচলে চোখের জলের লজ্জাটুকু মুছিয়া লইয়া সে বলিল—ওই দেখ টেবিলের ওপর স্নো রয়েছে, একটু মেখে ফেল। দেখেছিস বোধ হয় আমি মুখে মাখি, হ্যাঁ, ওইটে।

ঘণ্টা-দুয়েক পরে সঞ্জীব আসিয়া বলিল—একটা সুসংবাদ আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিল—আপনি মঙ্গলের অগ্রদূত, সঞ্জীববাবু। মঙ্গল আপনার অনুসরণ করে, আর আপনাকে লঙ্ঘন করে যেতে হয় রাজ্যের অমঙ্গল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আজ এত বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন কেন বলুন তো? রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদে' পড়েছিলাম অ্যাসিডিটি বেশী হলে এই রকম লক্ষণ দেখা দেয়। ওষুধও তিনি বাতলেছেন, বাইকার্বোনেট অফ সোডা। তাই বরং একটু খেয়ে দেখুন।

হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নলিনী বলিল—মহাকবির চরণে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁর প্রেসক্রিপসন মত ওষুধ আমি খেতে পারব না। উচ্ছ্বাস আসে বৈকি সঞ্জীববাবু। সত্য যে সুন্দর, সুন্দরই আনে মোহ, আর মুগ্ধ অন্তরই হল উচ্ছ্বাসের উৎপত্তিস্থল। মিথ্যা তো বলি নি আমি, অসীম পৃথিবীর জন্য বিরাট মঙ্গল আপনি আনতে পারেন না, সে শক্তি আপনার নাই। সমগ্র দেশও তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দু-দশটি মানুষের মঙ্গল সেও তো সংসারে দুর্লভ, সেই বা ক'জনে—

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—শুনুন শুনুন, আমার সংবাদটা শুনুন আগে। একটি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। কথায় কথায় তিনি বললেন, তাঁরা কজন বন্ধু মিলে একটা ডাক্তারখানা খুলেছেন। অনেকটা ডক্টর্‌স্ ব্যুরো গোছের ব্যাপার। আসল উদ্দেশ্য হল পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁরা লেডি ডাক্তারের সাহায্যও নেবেন। আমি আপনার নাম করলাম, কিন্তু আপনার মত না নিয়ে কথা দিতে পারলাম না।

নলিনী বলিল—কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে, আমি যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার ভবিষ্যতের চিন্তার অর্ধেক ভার লাঘব করে দিলেন।

সঞ্জীব তেমনি লঘুভাবে বলিল—এখন একটা বাসা ঠিক করতে পারলেই, ব্যস, আমি খালাস। কি বলেন?

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। সে উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ব্যাঙ্কে যাবেন বলছিলেন না?

—হ্যাঁ যাব একবার। কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে আমার। পাসবইখানা আছে, চেক-বই নাই। চেক-বই একখানা নিয়ে আসব। আর টাকাও কিছু বার করতে হবে।

—বেশ, আপনি তৈরি হয়ে নিন তাহলে।

—আপনার পাওনার হিসেব একটা তৈরি করে দেবেন দয়া করে। কত টাকা হবে জানালে টাকাটা আনার সুবিধা হত।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস গাঙ্গুলী। এখন সে শোধ করবার দরকার নেই। সঞ্চয় যেটা আছে সে নষ্ট করবেন না। উপার্জন থেকে বরং ক্রমে ক্রমে শোধ করবেন।

মুখ ফিরাইয়া নলিনী বলিল—না। উপকারের ঋণ শোধ করবার অহঙ্কার আমার নেই সঞ্জীববাবু। আজীবন সে ঋণ আপনাদের কাছে আমার থাক। কিন্তু অর্থের ঋণ অতি হেয় জিনিস, সে আমি রাখতে চাই না।

এবার সঞ্জীব ঈষৎ ক্ষুব্ধ না হইয়া পারিল না। তবুও সে নীরব রহিল।

ঘরের বন্ধ দরজাটা ঠেলিয়া নলিনী বলিল—কে? রমা? কি করছিলে তুমি এখানে?

বিবর্ণ মুখে রমা কি বলিল বেশ বুঝা গেল না। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দিবার মত অবসর বা মনের অবস্থা নলিনীর ছিল না। সে কাপড় বদলাইতে ওঘরে চলিয়া গেল। কাপড়চোপড় পাল্টাইয়া বাহির হইবার মুখে রমাকে সে বলিল—আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। এ কি রমা, কাপড়ের নীচে সেমিজ পর নি, ছিঃ! সেমিজ পরে ফেল একটা। আর এ-ঘরে চাবি বন্ধ করে ও-ঘরে বসে থাক। সাবধানে থাকবে, বুঝলে? অন্য কোন ঘরে যাবে না।

রমা বলিল—আমার জন্য একটা স্নো আনবে দিদিমণি!

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে দেবতা বলে মানতে ইচ্ছা করে। যখন তিনি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি দেন তখন কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না।

সামান্য কতক কতক আসবাবপত্র কিনিয়া বাসাখানিকে বাসোপযোগী করিয়া বাসায় আসিয়া ওঠা হইল।

সঞ্জীব বলিল—গৃহপ্রবেশের দিন আপনার আজ। বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করুন। আমি হলাম ব্রাহ্মণ, ভোজন করে দক্ষিণা নিয়ে আশীর্বাদ করে বিদায় হব।

নতমুখে নলিনী বলিল—আমার হাতে ভাত খাবেন আপনি ?

তাহার মুখের উপর অকুণ্ঠিত পরিপূর্ণ দৃষ্টিখানি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব অভ্যাসমত হাসিয়াই উত্তর দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর হাস্যস্পর্শে লঘু নয়, গভীর আন্তরিকতায় মর্ম স্পর্শ করে সে স্বর। সে বলিল—আমরা কমরেড, মিস গাঙ্গুলী। আপনি আমার চেয়ে হীন নন, আমার চেয়ে অস্পৃশ্যা নন, পৃথিবীর সমতল বুকের উপর আমরা মানুষ।

উজ্জ্বল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সঞ্জীবের চোখে চোখ রাখিয়া নলিনী বলিল—অপরাধ যদি করি মার্জনা করবেন দয়া করে। আপনি কি বিপ্লববাদী ?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—না, আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ মিস গাঙ্গুলী। বিরাট দেশের দৈন্য-দুর্দশা দেখবার মত দৃষ্টি আমার নাই। আমি আমার পল্লীটুকুর মধ্যে কাজ করি। আর করি যারা চারদিক থেকে সমাজের সকল স্তরের চাপে পিষ্ট। পল্লীতে আমি নতুন রূপ দিতে চাই। তাতে যদি ভেঙে যায় পুরাতন, যাক ভেঙে। ভেদাভেদহীন মানুষের একটি বসতি—শ্রীময়ী শক্তিময়ী শান্তিময়ী পল্লী আমি গড়ে তুলব।

নলিনী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। কথা শেষ হইবার পরও সে কথা কহিতে পারিল না।

সঞ্জীবই আবার বলিল—প্রয়োজন হলে সাহায্যের প্রার্থনা করব মিস গাঙ্গুলী। আমার বিশ্বাস আপনার সাহায্য পাব।

নলিনী গাঢ় স্বরেই বলিল—আমার জীবন কৃতার্থ হবে সেদিন, সঞ্জীববাবু।

হাত বাড়াইয়া সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—হাতে হাত দিন, আমরা কমরেড।

নিঃসঙ্কোচে হাতে হাত দিয়া নলিনী বলিল—কমরেডের জন্যে কি রান্না করব বলুন! কমরেড কি খেতে ভালবাসেন ?

সঞ্জীব বলিল—ভাল রান্না হলে সবই আমার ভাল লাগে। তবে পাতের প্রথম দিকে যেগুলো থাকে সেইগুলোর ওপর আমার লোভ বেশী। কারণ শেষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পেট আসে ভরে। তখন সেগুলো আর ভাল লাগে না।

নলিনী হাসিয়া উঠিয়া গেল। পাশের ঘরটার দরজা ঠেলিয়া সে ডাকিল—রমা!

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া রমা কি করিতেছিল, নলিনীর কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

নলিনী দেখিল, সে তাহার কেশ প্রসাধনের সামগ্রীগুলি লইয়া আধুনিক রুচি অনুযায়ী কেশবিন্যাসের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। নলিনীর কিন্তু আজ রাগ হইল না। তাহার মন ছিল তুষ্ট, সে স্নেহসিক্ত স্বরেই বলিল—ও-বেলা ভাল করে চুল বেঁধে দেব তোমার। এখন এস তো ভাই, রান্নার বাটনাগুলো বেটে দেবে এস তো।

মাসখানেক পরে সেদিন অপরাহ্ণে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। মা বলিলেন—

আজ আবার ধোওয়া কাপড় ভাঙলি যে সঞ্জীব ? যে কাপড় পরছিলি সে তো তেমন ময়লা হয় নি !

সঞ্জীব বলিল—নিচের দিকটা রাঙা ধুলোয় লাল হয়ে গেছে মা। তা ছাড়া কাল সকালেই একবার কলকাতা যাব, তাই—

কথা শেষ না হইতেই মা বলিয়া উঠিলেন—এখন কলকাতা কি জন্যে আবার ?

ছেলে হাসিয়া বলিল—কোথাও যাব বললেই তোমার মাথা ধরে ! না মা ?

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—কাজটাই কি শুনি ?

—আমাদের কো-অপারেটিভ স্টোরের জিনিসপত্র আনতে হবে মা।

মা বলিলেন—এতদিন তো এই সদর শহর থেকেই জিনিসপত্র আসছিল। এখন আর কলকাতা না হলে চলছে না ?

ছেলে কহিল—তখন আমাদের পুঁজি ছিল কম, জিনিসপত্রও আসত কম। কলকাতা আসা-যাওয়ার খরচ পোষাত না। এখন আমাদের আয় বেড়েছে। কলকাতা গেলেই এখন সুবিধে হবে।

মা প্রশ্ন করিলেন—কবে ফিরবি ?

—পাঁচ-সাত দিনের বেশী হবে না বোধহয়।

—উঠবি কোথায় ?

—কোন বন্ধুর বাড়ি, কিম্বা কোন মেসে উঠব। ঠিক করি নি কিছু।

মা বলিলেন—অ।

তারপর ওঘরে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—চুলগুলো আজকাল কি ফ্যাশনে কাটাচ্ছিস রে ? একেবারে ঘাড়ের চামড়া বের করে—ছিঃ !

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা, সামনের দিকটা খানিকটা কেটে ফেলব কলকাতায়।

মা বলিলেন—চার আনা পয়সা দিয়ে ? তুই আজকাল বড় বাবু হয়ে উঠেছিস সঞ্জীব।

হাসিয়াই সঞ্জীব বলিল—চার পয়সাতেও চুল কাটা হয় মা সেখানে।

গম্ভীর ভাবে মা বলিলেন—চার পয়সা কিম্বা চার আনার জন্যই শুধু বলি নি আমি। সত্যিই তুই আজকাল বাবু হয়ে উঠেছিস। এ ভাল নয়।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব বলিল—বাবুগিরি তো কিছু করি নি মা। নিজেই নিজের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ পর পুনরায় বলিল—সত্যিই কি আমি বাবু হয়ে পড়েছি মা ? কিন্তু তুমিই তো আমায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য তিরস্কার করতে।

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর বিলাসিতায় পার্থক্য আছে বাবা। তারপর সস্নেহে আবার বলিলেন—ছেলেকে মা মানুষ করে তোলে কারিগরের হাতের পুতুলের মত। সে পুতুল যদি মনের মত না হয় সঞ্জীব, তবে আর আক্ষেপের সীমা থাকে না বাবা। মায়ের মনে হয় এর চেয়ে আমার মৃত্যু হল না কেন ?

সঞ্জীব নীরবেই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পর সে ডাকিল—মা!

মা আর সেখানে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন না। ঘরের মধ্যে তিনি আপনার কাজ করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতেই উত্তর দিলেন—কিছু বলছিস আমায়?

ঘরের দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিল—আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি মা?

সস্নেহ হাস্যে মায়ের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তুই আমার পাগল ছেলে রে! মা কি ছেলেকে উপদেশ দেয় না?

রাত্রে সঞ্জীব খাইতে বসিলে মা বলিলেন—মহেন্দ্রবাবু নালিশ করেছেন। বিকেলবেলা তুই বেড়াতে গেলে সমন জারী করে গেল।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—মামলা-মোকদ্দমার কিছুই জানি নে আমি মা। তুমিই এই ঝঞ্ঝাট টেনে আনলে, এ পোয়ানো আমার পক্ষে ভারী কঠিন হবে।

মা উত্তর দিলেন কঠিন স্বরে—তা তো হবেই বাবা! এতে তো আর দেশোদ্ধার হবে না!

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন—বেশ, আমিই যাব আদালতে। তোমার সংসারে এসে সুখ তো হল আমার ষোল আনা। এটুকুই বা বাকি থাকে কেন? এও হবে।

সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি বলি নি মা। আমি বলছি—আইনকানুন সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না।

রুষ্টভাবে মা বলিলেন—তুই মানুষ না জানোয়ার? মোকদ্দমার কিছুই জানি না বলে হাঁ করে চেয়ে রইলি যে! সবই কি লোকে মায়ের পেট থেকে শিখে আসে? কলকাতা যাবি তুই পরে। কালই তুই সদরে যা। সেখানে উকিল আছে, আইনের পরামর্শ দেবার জন্যই। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করতে হবে করে আয়।

সঞ্জীব বলিল—বাঃ রে! তুমি বলে না দিলে পথই বা আমি জানব কি করে?

অত্যন্ত কঠোর ভাবে মা বলিয়া উঠিলেন—ন্যাকামি করিস না সঞ্জীব। সব আমি সইতে পারি, ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না। বাবা, আসলে এ ব্যবস্থাটাই তোমার মনঃপূত হয় নি। নইলে আইন না জানার জন্যে কিছু যেত আসত না। আইন না জানলেও শেখা যায়। কই বাবা, নলিনীর জামীন হবার সময় তো আইন না জানায় কিছু যায়-আসে নি। মায়ের পরামর্শের দরকারও হয় নি। সেদিন তো আইনের ধারা নিজেই জেনে নিয়েছিলে।

নতমুখে সঞ্জীব বলিল—তাই হবে মা, কালই সদরে যাব।

মা বলিলেন—এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সঞ্জীব। নিজের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করতে পার, তবে পরের অধিকার রক্ষা করতে যাবে কোন্ সাহসে? আর আইন আদালত তো ছোট জিনিস নয় বাবা। যে কোন রাজ্যে বাস করতে গেলে সে রাজ্যের আইন যে না জানে তাকে বলি আমি মূর্খ।

সঞ্জীব বলিল—তা হলে উকিলকে কি ভাবে কি বলতে হবে সে সব বলে দাও আমায়,

আমি নোট করে নেব।

মা বলিলেন—রচনা করে শিখিয়ে দেবার তো কিছু নেই এতে। সত্য যা, উকিলকে তাই বলবে। সে-সবই তো জান তুমি। তবে মনোবিবাদ হেতুই যে মহেন্দ্রবাবু এ মোকদ্দমা করেছেন, সত্য হলেও এটুকু আমাদের না বলাই ভাল। তাতে তাঁর দুর্নাম রটবে, আর নলিনী-রমারও কলঙ্ক রটবে।

সঞ্জীব বলিল—সত্য যা ঘটেছে সেইগুলোই আমি লিখে নিতে চাচ্ছিলাম মা। যদি ভুলেই যাই কোনটা! লিখে নেওয়াটা ভাল।

—আচ্ছা, সেগুলো গুছিয়ে আমি লিখে দিচ্ছি। তুই তা হলে কাল এখানে ফিরে পরশু কলকাতায় যাবি।

—না মা। তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমি বরং ওই পথেই কলকাতায় চলে যাব। তোমায় চিঠিতে খবর দিয়ে যাব বরং।

হারান বাগ্দী এই সময় বাড়িতে প্রবেশ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া একটা হাঁড়ি নামাইয়া দিল। বলিল—খেজুরের গুড় আছে মা খানিকটে। দাদাবাবু বলেছিলেন কলকাতায় নিয়ে যাবেন।

সঞ্জীব বলিল—নলিনীকে দিয়ে আসব মা।

মা প্রশ্ন করিলেন—নলিনীর ঠিকানাটা কি রে? ওখানে চিঠি দিলেই তুই পাবি বোধহয়?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ মা, সেই ভাল হবে। দরকার হলে ওখানেই চিঠি দিয়ো তুমি। যেখানেই থাকি রোজ একবার খবর নেব নলিনীর বাসায়।

মহকুমায় উকিলের সাহায্যে মোকদ্দমার কাজকর্ম শেষ করিয়া সঞ্জীব কলকাতায় আসিয়া পৌঁছিল রাত্রে। উঠিয়াছিল সে ভবানীপুরে একটা মেসে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া অভ্যাসমত সে বেড়াইতে বাহির হইল। শীত সবে পড়িতেছে। বিলাসিনীর সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বসনের মত ক্ষীণ কুয়াশায় শহরের সর্বাঙ্গ আবৃত। অভ্যাস ও নিয়মমত দ্রুতপদে সঞ্জীব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়া পূর্বমুখে বড় গির্জাটার নিকট চৌরঙ্গীতে আসিয়া উঠিল। ট্রাম, বাস তখন চলিতে শুরু করিয়াছে। একখানা ট্রাম চলিতেছিল ধর্মতলার দিকে। রাস্তার জংশনের উপর ট্রামস্টপে ট্রামখানা বোধহয় সঞ্জীবকে দেখিয়াই থামিয়া গেল। অকস্মাৎ সঞ্জীব বিনা কারণে ট্রামখানায় উঠিয়া পড়িল। কণ্ডাক্টর আসিয়া টিকিটের জন্য দাঁড়াইতেই সঞ্জীবের সে কথাটা খেয়াল হইল। তাই তো, কোথায় যাইবে সে? পরক্ষণেই একটি সিকি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—শ্যামবাজার।

শ্যামবাজারে নলিনীর বাসায় আসিয়া ঘরের বাহির হইতেই সে বলিয়া উঠিল—সুপ্রভাত মিস গাঙ্গুলী।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল রমা। আড়ম্বরহীনা, একান্ত সঙ্কুচিতা সরলা পল্লীর সে মেয়েটি তো এ নয়। সযত্ন মার্জনায়, সুচারু প্রসাধনে শান্ত সৌন্দর্য তাহার উগ্র, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, দেহের বর্ণলাবণ্যে রক্তাভা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তৈলহীন চুলগুলি রেশমের মত কোমল ও চিকণ। সূক্ষ্ম সরলরেখার মত সিঁথি টানিয়া হালফ্যাশনে সযত্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত। হাতে দুগাছা চুড়ি।

রমা আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—দাদাবাবু! কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুপরিস্ফুট লজ্জার পরিচয়।

সঞ্জীবের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। এই সেই রমা!

মুখ নত করিয়া রমা আবার বলিল—বসুন দাদাবাবু। দিদিমণি স্নান করছেন। আসবেন এক্ষুনি।

এতক্ষণে সঞ্জীব বলিল—তোমায় আমি চিনতেই পারি নি রমা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলে আর চিনবার উপায় নাই তোমাকে।

রমা মুখ নত করিয়াই রহিল। কিন্তু তাহার অনাবৃত মুখের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, সেইটুকুরই রক্তাভ বর্ণ হইয়া উঠিল সুরক্তিম।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টমনে সঞ্জীব বলিল—এদিকে তো দেখতে-শুনতে শহুরে হয়েছ। কিন্তু কাজে-কর্মে কতদূর এগুলো পরীক্ষা দাও দেখি। চায়ের জল চড়িয়ে দাও। চা তৈরি করতে শিখেছ?

হাসিমুখে রমা বলিল—চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে এসেছি। চা তো এখন আমিই তৈরি করি।

—আর কি কি শিখলে বল! নার্সের কাজ শিখছ তো?

ঘাড় নাড়িয়া রমা বলিল—হ্যাঁ। থারমোমিটার দিতে পারি, দেখতে পারি। ফুটবাথ দিতে শিখেছি। মাথায় জলপটি দিতে পারি। এখন ফার্স্ট এড শিখছি, দাদাবাবু।

উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সঞ্জীব বলিল—বাঃ, বাঃ! এ যে অনেক শিখে ফেলেছ দেখছি। তারপরে লিখতে পড়তে শেখাও যে দরকার। সেটা আরম্ভ করেছ?

রমা বলিল—দিদিমণির কাছে পড়ছি—প্রথম ভাগ আরম্ভ করেছি। কালো জল, লাল ফুল পড়ছি এখন। ঐ যা—চায়ের জল পড়ে যাচ্ছে বোধহয়।

রান্নাঘরের দিক হইতে একটা সোঁ সোঁ শব্দ উঠিতেছিল।

রমা লঘুপদে বাহির হইয়া গেল। সে গতির মধ্যে তরঙ্গায়িত একটি ভঙ্গি আছে। সঞ্জীবের সেটুকু বড় ভাল লাগিল। পরম স্নেহভরে রমার গমনপথের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

—নমস্কার! সদ্যস্নাতা নলিনী ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল।

সঞ্জীব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—শুধু নমস্কার নয়, সুপ্রভাত কমরেড।

অপরাজিতার ফুলটি যেন মৃদু বাতাসে দুলিয়া উঠিল। লাজনম্র মৃদু হিল্লোলে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া শ্যামলা মেয়েটি হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—কমরেড! তারপর পাশের চেয়ারে বসিয়া সে বলিল—ভারী মন কেমন করে কিন্তু সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাদের বুঝি করে না মনে করেন? সত্যি মিস গাঙ্গুলী, এখান থেকে বাড়ি গিয়ে বাড়িটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকত। আপনি যখন ছিলেন তখন বাড়ির একটা নতুন শ্রী হয়েছিল। অভাবের মধ্যে প্রতিনিয়তই সেটা এখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

নলিনী পিছন ফিরিয়া কি যেন একটা দেখিয়া লইল। তারপর বলিল—মা ভাল আছেন সঞ্জীববাবু? তিনি আমার নাম করেন?

সঞ্জীব বলিল—অসংখ্যবার। বলেন, মেয়ে কি বউ নইলে সংসার মানায় না। নলিনী থেকে সেটা আমি বেশ বুঝেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিপদ। বলেন বিয়ে কর তুই। কি, ওটা কি কুড়োচ্ছেন আপনি?

নত হইয়া নলিনী কি একটা কুড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল। সে বলিল—একটা পায়রার পালক। ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সে বলিল—বিয়েতে নেমন্তন্ন করবেন তো আমাদের?

সঞ্জীব হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া সে বলিল—তপস্বী শিব আমাদের দেবতা, নলিনী দেবী। আমাদের দেবতার কোপানলে মদন হয়েছিল ছাই। প্রেমে আমাদের অধিকার নেই নলিনী দেবী। নিমন্ত্রণের আশা আপনার একান্ত দুরাশা বলেই মনে হয়।

নলিনী সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে ধীরভাবে বলিল—মদন ছাই হয়েছিল—কিন্তু অতনু অবিনাশী সঞ্জীববাবু। গৌরীর তপস্যা শিবের বরদান ইত্যাদি যত কৈফিয়তের দোহাই দিন আপনারা, অতনুর জয়-গৌরব তাতে ঢাকা পড়ে না। যাক ও-কথা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নারী জাতিকে এত তুচ্ছ মনে করেন কেন?

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—অবিচার করছেন আমার ওপর। নারী জাতিকে তুচ্ছ আমি মনে করি নে। না হলে আপনাকে কমরেড বলতাম না কখনও। নারী জাতিকে সহকর্মিণী বলে গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করি না, মিস গাঙ্গুলী। কিন্তু সহধর্মিণীরূপে কল্পনা করতে পারি না, তাতে আমার ভয় হয়। ভুজলতার বন্ধন শৃঙ্খলের চেয়ে কঠিন এবং দৃঢ়।

নলিনী এ কথার কোন উত্তর দিল না। নীরবে সে পালকটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

রমা ঘরে চা লইয়া প্রবেশ করিল। পরিপাটি শৃঙ্খলার সহিত কাপ দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল—ময়দা মেখে রেখেছি, লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে আসি। চলে যাবেন না দাদাবাবু।

চা পান করিতে করিতে নলিনী বলিল—ক'দিন ধরে আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

আপনার পরামর্শ না নিয়ে কিছু স্থির করতে পারি নি সঞ্জীববাবু। রমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন আপনি?

সঞ্জীব কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিয়া সে নলিনীর মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিল—বাইরের মত বোধ করি ওর মনেও একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন ওর দায়িত্ব নিতে আমার ভয় হচ্ছে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—না না, না মিস গাঙ্গুলী। একান্ত সরল ও।

নলিনী বলিল—সরলের চেয়েও বেশী, রমা বুদ্ধিহীনা। সেখানেই বিপদের ভয় বেশী। আপনাদের চেয়ে ওদিকে আমাদের দৃষ্টি অনেক প্রখর। এতদিন ও ছিল শিশু। এখন কিন্তু ওর ভেতরে ক্রমে ক্রমে মনের বয়স বাড়ছে। হয়তো দেহের বয়সের সঙ্গে মনও ওর এতদিনে সমবয়সী হয়েই উঠল।

সঞ্জীব চিন্তান্বিত ভাবে বলিল—প্রতিকারের কি করা যায় বলুন তো?

নলিনী বলিল—প্রতিকারের প্রকৃষ্ট পন্থা ছেড়ে দিয়েই আজ এ অবস্থা। বিধবা বিবাহ কি আপনি সমর্থন করেন সঞ্জীববাবু? সেই হবে এখন প্রকৃষ্ট উপায়।

সঞ্জীব আনন্দে বলিয়া উঠিল—সেই সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে ভাল মিস গাঙ্গুলী। এর চেয়ে ভাল সত্যি কিছু হতে পারে না। আহা-হা, এমন সুন্দর ফুলের মত মেয়েটি মা হয়ে সংসারে ধন্য হোক। ওর রূপের প্রতিবিম্ব পেয়ে পৃথিবীও সুন্দর হবে।

নলিনী কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে সে অকস্মাৎ উঠিয়া চায়ের পেয়ালা দুটি লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—পেয়ালা দুটো ধুয়ে ফেলা দরকার।

সঞ্জীব বলিল—আমিও তাহলে উঠি।

নলিনী তখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সঞ্জীব একটু আহত হইল। সে অনুভব করিল, নলিনীর অন্তরের মধ্যে কোথায় আছে যেন চোখে না ঠেকার মত অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণধার একটি কাঁটা। ব্যবহারের মধ্যে সুতীক্ষ্ণভাবে পর পর যেন সেটা বিঁধিতে থাকে। ফিরিবার পথে বার বার সে এই কথাটাই চিন্তা করিল। সে স্থির করিল অপ্রয়োজনে সে আর নলিনীর ওখানে যাইবে না।

সেদিন সকালেই নলিনী একটা কলে বাহির হইয়াছিল। ফিরিতে হইয়া গেল বারোটারও বেশী। রমাও সঙ্গে গিয়াছিল, সে পিছনে পিছনে ওষুধ ও যন্ত্রপাতির বাক্সটা হাতে করিয়া আসিতেছিল। ঘরের দরজাটা খুলিয়া ঘরে ঢুকতেই নলিনীর নজরে পড়িল একখানা খামের চিঠি।

কাহাকেও না পাইলে পিয়ন দরজার ফাঁক দিয়া এমনিভাবে চিঠিপত্র ভিতরে ফেলিয়া দিয়া যায়। চিঠিখানি সে কুড়াইয়া লইল। দেখিল তাহাকেই কে লিখিয়াছে। হস্তাক্ষর

পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। চিঠিখানি ছিঁড়িয়া প্রথমেই সে দেখিল লেখকের নাম। সেখানে লেখা ছিল—আশীর্বাদিকা, শুভার্থিনী 'সঞ্জীবের মা'। চিঠিখানা সে রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িয়া গেল।

"কল্যাণীয়াসু,

মা নলিনী, আমার অসংখ্য আশীর্বাদ জানিবে। আশা করি তুমি ও রমা কুশলেই আছ। তোমাকে আজ একটি বিশেষ গুরুতর বিষয় জানাইতেই এই পত্র লিখিতেছি। তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি ভুল বুঝিবে না। তোমরা আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মেয়ে। কিন্তু মা, সংসারের অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে আমাদের অনেক বেশী। মা, একটা বয়স আছে, যে বয়সে সম্বন্ধহীন স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আমরা ভাল মনে করি না। এমন ক্ষেত্রে বিপদও অধিকাংশ স্থলেই হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি সঞ্জীব ও তোমার মধ্যে বন্ধুত্বের জের আর না চলাই ভাল। তাহাতে তোমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমার ছেলেকে আমি জানি। সে কখনও তাহার সচেতন বুদ্ধিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না। কিন্তু মা, কোন তুচ্ছতম বস্তুই তো মানুষ জ্ঞাতসারে হারায় না। হারাইলে তাহাকে হারানো বলে না, বলে বিসর্জন দেওয়া। তাহা সে কখনও করিবে না। কিন্তু যদি অজ্ঞাতসারেই সে কোনদিন নিজেকে হারাইয়া ফেলে, তবে তাকে দোষ দিব কি করিয়া?

সঞ্জীবকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে যাওয়া আমার পক্ষে লজ্জার কথা। আর আকর্ষণ যদি ইতিমধ্যে প্রবলই হইয়া থাকে তবে মায়ের অবাধ্য হওয়া বা মিথ্যার আশ্রয় লওয়া যুবক পুত্রের পক্ষে বিচিত্র নয়।

একদিন সে তোমার উপকার করিয়াছে। আজ তাহার প্রতিদান আমি দাবী করি। তুমি তাহার পথ হইতে সরিয়া যাও। তুমি নিজেও তোমাদের সমাজের মধ্যে বিবাহ করিয়া সুখী হও এই আমার উপদেশ। আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও। ইতি"

নলিনীর পায়ের তলায় বসুন্ধরা যেন দুলিতেছিল। বিবর্ণমুখে শূন্য দৃষ্টিতে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখের সম্মুখে সব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু একটি মুখ—অবশ্য অগণ্য অসংখ্য হইয়া সারি সারি সে ভাসিয়া চলিয়াছে। নিস্পন্দ দেহের মধ্যে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল শুধু দুটি ঠোঁট, দুটি বায়ুতাড়িত বটপত্রের মত।

রমা লজ্জিত স্বরে ডাকিল—দিদিমণি!

সেই বিহ্বলতার মধ্যেই নলিনী উত্তর দিল—অ্যাঁ!

—কি হয়েছে দিদিমণি?

নলিনী উত্তর দিল না।

রমা আবার ডাকিল—দিদিমণি!

এবার নলিনী যেন সচকিত হইয়া উঠিল। কহিল—রমা! কিছু বলছ?

—কি হয়েছে দিদিমণি?

তখনও নলিনীর ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল। কোনরূপে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল—কিছু হয় নি রমা। তুমি রান্নাটা চড়িয়ে ফেল গিয়ে। আমার একটু কাজ আছে, সেরে ফেলি।

রমা চলিয়া গেলে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে যেন ভাঙিয়া পড়িল। তারপর সে যখন মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল, তখন সম্মুখের দেওয়ালের আয়নায় দেখিল তাহার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র এক হাসি। পত্রখানার অতর্কিত আঘাতে নিজের ক্ষণিক বিমূঢ়তার জন্য বার বার তাহার প্রতিবিম্বখানি ব্যঙ্গ হাস্যের তীক্ষ্ণ সায়কে তাহাকে যেন জর্জর করিয়া তুলিতেছিল।

ধূমকেতুর বিরহে পৃথিবীর শোক। এই সম্পূর্ণ সজাগ মুহূর্তে সঞ্জীবের সহিত জীবন-সূত্রে গ্রন্থি দেওয়ার কল্পনা যে কতবড় হাস্যকর তাহা ক্ষণপূর্বের অশ্রুসজল চোখের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আরও হাসি পাইল তাহার সেই পল্লীবাসিনী প্রৌঢ়ার আশঙ্কার কথা ভাবিয়া। কত মূল্য দেন তিনি তাঁহার এই স্বপ্নবিলাসী ভাবপ্রবণ অক্ষম সন্তানটির পরে।

যাক, উপকারের প্রত্যুপকার তাহাকে করিতে হইবে। স্বপ্নবিলাসের মধ্যে একখানা কাঁচকে সে রত্নের যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়াছিল। সেই অঞ্চলপ্রান্তটুকু কাটিয়া দিতে হইবে।

দোয়াত কাগজ কলম টানিয়া লইয়া সে পত্র লিখিতে বসিল।

আটটার সময় নলিনীর ডিসপেন্সারী যাইবার সময়। কিন্তু উত্তেজনাবশত গত রাত্রে নলিনীর ভাল ঘুম হয় নাই। প্রাতঃকালেই নিয়মমত স্নান সারিয়াও দেখিল শরীর তখনও যেন তেমন সুস্থ নয়। সে স্থির করিল, ডিসপেন্সারীতে আজ আর সে যাইবে না।

চিঠিখানি গতকালই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে সঞ্জীব পাইবে। তাহার মনে আবার ঐ চিন্তা আসিয়া পড়িল।

সঞ্জীবেরও কি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল তাহার উপর? না, তাহার অতি সাবধানী মায়ের কল্পনা এ? আবার তাহার ঠোঁটে দেখা দিল সেই হাসি। উঃ, কত বড় মূর্খের মত অন্ধ আবেগে ছুটিয়াছিল সে!

—নমস্কার মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী চমকিয়া উঠিল। দরজা ঠেলিয়া সঞ্জীব ভিতরে প্রবেশ করিল। মুহূর্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া নলিনী বলিল—আপনি?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। অবাঞ্ছিত অতিথিই বটে। আপনার পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি মর্যাদাহানি সহ্য ক তে পারি নে। সেইজন্য তার কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি।

নলিনীও মাথা তুলিল দৃপ্ত ভঙ্গিতে। তারপর ধীরে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল—বলুন!

সঞ্জীব বলিল—শুধুমাত্র যদি আপনি আমায় এখানে আসতে নিষেধ করে চিঠি লিখতেন তা হলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু কারণের উল্লেখ করে আপনি আমার মর্যাদায় আঘাত করেছেন।

আপনার সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই আমি সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম কমরেড-এর। কর্মের পাকে আর বিপাকেই বলুন আপনার সঙ্গে আমার দেখা।

নলিনী বাধা দিয়া বলিল—সে ঋণ, সে কৃতজ্ঞতা আমি অস্বীকার করি নে সঞ্জীববাবু। কিন্তু নারী-পুরুষের কমরেডশিপে আমার আস্থা নাই।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—এইখানে আপনি আমায় সব চেয়ে বড় অপমান করেছেন। আমার অন্তরের আন্তরিকতায় দোষারোপ করেছেন।

নলিনী বলিল—যদি করেই থাকি সঞ্জীববাবু, তবু সে মিথ্যা করি নি। আপনার মনের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। নইলে আমি চলে এলে আপনার বাড়ি অকস্মাৎ শ্রীহীন হয়ে উঠল কেন শুনি?

সঞ্জীব দৃঢ়ভাবে বলিল—আমার দুর্ভাগ্য যে আপনি স্ত্রীলোক। আপনি পুরুষ হলেও আপনার বিদায়ের পর আমার বাড়ি ঠিক এমনি শ্রীহীনই ঠেকত নলিনী দেবী।

নলিনী সহসা এত বড় অপমানজনক কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে ধীরে ধীরে বলিল—তাহলে তো আর আপনার মর্যাদাহানির কথাই উঠতে পারে না সঞ্জীববাবু। আমার নিক্ষিপ্ত বিষবাণ আমার বুকেই ফিরে এসে বিঁধল।

সঞ্জীব কথার উত্তর দিল না। মনে তাহার রুক্ষতার জন্য অনুতাপ দেখা দিয়াছিল।

নলিনী বলিল—আর পত্রেও তো আপনি আমার প্রতি আকৃষ্ট এমন কথা লিখি নি আমি। আমি লিখেছি—

আর সে বলিতে পারিল না। অবরুদ্ধ অশ্রুর পীড়নে রক্তিম মুখে সে অন্য দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিল।

অনুতাপে লজ্জায় সঞ্জীব আপনাকে এবার অপরাধী না ভাবিয়া পারিল না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নলিনীর হাত দুটি ধরিয়া বলিল—আমায় মাপ করুন নলিনী দেবী।

ধীর আকর্ষণে হাত দুইটি ছাড়াইয়া লইতে লইতে নলিনী বলিল—ছাড়ুন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া সে কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু সে বলা তাহার হইল না। তাহার পরিবর্তে রোষে ক্ষোভে রক্তিম হইয়া সে বলিয়া উঠিল—রমা!

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সঞ্জীব দেখিল, ও-ঘরের অর্ধোন্মুক্ত জানালার অন্তরালে জাগিয়া রহিয়াছে রমার মুখ। সমস্ত মুখে তাহার কে যেন সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছে। বিচিত্র একাগ্র দৃষ্টিতে সে এই দিকেই চাহিয়া ছিল।

নলিনী আবার ডাকিল—রমা!

রমা যেন সম্বিৎ পাইয়া সরিয়া গেল।

নলিনী দ্রুতপদে ও-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সঞ্জীব শুনিল নলিনী বলিতেছে—এত বড় নির্লজ্জ তুমি রমা! ছি, তোমায় আমি ভাল মনে করতাম!

নলিনী এ-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সঞ্জীবকে বলিল—ওকে কি আপনি আজই নিয়ে যাবেন?

সঞ্জীব বলিল—সে-কথার আলোচনাও করবার আছে মিস গাঙ্গুলী। ওর ভার আপনি নিন। দেখেশুনে বিয়ে দিন।

নলিনী হাতজোড় করিয়া বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। রমার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া ও এখানে থাকা মানেই আপনার আমার মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখা। সে-সূত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে ছিন্ন হয়ে যাক।

সঞ্জীব বলিল—তা হলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী। কাল এসে ওকে আমি নিয়ে যাব।

পরদিন গাড়িতে জিনিসপত্র তুলিয়া রমা ও সঞ্জীব গাড়িতে চড়িয়া বসিল। দুয়ারের সম্মুখেই নলিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সঞ্জীব হাস্যমুখেই বলিল—নিজেদের সমাজে বিবাহ করবেন লিখেছেন। কায়মনোবাক্যে কামনা করি আপনি সুখী হন। কিন্তু কমরেডকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলবেন না। আমরা ইতরজন, শুধু মিষ্টান্নের প্রত্যাশী।

নলিনী দুটি হাত জোড় করিয়া বলিল—কমরেড আর নয় সঞ্জীববাবু। ও সম্পর্কের আজ থেকে অবসান হোক।

সঞ্জীব বলিল—এর চেয়ে বড় কোন সম্পর্ক আপনার সঙ্গে যে ধারণা করতে পারি নে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী তখন আর সেখানে ছিল না।

সঞ্জীবদের গ্রামের স্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল বেলা পাঁচটায়। রমাকে সঙ্গে লইয়া সঞ্জীব বাড়ি আসিয়া ডাকিল—মা!

সম্মুখেই ঘরের মধ্যে চোখে চশমা দিয়া মা সেলাই করিতেছিলেন। ছেলের ডাকে তিনি মুখ তুলিলেন। মুখ তুলিয়া কিন্তু আর উত্তর দেওয়া তাঁহার হইল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখিতেছিলেন রমাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—রমা নয়!

মায়ের বিস্ময়ের হেতু সঞ্জীব বুঝিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ। সে রমা আর আর নেই মা!

গম্ভীরভাবে মা উত্তর দিলেন—তাই দেখছি। কিন্তু ওকে নিয়ে এলি যে! টেনে জঞ্জাল ঘাড়ে করা কি তোর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল সঞ্জীব?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে সঞ্জীব বলিল—নলিনী আর ওকে রাখতে চাইলেন না, মা।

—কেন?

একটু ইতস্তত করিয়া সঞ্জীব বলিল—সে অনেক কথা মা। মোট কথা তিনি আর আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। রমাও তো আমাদের লোক।

সঞ্জীব আবার বলিল—যতখানি যত্ন নলিনীর মধ্যে প্রত্যাশা করেছিলাম মা, তা তাঁর মধ্যে নেই। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে নলিনী।

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মানুষের চরিত্র কাচের মত জিনিস নয়, তাকে এক নজরে চেনা যায় না বাবা। কাজ দেখেও বিচার করা সম্ভব নয়। কাজের আড়ালে থাকে কারণ। সেই কারণ না জেনে বিচার করতে গেলে ঠকতে হয় বাবা।

সঞ্জীব এ কথায় কোন উত্তর দিল না। সে রমাকে বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন রমা? বস তুমি।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—হাত-পা ধুয়ে আসি আমি।

সে চলিয়া গেলে সঞ্জীব বলিল—ওর বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলাম মা। নলিনীও আমায় সেই কথাই বলছিলেন।

মা বলিলেন—হুঁ। কিন্তু এ কথাটায় কি তুই আমার সম্মতি পেতে আশা করিস সঞ্জীব?

—উচিত যা, তাই তোমার কাছে প্রত্যাশা করি মা।

দৃঢ়কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন—বিধবার বিয়ে আমার কাছে অধর্ম। উচিত অনুচিতের অনেক উপরে।

—তাহলে ওর্ কি ব্যবস্থা করব মা?

—যা তোমাদের খুশী। আমার মতের সঙ্গে এখানে তোমাদের মতের মিল হবে না। ওকে এখানে আনাই তোমার ভুল হয়েছে।

একটু চিন্তা করিয়া সঞ্জীব বলিল—সত্যিই কাজটা অবিবেচনার হয়ে গেছে মা। এখন উপায় এক তোমার আশ্রয়।

মা বলিয়া উঠিলেন—না সঞ্জীব, ওকে বাড়িতে আমি রাখতে পারব না। ওকে তুমি ওর বাপের ওখানে রেখে এস।

—সে যে ওর সর্বনাশ করা হবে মা!

অকস্মাৎ রুক্ষ হইয়া মা বলিলেন—দেশের লোকের সর্বনাশ দেখবার আমার কিছু কথা নেই সঞ্জীব; ও আগুনের খর্পর আমি বাড়িতে রাখতে পারব না।

সঞ্জীব এমন কথা তাহার মায়ের নিকট হইতে প্রত্যাশা করে নাই। মায়ের জন্য অন্তরে অন্তরে তাহার একটা অহঙ্কার ছিল। হোন তিনি কটুভাষিণী, কিন্তু সঞ্জীবের ভাল কাজে কখনও তিনি বিদ্রোহ করেন নাই। এমন কি আপন ধর্মাচরণের প্রবল নিষ্ঠা, সুকঠোর শুচিতা বিপন্ন হইলেও না। আজ তাঁহার কথায় সঞ্জীব একটু আঘাত পাইল। সে মায়ের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের গন্ধ পাইল। সে উত্তপ্ত স্বরেই বলিল—একটা দিন অপেক্ষা কর মা। কালই ওকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাব। কোথাও-না-কোথাও ওর স্থান হবেই।

মা বলিলেন—বেশ, তাই যেয়ো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্বর এত উগ্র হল কেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—তোমার ওপর অভিমান করবারও কি অধিকার নাই আমার, মা ?

মা উত্তর দিলেন, কিন্তু পূর্বের কণ্ঠস্বরে নয়। বিচিত্র এ কণ্ঠস্বর। বর্ষার পরিপূর্ণ নদীর মত মমতায় উচ্ছল বেগবতী, মুমূর্ষের অকপটোক্তির মত সকাতর মর্মস্পর্শী সে স্বর। তিনি বলিলেন—সঞ্জীব, সংসারে সকল মায়ের সব চেয়ে বড় কাম্য কি জানি নে বাবা। কিন্তু তোর মায়ের কাম্য শুধু তোর চরিত্র, তোর সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তা হলে যে মৃত্যু ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না বাবা।

দিনের উপর মৃত্যুর স্পর্শের মত রাত্রির ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। ম্লান সন্ধ্যালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ না দেখিলেও সঞ্জীব স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহার তেজস্বিনী মায়ের চোখে জল দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই বাড়ির বাহির হইতে কে ডাকিল—বাবাজী, রয়েছ নাকি বাড়িতে ? ওগো বাবাজী সঞ্জীব !

একটা হ্যারিকেন হাতে লইয়া সঞ্জীব বাহিরে আসিল। দেখিল বাহিরের দাওয়ার ওপর আলো হাতে দাঁড়াইয়া কড়ি গাঙ্গুলী। মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশ করিল সঞ্জীব।

এককড়ি গাঙ্গুলী বলিল—এলে কখন বাবা কলকাতা থেকে ? শরীর ভাল আছে ?

শুষ্কভাবেই সঞ্জীব বলিল—আজ বিকেলেই এসেছি। শরীরও বেশ ভালই আছে।

—বেশ, বেশ। তোমাদের ভাল হলেই আমাদের ভাল। তারপর তোমার সঙ্গে যে কথা ছিল বাবাজী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, একটা কিছু আন না বাবাজী, পেতে বসা যাক।

বাহিরের ঘর হইতে একখানা কম্বল আনিয়া সঞ্জীব অগত্যা বিছাইয়া দিল। গাঙ্গুলী তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল—বস বাবাজী, বস। উঃ শীতও আচ্ছা পড়েছে এবার। বুড়ো হাড় আমাদের কনকন করছে। তার ওপর বাতব্যাধি, কদিনই বা বাঁচব আর—হরিবোল হরিবোল।

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। এ-কথার উত্তরে বলিবার মত কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না।

গাঙ্গুলী বলিল—তারপর বাবাজী, রমা আমাদের বেশ ভাল আছে তো ? আহা বাবা, তোমার কৃপাতেই হতভাগিনীর একটা গতি হল।

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, ভালই আছে রমা। তাহার মনের মধ্যে আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন নির্লজ্জ পাষণ্ড যে মানুষ হইতে পারে এ ধারণা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। কড়ি গাঙ্গুলী তাহার অপরিচিত নয়, পাষণ্ড বলিয়াই তাহাকে সে জানিত। কিন্তু তবু তাহার ধারণা ছিল, কড়ি গাঙ্গুলী আর তাহার চোখে চোখ জুড়িতে পারিবে না।

গাঙ্গুলী বলিতেছিল—তাই তো বলি বাবা, আমাদের সব ছেলেগুলোকে, শিখবি যদি তবে আমাদের সঞ্জীবকে দেখে শেখ। বিত্তের গুণ দেখ। বর্ষার জলভরা মেঘ যেন, যেদিকে যাবে ছায়ায় জলে সব শীতল করে দিয়ে যাবে।

সঞ্জীবের মনের মধ্যে বিরক্তি ঘৃণা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়াও বাঁকা ভাবেই সে বলিয়া ফেলিল—আপনার স্নেহের কথা আমি ভাল করেই তো জানি গাঙ্গুলী কাকা।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাঁটুতে হাত দিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—গুরুর দিব্যি, ইষ্ট দেবতার দিব্যি। মিথ্যে বলি তো মাথায় বজ্রাঘাত হবে বাবা, এ কাজ আমার নয়। ওই পাষণ্ড আমাকে ঘরে ভরে বন্দুক দেখিয়ে দলিলখানা কেড়ে নিলে আমার কাছ থেকে।

সঞ্জীবের বিরক্তির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল।

গাঙ্গুলী আবার বলিল, যে জবাব তুমি দিয়েছ বাবাজী, বুঝেছ কি না, ওতেই কিস্তিমাৎ। ওর ঠেলা—

—বামুন কাকা!

গাঙ্গুলীর কথা অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া দরজার আলোকিত মধ্যস্থলে রমাকে দেখিয়া হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সবিস্ময়ে সে যেন প্রশ্নই করিল—রমা! রমা তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া গাঙ্গুলী কহিল—আহা-হা মা, চোখ জুড়োল তোকে দেখে। এমন হয়েছিস তুই, অ্যাঁ! একেই বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস।

রমা সলজ্জভাবে বলিল—আমাদের বাড়ির সব ভাল আছে কাকা?

—আর ভাল মা! তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে তোর মা নদী-গঙ্গা ভাসিয়ে দিলে। চারিদিকে খোঁজখবর করে কোন পাত্তা পাই না। কেউ বলে মরেছে। কেউ কিছু—তা একটা খবরও তো দিতে হয় বাপু। তারপর খবর পেলাম, সঞ্জীব দয়া করে তোকে কলকাতায় রেখে ডাক্তারী না কি শেখাচ্ছে।

রমা প্রশ্ন করল—খোকা ভাল আছে?

—হ্যাঁ। দিন .ত তোর নাম করে। বলব আমি তোর বাবাকে—হ্যাঁ, দেখে এস গিয়ে তোমার মেয়েকে। দেখে চক্ষু জুড়িয়ে এস।

সঞ্জীব বলিল—যাও এখন, ভেতরে যাও রমা।

কুণ্ঠিতভাবে রমা বলিল—যাই। কিন্তু তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিতর হইতে সঞ্জীবের মায়ের ডাক আসিল—রমা!

রমা আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। ভিতরে চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলী বলিল—একটা কথা বলছিলাম বাবাজী!

—বলুন।

—একটা মিটমাট করে ফেল বাবাজী। জান তো, দুষ্টকে দূরে হতে করি পরিহার!

সঞ্জীব বলিল—আমার শরীরটা বেশ ভাল নেই গাঙ্গুলী কাকা। আমি উঠছি। মাপ করবেন আমাকে। সে আলোটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—দাঁড়াও বাবা। হ্যারিকেন বদল হল কিনা দেখে নিই, দু মাস হল

কিনেছি—আমার আবার নতুন আলো!

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমারটা আরও নতুন। আজই কলকাতা থেকে এনে জ্বেলেছি।

তবুও গাঙ্গুলী আপন হ্যারিকেনটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া রাস্তায় নামিল। যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাবাজী!

সঞ্জীব তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভোরবেলায় সঞ্জীবের তখনও ঘুম ভাঙে নাই। মা ডাকিলেন—সঞ্জীব, সঞ্জীব!

সঞ্জীবের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উত্তর দিল—মা!

—উঠে আয় শীগগির।

গায়ের কাপড়টা জড়াইয়া লইয়া সঞ্জীব দরজা খুলিয়া বলিল—কি মা?

—বাড়ীর চারিদিকে পুলিস।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিল—পুলিস! পুলিস কেন মা?

মা বলিলেন—বলতে তো পারবো না বাবা। গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মে গণনা করে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ষড়যন্ত্রের কথা কোন শাস্ত্রমতেই তো জানা যায় না বাবা। দেখ তুই এগিয়ে দেখ।

বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিল—সম্মুখেই দাঁড়াইয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টরবাবু।

সঞ্জীবকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—নমস্কার সঞ্জীববাবু। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। বাড়ীটাও সার্চ করে দেখতে হবে।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—অপরাধটা কি শুনতে পাই না?

সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন—বলতে আমারও লজ্জা হচ্ছে সঞ্জীবাবু। অপরাধ আপনার দাঁড়াচ্ছে নারীহরণ। রমণদাসের নাবালিকা কন্যা রমা দাসীকে অসদভিপ্রায়ে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন—। সে কি আপনার বাড়ীতে আছে?

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আছে। রমা—রমা! মা, রমাকে পাঠিয়ে দাও তো।

রমা বাহিরে আসিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার পিতা রমণদাস তাহাকে দেখিয়া একটা কৃত্রিম ক্রন্দনে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সাব-ইন্সপেক্টর তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন—চুপ কর বেটা বদমাস চোর। তারপর সঞ্জীবকে বলিলেন—তাই তো সঞ্জীববাবু, শেষ পর্যন্ত আপনার মাকেও না জড়ায়!

সঞ্জীব বলিল—অপরাধ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি সাব-ইন্সপেক্টরবাবু। তারপর আবার বলিল—একটু অপেক্ষা করুন, আমি গায়ে জামাটা দিয়ে মাকে প্রণাম করে আসি।

সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন—তাই তো সঞ্জীববাবু, আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের যে সীমা দেখতে পাচ্ছি না। এমন একটা অপরাধ—

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—অপরাধ কারও নয় সাব-ইন্সপেক্টরবাবু, এ আমার স্বখাত সলিল।

মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সঞ্জীব ডাকিল—মা!

তেজস্বিনী মায়ের ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নীরবে তিনি ছেলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রব সংযত হইলেও রোদন বাঁধ মানিল না, দরদর ধারে দুই চোখ বাহিয়া সঞ্জীবের নতমস্তকে ঝরিয়া পড়িল।

দিন কয় পর।

সেই আয়না-ঘরের মধ্যে রমাও আজ আবার দাঁড়াইয়াছিল। রমা বাবুর বাড়িতে আসিয়াছে। সঞ্জীবের গ্রেপ্তারের পর সে বাড়ি গিয়াছিল। সমস্ত ঘটনা সে বুঝিয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ উদ্বেগ তাহার ছিল না। রমার মা বলিয়াছিল—খোকাবাবুকে মানুষ করবার জন্যে আবার তোকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন বাবুরা। দেখ, যাবি তুই?

মায়ের মুখের উপর চকিত একটি দৃষ্টি হানিয়া সে সলজ্জভাবে মুখ নত করিয়াছিল। মায়ের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিতের আভাস তাহার কাছে আজ অপ্রকাশ রহিল না।

বুকের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ঘন আবেগ গর্জনমান উতলা মেঘের মত মুখর হইয়া উঠিল। সে অনুভব করিল, বাহির পর্যন্ত তাহার সে গর্জনের প্রতিধ্বনিতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। হৃদ্‌স্পন্দন ঘনবেগে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিতেছিল।

চকিতে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল—সেই ঘর সেই দুয়ার। ঘরের মধ্যে চেয়ারের উপর যেন বাবু বসিয়া আছেন, টেবিলের উপর চায়ের কাপে সে যেন সলজ্জ নতমস্তকে চা ঢালিয়া দিতেছে। সে অনুভব করিল বাবুর সস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব অবয়বে আরতি করিয়া ফিরিতেছে। সলজ্জ পুলকে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল।

পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল—খোকাবাবুর সুকুমার ছবিখানি। খোকাবাবুকে কোলে লইয়া সে যেন মৃদুস্বরে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। অকস্মাৎ যেন বাবু আসিয়া গেলেন। অনাবৃত মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে গিয়াও যে দিতে পারা যায় না। দুষ্ট খোকা যে কাপড় চাপিয়া ধরিতেছে। বাবুর অধরে মৃদু হাস্যরেখা। সমস্ত দেহ তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দেহে রক্তধারা যেন উত্তাল তরঙ্গে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার মনে হইল—সেই আয়না-ঘরে বসিয়া সে যেন চুল বাঁধিতেছে। হাতের কাছে সজ-বাক্সার চিরুনিটা যে নাই। ঝি-কে ডাকিয়াও যে পাওয়া যায় না। ঝি-টা বড় অবাধ্য

হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে তিরস্কার করা দরকার। এ কল্পনায় মন তাহার ভরিয়া উঠিয়াছিল।

আজ আয়না-ঘরে দাঁড়াইয়া সেই সব ছবিগুলি আবার তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অধরে বিকশিত হইয়া উঠিল হাসির কুঁড়ি। উপরে দেওয়ালের গায়ে সেই ছবিগুলি। আজ রমা ভাল করিয়া ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। পুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ মেয়েটির মুখে কি বিচিত্র হাসি! রমার মুখ হইয়া উঠিল গাঢ় রক্তিম।

এপাশে আর একখানি ছবি। অর্ধনগ্ন একটি মেয়ে। তাহার এলানো চুলের কয়টা গোছা নগ্ন বুকের উপর ঘুমন্ত কালো সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়া আছে। বুকের কাপড় সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে আপন শুভ্র-সুন্দর বক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। ছবিখানি দেখিতে রমার বিমূঢ় মনে কি ইচ্ছা হইল কে জানে! সেও আপনার বক্ষবাস মুক্ত করিয়া নগ্ন বুকের দিকে চাহিয়া দেখিল। দর্পণে দর্পণে সেই প্রতিবিম্ব। রমা মুখ তুলিয়া দর্পণের দিকে চাহিতেই তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল সলজ্জ মৃদু হাসি।

অকস্মাৎ দরজা খোলার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে দশ-বারোটি পুরুষ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

রমা চিনিল—চারিদিকের দর্পণে বাবুর প্রতিবিম্ব। সলজ্জ ত্রস্তভাবে সে বক্ষাবরণ সুবিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই সে পুরুষের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

দর্পণে দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। রমা একসময় সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার কমনীয় হাত দুখানি কখন পুরুষটির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। লজ্জায় সে চোখ বুজিল।

নলিনী বজ্রহতার মত স্তম্ভিত নির্বাক হইয়া গেল, সঞ্জীবের প্রতি বিচারকের দণ্ডাদেশ শুনিয়া। পাঁচ বৎসরের কঠোর কারাবাসের আদেশ। সঞ্জীব যেমন স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। সঞ্জীবের তরফের উকিল নলিনীকে পত্র দিয়া আনাইয়াছিলেন। সঞ্জীবের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে সকলের চেয়ে বড় সাক্ষী সে-ই। লাঞ্ছনার তাহার সীমা রহিল না। আদালতের কঠোর বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান তাহার ছিল না। কাজেই এতখানি সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিপক্ষ হইতে সরকারী উকিল তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি মহেন্দ্রবাবুর উপপত্নী ছিলে? নলিনীর মুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। মাথা যেন তাহার আপনি নত হইয়া মাটির

বুকের মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। মনে হইল পৃথিবীর বায়ু যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে। উকিল ধমক দিলেন—চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও!

আপনাকে সংযত করিয়া নলিনী দৃপ্তভাবে মাথা তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু বাধা দিল সঞ্জীব। সে কোন কিছু উচ্চারণ করিবার পূর্বেই সঞ্জীব বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—মহামান্য বিচারকের কাছে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইয়াছিল সে রমার এজাহার শুনিয়া। সেই রমা—সুদীর্ঘ একটা মিথ্যা ইতিহাস সুচারুভাবে গুছাইয়া গুছাইয়া তোতাপাখির মত আওড়াইয়া গেল। এক চুল এদিক ওদিক করিল না। চকিতা হরিণীর মত সে এক-একবার সঞ্জীবের দিকে চাহিতে লাগিল। আর এক-একবার চাহিতেছিল সে, যেদিকে মহেন্দ্রবাবু বসিয়া ছিলেন সেইদিকে।

রায়ে বিচারক রমার সম্বন্ধে মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, আসামীর মত দৃঢ় চরিত্রের শিক্ষিত যুবককে এই জঘন্য অপরাধে অপরাধী বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, বাদিনী রমার মত একান্ত সরলা মেয়েটির বর্ণিত সকরুণ ইতিহাস অবিশ্বাস করাও তেমনি কঠিন।

এমনি করিয়া বিচারের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

নলিনী নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বিচারালয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। চেতনা হইল তাহার সঞ্জীবের ডাকে।

ডক হইতে বাহির হইয়া সঞ্জীব ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী!

নলিনীর চোখের জল আর বাঁধ মানিল না।

সঞ্জীব বলিল—যেটুকু অসম্মান আপনার হয়ে গেল তার ওপর আমার হাত ছিল না। আমায় মাফ করবেন।

নলিনী কোন কথা কহিল না। কহিল না নয়, কহিতে পারিল না। একটা শোকার্ত আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সঞ্জীব সেটুকু বুঝিল। সান্ত্বনা দিয়াই সে বলিল—হাসিমুখে উৎসাহ দিয়ে বিদায় দিন মিস গাঙ্গুলী। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পাথেয় চাই আমার। আপনাদের উৎসাহ—মায়ের আশীর্বাদ আমার সেই পাথেয়।

বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া নলিনী এতক্ষণে বলিল—এ কি করলেন আপনি? আমার লাঞ্ছনা নিবারণ করতে মিথ্যা দোষ আপনি স্বীকার করে নিলেন?

সঞ্জীব বলিল—দোষ স্বীকার না করলেও এ জাল থেকে উদ্ধারের আমার উপায় ছিল না। বড় সুকৌশলে জাল রচনা করেছিলেন মহেন্দ্রবাবু।

একটু নীরব থাকিয়া নলিনী বলিল—কিন্তু এরই নাম কি বিচার?

—ভুলকে এড়াবার পথ যে মানুষের নেই নলিনী দেবী। বিচারকও যে মানুষ। আর তাঁরই বা দোষ কি বলুন? মানুষ যতদিন মিথ্যা বলতে না ভুলবে, বিচারককেও ততদিন ভুল করতে হবে। তবু মানুষের মহত্ত্ব যে সে বিচার করবার চেষ্টা করে।

কনেস্টবল সঞ্জীবকে বলিল—চলিয়ে, চলিয়ে।

সঞ্জীব হাস্যমুখে বলিল—তাহলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিয়া উঠিল—মাকে কিছু বলবেন না?

সঞ্জীব চলিবার জন্য বিপরীত মুখে ঘুরিয়াছিল, সে আবার ফিরিল, ঠোঁট দুইটা এবার কাঁপিয়া উঠিল। চোখের বুকে বিন্দুর মত ছোট হইয়া আকাশের সূর্য তখন প্রতিবিম্বে ধরা দিয়াছে।

একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—না, কিছু বলব না। জেলের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার সে দাঁড়াইল।

নলিনী তাহার গমনপথের দিকেই চাহিয়াছিল, চোখে চোখ মিলিতেই সঞ্জীব বলিল—বলবেন, সঞ্জীব আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছে।

সঞ্জীবের বার্তা সে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু যাইবার মুখে পথে পা দিয়া সে অনুভব করিল—কি ভীষণ সে গুরুভার! তাহার বুক যে সে গুরুভারের পেষণে ভাঙিয়া যাইতেছে। মায়ের সম্মুখে এই বার্তা লইয়া দাঁড়াইবার কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠিল। সে তো জানে, কত আশা কত কল্পনা কত অহঙ্কার এই সন্তানটিকে লইয়া সেই তেজস্বিনী প্রৌঢ়ার। আবার তেমনি সুগভীর মমতায় অন্ধ তিনি। আজও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানটিকে শিশুর মত নিজের উপদেশে চালিত করার প্রবৃত্তি তাঁহার যায় নাই। না হইলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, শঙ্কা যায় না। নলিনীর ইচ্ছা হইল একখানা পত্রে সমস্ত জানাইয়া তাহার কর্তব্য শেষ করে। কিন্তু তাও সে পারিল না। দ্বিধার মধ্যে ট্রেনে চলিয়াছিল। অবশেষে পরের ট্রেনে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় সে সঞ্জীবের গ্রামে আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়া একান্ত একাকী সে সঞ্জীবের বাড়ির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া সে বাড়ি ঢুকিবে? বার বার তাহার মনে হইল, না আসিলেই সে ভাল করিত!

বাড়িখানা নিস্তব্ধ—যেন থম্‌থম্ করিতেছে। ম্লান সন্ধ্যালোক গৃহবেষ্টনীর মধ্যে গাঢ় অন্ধকারের রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নলিনী ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝ-আঙিনায় দাঁড়াইল।

কোথাও কোন সাড়া নাই। জনহীন নীরবতার মধ্যে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক নিস্তরঙ্গ প্রবাহের মত একটানা তীক্ষ্ণস্বরে অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। নলিনী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই। শুধু মাটির বুক হইতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘনাইয়া ঘনাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—অবরুদ্ধ প্রগাঢ় বেদনার মত।

সহসা তাহার মনে হইল, ও-পাশের মুক্তদ্বার ঘরখানার মেঝের উপর কে যেন পড়িয়া আছে। বুকখানা তাহার চমকিয়া উঠিল।

শঙ্কিত পদে অগ্রসর হইয়া সে দেখিল, সত্যই তিনি মা। অনুচ্ছ্বসিত গভীর বেদনায় স্থিরভাবে মাটির বুকে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। স্পর্শ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে সকরুণ স্বরে ডাকিল—মা!

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা মুখ তুলিতে তুলিতে বলিলেন—কে?

উত্তর নলিনীর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে নীরবে আপনার উচ্ছ্বাস দমিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টায় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা মুখ তুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—নলিনী! এস মা বস। তারপর চারিদিকের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—উঃ, সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে! এখনও সন্ধ্যে জ্বালা হয় নি। তুমি একটু বস মা নলিনী। আমি সন্ধ্যেটা জ্বেলে ইষ্ট স্মরণ করে নিই।

নলিনী বিমূঢ়ার মত বসিয়া রহিল। সে শুধু ভাবিতেছিল, মাকে সে সংবাদ দিবে কেমন করিয়া?

সমস্ত কর্তব্য শেষ করিয়া আলো হাতে মা আসিয়া বলিলেন—মুখে-হাতে জল দাও মা নলিনী। ট্রেনে এসেছ, কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি উনানটা ধরিয়ে ফেলি, তুমি চায়ের জল একটু চড়িয়ে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—না মা, চা আমি খাব না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন—আজ দু-মাস চায়ের সরঞ্জাম নামানো হয় নি আমার। আবার পাঁচ বছর পার না হলে আর নামানো হবে না। জান কি মা নলিনী, জেলে চা দেয় কিনা?

নলিনী নীরব হইয়া রহিল।

প্রদীপের আলোয় মা দেখিলেন, নলিনীর চোখের তলের মৃত্তিকা বিন্দু বিন্দু করিয়া ভিজিয়া উঠিতেছে। তিনি বলিলেন—কাঁদছ মা নলিনী! আমিও অনেক চেষ্টা করলাম কাঁদবার, কিন্তু কান্না এল না। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঊর্ধ্বমুখে শীত-শেষের গভীর নীল আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব হইলেন।

আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে শুক্রগ্রহ দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহার প্রভায় রাত্রির অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল। সেই প্রায়ান্ধকার আলোকের মধ্যেও সে অনুভব করিল, মায়ের প্রশান্ত মুখখানি বেদনার্ত গভীর উদাসীনতায় সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে, কৃষ্ণ-রাত্রির সমুদ্রের মত। আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি বলিলেন—হারাণ এসে আমায় খবর দিলে। আমি শুকনো চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম শুধু। মুখে কথা এল না, কান্না এল না। সে বোধ হয় আশ্চর্য হয়েই চলে গেল। তারপর এই এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সঞ্জীবের বাল্যকাল থেকে এ পর্যন্ত কত কথাই একে একে মনে করলাম। বুকের মধ্যে কান্না তোলপাড় করছে, কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ যেন পাচ্ছে না।

নলিনী ডাকিল—মা! তাহার শঙ্কা হইল মায়ের সংজ্ঞা বোধ হয় লোপ পাইতেছে।

মা বলিলেন—সঞ্জীব আমায় কিছু বলে যায় নি ? হারাণ বলছিল, যাবার সময় তোমার সঙ্গেই শুধু তার কথা হয়েছিল।

একান্ত অপরাধীর মত নলিনী বলিল—বলেছেন।

মা ধীরভাবে কথাটি শুনিবার অপেক্ষায় রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে নলিনী বলিল—বলেছেন, মা যেন আমার ফেরবার অপেক্ষায় বেঁচে থাকেন।

মায়ের চোখ দিয়া অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন—তার দোষ নেই। সে ভেবেছে এ আঘাত আমি সইতে না পেরে আত্মহত্যা করব। একথা যে কতবার বলেছি আমি তাকে! যেদিন সে গ্রেপ্তার হয় তার আগের দিন রাত্রেও একথা তাকে আমি বলেছিলাম, মা। বলেছিলাম, সঞ্জীব, সংসারে আমার সব-চেয়ে বড় কাম্য তোর চরিত্রের সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তবে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর পথ থাকবে না। নীরব হইয়া আবার তিনি কাঁদিলেন। তারপর বলিলেন—সেই মিথ্যের কালিই সেই বস্তুতে মাখিয়ে দিলে, তবুও আশ্চর্য এই নলিনী, কই, আমি তো মরবার কল্পনাও করতে পারছি না!

নলিনী বলিল—তিনি আপনাকে বেঁচে থাকতে বলে গেছেন মা।

মা বলিলেন—ভয় নেই মা, সে কল্পনা আমি করি নি। আঘাতের ভয়ে ধর্মকে লঙ্ঘন করতে আমি পারব না। আত্মহত্যা মহাপাপ। আর তার যে কথা সে-ও আমি হেলা করব না মা। বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব। তার দুঃখে আমি দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু সে আমায় দুঃখ দেয় নি, একথা তাকে বলবার জন্য আমি চেষ্টা করব।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মা সংসারের বন্দোবস্তে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিলেন। হারাণ বাগ্দীকে ডাকিয়া নানা বন্দোবস্তের কথা হইতে লাগিল। সঞ্জীবের পাশের গ্রামবাসী এক বন্ধুকে ডাকিয়া কি সব পরামর্শ হইল। নলিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। এ সংসারে শোভন বলিয়া একটা কথা আছে। তাহাকে নলিনী ভুল বুঝিল না, কিন্তু এই সময়ে সংসারের প্রতি এতটা গভীর অনুরাগ তাহার যেন কেমন মনে হইল।

দিন-দুই পরে সে বলিল—মা, আমি আজ যাব মনে করছি।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন—কাজের ক্ষতি যদি হয় তোমার, তবে মা বারণ করব না। কিন্তু যদি সে ভয় না থাকে, তাহলে কি আর চার-পাঁচটা দিন থেকে যেতে পার না?

যতই অসন্তোষ মনে থাক তাহার, অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। মৃদুস্বরে সে বলিল—তাই হবে।

মা বলিলেন—একা এই ঘরে থাকতে হবে ভাবতেও আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে মা। মনে হয় ঘর যেন আমায় গ্রাস করে ফেলবে। ভাবছি কোথাও চলে যাব।

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবেন মা?

—কাশী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। এ কয়দিনের অবিচারের জন্ম অন্তরে অন্তরে অপরাধ বোধ না করিয়া সে পারিল না।

মা বলিলেন—অবলম্বন ভিন্ন তো সংসারে বাস করা যায় না মা। একমাত্র অবলম্বন যখন বিশ্বনাথ আমাকে কোল-ছাড়া করে দিলেন, তখন তাঁকে ছাড়া আর কাকে অবলম্বন করব বল?

গাঢ়স্বরে নলিনী বলিল—দয়া করে আমায় সঙ্গে নেবেন মা?

মা মুখ তুলিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—যাবে? তারপর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন—আচ্ছা চল।

রমার জীবনে—তারপর?

তারপর উন্মত্ত ব্যভিচারের একটা সুদীর্ঘ বিচিত্র কাহিনী। রমা উন্মত্ত ভাবে বাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যৌবনের আকস্মিক জাগরণে সে চাহিয়াছিল আত্ম-সম্মানের জন্য পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনী, সংসার, সন্তান, জীবজগতে কৈশোর-অতিক্রান্ত নারীর কল্পনার বস্তু যাহা কিছু—সব। প্রেম সে বোঝে নাই। কাহাকেও পাইতে কামনা সে করে নাই। সে কামনা করিবার মত আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠতা তাহার ছিল না। সংসারের ঘটনার প্রবাহের মুখে যেখানে আসিয়া ঠেকিল, সেইটুকুকেই সে অবলম্বন করিল। সঞ্জীবের ছায়া তাহার অন্তরে পড়িতে পারে নাই। প্রখর সূর্যের কিরণদাহে শ্রান্ত-ক্লান্তের মত সসম্ভ্রমে ছায়ার আড়ালে আড়ালেই সে থাকিত। কোনদিন দীপ্ত সূর্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখ হইতে তাহার সাহস হয় নাই। মহেন্দ্রবাবুকেও যে সে কামনা করিয়াছিল তাও নয়। কর্মচক্রে যেদিন তাহাকে তাহার বাপ-মা শতমুখে তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলেন, সেদিন সে কিশোরী নববধূটির মতই আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া অচেনা অজানা একটি পুরুষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল। বিবেচনা করে নাই, বিচার করে নাই, করিয়াছিল শুধু বাপ-মায়ের কথার প্রতিধ্বনি, আপন ভাগ্যের প্রশংসা। এখানকার আদর লাঞ্ছনা সবই একান্ত আপনার বলিয়া সে গ্রহণ করিল। তাই মহেন্দ্রবাবু যখন একটি সুরচিত মিথ্যা কাহিনী তাহাকে পাখির মত পড়াইয়া গেলেন, তখন সে সত্যের দিকে তাকাইতে সাহস করে নাই। সভয়ে ক্লিষ্ট অন্তরেও সে পাখির মত সে কাহিনীটা আয়ত্ত করিল, আপত্তি করিতে পারিল না। শুধু একবার অভ্যাসমত ভীরু সরল চোখের চকিত দৃষ্টি তুলিল, কিন্তু পর মুহূর্তেই আপনা হইতেই সে দৃষ্টি নত হইয়া নিবদ্ধ হইল ধরিত্রীর বুকে।

অপরপক্ষে মহেন্দ্রবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব রাজ্যের সজাগ মানুষ। জীবনে আয়োজন করেন তিনি প্রয়োজনের জন্য। প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আয়োজন তাঁহার চক্ষে আবর্জনার সামিল। হয়তো সংসারের অধিকাংশ মানুষেরই তাই। কিন্তু এদিকে তাঁহার কঠোরতা

যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি সবল। বৎসর-তিনেক পর সেদিন তিনি কড়ি গাঙ্গুলীর সহিত কথা কহিতেছিলেন—কোন কষ্ট ওর হবে বলে আমি মনে করি নে গাঙ্গুলী। ঘর একখানা কিনে দিয়েছি। তার ওপর কিছু টাকাকড়ি হলেই দিন ওর বেশ চলে যাবে।

কথা হইতেছিল রমাকে বিদায় করিবার। এই অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই রমার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে। সে আজ রোগজীর্ণ।

গাঙ্গুলী বলিল—সেটা কি ঠিক হবে হুজুর? ও কি আর সমাজে ঠাঁই পাবে?

বাবু হাসিলেন। বলিলেন—শাসন করে দেব সমাজকে।

গাঙ্গুলী বলিল—কিন্তু ধর্ম বলেও তো ··

বাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। গাঙ্গুলীর কথা আর শেষ হইল না। বাবু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—তুমিও ধার্মিক হয়ে উঠলে গাঙ্গুলী! দোহাই তোমার, ভুল আইনের ভয় মত পার দেখাও, কিন্তু ধর্মের কাহিনী তুমি বলো না। তা হলে হয়তো বয়স আর আমার বাড়বে না। এই বয়সেই অমর হয়ে থাকতে হবে।

গাঙ্গুলীর মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না।

বাবু আবার বলিলেন—ধর্মাধর্মসমাযুক্ত লোভমোহসমাবৃত মানুষ আমরা গাঙ্গুলী। আমাদের এই ধর্ম। কায়মনোবাক্যে তাই পালন করি। এর বেশী কিছু ধর্ম বলে মানি না। পালন করতে প্রবৃত্তিও হয় না।

কথাগুলা গাঙ্গুলীর মাথায় হয়তো ঢুকিল না। সে নির্বোধের মত মাথা চুলকাইতে লাগিল।

মহেন্দ্রবাবু অকস্মাৎ উগ্র হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনাভরেই তিনি বলিয়া গেলেন—বলতে পার গাঙ্গুলী, একটা মানুষ বেশী জীব হত্যা করে, কী একটা বাঘ বেশী জীব হত্যা করে! মানুষ অবলীলাক্রমে অলস অবসরে টিপে টিপে পিঁপড়ে পতঙ্গ মেরে থাকে। আমি তো মেরে থাকি। পশুর ব্যভিচারের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, নিয়ম আছে, কিন্তু মানুষের ব্যভিচারের সময় নাই, নিয়ম নাই। হিংস্র পশু খায় শুধু রক্তমাংস, কিন্তু উদ্ভিদ পশু জলচর খেচর কীটপতঙ্গ মানুষের অখাদ্য কিছু নয়। ধর্মের দোহাই আমাকে দিয়ো না গাঙ্গুলী। এইগুলোই মানুষের ধর্ম—এই ধরেই মানুষ বেঁচে আছে আসলে।

গাঙ্গুলী একান্ত নির্বোধের মত বলিল—আজ্ঞে তা তো বটেই, তা তো বটেই।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—কথাগুলো তোমার হয়তো কানে গেল না। তা না যাক ক্ষতি বিশেষ নাই। থাক ও-কথা, তোমায় যা বললাম তাই ঠিক। রমার জবাব হয়ে গেল। ওকে তুমি নিয়ে যাও। যদি কখনও কিছু দরকার হয়, তুমি এসে জানিয়ো বা জানাতে বলো।

গাঙ্গুলী বলিল—আপনার বাড়িতে তো দশটা-বিশটা দাসী-বাঁদী রয়েছে। ও যদি এইখানেই—

দৃষ্টিটা একটু তুলিয়া বাবু বলিলেন—তোমার এত সঙ্কোচ হচ্ছে কেন বল তো?

গাঙ্গুলী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বোধ করি সেই চিন্তাই করিল। অবশেষে বলিল—কেমন যেন লজ্জা হচ্ছে আমার বাবু!

খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যে বাবু হাসিলেন। তারপর গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—না, তা হয় না এককড়ি। পুরাতন কাপড় বাক্সে তুলে রেখে পরিত্যাগ করা আমি পছন্দ করি নে। তুমি ওকে ডেকে বলে দাও। ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও বরং।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আমাকে মাপ করুন হুজুর।

বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

গাঙ্গুলী মিনতিভরে বলিল—হুজুর!

মহেন্দ্রবাবু অনুরোধের সুরে বলিলেন—তোমাকেই বলতে হবে গাঙ্গুলী। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

একা নির্জনতার অবকাশ পাইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড! বেটা মহা পাষণ্ড রে! কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। ক্ষেত্র এবং কাল সম্বন্ধে চেতনা তাহার মুহূর্তে ফিরিয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে দরজাটা অর্ধোন্মুক্ত করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মনের আক্ষেপ মিটাইয়া সকল কথা বলা তাহার হয় নাই, মৃদুস্বরে সে আবার আরম্ভ করিল—বলে পাপ নাকি বাপকে ছাড়ে না। তা এ কি পাপের কর্তাবাবা না কি রে বাপু! বিন্ধ্যগিরির মত বেটা বেড়েই চলেছে।

তারপর এদিকের দরজাটা ঠেলিয়া সে ডাকিল—কানাই! কানাই!

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—যাই।

গাঙ্গুলী আবার বলিয়া উঠিল—আর এ বেটাও কি জুটেছে রে বাবা! ধম্মরাজের চর্ বেহ্মদত্যি! পেভুভক্ত বটে বাবা!

কানাই আসিয়া বলিল—রমাকে ডেকে দিতে হবে নাকি?

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। তুই কাজটা সেরে দিলেই তো পারতিস। রমাকে বলে দিগে, ওর জবাব হয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে। কি আছে-টাছে গুছিয়ে নিয়ে আজই যেতে হবে আমার সঙ্গে। বুঝলি?

কানাই বলিল—যা বলবেন আপনিই বলুন। বাবু তো আপনাকেই বলতে বলে গেলেন। আমি ডেকে দিচ্ছি। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর রমা আসিয়া প্রবেশ করিল। সত্যই রমা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। সে লাবণ্য শুকাইয়া গিয়াছে। মাথায় সে ঘন কেশ-শোভা নাই। শীর্ণ মুখের মধ্যে এখনও জাগিয়া আছে সেই হরিণীর মত সরল ভীরু দুটি চোখ ও তাহার চাহনি।

রমা কহিল—আমায় ডাকছিলে বামুন কাকা?

গাঙ্গুলী শুধু বলিল—হুঁ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রমা বলিল—খোকার দুধ চড়িয়ে এসেছি আমি, বামুন কাকা।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আর নামাতে হবে না তোকে। তোর জবার হয়ে গেল।

রমা একদৃষ্টে গাঙ্গুলীর দিকে চাহিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী মাথা নত করিল। নতশিরেই সে বলিল—বাবু বলতে বলে গেলেন আমাকে। বুঝলি? চকিতের মত দৃষ্টি তুলিয়া গাঙ্গুলী দেখিল রমা এখনও তেমনি ভাবে চাহিয়া আছে। সে আবার বলিল—বুঝলি?

আবার গাঙ্গুলী চাহিয়া দেখিল, রমা এখনও তেমনি দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া আছে। তাহার আর সহ্য হইল না। সে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—ড্যাব ড্যাব করে গরুর মত চেয়ে আছে দেখ! আমি কি করব তা? চোখ নামা রে বাপু, চোখ নামা! বলি যা বললাম শুনলি তো? আজই আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখানে আর থাকা হবে না।

এতক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমা প্রশ্ন করিল—আমার জবাব হয়ে গেল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার সঙ্গেই যেতে হবে তোকে।

—চল।

গাঙ্গুলী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ভাল বিপদ রে বাবা! চল না—চল। একেবারে যেতে হবে। কি কি আছে তোর ভাল করে গুছিয়ে-টুছিয়ে নে, বুঝলি?

রমা বলিল—কিছু তো নিয়ে আসি নি আমি।

আরও দেড় বৎসর পর।

অরুণোদয়ের পরই বন্দীশালার দুয়ার উন্মুক্ত হইল। জীবনের নবপ্রভাতে সেদিনের কারামুক্ত কয়জন বন্দীর সহিত বাহির হইয়া আসিল সঞ্জীব, শীর্ণ দেহ, বিশৃঙ্খল দীর্ঘ রুক্ষ চুল, মুখের নিম্নাংশ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন। সুন্দর রঙ পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। যেন মরিচাধরা তীক্ষ্ণধার দীর্ঘফলা বিগতগৌরব তরবারি একখানি।

মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল—আঃ!

চারিদিকে দেখিতে দেখিতে সহসা সে বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—মিস গাঙ্গুলী!

দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ির নিকট আসিয়া ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী!

নলিনী গাড়িখানার পাশে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রত্যাশায় এদিকে ওদিকে চাহিতেছিল। কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া নলিনী যেন বেদনার্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে সকরুণ স্বরে শুধু বলিল—আপনি! সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, আমি। আপনি এমন হয়ে গেছেন? উঃ, যে শালার পরিশ্রম! কথাটা বলিয়াই সে যেন চকিত হইয়া উঠিল। বলিল—মাফ করবেন মিস গাঙ্গুলী। আজ সাড়ে চার বছর বাস করেছি জঘন্য ইতরমির মধ্যে। ভেতরে এতটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারি নি, সে রোগের বীজাণু আমার মধ্যেও প্রবেশ করেছে।

নলিনী বলিল—ওসব সাময়িক সঞ্জীববাবু।

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার তা মনে হয় না। বাইরে যেমন দেখছেন, সে মানুষের কঙ্কাল আমি, ভেতরেও ঠিক তাই। জীবনের যা-কিছু সঞ্চয় সমস্ত নিঃশেষে অপব্যয় করে রিক্ত হয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা আছে, চিত্ত নাই। বুকের মধ্যে রাশি রাশি বেদনা যেন রয়েছে, কিন্তু বোধশক্তি নাই। অনুভব করতে পারছি নে। আপনার সঙ্গে কথা কইছি, আমার ভয় হচ্ছে, সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে সংযত হয়ে কথা ভেবে বলতে হচ্ছে।

নলিনী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও সে বলিল—আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সঞ্জীববাবু। স্থির হোন আপনি।

সঞ্জীব জর্জর ব্যক্তির মত বলিয়া উঠিল—উত্তেজনা যে দুর্বলেরই ব্যাধি। মুক্ত স্বাধীন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আমার দেহমন কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু।

ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলিয়া উঠিল—আজ আমার সব চেয়ে বড় আশ্বাস কি জানেন? শুনলে ঘৃণা করবেন আমাকে। সব চেয়ে বড় আশ্বাস, মা আমার বেঁচে নেই। এই মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে আমায় দাঁড়াতে হবে না।

নলিনী শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সঞ্জীব বলিল—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?

নলিনী এতক্ষণে বলিল—আপনাকেই নিতে এসেছি কমরেড।

—কমরেড! সঞ্জীব একটু হাসিল।

নলিনী বলিল—গাড়িতে উঠে বসুন।

—গাড়িতে উঠতে হবে? ভাল। সঞ্জীব গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পিছনে পিছনে নলিনী গাড়িতে উঠিয়া ক্যোচম্যানকে বলিল—হোটেলে নিয়ে চল।

সঞ্জীব বলিল—আপনার কাছে ঋণের আমার শেষ নেই। আপনার নিয়মিত পত্রেই শেষের দিকটায় সান্ত্বনা পেয়েছি, আশ্বাস পেয়েছি। নইলে মায়ের সংবাদ না পেলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। আপনি তো বরাবর মায়ের কাছে ছিলেন। মা সে-কথা আমায় জানিয়েছিলেন।

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—আমার সৌভাগ্য সঞ্জীববাবু, তিনি আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন।

সঞ্জীব বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ দেব না। কৃতজ্ঞতার ঋণ ধন্যবাদে শোধ হয় না। কিন্তু কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে। মিথ্যে বলবেন না দয়া করে। মা কি আমার খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন?

নলিনীর চক্ষু সজীব হইয়া উঠিল। রুদ্ধস্বরে সে কহিল—এই কথা বলবার ভার মা আমায় দিয়ে গেছেন। তাঁর সমস্ত ভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

অসহিষ্ণু ভাবে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—তাঁর মৃত্যুর কথা বলুন আগে। কত কষ্ট—

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—সত্যিই আপনার অন্তরের বহু বিকৃতি ঘটেছে সঞ্জীববাবু। আপনার মাকেও আপনি স্মরণ করতে পারছেন না। কষ্ট কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারত

সঞ্জীববাবু? যেদিন আপনার কথাগুলো বয়ে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে, তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন আকাশের দিকে চেয়ে। সেদিন বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, তাঁর বক্তব্য আমার সঙ্গে ছিল না। ছিল উপরের সঙ্গে। তার পরদিন থেকেই কাশী যাবার উদ্যোগ আরম্ভ করলেন। বললেন—নলিনী, নিরবলম্বন হয়ে তো মানুষ থাকতে পারে না মা। আমি বিশ্বনাথকে অবলম্বন করতে কাশী যাব। আমার বহু ভাগ্য, আমায়—দয়া করে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন। আপনি দেখেন নি, ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, কি গভীর কি বিপুল সে নিষ্ঠা!

শুনিতে শুনিতে দরদরধারে সঞ্জীবের চোখ দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া গেল। নলিনী নীরব হইলে বলিল—আমার কথা—আমার কথা কি বলতেন তিনি আমায় বলুন!

নলিনী বলিল—আপনার কথা মানুষের কাছে কোনদিন বলতেন না তিনি। আপনার কথা তিনি বলতেন তাঁর বিশ্বনাথের সঙ্গে। তবে আপনাকে বলতে বলে গেছেন তিনি—উদ্গত আবেগে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সঞ্জীব ব্যগ্রভাবে বলিল—বলুন বলুন, থামলেন কেন?

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মৃত্যুর পূর্বদিন আমায় বললেন, কয়েকটা কথা বলে যাই, সঞ্জীবকে বলো মা তুমি। তোমায় ভার দিয়ে যাচ্ছি। বলো—তার মা হয়ে কোনদিন অনুশোচনা করতে হয়নি আমাকে। সে যে দুঃখে ক্লেশ পেল তারই জন্য দুঃখ আমার। নইলে সে আমায় দুঃখ কোনদিন দেয় নি।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সঞ্জীব বহুক্ষণ কাঁদিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর সৎকার?

নলিনী বলিল—তাঁর নির্দেশমতই করিয়েছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন—নলিনী, মণি-কর্ণিকা ঘাটে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে শ্মশানচণ্ডাল দিয়ে—

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—চণ্ডাল!

—হ্যাঁ, চণ্ডাল। আমিও সে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। তিনি বললেন—চণ্ডাল বলে ঘৃণা করো না। চণ্ডালের মধ্যে থাকেন আমার বিশ্বনাথ। সঞ্জীব আমার ছোট জাতকে অস্পৃশ্য বোধ করতে নিষেধ করত। জীবন থাকতে তো সংস্কার ত্যাগ করতে পারলাম না। মরে সেই অনুরোধ রাখব। এই নিন তাঁর চিতাভস্ম।

একটি সুদৃশ্য কৌটা হইতে ভস্ম লইয়া সঞ্জীবের ললাটে তিলক পরাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া হোটেলে থামিল।

অপরাহ্ণে ট্রেনে চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া সঞ্জীব ও নলিনী দেশে ফিরিতে-ছিল। ক্ষৌরকর্মের পর সুপরিচ্ছন্ন শুভ্র পোশাকে কৃশ সঞ্জীবকে দেখিয়া নলিনী একসময়ে বলিল—আপনাকে কেমন বোধ হচ্ছে জানেন?

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেমন?

—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিব মত।

ম্লানভাবে সঞ্জীব হাসিল। বলিল—বহ্নি এখনও আছে, বলছেন নলিনী দেবী ?

নলিনী বলিল—নিশ্চয়। বহ্নির বিনাশ নাই সঞ্জীববাবু।

অন্যমনস্ক ভাবে সঞ্জীব বলিল—হবে।

দু-পাশের প্রান্তব বহিয়া হু-হু শব্দে ট্রেনখানা চলিযাছে। জানালাব উপব হাত-দুটি ভাঁজিয়া তাহাব উপর মাথা বাখিয়া সঞ্জীব কি যেন ভাবিতেছিল। নলিনী বাহিবে পিছন-পানে ধাবমান পার্বিপার্শ্বিকেব দিকে একান্ত অন্যমনস্কেব মত চাহিযা ছিল। একটা স্টেশনে আসিয়া ট্রেনখানা থামিল। কযজন যাত্রী কামবাখানাকে প্রায শূন্য কবিযা নামিল। মিনিট দুই বিবতিব পব ট্রেন আবাব চলিল।

অকস্মাৎ সঞ্জীব ডাকিল—নলিনী দেবী!

নলিনী মুখ ফিরাইল। সঞ্জীব তখন মাথা তুলিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল। সঞ্জীবের সে দৃষ্টি দেখিয়া নলিনী শিহরিয়া উঠিল। প্রশান্ত দৃষ্টি তাহার অস্বাভাবিক উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেহের মধ্যে একটা অস্থিরতা সংযমের শাসন উচ্ছেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। নলিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল—শবীর কি অসুস্থ হয়ে পড়ল সঞ্জীববাবু ?

সঞ্জীব বলিল—না।

—তবে এমন করছেন কেন আপনি ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু নয়। আপনি আমাব মায়েব কথা বলুন।

নলিনী তাহাব এই আকস্মিক উত্তেজনার কাবণ কিছুই বুঝিল না। কিন্তু এই অস্বাভা-বিকতার অন্তরালে বেদনার সন্ধান যেন সে পাইল। সে সুগভীর সহানুভূতির সহিত বাছিয়া বাছিয়া মায়ের জীবনের এই কয় বৎসরের খুঁটিনাটি নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

আর একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিল।

সঞ্জীব বলিল—মায়ের কথা মনে করলে দেহে-মনে শক্তি পাই আমি। মাতৃভাগ্যে আমার মত ভাগ্যবান কম লোকই আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী গাঢ় স্বরে উত্তর দিল—সে কথা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নলিনী আবার বলিল—তিনিও তাঁর সন্তানভাগ্যের প্রশংসা করে গেছেন। মনকে আপনি পীড়িত করবেন না।

ইহার পর একটা নিস্তব্ধতায় দুজনেই যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গর্জনমান গতিশীল গাড়িখানার গতি, গর্জন কিছুতেই সে আচ্ছন্নতাকে যেন স্পর্শ করিতে পারিল না। বাহিরে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। গৈরিক-বর্ণ অসমতল প্রান্তর যেন নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

নলিনী সচেতন হইয়া উঠিল। বলিল—আমাদের নামতে হবে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীবও সচেতন হইয়া বলিল—হ্যাঁ। এই যে, এসে পড়েছি দেখছি। এইখানে একদিন বেড়াতে এসেছিলাম মনে আছে? এই বাংলোটা? এটা তো ছিল না। এই বাংলোটা নূতন হয়েছে দেখছি।

একটা টিলার উপর সুদৃশ্য একটি বাংলো দেখা যাইতেছিল।

নলিনী বলিল—এটা মহেন্দ্রবাবুর বাংলো। এইখানেই তিনি থাকেন এখন। থাইসিস হয়েছে তাঁর।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—থাইসিস হয়েছে! তারপর আবার বলিল—শক্তিমান পুরুষ। ওঁর মতকে পথকে আমি ঘৃণা করলেও, ওঁর শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি মিস গাঙ্গুলী।

ঠিক সেই সময়ই এই বাংলোটার মধ্যে খাটে শুইয়া মহেন্দ্রবাবু কথা কহিতেছিলেন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁহার অসুখ লইয়াই কথা। তিনি বলিতেছিলেন—ও ডাক্তারদের কথা বাদ দাও তুমি। ওরা যে যা বলে বলুক, এ সারবার রোগ নয়। ওয়াল্টেয়র, পুরী, সিমলে, নৈনীতাল যাওয়া, ও শুধু টাকার শ্রাদ্ধ করা। আমি এখানেই বেশ আছি।

কর্মচারীটি পুরনো লোক। বাবুর বাপের আমল হইতে এখানে কাজ করিয়া চুলে পাক ধরিয়াছে। সে বলিল—সারবে বলেই তো লোকে যায়। অন্ততঃ উপকারও তো হবে।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—সে উপশম এখানেও হবে। রোদ আর মুক্ত বাতাসের এখানে অভাব নাই। থাইসিসের বীজাণু—থাক, এত তুমি বুঝবে না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি আবার বলিলেন—কালই তাহলে তুমি সদরে যাও। না। কলকাতায়ই যাও, এটর্নীর বাড়ি। বিষয় বন্দোবস্তের খসড়াটা করে নিয়ে এস। বিষয় যেন ভবিষ্যৎ পুরুষেও কেউ ভাগ করতে না পারে—নষ্ট করতে না পারে। আমার বংশ যেন চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকতে পারে। এখানে আর কেউ প্রভুত্ব করছে এ আমি মনে করতেও শিউরে উঠি। গোপীনাথপুরের কি হল? ওটা ও এখনও দিতে চাচ্ছে না?

—না।

—যেমন করে পার যত দাম লাগে—ওটাকে কিনে ফেল। চাকলার মধ্যে বাড়ির দোরে ঐটুকু—ও আমি বাদ রেখে যাব না। বাদ রেখে গেলে ও আর হবে না। যেমন করে হোক—বুঝলে? ধর্ম-অধর্ম বাছতে গেলে চলবে না।

কর্মচারীটি নীরবে আদেশ শুনিল, কোন উত্তর দিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন—হাসপাতাল, ইস্কুল, কুয়ো, টিউবওয়েল যা যা সব করা হয়েছে সেগুলোর আলাদা একটা দলিল হবে। দেবোত্তরের কতগুলো সম্পত্তি নিয়ে ঐগুলোর মধ্যে দিতে হবে। তার থেকে এ সবের খরচ নির্বাহ হবে।

কর্মচারী শুনিয়া গেল। কিন্তু যেমন নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—দাঁড়িয়ে রইলে যে। কিছু বলবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা মুশকিল হচ্ছে—

—কি?

—আপনার সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কানাই একলা পেরেও উঠছে না।

—হুঁ।

মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সূর্য পাটে বসিয়াছে। অস্তরাগ-রঞ্জিত আকাশে বিচিত্র বর্ণশোভা।

কর্মচারীটি বলিল—পিসীমা বলছেন এসে থাকতে চান। বলছেন—আমার বয়স হল, মরতে চলেছি, আমার আবার রোগের ভয়! তা তিনি—

—না। পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে একের পর এক আর একজনকে ধরবে। সে হবে না।

—তা হলে কি কলকাতা থেকে একজন নার্সের ব্যবস্থা—

—না। সেও সুবিধে হবে না।

অকস্মাৎ যেন চিন্তার ঘোর হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—এক কাজ কর। কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে লোক পাঠিয়ে দাও।...না। একেবারে লোক পাঠিয়ে দাও, রমা বলে যে ঝি-টি এখানে ছিল তার কাছে। সে হয়তো আসতে পারে।

সঞ্জীবের শরীর ও মনের অবস্থা দেখিয়া যাই-যাই করিয়াও নলিনী যাইতে পারিল না। এক মাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। নলিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইবার তাহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা আসিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ আছে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার কর্তব্য যথাসাধ্য সে করিয়াছে।

কিন্তু এদিকে সঞ্জীবের অবস্থা দেখিয়া চিন্তা উদ্বেগ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ভগ্ন শরীরের এতটুকু উন্নতি হয় নাই। বরং যেন অবনতিই ঘটিয়াছে। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়ে সে। একটা বিমর্ষতার মধ্যে সদা-সর্বদাই যেন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহাকে প্রফুল্ল সজীব করিবার জন্য নলিনীর চিন্তার আর অবধি রহিল না। কিন্তু তাঁও যেন সে চায় না। তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা যেন সঞ্জীবের অহরহ। নলিনীর চিকিৎসকের মন, নানা কঠিন ব্যাধির উপক্রমণিকা এই অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করিল। কর্মে প্রবৃত্তি নাই, প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কোন বস্তুই যেন তাহাকে আকর্ষণ করে না।

প্রত্যহই নলিনী তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিত। সেদিন সে তাহাকে জোর করিয়া ধরিল।

—চলুন সঞ্জীববাবু, একটু বেড়িয়ে আসি। আজ আপনাকে যেতেই হবে। সেই টিলার উপরে যাব, চলুন।

সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—না।

—কমরেডের আহ্বান—এ আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

সঞ্জীব নীরব হইয়া রহিল। নলিনী বলিল—আমার অনুরোধ রাখবেন না সঞ্জীববাবু? দু-একদিনের ভেতরেই চলে যাব আমি। আপনাদের সেই টিলার ছবি বড় ভাল লাগে আমার।

সঞ্জীব আর না বলিতে পারিল না।

বৈশাখের অপরাহ্ণ। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়া রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও প্রখরতার শেষ নাই। পায়ের তলায় মাটির বুকে বসন্তে উদ্গত ঘাসগুলির মাথায় ছোট ছোট ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। আশেপাশে বহু আকন্দফুলের গাছ। সেখানেও সব ফুলের স্তবক শুকাইয়া গিয়াছে। তপোভঙ্গে রুদ্রের রোষবহ্নিতে বসন্তশোভার অন্তরালে মদন যেন ভস্ম হইয়া গেল। দিগন্তে এখানে ওখানে কালো মেঘ মাঝে মাঝে যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিতেছিল।

সঞ্জীবের কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে চলিয়াছিল নতমুখে নীরবে।

একস্থানে নলিনী বলিয়া উঠিল—এইখানেই আমাকে সেদিন ফুল পেড়ে দিয়েছিলেন, না?

সঞ্জীব বলিল—হুঁ।

নলিনী বলিল—আপনার কি হয়েছে সঞ্জীববাবু? অনেক দিন থেকেই জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। সঙ্কোচের জন্য তা পারি নি। আজ কিন্তু আর থাকতে পারলাম না।

সঞ্জীব শুষ্কস্বরে বলিল—কিছু তো হয় নি।

—আমার কাছে লুকোবেন না। শরীরে কি অসুস্থতা অনুভব করেন?

—না।

—তবে?

সঞ্জীব কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—মনের অসুস্থতা আমার। কিন্তু সে বলতে আমায় অনুরোধ করবেন না মিস গাঙ্গুলী।

ব্যথিত চিত্তে নলিনী বলিল—আমায় এত পর ভাবেন আপনি!

সঞ্জীব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—সাবধানে এবার মিস গাঙ্গুলী। টিলা আরম্ভ হল।

নলিনী হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—দুর্গম পথের যাত্রী আমরা। হাতে হাত দিন কমরেড। টিলার পর টিলা অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিয়াছিল।

নিস্তব্ধ গুমোট অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ একখানি ছায়া যেন মমতার মত

তাহাদের সঙ্গে আসিয়া পড়িল।

নলিনী বলিল—আঃ, ছায়াটি বড় মধুর লাগল, না সঞ্জীববাবু? দেখুন দেখুন সঞ্জীববাবু, কি ঘন কালো মেঘ!

সঞ্জীব মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল।—এ কি! এ যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে! উপরের দিকে তো তাকাই নি! ফিরুন, ফিরুন।

নলিনী তখনও আকাশের দিকেই চাহিয়া ছিল। পুঞ্জিত নিকষ-কালো মেঘ তুলার মত ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া দ্রুতবিস্তারে পরিধিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিক বিষণ্ণ নিথর। দলে দলে পাখীরা ত্রস্তস্বরে কলরব করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে লোকালয়ের দিকে। ঊর্ধ্বে আকাশের কোলে ঘূর্ণায়মান বিন্দুর মত চিল-শকুনেরা পাক খাইয়া খাইয়া ত্বরিত বেগে নীচে নামিয়া পড়িতেছিল। দূর-দিগন্তে একটা গর্জমান শব্দ ক্রমশঃ যেন নিকট হইয়া আসিতেছে।

দ্রুতপদে দুজনে ফিরিয়া চলিয়াছিল। গর্জমান শব্দটা ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ চারিদিকের মেঘাচ্ছন্নতার ছায়ার ম্লানিমা চকিত হইয়া উঠিল একটি তীব্র নীল দীপ্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গর্জনধ্বনি।

সঞ্জীব দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া দেখিয়া সে বলিল—ঝড় যে এসে পড়ল! আশ্রয়—আশ্রয় কোথায় পাই?

নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্ত একটি প্রগাঢ় ধূলার যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছিল।

নলিনীই তাহাকে ডাকিল—সঞ্জীববাবু, আসুন অমুন ঐ গর্তটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিই। রাস্তার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে কাহারা টিলার পার্শ্বদেশ কাটিয়া কাঁকড় লইয়া গিয়াছে। তাহারই ফলে ছোট একটি গহ্বরের মত আশ্রয়। তাহারই মধ্যে উভয়ে গিয়া আশ্রয় লইল। দেখিতে দেখিতে গর্জমান ঝড় টিলার মাথার উপর দিয়া বিপুল বেগে বহিয়া গেল।

ঝঞ্ঝাতাড়িত উপলখণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষে বিচিত্র শব্দ উঠিতেছিল। ঝড়ের প্রবাহের মধ্যে একটা উন্মত্ত হা-হা রব। ধূলার প্রবাহে চারিদিক অন্ধকার। ছোট গহ্বরটির মধ্যে দুটি নর-নারী শঙ্কাতুর বিস্ময়ে ঝড়ের এই উন্মত্ত লীলা দেখিতেছিল।

অকস্মাৎ নলিনী বলিয়া উঠিল—অদ্ভুত, এ অদ্ভুত সঞ্জীববাবু!

—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে আদিম যুগের মানুষ আমরা। ঝড়ের তাড়নায় আজই সর্বপ্রথম নীড় আবিষ্কার করলাম এই গহ্বরের মধ্যে। একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সঞ্জীবের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বিপুল উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ নলিনী, হ্যাঁ। আদিম যুগের মানুষ আমরা—আমি নর—তুমি নারী। ঝঞ্ঝার তাড়নায় গহ্বরের মধ্যে অকস্মাৎ একত্র হয়েছি

নীড় রচনার জন্ম। ভবিতব্যতার বিধানে—প্রকৃতির ইঙ্গিতে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে নলিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হাত দুটি ধরিয়া সঞ্জীব কম্পিত স্বরেই বলিল—নলিনী, আমি তোমায় ভালবাসি।

তাহার স্পর্শে নলিনী চমকিয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে বলিল—উত্তেজিত হবেন না সঞ্জীববাবু, আমরা কমরেড।

উত্তেজনাভরেই সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ—কমরেড, কর্মসাথী। নীড় রচনা করব আমরা দুজনে। আমি বয়ে নিয়ে আসব উপাদান, তুমি করবে রচনা। আমরা সত্যিই কমরেড।

নলিনী বলিল—সঞ্জীববাবু—সঞ্জীবাবু!

—শুনতে পাচ্ছি তোমার ডাক। কিন্তু জান নলিনী, প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করা চলে, কিন্তু প্রকৃতির প্রেরণাকে অবহেলা করবার সাধ্য কারও নাই। একদিন তোমাকে বলেছিলাম, রুদ্রের অনুচর আমরা, আমাদের তপোবনে মদনের প্রবেশ নিষেধ। ভুল—ভুল, স্বীকার করছি সে ভুল। তোমার কথাই সত্য, মদন ভস্ম হয়, কিন্তু প্রকৃতির দুলাল অতনুর গতি অবারিত।

নলিনী বলিল—সঞ্জীববাবু, তা হয় না। আর তা হয় না। মায়ের কাছে যে পথ আমি পেয়েছি—সে পথ ত্যাগ করব না, করতে পারব না। পথ ছাড়ুন আপনি।

সঞ্জীবের চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল। সে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—না।

দৃপ্ত ভাবে নলিনী বলিল—আপনি অতি বর্বর, অতি নীচ—অতি হীন হয়ে গেছেন।

সঞ্জীব বলিল—হয়েছি। জান, জেলে বসে বসে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কল্পনায় তোমায় নিয়ে আমি নীড় রচনা করে এসেছি। এ কদিন সেই কথা নিবেদন করবার জন্ম পাগলের মত অস্থির হয়ে ফিরেছি। বর্বর, হীন, নীচ যা বল তুমি, হয়েছি তোমার জন্ম, তোমায় আমার পেতে হবে।

নলিনী দৃঢ়স্বরে বলিল—পথ ছাড়ুন!

—না।

নলিনী দৃপ্তভাবে এবার সঞ্জীবকে ঠেলিয়া পথ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। সঞ্জীব যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রতিরোধকল্পে নলিনীকে ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। সে-ধাক্কা নলিনী সহ্য করিতে পারিল না। ঘুরিয়া উপুড় হইয়া সে শুইয়া পড়িল। সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল পাথরের মূর্তির মত।

নলিনী ধীরে ধীরে উঠিল। কপালে একটা ক্ষত হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল। রক্তের উত্তপ্ত স্পর্শে নলিনী কপালে হাত বুলাইয়া দেখিল—রক্ত। সে বলিল—দেখুন তো পাগলের মত কি করলেন? ছিঃ!

রক্ত দেখিয়া সঞ্জীবের যেন জ্ঞান ফিরিল। সে নত মস্তকে বলিল—সত্যিই আমি বর্বর, নীচ, হীন, মিস গাঙ্গুলী। আমায় মাফ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ত ঝড়ের মত বাহির

হইয়া গেল। দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে আকাশচারী বিহঙ্গের মত দূর-দূরান্তে সে যেন ভাসিয়া চলিয়াছিল। পিছন হইতে বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিল—সঞ্জীববাবু—সঞ্জীববাবু! সে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। দেখিল তাহার পশ্চাতে নলিনী তাহাকে আর্তস্বরে আহ্বান করিতেছে।

—এই ঝড়ের মধ্যে নির্জন প্রান্তরে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় যাবে তুমি! ফিরে এস—নয়তো দাঁড়াও। আমায় সঙ্গে নাও।

বহু কষ্টে সঞ্জীব ফিরিল। নলিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে বলিল—এত বড় শাস্তি দিতে চাও কেন তুমি আমাকে? কী করেছি তোমার আমি? কোথায় যাবে তুমি? জান, মা তোমার ভার আমায় দিয়ে গেছেন!

সঞ্জীব স্থির দৃষ্টি তাহার উপর স্থাপন করিল এবং বলিল—সত্যি কথা নলিনী?

নলিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল—ঝড় এখনও থামে নাই। এস ওখানে যাই। যে নীড় রচনা করেছি, আজ এত শীঘ্র তাকে ভেঙে দিয়ো না।

গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নলিনী বলিল—হ্যাঁ, মা তোমায় আমার উপর ভার দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমায় কমরেড হিসাবে চেয়েছিলে, তারই উপযুক্ত করে আমাকে গড়ে তুলেছি আমি।

কয়েক ফোঁটা রক্ত তাহার নাক বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল। সেটুকু অনুভব করিয়া বলিল—কিন্তু এ কি করলে বল তো!

রক্তের ধারা সে মুছিতে গেল। বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—মুছো না। এস, ওই রক্ত নিয়ে আমি তোমার সীমন্তের সিঁদুর রচনা করে দিই। গুহার মধ্যে মিলন আমাদের—এই আমাদের বিবাহ। আমি নর—তুমি নারী। আমি বর—তুমি বধূ। একসঙ্গে দুজনে নীড় রচনা করব। এক কর্মে আমাদের চারখানি হাত অগ্রসর হয়ে আসবে। আমরা কমরেড—এস।

* * * *

আরও কয়টা টিলার পরে—একটা টিলার উপর সেই বাংলোটার মধ্যে তখন মহেন্দ্রবাবু শয্যায় শুইয়া ঝড়ের আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন। রমা আসিয়া শার্সিগুলি বন্ধ করিয়া দিতেছিল।

রমা আসিয়াছে—আজই আসিয়াছে। আহ্বান মাত্রেই সে আসিয়াছে। মহেন্দ্রবাবু মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন তখন।

কর্মরতা রমার দিকে চাহিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—রমা!

রমা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন—তুমি থাকবে তো রমা?

মৃদু অনুচ্চ স্বরে শান্ত মেয়েটি বলিল—থাকব।

তাহার হাত ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—উইলে তোমায় আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবো রমা।

তিনি তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া রমা বলিল—না।

বাবু বলিলেন—ঈশ্বরের দিব্যি রমা—

রমা শুধু হাসিল। বিচিত্র তিক্ত হাসি।

তারপর বলিল—ওষুধ খাবার সময় হয়েছে আপনার।

বিবিধ

কালাপাহাড়

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই। বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশী বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, তাহা না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মতো ভুলিতেও চায় না।

যশোদানন্দন বসু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মন তাই কর গে যাও, দুটো হাতি কিনে আন গে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপব অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, হাতি—হাতি। বলি, ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি ?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল। গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল—সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতি কেন ? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মত ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা শীষ ! চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখলে এমনি মুখ্যুই হয় কিনা ! বলি, হাঁ'রে মুখ্যু, ভালো গোরু না হলে চাষ হয় ? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রংলাল ধরিয়াছে এবার সে গোরু কিনিবে। এই গোরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েকদিন হইতেই কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম। বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয় এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ। তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রং, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মত গোরু যেন আর কাহারও না

থাকে। গোরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায়; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা কেষ্টর জীব!

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর গতবার ধানও মন্দ হয় নাই, এইজন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গোরু তাহার চাই-ই। একজোড়া গোরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গোরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোনোমতে বলা চলে না, কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গোরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি, আর এবারও যদি ধান ভালো হয় তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা?

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রংলাল জানে না, তবু গোরু তাহার চাই-ই।

অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গোরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল একশত টাকা, বাকি একশত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? তুমি গোরু কিনে আন না। কিনে আনলে তো কিছু বলতে লারবে।

রংলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?

যশোদার মা বলিল, এ গোরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গোরু কেনো তুমি। ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায়?

সে আপনার গয়না কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যাক, রংলাল টাকা-কড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু-মহিষের বাজারে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মতো দুইটি গোরু সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মতো সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি। পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হু-হু! এ যে—ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা!

হাজার হাজার না হলেও গোরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনিই অনুপাতে জুটিয়াছে। গোরু-মহিষের চীৎকারে, মানুষের কলরবে সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে এক ফোঁটা ছায়া কোথাও নাই।

মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গোরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলো চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মতো—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্চা! আরবী ঘোড়া!

রংলাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপনার মনের মতো সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয় যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ওই দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ারগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মতো। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাত কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতকগুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানে কী আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাঁও দাও; লাঠি-গাছটা দাও হে!

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত না হয় খানিক, টুকচা রক্ত পড়ত, আর কী হত!

রংলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত আর কী হত?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও!

রংলালকে ভালো করিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কী, লাঠির প্রান্তে যে সূচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নেই, দিয়ে দাও ভাই!

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল—সূচের অগ্রভাগই বটে; একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় সূচ বসাইয়া রাখে, ওই সূচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কী, কিনবে কী কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই!—বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

চারিপাশেই মহিষের মেলা; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গোরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষপ্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই। কয়েকজন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট; দেখি আবার কোথায় যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্তুতে নিয়ে কী করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ!

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ, লাঙল বড় করলেই জানোয়ার জব্দ! এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষ-জোড়াটার দিকে চাহিয়াছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে! কালো রং! নিকষের মতো কালো। শিঙ দুইটির বাহার সব চেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে, পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ওই জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রংলাল ওই মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ঐ টাকাতেই তাহার হইল; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিন আবদ্ধ হইয়া আছে। সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর সম্বল নাই, তখন একশত আটানব্বই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়া-জানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা

ছাড়া এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্তের মতো উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কী বলিবে? মহিষেব নাম শুনিলে জলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক-এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে সে কথা কেহ জানে? রংলালের মনে হইল—মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই এক জোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু এক জোড়া বলদ কিনিয়াছে; সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভালো নয় বাপু। বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ-গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনিলাম?

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?

হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি?

হ্যাঁ।

আর এমন করে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জলে যাচ্ছে।—যশোদার মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

আহা-হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল। লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিন্দুর লাও—চল দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো!

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় ক-গোছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট! এক-একটির কুম্ভকর্ণের মতো খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ংকর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে

রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

রংলাল বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে! ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা।

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল, অ্যাই খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে। বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ।

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মতো চেহারা।

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড। আর এইটার নাম কী হবে বল দেখি?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর একটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে।

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোসাঁই-ই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে তা নয়, এটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখো। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো তুমি?

যশোদা বলে, যাবে কোন দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ওই আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে; কখনও কখনও বা ছুটিতে আরম্ভ করে। রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন

প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন ?

রংলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি নাকি ? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনও বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে ; রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে ; রংলাল হাসে।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কী মনান্তর যে ঘটে ;—উহরা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মতো সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন আপন শিঙ উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকে পিটাইতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকে সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে ; তারপর পৃথকভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই ! একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবি—তবে তো।

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মতো গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সে ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল,—আঁ—আঁ—আঁ !

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল,—আঁ—আঁ—আঁ !

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল—কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার একদিকে কালাপাহাড়, অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়া অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিঙ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উন্নত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিঙ দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিঙ বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণাকাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দুই-একটা আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে। চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে। রংলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর-হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল দেড়শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চার-খানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিঙ বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দেবো তোমার তা বলে, হ্যাঁ!

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে পারছে না। কতদিনের ভাব! —কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে।

মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে! ওরা হল বন্ধু।

তা বটে। রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠ ওঠ, চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মাশায়, শীগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়। আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে।

রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দু অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড়ের অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মতো পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই, সে নির্মম-ভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহুকষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ সত্যই খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্‌দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল দেখি—দেখি!

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল! রংলাল পরম স্নেহে তাহার

মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রংলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে—আঁ—আঁ—আঁ!

সে ঊর্ধ্বমুখ করিয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ওই নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গোরুর বাছুরকে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহুদিন অবুঝের মতো সে তাহাদের পেটতলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবার জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিঙ দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল, ষাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায়?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৫

আঁ—আঁ—আঁ!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ—আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়! কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপরে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধকোশ ছুটে পালাই তবে রক্ষে। তখন উ আপনার বিশ্বে, একবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে—

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ওই পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে পরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও হাটে বড় যায় না।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়া জানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতে পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল। মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গো-হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা। এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার কালা-পাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালোই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা -ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল,—আঁ—আঁ—আঁ!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল চল!

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মতো চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই!

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ। এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতে ছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিঙ দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল।

কিন্তু এ কি! এসব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা! ওটা কী?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ-হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ? ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ--আঁ—আঁ! কিন্তু এ কী! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায় কত দূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানা তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে। পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল।—কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভালবারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কনেস্টবলকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।

বেদেনী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, ভোজবাজি—'ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি,—সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি, অন্য পাশে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্ন মুণ্ড। প্রবেশ মূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে 'গোলোকধামের' খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজ বিবিকা কবর'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটি ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘটাকে চুমা খায়। সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম দুম দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল বাজায়—ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে—বাঘ! ওই বড় বা-ঘ!

বেদেনী প্রশ্ন করে—বড় বাঘ কি করে?

—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলা শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল-কম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকতক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর

একটি বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্ত নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির উপর একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে।

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রূর-নিষ্ঠুরতাপরিব্যঞ্জক এক ধারার উগ্র তামাটে রঙ আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দন্তুর সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে, তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল; সে বলিল—দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল—কে বটে, মালিক কে বটে?

—কি চাই? তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, লম্বা হালকা দেহ,—তেজী ঘোড়ার যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হালকা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রঙ কালোই, নাকটি লম্বা টিকালো, চোখ সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মত একজোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি-চুল, গলায় কারে ঝুলানো একটি সোনার ছোট চাকা তক্তি—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছিল।

—কি চাই? নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচে বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল—এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল—সে হবে, আগে মদ টুকচা—

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল। কালো সাপিনীর মত ক্ষীণ তনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতার মত সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা টানা অর্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুইটি চোখে, সুচালো চিবুকটিতে—সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল, মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিদিকে হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিলখিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল, বাক হর‍্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল—বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব! এস।

কথা সত্য, এই জাতিটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়; কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা—। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তুই আইছিস কেন এখেনে?

রাধিকা এবারও খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলা মুড়ি পেঁয়াজ লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া ঊর্ধ্ববাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মত লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—তোমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা ঝুলির;

আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল—কি নাম গো তুমার বাজিকর ?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

—কেনে ?

—নাম বটে কিষ্টো বেদে।

—তা গালি দিব কেনে ?

—তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—কই, কালীয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি !

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল ; কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, একটা কালো কেউটের বাচ্চা ! আহত সর্পশিশু হিস্-হিস্ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল, শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল—আ-কামা—অর্থাৎ বিষ-দাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল ; এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই-ই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল ; কিন্তু রাগে সে মুহূর্ত-পূর্বের ওই সাপটার মতই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে ?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বলল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরও একটু দূরে একটা গাছের

পাশে নামাজ পড়িতেছে কেষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসাপূজা করে মঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দুপুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেদের বলে—পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ-আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলাম পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়। অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়, কিন্তু নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া বাঘটাকে সে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম, মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার যে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল—তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধ শম্ভু বলিল—তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল—না, জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল—ওরে মড়া, মড়ার নাচ দেখতে কার কবে ভালো লাগে রে! আমারে বলে, তুই জানছিস সব!

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুটি পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল—ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিল—কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল, বেইমান তাহাকে এত বড় কথা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ। তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা

তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতের। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ধামা বুনিত, চেয়ার পালিশের কাজ করিত, ফুলের শৌখিন সাজি তৈয়ার করিত, তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত। সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস, রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী, রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আর একটা কত বড় গুণ ছিল। তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা সুতার ঘন ঘন ঘর কাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালোবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু, আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল, রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত, সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল—এই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন!

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—শখ যে খুব! পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না, তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কি অদ্ভুত কথা! বলে—বাঘ দেখাইবে! সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, সত্যি বলছ?

—বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই

বাঘ দেখাইয়াছিল। রাধিকা সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল।

—ই বাঘ নিয়া তুমি কি কর ?

—লড়াই করি, খেলা দেখাই।

—আঁ্যা !

—হ্যাঁ, দেখবি তু ?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল – তু এইবার সাপ দেখা আমাকে।

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল—উটা তুমার পোষ মেনেছে ?

হি-হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাতেই আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে-সব গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল ; শম্ভু যাহা রোজগার করে সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল ! সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ওদিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে। দোসরা দফায় খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথরাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয় ?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ-পোশাক, চোখ রাঙা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে ইথে দোষটা কি হল ? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হচ্ছে ! খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল ?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল—খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার ! অপমান করতে আসছিল তু !

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট-কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে ইটটা

বলের মত লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্ত কয়টা মুহূর্তের জন্ম যেন গুম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইঁট কুড়াইয়া লইল; শম্ভু তাহাকে নিরস্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া কোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল—এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাত ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাত খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে!

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরত দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, পুলিসে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব।

ওদিকে টিয়াপাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা।

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুতে আগুন ধরিলে ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়। কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল, উঠিয়া দেখিল শম্ভু নাই, সে বোধ হয় দুই-চারিজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। এ কি! সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন—ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব।

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল—কি কসুর করলাম হুজুর?

—মদ আছে কিনা দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন; কিন্তু সে আর তাঁহার ভুল ভাঙাইল না। সে বলিল—ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে হুজুর—

—আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে,

শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া রাধিকা বলিল—পুলিস আইছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন—এ তাঁবু তোমার ?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল—জী হুজুর।

—দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়া ছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল—ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে !

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল। রাধিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল—খাবা, ছেলে খাবা ?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল—সব মাটি করে দিছিস তু ; উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিসে বলে এলাম, আর তু করলি এই কাণ্ড !

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গতরাত্রির কথা, সত্যই এ কথা তো সে বলিয়াছিল ! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ন হইতে এই তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোশাকটি বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙের মত সরু প্যাণ্টালুন, আর একটা কালো রঙেরই খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাগরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল-মোটা, হবিয়ার মতো ঝুলাজী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটা জাঙিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের

বড়িস। কুৎসিত মেয়েটাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মত একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে।

আর এই কতকালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ!

রাধিকা রুদ্ধ স্বর কোনোমতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহভরেই বলিল—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্রক আর্তনাদের মত গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। ক্রুর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে। রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল—ফিন একবার।

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয়বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবল গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি উটা?

—কেরাচিন। আগুন লাগায়ে দিব উহাদের তাঁবুতে। পুরা পেলুম নাই, দু সের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—লিয়ে আয় মদ!

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল—দাউ-দাউ করে জ্বলবেক যখন!

সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে। উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল! দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—এখুন লয়, সেই নিশুত রাতে।

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে; বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল,

এক মুহূর্তের জন্ম তাহার চোখে ঘুম আসে নাই।

বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থমথম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া গেলে তবে এদিকটায় মেলার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রুর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া সনসন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাতিয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মত পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতে লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলো কি নিটোল! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ— ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন! দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল—হ্যাঁ, চুপ।

কিষ্টো চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল—দাঁড়াও, মদ আনি।

—না। চল, উঠ, এখুনই ইথান থেক্যে পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল—কুথা ?

—হু-ই, দেশান্তরে।

—দেশান্তরে ? ই তাঁবু-টাবু ?

—থাক পড়্যা ! উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উয়ার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না ?

সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া, তাহার উপর দুরন্ত যৌবন, কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল—চল্ !

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল—দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল—চল্ !

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—মরুক বুড়া পুড়্যা !

আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা

আগুনের আসল সত্তা উত্তাপে। সে তার মৌলিক সত্তায় সর্বত্র আছে, কিন্তু থাকলেও সে দৃশ্যমান নয়। অকস্মাৎ বস্তুপুঞ্জকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করে। তখন উত্তাপের সঙ্গে দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়। প্রদীপে তেল আছে সলতে আছে—শিখা নেই, সেই শিখাটি নিতে হয় অন্য একটি জলন্ত প্রদীপের শিখা থেকে। নানান মানুষের জীবনে নানান গুণের উপকরণ থাকে কিন্তু উপকরণগুলির অবস্থা মাটি বা ধাতুর প্রদীপ, ঘি বা তেল বা ওই জাতীয় কিছু এবং সলতের মত। সে প্রদীপরূপে সার্থক হয় অন্য জলন্ত প্রদীপের শিখা থেকে নিজেকে জ্বালিয়ে নিয়ে। শতকরা নিরেনব্বুইটি ক্ষেত্রে কীর্তিমানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বা কীর্তির সংস্পর্শে এসে নবীন জীবনের দীপাধার তেল সলতের উপকরণ প্রদীপ হয়ে জলে ওঠে ; জীবনে গুণের উপকরণে আগুনের ছোঁয়া লেগে ভিতরের আগুন শিখায় আত্মপ্রকাশ করে।

সাহিত্যিকের জীবনে কোন সাহিত্যিকের সংস্পর্শ বা কোন সাহিত্যিকের কীর্তির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ই সেই আগুন ছোঁয়ানো। সেই কারণেই ওই সংস্পর্শে বা কীর্তির সঙ্গে পরিচয় তার জীবনে অবিস্মরণীয়। আমার জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা বইখানি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। বিচিত্র ভাবে এই গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল বোধ করি মাসখানেক আড়াআড়ি।

১৯০৭-৮ সাল। আমার জন্ম ১৮৯৮ সালে ; বয়স তখন ১০-১১। পড়ি বোধ করি আজকালকার ক্লাস ফাইভ-সিক্সে। তখনও পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে পড়েছি কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাসের রামায়ণ মহাভারত। আমাদের বাড়িতে কিছু বইয়ের সংগ্রহ ছিল, মায়ের বাড়িতে কিছু বইয়ের সংগ্রহ ছিল, মায়ের থাকত। কিছু উপন্যাস ছিল এবং বাবার সংগৃহীত পুরাণ সংহিতা ইত্যাদি ছিল অনেক। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা অনুবাদ। মধ্যে মধ্যে উল্টে দেখে পড়তে চেষ্টা ক'রে নিরুৎসাহিত হয়েছি। বাংলা বই থাকত সব থেকে উপরের থাকে। নাগাল পেতাম না। কিন্তু নাগালের চেয়ে আগল ছিল বেশী। মা প্রায় ছুঁতে দিতেন না। কাব্যের মধ্যে ছিল ভারতচন্দ্র। আরও কিছু ছিল যার নাম আজ ভুলে গেছি। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছি—কোন বই দেখি নি। শরৎচন্দ্র তখনও উদয়দিগন্তের অন্তরালে। এই সময় একদিন ঘটল অঘটন। প্রায় শৈশব থেকেই আমি পিসীমার কাছে মানুষ হয়েছি, তাঁর হাতেই খাওয়া, তাঁর কাছেই শোওয়া, তিনিই তেল মাখিয়ে নাইয়ে দিতেন ; তাঁকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না ; মাকে ভয় করি—দূরে দূরে থাকি। পিসীমা গেলেন কোথায় কোন্ তীর্থে। সারাটা দিন কোন-রকমে কাটল, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আমার অবস্থা হ'ল সন্তমাতৃহারা বালকের মত। মা সন্ধ্যেবেলা অনেক ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়াবার জন্ম গল্প বললেন। মা আমার খুব ভাল গল্প

বলতেন। ঘুম এল কিন্তু হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে, মা এবং আমার অন্য ভাইবোন ঘুমুচ্ছে। বাবা তখন নেই, বিগত হয়েছেন, তাঁর বড় খাটখানা শূন্য পড়ে রয়েছে। আমি খোলা জানালার ধারে ব'সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আজও জানালার মধ্য দিয়ে দেখতে না পাওয়া আকাশ এবং সেই তারাগুলিকে আমি দেখতে পাই। মা কখন জেগে উঠছিলেন বুঝতে পারি নি, চমকে উঠলাম তাঁর কথায়।—কিরে ঘুম আসছে না! ঘাড় নেড়ে উত্তর দিয়েছিলাম—না। মা একটু চুপ ক'রে থেকে আলোটা উস্কে দিয়ে আলমারি খুলে বই বের ক'রে এনে বলেছিলেন—বই পড়ি, শোন। পড়তে লাগলেন তিনি, আমি আকাশের দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

"প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।"

কয়েক পংক্তি পড়িতেই একটা গভীর উৎকণ্ঠা আমাকে আচ্ছন্ন করলে।—"রাত্রিশেষের কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল।"

নৌকা পথ হারিয়েছে।

আরও খানিকটা যেতে না যেতেই নবকুমারকে ভালবেসে ফেললাম। দুঃসাহসী নবকুমার কুড়ুল কাঁধে একলা কাঠ আনতে বেরিয়ে গেল।

তারপরই নদীতে এল জোয়ার; খাবার-দাবার ভেসে গেল, যাত্রীরা কোনরকমে নৌকায় উঠে পড়ল; নাবিকেরা সুনিপুণ নয়, নৌকা সামলানো গেল না, জোয়ারের বেগে নৌকা চলল উজানে—নবকুমার প'ড়ে রইল রসুলপুরের নদীর বালুচরের মধ্যে। জনহীন বালুচর, বাঘ ঘুরে বেড়ায়। জল লবণাক্ত, পাদপছায়াহীন, আশ্রয় নাই। ক্লান্ত নবকুমার ঘুমিয়ে পড়ল—আমি তার শিয়রে জেগে বসে রইলাম। দেব-দেবী নয়, রাজা-রাজপুত্র নয়, রাক্ষস-রাক্ষসী নয়—নবকুমার আমাদের গ্রামের তরুণদের যে কোন একজনের মত। কাপালিক, সেও আমার দেখা। তন্ত্রের দেশ—খাঁটি না হোক, মেকী অনেক দেখেছি। বেশভূষায় আচারে-আচরণে অচেনা নয়। তারপর দেখলাম অপূর্ব নারীমূর্তি। কেশভার অবেণীসম্বদ্ধ সংসর্পিত—রাশীকৃত আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার। যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। মানে বুঝলাম না, কিন্তু ছবি দেখলাম। অপূর্ব সে ছবি। কোন রাজকন্যার চেয়ে সে কম মনোরমা নয়। এর আগে কোন গল্পে—কোন বইয়ে এমন স্পষ্ট ছবি দেখি নি। এর নূতন স্বাদ নূতন গন্ধ নূতন স্পর্শ। গোটা বইখানা শেষ হল; কপালকুণ্ডলা নবকুমার তটভূমির সঙ্গে মহাশব্দের সঙ্গে খরস্রোতা নদীগর্ভের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে হারিয়ে গেল। সে শব্দ আমার বুকের মধ্যে উঠল, হাহাকার ক'রে উঠল অন্তর। কাঁদছিলাম তার আগে থেকেই, নবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছিলাম।

নবকুমার কহিলেন—কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ী! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।—বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে

লাগিল। তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।—এই বলিয়া নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।"—তখন থেকেই কি তারও আগে থেকেই কাঁদছি।

কপালকুণ্ডলা কাহিনী আমার চোখের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাবে যেন ঘটে গেল। অবিস্মরণীয় হয়ে রইল আমার জীবনে। শুধু অবিস্মরণীয় নয়, কপালকুণ্ডলা আজও আমার কাছে চিরনূতন। অনেক ছবি আমার অলস মুহূর্তে অকস্মাৎ ভেসে ওঠে। অনেক স্থান আমার মুখস্থ থেকে গেছে।

কাপালিকের বন্দী নবকুমারের পিছনে—কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব। "এমন সময় নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী কপালকুণ্ডলা। তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে।"

তারপর পথে দেবমন্দিরে অধিকারীর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার একটি কথা। "বি-বা-হ।" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন—"বিবাহের নাম ত তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?" এই কথা ক'টির মধ্যে কপালকুণ্ডলা জলতলের শুক্তিগর্ভের একটি অকলঙ্ক শুভ্র মুক্তার মত স্বরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিন এটা বুঝি নি নিশ্চয়, কিন্তু আশ্চর্যভাবে এইস্থানে ছবিটি মনের মধ্যে ধরা পড়ে রয়েছে। এমন নারী জীবনে দেখি নি। এর সন্ধানে সমুদ্রতটে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বের হতে ইচ্ছে করে।

আর একটি জায়গা অনেক স্থানে আমি প্রসঙ্গক্রমে বলে থাকি। এই ত কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনের পথে—ডঃ কালিদাস নাগ—শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায় আই সি এস প্রভৃতি একদল লোকের মধ্যে নবকুমার এবং মতিবিবির সাক্ষাৎকারের কথাগুলি বললাম। প্রসঙ্গটা ছিল বোধ করি উপন্যাসে নাটকীয় উপাদানের কথা।

চটীর পথে অন্ধকারে নবকুমার 'ভগ্ন শিবিকায়' ধাক্কা খেয়ে, শিবিবাহকের মৃতদেহে পা দিয়ে—কপালকুণ্ডলার সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছ?"

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল—আছি।

নবকুমার কহিলেন—কে তুমি?

উত্তর হইল—তুমি কে? নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কপালকুণ্ডলা না-কি?

স্ত্রীলোক কহিল—কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না—আমি পথিক, আপাতত দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।

আশ্চর্য চমকে মনটা চমকে ওঠে। কে এই নারী, যে দস্যুর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে মানুষের সাড়া পেয়েও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে না—এমন কৌতুকভরে উত্তর দেয়? এবং চটীতে যখন এই মেয়েকে প্রদীপের আলোয় দেখি—যখন প্রত্যাশা পূরণে খুশী হয়েই দেখি

যে, সে অসামান্য সুন্দরী। "রূপরাশিতরঙ্গে তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণ নদীর স্থায় উছলিয়া পড়িতেছিল। তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।"

সুন্দরী নবকুমারের সঙ্গে নিজের রূপ নিয়েই রহস্তের সঙ্গে বাক্‌বিনিময় করছিলেন। "নবকুমার দেখিলেন—এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন—আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্বে জিজ্ঞাসা করিলেন—একটিও না?

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্বে উত্তর দিলেন—একটিও না—এমত বলিতে পারি না।

—তবু ভাল! সেটি কি আপনার গৃহিণী?

—কেন? গৃহিণী কেন ভাবিতেছ?

—বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

—আমি বাঙ্গালী, আপনিও ত বাঙ্গালীর স্থায় কথা কহিতেছেন, তবে আপনি কোন্ দেশীয়?

—অভাগিনী বাঙ্গালী নহে, পশ্চিম প্রদেশিয়া মুসলমানী।

নবকুমার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিম প্রদেশিয়া মুসলমানীর স্থায় বটে। কিন্তু বাঙ্গলা ত বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন—

"মহাশয় বাগ্‌বৈদগ্ধে আমার পরিচয় লইলেন, আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী, সে গৃহ কোথায়?"

নবকুমার কহিলেন—আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন—দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?

নবকুমার কহিলেন—নবকুমার শর্মা।

"প্রদীপ নিভিয়া গেল।"

এই 'প্রদীপ নিভিয়া গেল'—এই কথা কয়টির তুলনা হয় না। আজও এমন একটি লাইন আমি খুব কম পেয়েছি।

বোধ হয় এ প্রদীপ নিভবার আগেই আমার মনের প্রদীপে শিখা জেলে দিয়েছিল।